বনফুল রচনাবলী

(চতুর্বিংশ খণ্ড)

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭
সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
ফটো-টাইপ সেটিং
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

মুদ্রণ : প্রিণ্ট ও-গ্রাফ্
ভবাণী দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ রূপায়ণে :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস

আশাবরী

নাম সত্যেন। সত্যেন ভদ্র।

ছোঁড়াটা হতভাগা। বয়স বছর পঁচিশ। মামার বাড়িতে থেকে ইতিহাসে এম-এ পাস করেছে। চাকরি জুটছে না। অনেক দরখাস্ত করেছে চারদিকে। কোথাও কিছু হয় নি। মামা যদিও তাড়িয়ে দেন নি, মামীমা যদিও বলেন নি আমি আর তোমার জন্যে দুবেলা খাবার তৈরী করতে পারবো না, তবু চলে এসেছে সে সেখান থেকে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দেখে অনেক ফেরিওয়ালা ফেরি করছে, অনেক রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে, অনেক কুলি মাল বইছে, অনেক মজুর রাস্তা তৈরি করছে, অনেক মূর্খ লোক গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগার করছে। সে কিন্তু কিছুই করছে না পয়সা রোজগার করবার জন্যে। ওসব করবার সামর্থ্য নেই তার। চাকরি জুটলে করতে পারত, চাকরি জোটে নি। ফ্যানের তলায় চেয়ারে বসে কেরানীগিরি করবার সুযোগ যদি পেত অনায়াসে করতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ পায় নি। পাওয়ার আশাও নেই। তাই এখন ভিক্ষা করে। এ ও একরকম উপার্জন। পেটটা চলে যায়। রাস্তাতেই শোয়। কখনও কোনও বড় লোকের বাড়ির বারান্দায়। কখনও বা স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে। কখনও বা ফুটপাথের ওপরই। সে কিন্তু নিতান্ত নিঃসম্বল নয়। একটা ছেঁড়া কাঁথা যোগাড় করেছে। সেইটে পেতেই শোয় রাত্তিরে। সেইটে জড়িয়ে পুলিন্দার মতো করে বগলে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। গায়ে ছেঁড়া একটা আলখাল্লা কোট। কোটের পকেটে একটা খাতা। আর একটা পেন্সিল। কবিতা লেখে। আধুনিক ধাঁচের কবিতা লেখবার চেষ্টা করে। সব সময়ে কিন্তু হেঁয়ালি বানাতে পারে না। মানে বোঝা যায়, মামুলী মানে। তবু চেষ্টা করে সে। কবিতা না লিখে পারে না। ওটাই একমাত্র অবলম্বন। আর একটা অবলম্বন আছে—প্রিয়া। যে প্রিয়া নেই সেই প্রিয়া। যে প্রিয়া বাস্তবে দেখা দেবে না, যার রূপ নিত্য নূতন, সেই প্রিয়া। তার সঙ্গে সে রোজ কথা কয়।

শহরে অনেক পার্ক আছে, স্কোয়ার আছে। তারই একটাতে ব'সে কবিতা লেখে সে দুপুরে। দুপুরে লোকজনের ভিড় থাকে না। কবিতা লিখে প্রিয়াকে শোনায়।

সেদিনও তাই করছিল। কল্পনা করছিল চাঁ চাঁ দুপুরের রোদে তার পাশে বসে আছে টুকটুকে ফরসা একটি মেয়ে। মাথায় ঘোমটা নেই। পিঠে লম্বা-চওড়া কালো বেণী দুলছে পিঠ-কাটা ব্লাউসের উপর। মুচকি মুচকি হাসছে আর নখ খাচ্ছে।

> আকাশ, ছুঁচো আর ফটকিরি
> ভালবাসে পালক-মেঘের চচ্চড়ি।
> আমি বাসি না।
> আমি ভালবাসি
> গরম গরম ফুলকো লুচি,
> যে লুচি ভাজা হচ্ছে
> কুষ্টি-উনুনের ধিকি ধিকি আঁচে

মিষ্টি দৃষ্টির পরদার আড়ালে।
আমার ইচ্ছে দেখে
হাসছে গ্যয়টে
শেক্সপীয়রকে জড়িয়ে,
ন্যাংচাচ্ছে গেঁটে বাত,
হাঁচছে শীলার,
কাশছে টলস্টয়।
ওরা ভাবছে
আমি সংগত করব ওদের সংগে তবলা নিয়ে।
কিন্তু করব না
কভি নেই।
আমি একক, আমি স্বতন্ত্র, আমি অনন্য
আমি ভিখারী হয়েও সম্রাট।
মনের বাসনার খিড়কির ফাঁক দিয়ে
বেরিয়ে এল কামনা-টিকটিকি ল্যাজ ঘুরিয়ে,
বললে আমিও।
উপরে চেয়ে দেখলাম
আকাশ নীরব
সে কিছু বলছে না।
তুমিও বলবে না?

সে স্থানে তার পাশে প্রিয়া নেই। তবু চেয়ে দেখল একবার। রোজই দেখে। দেখতে পেল দূরে আর একটা লোক ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

এগিয়ে এল লোকটা।

'কি লিখছিসে—'

কেমন যেন লজ্জা হল তার। খাতা পেন্সিল পকেটে পুরে সলজ্জ হাসি হেসে বলল, 'কিছু না'। পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশ করল ভিক্ষুকটা।

বলল—'সমস্ত দিন খাই নি। কিছু দেবেন?'

লোকটা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েই রইল একটু। তারপর একটা দশ নয়া ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে পার্ক থেকে। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ ফুটপাথের উপর।

জনস্রোত চলেছে। আর চলছে মোটর গাড়ির সারি। চলেছে ট্রাম বাস লরি। চলেছে টেম্পো, ঠেলাগাড়ি।

তারপরই হঠাৎ একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল একটু দূরে। লোক জমে গেল। কাকে যেন মারছে অনেকে মিলে। একটা পকেটমার ধরা পড়েছে। সে-ও এগিয়ে গেল। দশ-বারো বছরের ছোঁড়া একটা, নির্দয়ভাবে মারছে তাকে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

'আর কখনও করব না—আমাকে ছেড়ে দাও, আর মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি।'

তারস্বরে চীৎকার করছে ছেলেটা।

ওরা কিন্তু ছাড়বে না। মেরেই চলেছে। তারপর পুলিস এল।
ও সরে গেল সেখান থেকে।
গেল একটা খবরের কাগজের স্টলে। সেখানে কাগজগুলো উল্টে 'নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি' অংশটা দেখল। রোজই দেখে। না, তার মামা তার খোঁজে কোন বিজ্ঞাপন দেয় নি।
চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। হাঁটতেই লাগল অনেকক্ষণ। তারপর একটা চানাচুরওলার দেখা পেল। চানাচুর কিনল খানিকটা। তাই চিবুতে চিবুতে আরও খানিকক্ষণ হাঁটল। পা ব্যথা করতে লাগল। বসে' পড়ল শেষে ফুটপাথের ওপরই একটা বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

॥ ২ ॥

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটছিল। পাশে সামনে পিছনে লোক চলছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। নানা রঙের পোশাক পরা। অধিকাংশই সাহেবী পোশাক। কেউ কাউকে চেনে না। সবাই চলেছে নিজের ধান্দায়। রাস্তার উপর ট্র্যাফিক জ্যাম।হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগুলো। একটা সাইকেল ক্রিং ক্রিং ক্রিং করতে করতে এগিয়ে এল। তার ওপর বসে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি। মাথায় গান্ধী টুপি, গায়ে লাল কামিজ, পরনে কালো চোং প্যান্ট। তার পিছনে তাকে জড়িয়ে বসে আছে একটা মেয়ে। তার মাথায় চুল বব্ করা, চোখে কাজল, বড় বড় দাঁত ওপরের ঠোঁট দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে। হতভাগা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। জ্যাম হওয়ার জন্যে সাইকেলটা আর চলছিল না। এক পা মাটিতে রেখে সাইকেলটাকে কেৎরে দাঁড়িয়ে ছিল গান্ধী টুপি। মেয়েটাও নেবেছিল।
'সমস্ত দিন খাই নি মা।'
হাত পেতে দাঁড়াল সে মেয়েটার কাছে। মেয়েটা ঘাড় অন্য দিকে ফেরাল। তখন দেখা গেল তার ঘাড়ে একটা কালো জড়ুল আছে। জড়ুলের উপর পাউডার লেগেছে একটু। ছোঁড়াটার অকারণে মনে হল, চুল বব্ না করলে জড়ুলটা ঢাকা পড়ত। মোটর হর্ন দিচ্ছে চারদিকে। নানা জাতের হর্ন। শুধু মানুষের নয়, শব্দেরও ভিড় হয়ে গেল চারদিকে। হঠাৎ খুব জোরে জোরে হুইসলও বাজতে লাগল। পুলিসের হুইসল। একগাদা লোক রাস্তা থেকে উঠে পড়ল ফুটপাথের উপর। একটা লেবুওলা ফুটপাথে লেবুর পশরা বিছিয়ে বসেছিল। সে হাঁ-হাঁ করে উঠল জোরে। তার লেবুর উপর দিয়ে লোক চলেছে। হুমড়ি খেয়ে সে শুয়ে পড়ল লেবুগুলোর উপর। তারপর তার কি হল সে আর দেখতে পেলে না। জনতার ধাক্কায় সে ছিটকে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করল সেই জড়ুলওয়ালা মেয়েটা আর নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেওয়ার দোকানের সামনে। সামনেই একটা প্রকাণ্ড জ্যাম্।
কাজুবাদাম। তার খুব প্রিয় জিনিস। চেয়ে রইল খানিকক্ষণ জারটার দিকে। তার চোখে বোধহয় লোলুপতা ফুটে উঠেছিল। দাড়িতে মেহেদী লাগানো দোকানদার হঠাৎ ভারি গলায় প্রশ্ন করল—'ক্যা দেখতো হো?'
'কাজু।'
'বারো রুপিয়ে কে-জি।'
ছেলেটা দাঁত বের করে বললে, 'মায় ভূখা হুঁ। মগর পয়সা নেহি হ্যায়।'
দাড়িতে মেহেদী লাগানো লোকটা তখন পকেট থেকে ছোট একটা আয়না আর চিরুনি

বার করে চুল আঁচড়াতে লাগল। রাস্তায় হৈ হৈ উঠল একটা। আবার জনতার একটা ধাক্কা। খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেছে—চীৎকার করতে করতে একটা লুংগিপরা লোক বোঁ করে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটাতে।

সে ও ঢুকে পড়ল। খুব সরু গলি। গলির মুখেই একটা কল থেকে অনবরত জল পড়ছে। জলের কলটা ভাংগা। অনেক দিন থেকেই জল পড়ছে বোধ হয়। নীচের শানটা ক্ষয়ে গেছে। আর একটু গিয়ে দেখতে পেল, দুটো ছোঁড়া ব্যাটবল খেলছে। একজনের হাতে একটা কেরোসিন কাঠের ব্যাট, অন্যজনের হাতে এটা ন্যাকড়ার বল। পাশের রাস্তায় এই যে তুমুল কান্ড হচ্ছে সে খেয়ালই নেই ওদের। খেলে চলেছে। তাদের পেরিয়ে তারপর একটা ছোট্ট দোকান পাওয়া গেল। দোকানের মালিক যুবতী নারী একজন। যুবতী দেখেনই মন ছোঁক ছোঁক করে ছোঁড়ার। দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সংগে সংগে মেয়েটা ভিতরের দিকের একটা ঘুপচি ঘরে অন্তর্ধান করল হঠাৎ। বেরিয়ে এল হোঁতকা গোছের ঘাড়েগর্দানে একটা লোক। তার গলায় কালো সুতো দিয়ে লটকানো একটা মাদুলী। দোকানে ছোট্ট একটা গ্লাস কেস। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল কাঁকড়ার ঝাল। কিছু শুকনো আলুর দম। কিছু বেগুনি ফুলুরিও। হোঁতকা লোকটা তার পানে ভ্রূকুটি করে চাইল একবার। তারপর দোকানের ঝাঁপটা তুলে দিল। আবার চলতে লাগল সে। কিছু দূরে গিয়ে দেখল একটা আবগারির দোকান। দোকানে বসে আছেন যিনি তিনি গীতাপাঠে মগ্ন। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল বইয়ের মলাটের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা—শ্রীমদ্ভাগবত গীতা।

'সমস্ত দিন খেতে পাই নি বাবা।'

গীতা নিরুত্তর।

'সমস্ত দিন খেতে পাই নি বাবা।'

আবার গীতা নিরুত্তর।

'সমস্ত দিন খেতে পাই নি বাবা।'

গীতা জানলা বন্ধ করে দিলেন।

আবার হাঁটতে লাগল সে। সত্যিই বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল তার। একটা বন্ধ দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগল অবশেষে।

কপাট খুলল।

'কি চাই—

'বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে বাবা—'

পাশের ঘর থেকে কে যেন গাঁক করে উঠল, 'মাফ কর বাবা। ওরে কপাটটা বন্ধ করে দে—'

'থাম্ থাম্। আজ যে খোকার জন্মবার। ভিকিরিকে ফিরিয়ে দিস না। রাত্তিরের যে রুটিগুলো আছে দিয়ে দে। তরকারিও আছে খানিকটা।

খান দুই রুটি আর একটু ফুলকপির তরকারি জুটে গেল। সামনের বারান্দায় বসে খেল সেটা। কাপড়েই হাত মুখ মুছে ফেলল। একটু জল পেলে হত—সামনের বাড়ির দরজা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। উঠে হাঁটতে লাগল। অনেক দূর হেঁটে কল পেল একটা, খুলে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল। আবার কিছুদূর হেঁটে পাওয়া গেল ছোট্ট একটা পার্কের মতন। লোহার বেঞ্চিও রয়েছে একটা। সেইখানে গিয়ে বসে রইল। আকাশের দিকে চাইল। আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইল। সব পরদা-লাগানো জানলা। যে জানলায়

পরদা নেই, সে জানলাটা ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। খাতা পেন্সিল বার করে কবিতা লিখতে শুরু করল সে।

'রান্না-করা কাঁকড়ার লাল লাল ঝালে
কাজুবাদামের নোনতা মিষ্টি স্বাদে
ঘিয়ে ভাজা পেঁয়াজের গন্ধে
হিং-দেওয়া কচুরির ফিং-দেওয়া মাধুর্যে
হাতে টানা রিকশার টুন টুন আওয়াজে
দাঁতভাঙ্গা চিরুনির ফাঁকে ফাঁকে
চুলের জটাপটিতে
দেখতে পাই তোমাকে।
আর আমি---
আমি তখন ব্যাংকের হিসাব মেলাই
যদিও আমার কোন ব্যাংকে হিসেব নেই।
যদিও মোটর নেই
তবু দেখি মোটরে তেল আছে কি না।
স্তূপ মেঘেদের পিছন দিকে
আকাশের যে নীল গলিটা—
অন্যমনস্কতার মেঘে ভেসে ভেসে
সেখানে আস তুমি মাঝে মাঝে।
আমাকে দেখেও দেখ না।
নির্মলদের বাড়ির লোম-ওঠা কুকুরটা
পিঁচুটি-ভরা চোখ দিয়ে
কটাক্ষ হানে আমার দিকে।
ক্ষীণমার্জারীরা আড়-চোখে চায়,
রুজ পাউডার মাখা ঘুজঘুজে মেয়েরা
ভঙ্গী করে নানা রকম।
আমার ব্যাংকের হিসাবে গোলমাল হয়
মোটরের ট্যাংকে পেট্রল কমে যায়।
তবু আমি দমি না
না পাওয়া কাঁকড়ার লাল দাঁড়াটা
চিবোই বসে আনমনে।
আর ভাবি টপসি কার নাম ?
কুকুরের, না, মানুষের ?
হঠাৎ দেখতে পাই
অন্যমনস্কতার মেঘে চেপে
ভেসে যাচ্ছ তুমি নিরুদ্দেশ যাত্রায়
আমি কি করে যাব ?
আমি ভারী, ভাসতে পারি না;
মোটর চড়ি

কিন্তু মোটরে যে তেল নেই।
শুনছ ?
কেমন হয়েছে কবিতাটা ?'

পাশে কেউ নেই। কল্পনা করছিল সাঁওতাল কিশোরীর মতো লাবণ্যময়ী তার প্রিয়া বসে আছে তার পাশে। নেই। কেউ নেই।

উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও উঠল একটা। সেই হাওয়াতে উড়তে উড়তে এল একটা কাগজ। উড়তে উড়তে তার দিকেই এল। তুলে নিয়ে দেখল বিখ্যাত দৈনিক কাগজের ছেঁড়া-পাতা একটা। উল্টো পিঠে একজন বিখ্যাত লোকের ছবি। ছবির উপর ময়লা লাগানো। বড় দুঃখ হল। ইচ্ছে হল ওই বিখ্যাত লোকটির ঠিকানা খুঁজে তার পায়ে গিয়ে ক্ষমা চাইতে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নাকের পাতা দুটো লাগল। হঠাৎ সামনের বাড়ি থেকে একটা ষন্ডা লোক বেরুল, তার হাতে চেন-বাঁধা ম একটা কুকুর। অ্যালসেশিয়ান নয়, বুলটেরিয়র। সাদা গায়ের ভিতর থেকে গোলাপী আভা বেরুচ্ছে। কেমন যেন একটা রোখা-রোখা ভাব। ও বুলটেরিয়ার কখনও দেখে নি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ভয়-ভয়ও করতে লাগল একটু। লোকটা পার্কেই ঢুকছে। অন্য গেট দিয়ে সরে পড়ল সে। হঠাৎ মনে হল সারা জীবনটাই সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। বাল্যকাল থেকেই গা বাঁচিয়ে চলছে। মুখে বলেছে—সম্মুখ-সমর। কিন্তু সম্মুখ সমর দেখে নি কখনও, কোথাও গোলমাল দেখলেই সরে পড়েছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল পুব দিকের বাড়ির বাইরের বারান্দাটি দিব্যি চকচকে ঝকঝকে। বোধহয় মোজেইক করা। এগিয়ে গিয়ে দেখল তাই। কারো চকচকে ঝকঝকে জিনিস দেখলেই নেবার লোভ হয়েছে বরাবর। এখনও হল। চারদিকে কেউ নেই। সটান উঠে শুয়ে পড়ল বারান্দাটাতে। মাথায় কাঁথার পুলিন্দাটি দিয়ে বেশ বাগিয়ে শুলো, পাশ ফিরে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। অগাধে ঘুমুতে লাগল। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নাচগানের শব্দে। দেখলে, পার্কে একটা ছোঁড়া নানা ভঙ্গী করে নাচছে আর গাইছে—

ওগো আমার মানিনী
নাকছাবিটি আনিনি
কাল আনব, কাল আনব, কাল আনব
মাইরি বলছি কাল নয়তো পরশু
বড় জোর তোরশু
পান্না থাকবে ওতে লো
ওগো আমার ডেসডেমোনা
আমি তোমার ওথেলো।

গান গেয়ে গেয়ে ক্রমাগত নাচতে লাগল ছোঁড়াটি। আর পয়সা পড়তে লাগল চারদিক থেকে। প্রতিটি বাড়ির জানলায় ভিড়। সবাই পয়সা দিচ্ছে।

কবি দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে। আধ ঘন্টা নেচে একগাদা পয়সা কুড়িয়ে ছেলেটা ঘুরে ঘুরে অভিবাদন করতে করতে চলে গেল। কবি পিছু নিল তার।

'শুনছেন ভাই।'

'আমাকে ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ আপনাকে। চমৎকার লাগল আপনার নাচ আর গান, মনে হয় আপনি লেখাপড়াও জানেন—'

'না, আমি মুখ্যু।'

'তাহলে ডেসডেমোনা আর ওথেলোর কথা জানলেন কি করে?'

'আমি যাত্রাপার্টিতে ছিলাম যে। ওথেলো নাটকটার বাংলা করে আমাদের অধিকারী মশাই নাবাবেন ভেবেছিলেন। ভালো ডেসডেমোনা পাওয়া গেল না। পেঁচামুখী পটলিকে মানালো না। তখনই জেনেছিলাম ওথেলো আর ডেসডেমোনার লভ হয়েছিল।'

'কোন্ যাত্রাপার্টি?'

'সে দল ভেংগে গেছে। ওই পটলিকে ঘিরেই আগুন জ্বলল। আমি সেখানেই নাচগান শিখেছিলাম তেনা মাস্টারের কাছে। তিনিই তো গানটা লিখে দিয়েছেন।'

'তেনা মাস্টার? কে তিনি—'

'ভালো নাম ত্রিনয়ন। তেনা তেনা বলে ডাকে সবাই। চমৎকার নাচ শেখায়, ভালো গান বাঁধতে পারে।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'চিৎপুরে। একসংগেই থাকি আমরা। ছোট্ট একটা ঘর নিয়েছি তবলার দোকানের উপরে।'

'তাঁর পরিবার নেই বুঝি?'

'কেউ নেই। আমিই তার পরিবার। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াই।'

'বিয়ে-টিয়ে করেন নি বুঝি?'

'না। একটি মেয়েমানুষের সংগে ছিলেন। সে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। ঐ রগচট মেজাজী লোককে সহ্য করবে কে। আমাকে তো প্রায়ই ঠ্যাঙায়। গুণী কিন্তু। শুধু গান বাজনায় নয়, গুনতেও পারে। ওর সংগে কথা আছে আমি সমস্ত দিন নেচে যে পয়সা পাব তার অর্ধেক দিতে হবে ওকে। ও ঠিক গুনে বুঝতে পারে আমি কত পয়সা পেয়েছি। একদিন তঞ্চকতা করেছিলাম, মেরে আমার পস্তা উড়িয়ে দিলে।'

কত রোজ পান আপনি।

'তা পাঁচ-ছ'টাকা হয়ে যায়।'

'তেনা মাস্টার আমাকে নাচগান শেখাবেন?'

'অনেক মার খেতে হবে কিন্তু। নাচে ভুল করলেই পায়ে সপাং করে বেত মারবে।'

'উনিই ওই গানটা বেঁধেছেন?'

'হ্যাঁ—'

'ইনি ওর চেয়ে ভালো একটু সভ্যগোছের গান বাঁধতে পারেন না?'

'পারেন। কিন্তু বলেন ওসব গান চলবে না। এদেশে চুটকি ফক্কোড় গান বেশী চলে। বলেন—রেডিওতে বড় ওস্তাদের গান কেউ শোনে না। শোনে বিবিধ ভারতী।'

হি হি করে' হাসতে লাগল ছোঁড়াটা।

'আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার তেনা মাস্টারের কাছে? আমিও নাচ শিখব—'

'আপনি ধেড়ে কার্তিক হয়ে গেছেন। নাচ আর আপনার দ্বারা হবে না। তেনা মাষ্টার দেখেই আপনাকে দূর করে' দেবে, তা ছাড়া আমি আপনাকে নিয়েও যেতে চাই না।'

'কেন?'

'নিজের সতীন আবার কেউ জোটায় নাকি?'

হি হি করে হাসতে লাগল। দাঁতগুলোতে পানের ছোপ ধরেছে। চোখ দুটোতে আলো নাচছে।

আচ্ছা চলি।

কোমরে হাত দিয়ে মাথা নেড়ে আর একটা গান ধরলে ছোকরা।

তন্ মন্ ধন সব দিয়া
তব্ ভি কুছ্ নেহি পায়া
দিন্ গিয়া রাত গিয়া
তব্ ভি প্যার নেহি আয়া।

তারপর হঠাৎ এক ছুটে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা।

'কি হে, তুমি এখানে কি করছ? কে তুমি—'

পাশের বাড়ির দরজা খুলে একটা গোঁফ আর জুলপি ওলা লোক বেরিয়ে এল।

'আমি এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এমনি দাঁড়িয়ে থাকে নাকি কেউ! নিশ্চয় কিছু মতলব আছে তোমার!'

'আমি ভিক্ষা করি—'

'কিছু হবে না এখানে। সরে পড়। জনার্দন যদি এসে পড়ে ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। এখান থেকে প্রায়ই জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে—'

'আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আমাকে দয়া করে দিন কিছু। বড্ড খিদে পেয়েছে—'

'কিছু পাবে না যাও—'

'আপনারা তো এখুনি নাচ দেখে ওই ছেলেটাকে কত পয়সা দিলেন—'

'তুমি নাচ দেখাও, তোমাকেও দেব। সোজা নাক দেখানোতে কোনও বাহাদুরি নেই। ঘুরিয়ে নাক দেখালে তবু কিছু আছে। ও ছোকরা ঘুরিয়ে নাক দেখাল, তুমি সোজা নাক দেখাচ্ছ। সরে পড় এখান থেকে—'

দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলে সে। ছোঁড়া আবার হাঁটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে দেখল একটা সরু গলির মোড়ে প্রকান্ড একটা লাল বাড়ি। রাস্তার দিকে বেশ বড় একটা বারান্দা। বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না, কিন্তু বারান্দায় বসতে পারে। বারান্দার ওধারে একটা রাস্তার কুকুরও কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এধারে গিয়ে বসল সে। খুব খিদে পেয়েছিল। হঠাৎ পিছনের জানলাটা খুলে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি প্রৌঢ়া মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার মনে হল একটি মাতৃমূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে।

করুণ দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন—'কে তুমি বাবা?'

'আমি ভিকিরি মা। বড্ড খিদে পেয়েছে, অনেকক্ষণ কিছু খাই নি—'

'তোমার গায়ের কাপড় জামাও তো খুব ময়লা। তুমি ভিকিরি হ'লে কি করে? তোমার বাবা মা নেই—'

'না। মামার বাড়িতে থাকতুম। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

ছোঁড়াটা চুপ করে রইল মাথা হেঁট করে। কারণ এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

'তুমি দাঁড়াও একটু।'

মহিলা অন্তর্ধান করলেন। তার একটু পরেই একটি চাকর এসে সদর দরজা খুলল।

'এই নাও।'

একটি মাটির সরায় কিছু খিচুড়ি। একটা সন্দেশ। তা ছাড়া ভাজা কয়েক রকম।

'এত খাবার আমাকে দিলেন?'

'হ্যাঁ। কাল সরস্বতী পূজো ছিল। তারই ভোগ।'

চাকরটির কাঁধে একটি খদ্দরের কোট আর ফরসা কাপড়ও ছিল কয়েকখানা।

'এগুলোও তোমাকে দিয়েছেন মা।'

একটু হক্চাকিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর খাবারের সরাটা নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। দেখল খিচুড়ি তরকারি, সন্দেশ—সব বরফের মত ঠান্ডা। বোধহয় 'ফ্রিজে' ছিল। তার মানে এরা বড়লোক। প্রচন্ড বড়লোক। এত বড় বাড়ি, বাড়িতে পূজো হয়। বাড়িতে 'ফ্রিজ' আছে। তার সংগে এক বন্ধু পড়ত—তার নাম দিব্যেন্দু দাস। সে বলত—দেখ্, এটা জানবি বড়লোক মানেই আমাদের শত্রু। ওদের ধ্বংস করলে আমাদের মুক্তি। দিব্যেন্দু তিনবার ফেল করে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। বলত—একজামিনাররা বড়লোকের ছেলেদের পাস করিয়ে দেয়—আর গরীব ছেলেদের ফেল করায়। ইচ্ছে করে করায়। দিব্যেন্দু কোনও ক্লাসেই নাকি একবারে প্রমোশন পায় নি। তার সংগে আই-এ পড়ত। ফেল করেছিল। সে যে অপদার্থ এ কথা কিন্তু একবারও স্বীকার করত না সে। বলত—তলে তলে—হুঁ হুঁ—অনেক ব্যাপার আছে ভাই। আমি যে গরীব। দিব্যেন্দুর কথা শুনে শুনে তারও মনে এই ধারণাটা গেঁথে গিয়েছিল যে বড়লোক মাত্রেই পাজী, গরীবরা সব ভালো। এখন কিন্তু এই ক্ষিধের মুখে খাবার পেয়ে তার ধারণাটার রং বদলে গেল হঠাৎ। মনে হল, না, সব বড়লোকেরা খারাপ তো নয়! আমাকে উনি খাবার জামা কাপড় না দিলেও তো পারতেন! যারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে তাদের মধ্যে গরীবও তো অনেক ছিল।

খেয়ে রাস্তার কলে জল খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। মনের ভিতর কিন্তু জুলফিওলা সেই লোকটার কথাগুলো জাগতে লাগল। ঘুরিয়ে নাক দেখালে বাহবা দেয় সবাই।...বড় রাস্তায় সে পড়েছিল। দেখল সারি সারি গাড়ি চলছে, প্রত্যেক গাড়িতে তুলোর বস্তা। গাড়িগুলো পার হল তো এল লরির সারি। এতেও সারি সারি বোরা। তেরপল দিয়ে ঢাকা। লরিগুলো চলে যাবার পর সে রাস্তা পার হয়ে ওপারে ফুটপাতে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি ইলেকট্রিসিটির থাম ছিল। তার নীচে একটা মুচি বসে জুতো সেলাই করছিল। থামের ও-পাশটা খালি ছিল। সেইখানেই গিয়ে বসে পড়ল সে। পকেট থেকে বার করল খাতা আর পেন্সিল। কবিতা লিখতে হবে। সেই ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কথাটাই মনে জাগছিল। শুরু করে দিলে—

সোজা নাক দেখালে
বাহবা দেয় না কেউ
ঘুরিয়ে নাক দেখালে বলে—চমৎকার।
মন কেমন করছে বললে
সবাই বলে সেকেলে
বলতে হয় পাংশু মনের কুটকুটুনি জ্বালাচ্ছে।
শুধু সবুজ বললে কান দেয় না কেউ।
উৎকর্ণ হয়ে ওঠে শ্যাওলা-সবুজ বললে,
পান্না-সবুজ বাতিল হয়ে গেছে আজকাল।
ঠিক করেছি তাই
ভাইকে বলব বাবার ছেলে
স্ত্রীকে শালার দিদি।

আর শ্বশুরকে শালীর দাদার বাবা।
বাবাকে পিসেমশায়ের বড় শালা।
এই সব হিসেব করছি
ক্রমাগত হিসেব করছি
হিসেবই করে যাচ্ছি
এমন সময় লাথি খেলাম,
মনে হল ঘোড়ার লাথি,
পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে।
উঠে দেখি ঘোড়া নেই
কেউ নেই
আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে
আমার মাত্রাবোধ।
আর তার পাশে তুমি।
লজ্জিত হলাম।

সে হয়তো আরও লিখত। কারণ লেখার একটা ঝোঁক এসে গিয়েছিল তার। কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়ল। নীল রঙের প্রকান্ড একটা ধামা এসে ধাক্কা মারল তাকে। তার পর সে আবিষ্কার করল ধামা নয় পাছা। তার ঠিক পাশেই পেন্টালুন পরা একটা মেয়ে হেঁট হয়ে কি যেন কুড়াচ্ছে রাস্তা থেকে। তার রঙ্গীন লজেন্সগুলো পড়ে গেছে ফুটপাতের উপর।

মণি থাম না একটু ভাই লজেন্সগুলো পড়ে গেছে। 'শো' সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে। এখনও অনেক দেরি।

হিপি-মার্কা মণি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হেসে বলল—তার আগে চীনে রেস্তোরাঁয় যাব। চীনে মাল খাওয়াব তোকে আজ। সেখানে শ্লারা আমরা শিরি ফরহাদ বনে যাব একেবারে—বুঝলি—

সব 'স' গুলোই সংস্কৃত দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করলে।

'এই ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সি দাঁড়াতেই উঠে পড়ল তারা। বোঁ ক'রে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তার প্রিয়া। তার মানসী। সে যেন একটু আগে এসে বসেছিল তার পাশে। তার নানারকম চেহারা কল্পনা করে সে। কিন্তু বিভিন্ন চেহারার ভিতর তার প্রিয়া প্রিয়াই থাকে, অপ্রিয়া হয় না কখনও। তার প্রিয়া পেলব শোভন মধুর অবর্ণনীয়া। এই মেয়েটাকে দেখে সে লজ্জায় মরে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার পাশ থেকে।

হঠাৎ আবার একটা হৈ হৈ উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একটা মোষের গাড়ির একটা মোষ খুলে গিয়ে দৌড়চ্ছে, একটা ছুটন্ত ট্যাক্সির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সেটা। ট্যাক্সিটাও থেমে গেল, লোকে লোকারণ্য। আবার দাঁড়িয়ে গেল মোটরের সারি। দেখতে পেল একটা ফুল দিয়ে সাজানো মোটর থেকে চেলিপরা একটি সুন্দর বৌ রক্তাক্ত মোষটার দিকে চেয়ে আছে।

আরও ভিড় জমতে লাগল। ভিড় বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। আবার হাঁটতে লাগল সে। হাঁটতে লাগল। ক্রমাগত হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একটা আশ্চর্য প্রশ্ন মনে জাগল—কেন আমি হাঁটছি? কেন আমি মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম? কি চাই

আমি ? কি খুঁজছি ? চাকরি ? চাকরি পেলেই কি আমি সুখী হব ? মজুমদার মশাই বড় চাকরি করেন, কিন্তু তিনি কি সুখী ? প্রায়ই তার মামার কাছে এসে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। সুখী হলে কেউ অমন করে কাঁদে ? এই সব আশ্চর্য প্রশ্নের একটা আশ্চর্য উত্তরও যেন আবছাভাবে মনে এল তার। তার মনে হল সে যেন নিজেকেই খুঁজছে, নিজেকেই সে যেন হারিয়ে ফেলেছে ভিড়ের ভিতর, নিজেকে খুঁজে পেলেই যেন আপাতত বর্তে যাবে সে।

জ্ঞানীরা 'আত্মানং বিদ্ধি' বলে চড়া সুরে উপদেশ দেন, সেই সুরে উদ্বুদ্ধ হয়ে ও নিজেকে খুঁজছিল না, ওর মনে হচ্ছিল ওর নিতান্ত 'আপনজন' যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে পেলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সে আপন জনের স্বরূপ কি ? তা-ও জানা ছিল না তার। জানা ছিল না, তবু খুঁজছিল। এই ভিড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব ? তারপর হঠাৎ মনে হল তার প্রিয়ার কথা যে প্রিয়াকে কখনও দেখেনি কখনও দেখবে না, তার কথা। মনে হল তাকে পাই বা না পাই, সে বড় ভালো বড় সুন্দর, এই মরুভূমিতে সেই মরূদ্যান, সেখানে সবুজ আছে ফুল আছে ঠান্ডা জল আছে।

হঠাৎ তার মনে হল তাকে পাব কি ? সংগে সংগে মনে হল, না পাব না। তার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে এই রূঢ় উত্তরটা দিলে। কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্তলে কল্পনার যে ফল্গুধারা বইছিল তার তীরে বসেছিল কে একজন। সে বললে—পাবে পাবে নিশ্চয় পাবে।

কিছু দূর হেঁটে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখলে একটা রোগা চিনেম্যানকে একটা কুচকুচে কালো মেয়ে জল খাওয়াচ্ছে। জল ঢেলে দিচ্ছে একটা সুদৃশ্য মগ থেকে। চিনেম্যানটা অঞ্জলি পেতে অঞ্জলিতে মুখ লাগিয়েই জল খাচ্ছে। কলকাতা শহরের রাস্তায় কিছুই বিসদৃশ নয়, কিন্তু এ দৃশ্যটা ভারি অদ্ভুত মনে হল তার। কে ওই কালো মেয়েটা ? ওর নাম নিশ্চয় শ্রাবণী! মূর্তিমতী শ্রাবণ যেন। চিনেম্যানটার সংগে ওর সম্পর্ক কি ? হঠাৎ এক পাল ছাগল আর ভেড়া এসে পড়ল। ফুটপাথেও উঠে পড়ল তারা। রাস্তায় তখন মোটরের ভিড় ছিল না। ভিক্টোরিয়া গাড়ি একটা দাঁড়িয়েছিল মোড়ের দিকে আর টুং টুং করে চলেছিল একটা রিক্সা। সবাই কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়ল এই ছাগলদের ভিড়ে। ভিক্টোরিয়া গাড়ির ঘোড়াটা কান খাড়া করে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল একবার। কিন্তু তা গ্রাহ্য না করে কশাইখানার যাত্রী সব দ্রুতবেগে ছুটে চলতে লাগল মৃত্যুর দিকে।

হাঁটতে লাগল আবার। এটা কোন্ পাড়া ? কোন্ রাস্তা ? এ সব নিয়ে মাথা ঘামাল না সে আর। দু একটা রাস্তা ছাড়া সব রাস্তাই এক রঙা। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হোঁচট খেল এক জায়গায়। স্তূপাকার বাঁধাকপি ফুটপাতের উপর। পাশেই একটা বাঙালী মিষ্টির দোকান—Haru's Sweets। বাঙালীরা পারতপক্ষে বাংলায় দোকানের নাম লেখে না। হঠাৎ মনে হল কথাটা। পরমুহূর্তেই কিন্তু ভুলে গেল আর একটা লোকের ধাক্কা খেয়ে। তারপরই খানিকটা ফাঁকা ফুটপাথ। তার পরই একটা ছোট্ট পার্ক।

পার্কে গিয়ে ঢুকল সে। ঢুকে বসে পড়ল একটা বেঞ্চির উপর। আহ্! বড্ড পা ব্যথা করছিল। অনেকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। তারপর খদ্দরের জামা আর কাপড়টা দেখলে। দুটাই বেশ ভাল। কিন্তু কাপড়জামা বদলাবে কোথায়! রাতে কোথাও বদলাতে হবে। আর একটা কথাও মনে হল। এই কাপড়জামা পরে ভিক্ষা করা চলবে কি ? ফরসা কাপড়জামা দেখে লোকের দয়ার উদ্রেক হবে কি ? দয়ার বা বিরক্তির ? বিরক্ত হয়েই লোকে দু-এক পয়সা ভিক্ষে দেয় সাধারণত। সামনের একটা ইলেকট্রিক তারের উপর কাক বসেছিল একটা। তার পাশে আর একটা কাক উড়ে এসে বসল। বসেই হাঁ করল, আর প্রথম কাকটা

তার মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার খাইয়ে দিলে। ওর মা নিশ্চয়। একটা ছেলে গুলতি দিয়ে টিপ করছিল ওদের। ওরা সংগে সংগে উড়ে গেল।

পার্কে অনেকক্ষণ কেউ এল না। তারপর এলো একটা কুৎসিত কালো লম্বা মেয়ে। তার কাঁধে একটা লম্বা থলি। সে আনমনে কাগজ কুড়িয়ে সেই থলিতে ভরতে লাগল। তারপব চলে গেল। তার দিকে একবার ফিরেও চাইল না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল একটা চিল চক্কোর দিচ্ছে। চিল না শকুনি? ঠাহর করতে পারল না ঠিক। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সেই রোগা চিনেম্যানটাকে। বার করল কবিতার খাতা–

অনেকদিন পরে টুংলিং এল।
বুঝতে পারলাম না
সে মানুষ না দিগন্ত পারের হাতছানি।
এসে বললে, তেষ্টা পেয়েছে
বড্ড পিপাসিত আমি
ওগো বাংগালী বাবু
আমার পিপাসা মেটাও।
ভদ্‌কা শ্যামপেন বারগান্ডি রম কোঁইয়াক্‌
অনেক খেয়েছি: পিপাসা মেটেনি।
নিয়ে গেলাম তাকে শ্রাবণীর কাছে
যার নিতল চোখের অতলতায়
ডুবে গেছে বড় বড় মানোয়ারি জাহাজ।
সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ
চোখের পাতা দুটো কাঁপল একটু।
তারপর বাঁশী বেজে উঠল
তার উদ্ভাসিত চোখে মুখে।
সে বাঁশী বলল, তুমি
শত্রুর মুখোস পরে আছ
কিন্তু তুমি শত্রু নও।
তোমার পিপাসা মেটাব আমি।
আমি ভারতবর্ষ।
আগেও তোমার পিপাসা মিটিয়েছিলাম।

হঠাৎ তার মনে পড়ল চীন-আক্রমণের কথা। সংগে সংগে মনে পড়ল আমাদের দেশেই আমাদেরই আপন লোকেরা কি প্রতিদিন আক্রমণ করছে না আমাদের? পাড়ায় পাড়ায় কেন ঘরে ঘরেই কোন্দল জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি খুন জখম দলাদলি তো খবরের কাগজের প্রধান খবর এদেশে। এরই ঘূর্ণাবর্তে তো আবর্তিত হচ্ছি আমরা, চোরেরা চুরি করছে আর ভদ্রলোকেরা মারা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল—কিন্তু না, আমি এ চাই না। আমি জানি এ থাকবে না। চাবুকে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু চাবুক থেমে যাবে। আমি চাই—হঠাৎ সে গুলিয়ে ফেলল সব। কি চায় সে? নিজেই জানে না। তার মনে হল অবাস্তব চাওয়াটা বাস্তব হবে না কখনও। তা উচ্চারণ করলে হো হো করে হেসে উঠবে সবাই, কিন্তু তবু আশা ছাড়তে পারে না সে—

কেমন যেন গুটিয়ে যায় সব
আসে, খুব কাছে আসে—
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাল-গোল পাকিয়ে যায় যেন।
নিয়তি, ভগবান, কর্মফল, অদৃষ্ট।
এদের মানলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।
কিন্তু মানি না, মানতে পারি না।
বুদ্ধি রাশ টেনে ধরে।
তাই সাজগোজ করি শুধু
তারপর দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান-শূন্য হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ি চিন্তার সমুদ্রে।
নাকানি চোবানি খাই
তবু মনে হয়
এই সমুদ্র থেকে হয়তো উর্বশী উঠবে
এই দুধ থেকেই মাখন।
এ আশা ছাড়িনি এখনও
তাই আকাশ নীল
সূর্য জ্বলন্ত
তুমি অপরূপ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার 'তুমি' নেই। কিন্তু আর একজন বসে আছে বেঞ্চের ও-প্রান্তে। চোং-প্যান্ট পরা দাড়িওলা একটা ছেলে। গায়ে একটা আধুনিক বুশ-শার্ট। চোখে শমা। গলায় একটা বাইনাকুলার। কবিতা-লেখায় মগ্ন ছিল বলে' বুঝতে পারেনি এই অদ্ভুত লোকটি কখন এসে বসেছে। হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর চোখাচোখি নমস্কার করলে। সে ছেলেটিও নমস্কার করে হাসলে একটু।

'আপনার গলায় ওটা কি?'

'বাইনাকুলার।'

'কি করেন ওটা দিয়ে?'

'পাখি দেখি।'

'পাখী দেখেন? কেন?'

'আর কিছু করবার নেই বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে আমি বেকার। কেরানীগিরি করবার সুযোগ পাইনি।'

ছোঁড়াটা হেসে বলল—'আমিও—'

'কি করেন আপনি?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই আর ভিক্ষে করি।'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সেই লোকটা বলল—চলুন তাহলে যাওয়া যাক—'

চলতে লাগল দুজনে। হঠাৎ দাড়িওলা বলল, 'আমি হিন্দু।'

'কোথা যাচ্ছি আমরা?'

'বিশেষ কোন ঠিকানা নেই। বিনুর কথায় এখানে ভুল জায়গায় এসে পড়েছিলাম। সে

বলে দিল এই পার্কে নাকি কুলো পাখী দেখা যাবে। কিন্তু এখানে এসেই বুঝলাম যাবে না। এ তো তকমা-আঁটা সভ্য-ভব্য পাড়া, এখানে কি ওই গেঁয়ো পাখী থাকতে পারে? তিনতলায় জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম কে একজন খাঁচায় কয়েকটা মুনিয়া পুষেছে। আহা মুনিয়ার ঝাঁক একবার দেখেছিলাম ভাগলপুরে স্যানাডিস কম্পাউন্ডে। মাঠের খানিকটা হঠাৎ যেন উড়ে গেল আকাশে। এখানকার মাঠে জোড়া জোড়া ঘুঘু বসে আছে, মানে. প্রেমিক ঘুঘু। দূরে নানা রঙের "নিয়ন" আলো জ্বলছে, আর মোটরের হর্ন শোনা যাচ্ছে। রাবিশ্, আসুন, এই ট্রামটায় ওঠা যাক—'

ছোঁড়াটা বললে—"আমার পয়সা নেই—"

'আপনি আসুন না। আমিই আপনার টিকিট কাটব। উঠে পড়ুন।'

উঠে পাশাপাশি একটা বেঞ্চে বসে দাড়িওলা ছেলেটা বললে—'সিগারেট খান?'

না—

'আমি কিন্তু খাই। কিন্তু ট্রামে খেলে আপত্তি করবে সবাই। তাই এখন খাব না। এইটে মুখে ফেলে দিই। এসপ্ল্যানেডে নেবে সিগারেট ধরাব।'

একটা বড়ি মুখে ফেলে দিলে ছোকরা।

'কি খেলেন ওটা—'

'নেশার বড়ি। খাবেন?'

'না। খেতেই পাই না, নেশা করার পয়সা পাব কোথা—'

'কোন নেশা নেই আপনার?'

'আছে। কবিতা লিখি মাঝে মাঝে—'

'ও তাই নাকি। তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশাই। চলুন আমার বাড়ি—বাড়ি মানে হোটেল। আপাতত একটা হোটেলে থাকি। বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। পাক সেনার অত্যাচারে পালিয়ে এসেছি। বিনোদ আমাকে এই হোটেলটা ঠিক করে দিয়েছে। বিনোদ আমার সহপাঠী। দুজনেই আমরা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি। ঢাকায় আমাদের বাড়ি। পরীক্ষা পাস করে সেখানেই গিয়েছিলাম চাকরির চেষ্টায়। এমন সময় যুদ্ধ বেধে গেল। আমার বাবা-মাকে মেরে ফেললে ওরা, সে দানবীয় অত্যাচার বর্ণনা করা যায় না। গা শিউরে ওঠে। কিন্তু সব মুসলমানরাই খারাপ নয়। কাশেম বলে এক মুসলমানের সাহায্যে আমি আর আমার বোন তামা পালাতে পেরেছিলাম। কাশেম আমাদের বাড়ির সহিস ছিল। ঘোড়া ছিল আমাদের। সেই ঘোড়া করে মাঠামাঠি ঘুরপথ দিয়ে কাশেম আমাদের পার করে দিয়েছিল। এখন হোটেলে আছি—'

ছোঁড়াটা বললে—'হোটেলে থাকতে তো পয়সা লাগে—'

'আমার পয়সা আছে আপাতত। আমার বাবা একটা ভালো কাজ করেছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি এখানকার একটা ব্যাংকে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল ওদেশে হয়তো আর থাকা যাবে না। বাড়িটা বিক্রি করতে পারেননি। নগদ টাকা সব তুলে এনে জমা করেছিলেন আমার নামে। ভাগ্যে আমার নামে করেছিলেন তা না হলে'—হঠাৎ চুপ করে গেল সে। তারপর আর একটা বড়ি মুখে ফেলে চুপ করে বসে রইল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল কেমন যেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

একটা চিল বসে' আছে—দেখে আসি ওর ল্যাজটা—'

ছোঁড়াটাও নেবে পড়ল তার সঙ্গে।

গড়ের মাঠ। অনেক দূরে একটা ইলেকট্রিক থামের উপর বসে ছিল চিলটা।

'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসি। আর আপনার যদি কৌতূহল থাকে আপনিও আসুন।'

'নাঃ, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি দেখে আসুন।'

একটা স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে। একটি কথাই মনে হতে লাগল—পাকসেনারা ওর বাবা ও মাকে হত্যা করেছে। ও এখন নেশা করবার জন্য কি একটা বড়ি চুষছে। আর পাখী দেখে বেড়াচ্ছে। চিলের ল্যাজ—তাতে দেখার কি আছে?

পাশে চেয়ে দেখল খবরের কাগজের স্টল একটা। নানা রকম রঙীন মলাটের পত্রিকা। আর প্রায় প্রত্যেক পত্রিকার উপরই নানা ভঙ্গীতে মেয়েমানুষের ছবি। লালসা-জাগানো ছবি। ওপাশে একটা লোক ফল বিক্রি করছে। চমৎকার কলা রয়েছে। কলা তার খুব প্রিয়। কত দিন যে কলা খাইনি—হঠাৎ মনে হল তার। হঠাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ড্রাইভার হো হো করে হাসতে হাসতে ওপাশে দাঁড়ানো লরিগুলোর দিকে চলে গেল। একটা অর্ধ-উলঙ্গ ফিরিঙ্গি মেয়ে খট খট করে চলে গেল সামনে দিয়ে। চুল বব্ করা। পরনের স্কার্ট ঊরুর অর্ধেকও ঢাকতে পারেনি। খটখট করে একটা বাসে উঠল তারপর জানলা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল। কাকে সম্ভাষণ করছে ভিড়ের মধ্যে ঠিক বোঝা গেল না। একটা দামী মোটর এসে দাঁড়াল। মোটরের জানলায় একটি তরুণীর মুখ। মনে হল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। সমস্ত দিন খাই নি মা—দয়া করে কিছু দিন। মেয়েটি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা টাকা দিয়ে দিল তাকে। অবাক কাণ্ড।

হ্যাঁ সত্যি একটা টাকা। সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো কলা কিনে ফেলল। ভালো মর্তমান কলা। দুটোর দাম নিল—তিরিশ নয়া। কলা খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় সেই দাঁড়িওলা ছোকরা ফিরে এল।

'চিলের ল্যাজ দেখলেন?'

'না। উড়ে গেল। আশ্চর্য ওর ল্যাজ! মনে হয় কতকগুলো ছুরি যেন সাজানো আছে। যখন ওড়ে তখন সেগুলো দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় ল্যাজটা বুঝি চেরা। ফিঙে পাখীর ল্যাজে দুটো বাঁকা ছোরা আছে। চিলেরও অনেকগুলো। পাখীর ল্যাজ একটা আশ্চর্য জিনিস। দোয়েল আর দর্জি পাখীর ল্যাজ তোলা দেখে বোঝা যায় ওদের তেরিয়া ভাব, খঞ্জনের ল্যাজ দোলানো যেন ওদের সদা-চঞ্চল সদা-ব্যস্ত স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছে, কাজল পাখী আস্তে আস্তে ল্যাজ দোলায়, মনে হয় যেন ও একটু হিসেবী, থিরথিরা পাখীর ল্যাজ দোলানো চমৎকার, উপর-নীচ নয়, পাশাপাশি তার সঙ্গে একটু নমস্কার করার ভঙ্গীও আছে, বুলবুলির ল্যাজের তলায় আগুন—টকটকে লাল। ময়ূরের ল্যাজ তো দেখেছেন, তাকে আমরা পেখম বলি, কুলো পাখীও ওই রকম পেখম তুলে নাচে, যার খোঁজে আজ গিয়েছিলাম—কিন্তু—'

ছোকরা থেমে গেল হঠাৎ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'কিন্তু কি—'

'মাকে মনে পড়ছে। মায়ের একটা টিয়া ছিল। অদ্ভূত ছিল তার লেজ। সবুজে, নীলে হলুদের আভায় সে যেন একটা রঙের ঝর্ণা। মা পাখী ভালবাসত। কাক চড়ুই শালিক সবাইকে খেতে দিত—'

আবার চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ আবার বলে উঠল—'জানেন আমার সেই মাকে ওরা খুন করেছে। খুন করবার আগে সতীত্ব হরণ করেছে, তারপর গুলি করেছে—আমার মা কারও কোনও অনিষ্ট করেনি—ওরা—' হঠাৎ থেমে গেল আবার।

'চলুন যাই। হোটেল কাছেই—'

রাস্তা পার হওয়া সহজ নয়। মোটর গাড়ির সারি চলেছে। মানুষ অসংখ্য। সবাই ছুটছে। ছোঁড়াটার মনে হল কে যেন ওদের চাবুক নিয়ে তাড়া করছে। প্রায়ভয়ে পালাচ্ছে সবাই। একটা ফেরিওয়ালা কিন্তু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে—হাতে একটা বাঁশ, তাতে অসংখ্য রঙীন বেলুন। ওপাশে সারি সারি রিক্‌শা। পরমুহূর্তেই হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই—একটা ছোট ছেলে ছিটকে গিয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে। তার মা তাকে ধরবার জন্যে আলুথালু বেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভিড়ের ভিতর। দেখে মনে হল বিহারিণী। নাকে প্রকান্ড একটা নথ। মাথায় এক ধ্যাবড়া সিঁদুর।

হোটেলটি অভিজাত হোটেল। তারই দোতলায় দুটি ঘর নিয়েছে দাড়িওয়ালা ছোকরা। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দাড়িওয়ালা ছোকরা হঠাৎ জিগ্যেস করল—'আপনার নামটা জিগ্যেস করা হয়নি। আমার নাম সাতকড়ি। আপনার?'

'আমার নাম সত্যেন। সত্যেন ভদ্র।'

'ডাক নাম সাতু কি?'

'হ্যাঁ—'

'আমারও ডাক নাম সাতু। অদ্ভুত মিল হয়ে গেল! বাঃ-'

ছোঁড়াটা অবাক হয়ে যাচ্ছিল। আরব্য উপন্যাসে আবু হোসেনের গল্প পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে সেই গল্পেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে না কি! এমন একটা অভিজাত হোটেলে সে যে প্রবেশ করতে পারবে তা একটু আগেও কল্পনার অতীত ছিল।

হঠাৎ কপাটটা খুলে একটি শেমিজপরা মেয়ে দেখা দিয়েই অন্তর্ধান করল নিমেষে।

সাতকড়ি নিম্নকণ্ঠে বলল—'তামা—'

তারপর চেঁচিয়ে বলিল-'ও তামাম্, নতুন বন্ধু পেয়েছি।'

ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সে। সোফা-সেটি দিয়ে সাজানো ঘর। একপাশে একটা ছোট ডিভান রয়েছে। ডিভানের উপর অনেক বাংলা ইংরেজি বই। ডিভানের পাশেই একজোড়া লাল স্যান্ডাল।

'তামা কোথা গেলে, কে এসেছে দেখ—'

শেমিজের উপর একটি লম্বা কোট গায়ে দিয়ে একটি মেয়ে কপাট খুলে ঘরে ঢুকল। ঢুকে নমস্কার করল।

সাতকড়ি বললে—'এঁর সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা। কুলো পাখী খুঁজতে গিয়ে এঁকে পেলাম। এঁর দুটি মহৎ পরিচয়। প্রথম—ইনি আমাদের মতো বেকার, দ্বিতীয়ত উনি কবি।'

তারপর ছোঁড়াটার দিকে ফিরে বলল—'এঁর নাম তামা। পুরো নাম নূরতামাম। আমি সেটা ছোট করে নিয়েছি। আমার বাবার বন্ধু জাফর আলির মেয়ে ও। ওর বাড়িরও কেউ বেঁচে নেই। ওর বাবাকে আমরা জেঠু বলতাম। সুতরাং, তামা আমার বোন। আপনাকে আমরা কি বলে ডাকব? মিতা, না স্যাঙাৎ?'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছোঁড়াটা. তার মনে হচ্ছিল এদের বাড়ির সবাইকে খুন করেছে বর্বর পাক সেনারা। অথচ এরা কত সহজভাবে কথা বলছে।

'চুপ করে আছেন কেন? ভাব করুন তামার সঙ্গে। ও খুব সাহিত্য-রসিক। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে। কবিতা খুব ভালবাসে—'

ছোঁড়াটা চেয়ে দেখল তামার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। নাকের ডগাটা ঈষৎ

কাঁপছে যেন। হঠাৎ সে আশ্চর্য হয়ে গেল তার গায়ের রং দেখে। রংটাও যেন তামার মতো। লালচে অথচ উজ্জ্বল। মনে হল কি একটা বইয়ে যেন রেড ইন্ডিয়ান যুবতীর ছবি দেখেছিল অনেকদিন আগে, তার গায়ের রং আর তামার গায়ের রং যেন এক। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে তামা কথা বলল।

'আপনাকে আমরা অতিথি বলে ডাকব। কখনও সেটা হবে "অতি" কখনও "তিথি"। নতুন রকম হল। রাজি?'

ছোঁড়াটা তবুও নির্বাক হয়ে রইল। কোনও কথাই সরছিল না তার মুখ দিয়ে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এদের জন্যে আমি কিছুই করিনি তো।

তামা আবার ভিতরে চলে গেল।

'বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চটপট ঘরের লোক হয়ে যান। তামা, খিদে পেয়েছে।'

তামা আবার বেরিয়ে এল।

বললে—'সন্দেশ কিন্তু একটি আছে। সেটি অতিথিকে দেব। ডিম আছে, ডিমের অমলেট বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাবেন, না কফি—'

ছোঁড়াটা তখন বলল—'যা দেবেন তাই খাব, খুব খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করবার আগে আমার পরিচয় আপনাদের জানানো উচিত—'

হো হো করে হেসে উঠল সাতকড়ি। তামার চোখে-মুখেও একটা হাসির আভা ঝলমল করতে লাগল।

ছোঁড়াটা বলল–'আমি ভিখারী। রাস্তার সাধারণ নগণ্য ভিখারী আমি–'

তামা বলল–'আমরাও ভিখারী–ভিখারী তো কি হয়েছে? যতক্ষণ সাতুর ব্যাংক ব্যালান্স "নিল" না হবে ততক্ষণ আমরা চালিয়ে যাব। আসুন ও-ঘরে। ইলেকট্রিক স্টোভ আছে তারই পাশে বসবেন। মেজেতে বসেই খাওয়া-দাওয়া করি আমরা। আসুন—'

খেতে খেতে সাতু বলল, 'খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই কিন্তু বেরিয়ে যাব। দুজনেরই ইনটারভিউ আছে দু' জায়গায়। আপনি কি থাকবেন এখানে?'

অবাক হয়ে গেল সত্যেন।

বলল—'আমাকে তো আপনারা চেনেন না। আমাকে বিশ্বাস করে' বাড়িতে রেখে যাবেন?'

তামা একগাল হেসে বলল—'যাব। আপনি যদি আমাদের জিনিসপত্তর চুরি করে' নিয়ে যান, তাহলে কি যে মজা হবে! সাতু আবার সব নতুন জিনিস কিনে দেবে। দেবে না সাতু?'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু উনি জিনিস চুরি করে' পালাবেন না।'

দু' কাপ চা, চার টুকরো মাখনদেওয়া পাঁউরুটি, দুটি ডিমের অমলেট এবং একটি সন্দেশ খেয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয়েছিল সত্যেনের। তখনি সে যেন বুঝতে পেরেছিল এ কয়দিন সে প্রায় অনাহারেই ছিল। খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল তার। বলল—'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি এখানে একটু ঘুমুই। আপনারা এলে তারপর চলে যাব।'

'চলে যাবেন কেন?'

সাতু জিগ্যেস করল।

চুপ করে রইল সত্যেন। তারপর বলল, 'আপনাদের কাছে থাকবার দাবী অর্জন করি

নি তো।' তারপর হঠাৎ বলল—'পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে বেশী। আমি নিজেকেই খুঁজছি যেন। মামার বাড়িতে তাই থাকতে পারিনি।'

তামা বলল—'বেশ না থাকেন, না থাকবেন। আমরা তো আপনার নিজের লোক নই যে জোর করব আপনার উপর। কিন্তু একটা ফরমাস আছে। ফিরে এসে একটা কবিতা যেন দেখতে পাই। টেবিলের উপর কাগজ কলম সব আছে।'

সাত্ত্ব বলল—'আর একটা কথা। আমাদের এখানে আপনার একটা পার্মানেণ্ট নিমন্ত্রণ রইল। যখন খুশী আসবেন। এতে রাজি তো?'

সত্যেন মুখে হাসি ফুটিয়ে চুপ করে' রইল।

তামা বলে উঠল—'নতুন ধরণের উপমা দিতে হবে কবিতায়। আমরা নূতনত্বের পক্ষপাতী কিন্তু!'

সত্যেন হেসে বলল—'তা তো দেখতে পাচ্ছি। লম্বা কোট পরা মেয়ে এর আগে দেখি নি। এ কোট আপনি করিয়েছেন?'

'না। এটা সাত্ত্বদার। আমাদের আরও নতুনত্ব আছে, শুনবেন? সাত্ত্বদা রোজ নামাজ করে আর আমি গায়ত্রী জপ করি—'

সাত্ত্ব গম্ভীরভাবে বলল—'অথচ আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়িনি।'

কলকণ্ঠে হেসে উঠল দুজনেই।

বিকেলবেলা তামা ফিরে এসে দেখল প্যাডে একটি কবিতা লেখা রয়েছে।

পাকিস্তানের জঙ্গী বর্বররা
বাংলাদেশের মা বোনদের উপর যখন
অকথ্য অত্যাচার করছিল,
জ্বালাচ্ছিল ঘর বাড়ি
চালাচ্ছিল ছোরা ছুরি বেওনেট-বোমা
যখন বাংলাদেশের জীবন্ত আত্মা
জীবন্ত কই মাছের মতো
ছটফট করছিল নৃশংসতার তপ্ত কটাহে,
দেশের বীরত্বসৌরভ যখন
সদ্য-ভাজা ইলিশ মাছের গন্ধের মতো
বিচ্ছুরিত হচ্ছিল দিগদিগন্তে,
তখন আমি কি করছিলাম?
কিছুই করি নি।
এক ফোঁটা জলও পড়ে নি চোখ দিয়ে।
হাহাকারের সাইরেন বাজছিল
বাংলাদেশ জুড়ে
সেই সাইরেন আমি শুনেছিলাম
কিন্তু ছুটে যাই নি পাগলের মতো
সীমান্ত পার হয়ে,
মহাভারতের পাণ্ডব হয়ে গিয়েছিলাম যেন
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখছিলাম মনে মনে

নিষ্ক্রিয় সঙের মতো!
আমাদের সেনারা গিয়েছিল সত্য
কিন্তু আমি যাই নি
আমি নিটোল ছিলাম, অটুট ছিলাম
আমার বুক ভেঙে যায় নি।
কিছুই করি নি আমি।
একেবারে কিছুই করি নি কি?
করেছিলাম, করেছিলাম, মনে পড়েছে—
নপুংসকদের আড্ডাখানায়
টেবিল চাপড়ে তর্ক করেছিলাম
আর চা কফি উড়িয়েছিলাম
কাপের পর কাপ।
তামা, সাত্,
আজ বুঝলাম
তোমরা আমার কেউ নও, অথচ সব।
আজ চোখ ফেটে জল পড়ছে তাই।
থাকতে পারলাম না—তবু
তোমরা আমার নাগালের বাইরে।
চললাম।
আমি তোমাদের কাছে থাকবার অযোগ্য।

॥ ৩ ॥

এই কলকাতা শহরেই মাঝে মাঝে অদ্ভুত গলি দেখা যায় এক একটা। ট্রাম লাইন থেকে দূরে, একে বেঁকে চলে গেছে এ-বাড়ি ও-বাড়ির পাশ দিয়ে। দুপুরে অদ্ভুত নির্জন নিঃশব্দ হয়ে যায় গলিটা। বাড়ির কপাট জানালা সব বন্ধ। পুরুষেরা কাজে বেরিয়ে গেছে; মেয়েরাও হয়তো। যারা কাজে বেরোয় না তারাই বসে আছে ঘরে খিল দিয়ে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। রেডিওর শব্দ পর্যন্ত নেই।

একজনের বাড়ির ভিতর থেকে একটা নিমগাছ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গলিটার ওপর। গলিতে ছায়া হয়েছে খানিকটা। সেই ছায়াতেই বসেছিল সত্যেন। পাশে ছিল তার নতুন বন্ধু টোটো। রাস্তার কুকুর একটা। তার সঙ্গে ভাব হয়েছে। একদিন সে যখন জিলিপি কিনে খাচ্ছিল তখন লোলুপ এই কুকুরটাকে দিয়েছিল একখানা জিলিপি। সেই থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে আছে। সে ভিক্ষে করে যা পায় তার অংশীদার হয়েছে টোটো। টোটো নামকরণ সত্যেনই করেছে। টোটোর যৌবন নেই। বুড়ো হয়ে গেছে। কাল যখন সে পাঁউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছিল তখন টোটোর মুখে একটা অদ্ভুত প্রশ্নাকুল দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। মনে হয় তার নিজের মনোভাবই যেন প্রতিফলিত হয়েছে টোটোর চোখের দৃষ্টিতে। মনে কবিতা জেগেছিল সে দৃষ্টি দেখে। সাধারণত সে কবিতার নামকরণ করে না। কিন্তু এ কবিতাটার নাম দিয়েছিল—সত্যেনের প্রতি টোটো।

সকালে ঘণ্টা-দুই ভিক্ষে করলে আজকাল প্রায় এক টাকা পেয়ে যায় সে। প্রায় ছাতু

কিনেই খায়। অনেকক্ষণ খিদে পায় না। যখন কবিতাটা মনে জেগেছিল তখন ছিল সে পার্ক স্ট্রীটে। মহাসভ্য স্ট্রীট। আগে সাহেবরা এ পাড়ায় থাকত। এখানে ছাতু পাওয়া গেল না। পাঁউরুটি কিনেছিল একটা। টোটো পাঁউরুটি খেয়েছিল সেদিন। কবিতাটা লিখেছিল কিন্তু গড়ের মাঠে গিয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলের ছায়ায় বসে।

সত্যেনের প্রতি টোটো

চলে গেছে যৌবন কলা দেখিয়ে।
কলাটা পেলাম না
তাই মিথ্যে কলা নিয়ে
মানে, ছলা-কলা নিয়ে আছি।
তুমি কিন্তু বলছ যা
আমি তা মানব না।
আকাশে মেঘগুলো
ছড়ানো- ছড়ানো
পেঁজা-পেঁজা
স্তূপ স্তর—নানা রকম।
এখনও কলের ভোঁ বাজেনি
এখনও আমি ডিউটি করছি
গোটাই আছি
ছিন্নভিন্ন হইনি।
নতুন বকলস দেখাচ্ছ আমাকে?
বকলস?
বকলস—হায় হায়—বকলস—
কিন্তু তবু বকলসের লোভ
কাবু করেনি আমায়।
কিন্তু কান খাড়া হয়ে উঠল
তোমার ভদ্রতার আড়-বাঁশীতে
ফুঁ দিলে যখন।
আমার অবশ চেতনার যেন
সাড় হল
চাড় হল
দুদ্দাড় করে ছুটে গিয়ে কামড়ে ধরলাম
তোমার ছুঁড়ে-দেওয়া পাঁউরুটির টুকরোটাকে।
কিন্তু হায়-হায়
শেষ পর্যন্ত—হায় হায়—
ভুলে যাই
আমি কুকুর—শুধু কুকুর।

কবিতাটি মৃদুকণ্ঠে পড়ল সে আবার। পাশে চেয়ে দেখল কেউ নেই। কেউ মানে, প্রিয়া। আগেই বলেছি সে প্রতিদিন কল্পনা করে একটি প্রিয়াকে। আজ কল্পনা করছিল নীলাম্বরী একটি শ্যামলী যেন ঝুঁকে দেখছে তার কবিতাটি। ফিরে দেখল কেউ নেই।

টোটো কুন্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে শুয়ে আছে। টোটোর হলদে রং। এখনও হলদে আছে, কিন্তু রংয়ের জলুস নেই। গায়ে ঘা হয়েছে মাঝে মাঝে। বুড়ো হয়ে গেছে টোটো।

ছোঁড়াটা ভাবতে লাগল—আমি যাকে খুঁজছি তাকে পাচ্ছি না কেন ? সে তো যুগে যুগে এসেছে। কাব্যে এসেছে, ইতিহাসে এসেছে, অনেকের জীবনেও এসেছে, আমারও মনের অন্তরীক্ষে এসেছে কতবার রঙীন আভাসে। কিন্তু মূর্তি ধরে আসে নি। একবারও আসে নি। বড় রাস্তায় দলে দলে মেয়ের সারি দেখছে সে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও দেখে নি যে তার প্রিয়া হবার যোগ্য। কতকগুলো কাপড়ের আলনা যেন হেঁটে চলেছে, কতকগুলো মাংসের স্তূপ। প্রিয়া নয় কেউ। কারো আয়তনয়নে লজ্জিত সুরুচি নেই। সব যেন উদ্ধত কাটখোট্টা। সে আসে নি। খাতা বার করে আর একটা কবিতা শুরু করল সে—।

নান্দুরের কবি-কণ্ঠ হয়েছিল যবে উদ্বেলিত
সে আহবানে এসেছিলে তুমি।
বেথেলহাম-কুটীর-প্রাঙ্গণে
এলেন দেবতা যবে
তুমি এসেছিলে।
শীর্ণ-গঙ্গার অঙ্গ হল যবে শিহরিত
কোশী-নদ-আলিঙ্গনে
তুমি এসেছিলে।
উদ্দাম পিয়ানো-মঞ্চে
বিটোফেন-ভাগনার যবে
আলিঙ্গন-বদ্ধ হল
তুমি এসেছিলে।
এসেছিলে গোলাপের জ্যোৎস্না বিলাসেতে,
এসেছিলে
যূথিকার চুপি অভিসারে
সন্ধ্যার গন্ধান্বিত অন্ধকার পথে।
কিন্তু হায় এলে না তো
যবে আমি
অখ্যাত পথের ধারে
বসে আছি কন্থা-সম্বল
তপ্ত পীচের পরে
আর্ত প্রত্যাশায়—
এলে না তো।
দুর্দান্ত প্রত্যাশার অগ্নি জ্বলে
হুহু-চুল্লী সম,
মন মোর জ্বালামুখি যবে
স্নিগ্ধ বারি সম তুমি এলে না তো।
ঘামাচি-বিক্ষত-পৃষ্ঠে
তোমার পেলব বাহুলতা
ক্ষণ-স্পর্শ দিল না তো।

এলে না—এলে না
মধ্যাহ্নের সূর্য সাক্ষী
হে মোহিনী, হে অবর্ণনীয়া,
মোর কাছে একবারও আসনি ভুলিয়া।

কবিতা লেখা শেষ না হতেই নির্জন গলিটা সহসা কার আর্তরবে যেন মুখরিত হয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল চোং-প্যাণ্ট-পরা একটা ষণ্ডা জুলফিদার ছেলে একটা দশ-বারো বছরের ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ছেলেটার আর্তরবে ভরে উঠল গলিটা। উপরের একটা ঘরের জানলা খুলে গেল। ষণ্ডা ছেলেটা বলল—বাড়ি চল, জুতিয়ে তোমাকে লম্বা করব।

টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল গলির বাঁকে। টোটোর ঘুম কিন্তু ভাঙে নি। সে যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল তেমনি ঘুমুতে লাগল। সে নির্বিকার।

একটু পরেই আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল নির্জন গলিটা। কিন্তু বেশীক্ষণ নিঃশব্দ রইল না। নিমগাছটার উপর বুলবুলি ডেকে উঠল একটা। সে ডাক অবর্ণনীয়। কাকে যেন খুঁজছে। পরক্ষণেই উড়ে গেল। সত্যেনের মনে হল তার মনটাই বুঝি বুলবুলি হয়ে গাছে গাছে খুঁজছে তার সঙ্গিনীকে।

মনের ভিতর থেকে আর একজন কে বলে উঠল—শুধু সঙ্গিনী পেলেই কি খুশী হবে? সঙ্গিনীর আনুষঙ্গিক যে সব জিনিস অপরিহার্য তা যোগাড় করবার সামর্থ্য তো নেই তোমার? তুমি অসমর্থ, তুমি গরীব, বিজ্ঞানের ভাষায়, 'আনফিট'। সঙ্গিনীকে ঘিরে আদর্শ সংসার না গড়লে অকস্মাৎ তোমার সমস্ত শরবৎ চিরতার চেয়ে তেতো হয়ে যাবে এ জ্ঞান তোমার অবচেতনলোকে টনটন করছে। আর সেই টনটনানির জ্বালায় তুমি যে সব কবিতা লিখেছিলে তাতে বিদ্রূপ করেছিলে নিজেকেই। কবির স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তুমি সত্যকেই দেখেছিলে, দেখেছিলে নিজের অন্তঃসারশূন্যতাকে। লিখেছিলে—অশ্বত্থ বটকে অস্বীকার করছে ব্যাঙের ছাতারা/সারপেনটাইন লেনে বিরাট জনসভার আয়োজন তাই/ঘেঁটু-পন্থী ধুরন্ধরেরা কচু-কাটা করছেন কাল-কাসিন্দা-পন্থীদের/বলছেন—সাবধান, সাবধান/এসব খবর কাগজে বেরোয় না/কিন্তু দিলমহলের গোপন কপাট খুলে দেখ,/দেখবে সেখানে লেখা আছে/আলকাতরার যুগ এসেছে/সূর্য চন্দ্র নিবে যাবে,/জয় হবে কেরোসিনের ডিবরির। / তার সঙ্গে সমঝোতায় যদি আসতে পার/আর আমাদের ফাণ্ডে যদি টাকা দাও/মাখন-মাখানো টোস্ট মিললেও মিলতে পারে/হয়তো দু'একটা আন্ডাও। /নচেৎ নয় নচেৎ নয়। /মনে রেখো, যদিও আমাদের পা-জামাটা নোংরা হয়ে যায় বারবার/তবু আমরা বীর। /আমরা বিদ্রোহী। /অসম্ভবকে সম্ভব আমরা করবই।। এ কবিতা তুমি লিখেছিলে আত্মধিক্কারে। মনের মধ্যে দুর্মুখ বিবেকটা বসে আছে। তাকে নিস্তব্ধ করা যায় না। কারণ সে সত্যবাদী।

সত্যেন কেমন যেন বিহ্বল হয়ে বসে রইল। সে সত্যি ভালো হয়ে থাকতে চায় কিন্তু পরিবেশ এমন হয়েছে যে কিছুতেই তা থাকা যাচ্ছে না।

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল সে। মনে একটা অদ্ভুত আকুলতা জাগছিল। মনে হচ্ছিল যত কষ্টই হোক যত দুঃখই পথ আঁধার করে আসুক আমাকে উঠতে হবে, ফুটতে হবে, জ্বলতে হবে। বাঙালীর উত্তরাধিকার বহন করছি আমি, সে উত্তরাধিকারের মান আমি রাখবই। হঠাৎ মনে পড়ল নেতাজীর কথা। মনে হল তিনি পাঠানদের দেশে আত্মগোপন করে বসে ছিলেন এক বোবা কাবুলী সেজে। তার আগে জেল খেটেছিলেন

বহুবার। বেণীমাধব দাস উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁকে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে। বিবেকানন্দ করেছিলেন দেশের মানুষের দিকে, গান্ধীজীর বাণী যখন দেশের সমস্ত মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছল তখন—হঠাৎ নেতাজী যেন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন আর সেই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এল এক অপরূপ যুবতী। সালোয়ার পরা, মুখের সামনে ওড়না আর সমস্ত মুখে লজ্জা। সে যে কী শালীনতা কী রূপ তা সত্যিই অবর্ণনীয়। মনে হল সন্ধ্যা যেন আরও নিবিড় হয়ে এসেছে। কেউ প্রদীপ জ্বালে নি—সে কিন্তু জ্যোতির্ময়ী। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার লজ্জার আবরণ যেন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে, তবু কিন্তু ঢাকতে পারছে না তাকে। স্বয়ম্প্রভ সপ্রতিভ দাঁড়িয়ে আছে সেই পাঠানী মেয়ে। মনে হল কাবুলের পাঠানদের ভদ্রতা যেন মূর্ত হয়েছে মেয়েটির মধ্যে। ওই ভদ্রতাই যেন নেতাজীকে আগলে ছিল। সত্যেন মনে মনে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর মনে মনেই কবিতা রচনা করতে লাগল। খাতা বার করে আর লেখবার সাহস হল না। ভয় হল চোখ খুললেই চলে যাবে সে।

...নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায় নৈষ্কর্ম্যের কাঁথা গায়ে দিয়ে/রোমন্থন করছিলাম নিজের দুর্দশার সংগে রাজনৈতিক খবর। /এমন সময় তুমি এসে অপরূপ যে খবরটা দিলে/তা রাজনৈতিক নয় লাজনৈতিক। তোমার লজ্জা হয়তো তোমার ভূষণ/কিন্তু আমার কাছে তা দুর্ভেদ্য বাধা। /সে বাধা অতিক্রম করি/এমন শক্তি আমার নেই। /আমি সীমিতবিক্রম। /আমার কল্পনার এরোপ্লেনও আমার ছোট আকাশ ছাড়িয়ে যেতে পারল না। /আমার ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর বকুল-বীথির মর্মর হয়ে গেল। /আমার বোমা ফাটল আমারই বুকে/রক্তাক্ত হয়ে গেল আমার সত্তা। /আমার যুদ্ধ-বাহিনী মুগ্ধ হয়ে প্রণত হল তোমার পদ-প্রান্তে। /তোমার ওই ময়ূরকণ্ঠী পাখতুনী সালোয়ারের পাটে পাটে যে রূপের হাট বসেছে,/ সেখানে পশরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে কি ? /খেলনার পশরা নয়,/নিয়ে যাব প্রণামের পশরা। /তুমি আমাদের নেতাজীকে রক্ষা করেছিলে একদিন।...

দুম করে একটা শব্দ হল।

চমকে জেগে উঠল টোটো। সত্যেনও হাঁটুর ভিতর থেকে মুন্ড বার করে দেখলে কয়েকটা ছেলে ছুটে পালাচ্ছে। গলির বাঁকে একটা ধূমায়িত পটকা। ওরাই কি পটকা ফাটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ? কেন ? এই নিদারুণ গ্রীষ্মে পটকা ফাটাচ্ছে কেন ? নিদারুণ গ্রীষ্মের বিরুদ্ধেই কি বিদ্রোহ করেছে ওরা ? আগুনের দিকে আগুন ছুঁড়ছে ? হঠাৎ মনে হল ওরা বোধ হয় পিপাসার্ত। ওরা বর্ষা-বিলাসী ডাহুকের দল গ্রীষ্মের পাল্লায় পড়েছে। তাই পটকা ফাটিয়ে বিদ্রোহ করছে। কিন্তু পারছে না। ছুটে পালাতে হল। প্রায় অসম্ভব বেগে উড়ে চলে গেল ডাহুকের দল।

কবিতা জাগল মনে। কিন্তু আর খাতা বার করলে না। মনে মনেই কবিতা মূর্ত হল তার মনে। সে ঠিক করলে আর খাতায় কবিতা লিখব না। খাতার পাতা গেছে ফুরিয়ে, পেন্সিল ভোঁতা হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবতে লাগল। যে ছেলেগুলো ছুটে পালাল তারা সবাই হাফপ্যান্ট পরা। কিন্তু তবু ওর মনে হল ওরা মানুষ নয় ডাহুক।

প্রায় অসম্ভব বেগে হাফ-প্যান্ট পরা ডাহুকের দল উড়ে গেল। উড়ে গেল সেই ঝাউবনে যে বনের ঘনিষ্ঠ আঁধারে জল থই-থই। পৃথুলা হংসীরা হয়তো সেখানে আছে। আর আছে আঁধার কুহক-গুহা কুম্ভক-গম্ভীর বন। আর আছে চিরশ্রাবণের চিরনিবিড়তা। মানুষের বেশে ছিল যারা গ্রীষ্মনিপীড়িত, ডাহুকের বেশে উড়ে গেল তারা শীতল-শীকর-স্নিগ্ধ কাজ্জলিত কাজরীর দেশে। বেদনার দীর্ঘশ্বাস মেঘ-রূপ ধরেছে

যেখানে–হঠাৎ চমকে উঠল সত্যেন। তার গালের উপর কার নিশ্বাস পড়ল যেন।

চোখ খুলে দেখে টোটো তার কানে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে। টোটোর চোখে উৎসুক দৃষ্টি। চল এবার ওঠা যাক এখান থেকে।

সত্যেন উঠে আবার চলতে লাগল। টোটোও চলতে লাগল পিছু পিছু। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলে গোটা দুই বিস্কুট আছে। একটা টোটোকে দিয়ে আর একটা নিজের মুখে পুরল, তারপর মনে হল–তেষ্টা পেয়েছে। এই দুপুরে রাস্তার কলে কি জল পাওয়া যাবে? হাঁটতে লাগল।

॥ ৪ ॥

একটা বড় রাস্তার ধারে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিল সত্যেন। তার ডান পাশে একটা তরকারির দোকান, বাঁ পাশে ফলের। পিছনে একদল প্যান্ট-পরা ছেলে দাঁড়িয়ে হল্লা হাসাহাসি করছে, পাশেই একটা পানের দোকান, সেখানে গাঁক গাঁক করে রেডিও বাজছে একটা। রাস্তায় একদল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বাসের আশায়। তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটা গরুর গাড়ি। গরু দুটোর শিং প্রকান্ড, তার পিছনে একটা ঠেলা, তার পিছনে ইলেকট্রিক হর্ন দিচ্ছে একটা মোটর, তার পিছনে সারি সারি মোটর। এরই মধ্যে একটা কুলী একটা খরমুজা খাচ্ছে ফুটপাথে বসে। সামনের দেওয়ালে প্রকান্ড একটা মেয়ের ছবি। প্রায়-উলঙ্গিনী একটি মেয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। ঠিক তার নীচেই একদল ভিখারী গৃহস্থালি পেতে বসেছে। হ্যাঁ, রীতিমত গৃহস্থালি। একটা হাঁড়িতে ছোট্ট উনুনে রান্না চড়েছে তাদের। পাশেই ফুটপাথে শুয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একটা কচি ছেলে, কেউ দেখছে না তাকে। তার পাশে বিড়ি খাচ্ছে একটা বিশ্রী বুড়ো। তার ডান দিকে বসে আছে ঘাগরা পরা একটা সোমত্ত মেয়ে। রাস্তার দিকে চেয়ে আছে আর দুহাত দিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে নাক-মুখ কুঁচকে। বুকের আবরণ যে সরে গেছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। তার নিরাবরণ বুকের উপর লক্ষ্য পড়েছে অনেকের। প্যান্টপরা ছোঁড়াগুলো সম্ভবত ওই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। একটু দূরে রাস্তার উপর ঝাঁকা নামিয়ে বসে আছে জন-কয়েক ঝাঁকা-মুটে। সবাই অবাঙ্গালী। দুজন ছাতু খাচ্ছে মনে হল।

সত্যেনও কিছু ছাতু কিনতে চায়। অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ছাতুর দোকান। একটা ঝাঁকার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে–ভাইয়া ছাতু কাঁহা মিলবে?

বিহারী ঝাঁকাটি উত্তর দিলে তার স্বকীয় বাংলায়—'ওই সামনেহর গল্লী দেখছেন ওইখানে চলিয়ে যান। পুছ করুন—সুরপতিয়ার দোকান কোথা। পাত্তা মিলে যাবে। সিংজির বড়া মকান আছে, সেই মকানের নীচে সুরপতিয়া থাকে। বঢ়িয়া সাততু মিলবে।'

সত্যেন এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখল টোটো নেই। কোথা গেল সে? কাছে-পিঠে নেই সে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল তার। আবার সে সচেতন হল সে নিজেকে খুঁজছে। খুঁজছে তার উত্তরাধিকার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে সে উত্তরাধিকার কি খুঁজে পাবে সে? খুঁজে যদি পায়ও তাহলেই বা কি চতুর্বর্গ লাভ হবে তার? জনতার স্রোত বয়ে চলেছে, এর মধ্যে বাঙ্গালী কারা? হাতকাটা জামা আর চ্যোং-প্যান্ট ছাড়া আর তো কিছু দেখা যায় না। অনেকের পেটে বোমা মারলে হয়তো বাঙ্গালী ডাল ভাত চচ্চড়ি বেরিয়ে পরবে। কিন্তু বাইরেটা বদলে ফেলেছে সবাই। সব একরঙা হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙ্গালীত্ব কি শুধু পোশাকে? বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী ছিলেন, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসও বাঙ্গালী ছিলেন।

বাংগালী ছিলেন রামমোহন রায়, বাংগালী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বাংগালী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পোশাক তো এক নয়। সব যেন গুলিয়ে গেল।

রাস্তা পার হচ্ছিল সে। ভিড়ের গুঁতো খেয়ে মোটরের পাশ দিয়ে ঠেলাগুলো বাঁচিয়ে রিকশাকে পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল সে গলিটার দিকে। এমন সময় একটা প্রকান্ড অদ্ভুত গাড়ি পথরোধ করে দাঁড়াল। গাড়ির উপর মই একটা আরও কত কি। একজন বলল—ট্রাম-লাইন সারাবার গাড়ি। তার উপরেও প্যান্ট-পরা হাতকাটা-জামা-গায়ে কয়েকটা লোক। বাংগালী ওরা কি? বোঝা যায় না।

সন্তর্পণে বড় রাস্তাটা পার হয়ে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে উঠল। ফুটপাথে পা রাখবার জায়গা নেই। একজন বসে আছে অনেক ছুরি কাঁচি চাবির রিং আর তালা নিয়ে। তার পাশেই চানাচুরওয়ালা মাথায় রংগীন পাগড়ি, পরনে রংগীন ফতুয়া, গোঁফ সূচ্যগ্র। হঠাৎ সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—বাদাম কাজু মটট্র মুং। বাংগালী নয় অবাংগালী। বোধহয় উত্তর প্রদেশের লোক। এ কিন্তু প্যান্ট পরে নি। পরনে মালকোচা-মারা কাপড়। মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল—চোখে সুর্মা পরেছে। না, বাংগালী নয়। হঠাৎ তার মনে হল এরা কেউ মানুষই নয়। সব স্বার্থসন্ধানী বকের দল। এই কলকাতা শহরটা বিরাট একটা জলা, সেখানে লক্ষ লক্ষ মৎস্যসন্ধানী বক ঘোরাফেরা করছে। মোটর রিকশা ঠেলা ট্রাম বাস— সব বক।

গলির মুখে একটা ফাঁকা বারান্দা পেল। সেইখানেই বসে পড়ল। কাছেই একটা ছোঁড়া মুখে হাত পুরে 'সিটি' দিলে একটা। তারপর ছুটে চলে গেল। সত্যেন ভুলে গেল ছাতু কিনতে হবে। বসে বসে রাস্তার দৃশ্য দেখতে লাগল সে। এ দৃশ্যে সূর্য নেই চন্দ্র নেই নক্ষত্র নেই সন্ধ্যা নেই উষা নেই। আছে খালি মানুষ, মানুষ আর মানুষ। আর নানারকম যানবাহন আর নানারকম চীৎকার। সিনেমার উন্নত বক্ষ মেয়েটার ছবিও দৃপ্ত ভংগীতে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এই জনতার দিকে। মুখে মুচকি হাসি। হঠাৎ এ দৃশ্যও লুপ্ত হয়ে গেল সত্যেনের চোখ থেকে, ফুটে উঠল বিরাট একটা জলার ছবি। কবিতা জাগল মনে।

সম্মুখে বিস্তৃত জলা। তার উপরে লক্ষ লক্ষ
বক। মুনাফা-সন্ধানী বণিকের মতো সন্তর্পণে
সঞ্চরিছে। বৈপ্লবিক বুদ্ধি এক জাগিছে মগজে
জলাটারে জমাইয়া বরফ করিয়া ফেলি যদি,
বকেরা পালাবে। আসিবে হয়তো লক্ষ লক্ষ
পেংগুইন পাখী, মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট তুলতুলে
চর্বিদার জীব সব। কি হয় তাহলে?
নিঃসন্দেহে অভিনব হয় কিছু। কিন্তু হায়
কিছুই হল না, কল্পনা ফুরায়ে গেল।
হঠাৎ এ কি এ! বকবকম করিছে বকেরা।
বকেরা হয়েছে পায়রা। পায়রাও তুলতুলে,
পায়রাও সুখাদ্য অতীব, পায়রার নানা রং,
পায়রার নানা গুণ—

'এই হটো হিঁয়াসে—'

ঘরের ভিতর থেকে বলিষ্ঠ একজন লোক শতরঞ্জি পাততে লাগল বারান্দার উপর। শতরঞ্জির উপর চেয়ার রাখা হল। তারপর এল একটা গড়গড়া। তারপর এলেন নগ্নগাত্র

কুচকুচে কালো থলথলে মোটা একটি লোক। তাঁর বাঁ হাতে প্রকান্ড একটা সোনার তাবিজ। ভড়াক ভড়াক করে তামাক খেতে লাগলেন। পিছনে একজন চাকর দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল তাঁকে।

সত্যেন গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

টোটো—টোটো—চীৎকার করলে দুবার। টোটোর দেখা নেই। কোথায় গেল সে? একটু এগিয়েই সে দেখতে পেল সুরপতিয়ার দোকান। দোকানের সামনেই বসে আছে সুরপতিয়া। চেহারাটা কিন্তু বেসুরো। প্রকান্ড গোল মুখ, মাথার সামনের দিকে টাক, ফরসা রং, বেজায় মোটা, দুহাতে প্রচুর উল্‌কি, দুপায়ে গোদ।

'ছাতু পাওয়া যায় এখানে?'

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল সুরপতিয়া। 'যায় বইকি। একটু দাঁড়াও বাবা, এটা ঘেঁটে দিই একটু—'

ফুটপাতের উপরেই একটি উনুনে কি যেন ফুটছিল একটা হাঁড়িতে। সেইটেতে কাঠের হাতার মতো জিনিস ঢুকিয়ে নেড়ে দিলে সুরপতিয়া।

'কিসের ছাতু চাই?'

'অর্ধেক বুট আর অর্ধেক যবের।'

'কত?'

'চার-আনার।'

'চার আনার ছাতুতে আগে পেট ভরত। এখন ভরবে না। তুমি খাবে?'

'আমি আর টোটো—'

'দুজনের পেট চার আনাতে ভরবে না।' সুরপতিয়া উঠে ঘরের ভিতর গেল। ধনীর প্রাসাদের বারান্দার নীচে ছোট্ট একখানি ঘর। ঘর না বলে তাকে গুহা বলা উচিত। একটি ছোট দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই দরজার ভিতর হেঁট হয়ে ঢুকে গেল সুরপতিয়া। একটু পরে বেরিয়ে এল আবার হামাগুড়ি দিয়ে। হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় ছাতু। সত্যেন আগেও ছাতু কিনেছে। দেখল সুরপতিয়া যত ছাতু এনেছে তার দাম এ বাজারে চার আনার অনেক বেশী।

'অত ছাতু আনলে যে। আমি তো মাত্র চার আনা দেব।'

'চার আনাই দাও। তুমি কোথায় কাজ কর?'

সত্যেন চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—'আমি কাজ করি না। ভিক্ষে করি—'

'ভিক্ষে কর! ছিয়া ছিয়া ছিয়া। কাজ কর না কেন বাবা! আমার ছেলে মিলে কাজ করে, আমার ছেলের বউ ঝি-গিরি করে, তার একটা মেয়ে আছে সেও ঘোষবাবুর ছোট ছেলেকে নিয়ে দুবেলা বেড়াতে যায় গাড়ি ঠেলে ঠেলে।'

সত্যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল—'তোমার বাড়ি কোথায়—'

'ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁও।'

'সেখান থেকে এখানে এসেছ কেন?'

'রোজগারের ধান্দায়। ঘরে আমার বুড়ো শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন। তাদের প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হয়। কহল গাঁয়ে বেশী রোজগার করবার উপায় নেই।'

'উনুনে কি হচ্ছে, ভাত?'

'না। মকাইয়ের ঘাঁটা। ভাত খাবার মতো পয়সা নেই। মকাইয়ের ঘাঁটা খায় ওরা।

ভাতের সংগে তরকারি চাই, ডাল চাই—সব মাগ্‌গি।'

'কত রোজগার হয় তোমাদের ?'

'সবাই মিলে প্রায় চারশ টাকা রোজগার করি আমরা।'

'আমি এত ছাতু নেব না। তুমি চার আনার ছাতুই দাও আমাকে—

সুরপতিয়া স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে কয়েক মুহূর্ত।

'বেশ।'

আবার সে ছাতুর ঠোঙা নিয়ে ঢুকল গুহার মধ্যে। আধ ঠোঙা ছাতু নিয়ে বেরিয়ে এল আবার।

'নাও।'

'একটু জল দিয়ে মেখে দেবে না ?'

'তুমি যখন আমার সংগে দোকানদারী করলে আমিও করব। জল দিয়ে মেখে দিতে হলে দু পয়সা বেশী দিতে হবে।'

সুরপতিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে।

সত্যেনের কাছে আরও পয়সা ছিল।

বার করে দিল সে আরও দু নয়া।

'ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে। তুমি তো ভিখ-মাংগা নও তুমি তো নবাব—দাও—' আবার ছাতুর ঠোংগা নিয়ে ঢুকল সে ঘরের ভিতর। ছাতু মেখে নিয়ে এল এক দলা। সত্যেনের মনে হল দলাটা বেশ বড়।

'আবার বেশী দিয়েছ মনে হচ্ছে।'

'ফের যদি কচকচ কর আমি ছাতু দেব না।'

অদ্ভুত একটা মাতৃমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুরপতিয়াকে ঘিরে।

সত্যেন অবাক হয়ে গেল। এই অহেতুক স্নেহের কারণ কি বুঝতে পারল না সে। জিগ্যেস করবার সাহসও হল না। অবাংগালীদের সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণাই তার ছিল এতদিন। সুরপতিয়ার স্পর্শে এসে সব মধুর হয়ে গেল যেন। মনে হল চিরন্তনী মা সব দেশে সব জাতের মধ্যে আছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'মা আমাকে মাপ কর। আমি চললাম।'

সুরপতিয়া বললে—'আমি ভিখ মাংগার মা হই না, আমি নবাবের মা হই না, আমি গরীব ভদ্রলোকের মা—'

সত্যেন তার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাতজোড় করে প্রণাম ক'রে চলে গেল তাড়াতাড়ি।

যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ল তার। আজকাল অনেকে বলছেন কলকাতায় অবাংগালীদের এই আধিপত্য সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু এই অবাংগালীরা যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাদের কাজ বাংগালী ছেলেরা করতে পারবে কি ? কুলী হতে পারবে ? রিকশ টানতে পারবে ? ফেরিওয়ালা হতে পারবে ? মেহনতের কোন কাজটা করতে পারবে তারা ? তারা তো মোড়ে মোড়ে চোংপ্যান্ট আর হাফ সার্ট পরে জটলা করে রাজা উজির মারে, ক্রিকেট আর ফুটবল খেলার মাঠে ভিড় জমায়, সিনেমার টিকিট কেনবার জন্যে 'কিউ' দেয়। আর করে স্ট্রাইক, করে সভা—

হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। টোটো কোথায়! এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কোথাও টোটো নেই। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এল, সেখানেও নেই। বাঁ ধারে চলতে

লাগল। কিছুক্ষণ পরেই পার্ক পওয়া গেল একটা। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্ক নয়, চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা ফাঁকা জায়গা খানিকটা। তার গেটও আছে একটা। সত্যেন সবিস্ময়ে দেখল সেই পার্কের ভিতর টোটো প্রেম করছে। কুকুরীটা পাঁশুটে রঙের। টোটোর প্রেমলীলায় বাধা দিতে ইচ্ছে হল না তার। রাস্তার কলে জল ছিল। সেইখানে গিয়ে অর্ধেকটা ছাতু খেয়ে ফেললে সে। তারপর জল খেল অনেকটা। টোটোর জন্যে রেখে দিল খানিকটা ছাতু। তারপর গিয়ে বসল সামনের বাড়ির রকে। মনে হল ভাগ্যে আগেকার বাবুরা রক বানিয়েছিলেন, তাই আমরা বসে বাঁচছি। দেখা গেল নায়িকা আমোল দিচ্ছে না টোটোকে। খ্যাঁক খ্যাঁক করে ধমকাচ্ছে। টোটো কিন্তু না-ছোড়। খ্যাঁকানি খেয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছে কুত্তীটার পিছু পিছু। হঠাৎ সত্যেনের ভাবান্তর হল। সে যেন নিজেকেই প্রত্যক্ষ করল টোটোর মধ্যে। মনে হল টোটো যা নির্লজ্জের মতো সবার সামনে করছে সে-ও কি তাই করছে না কবিতার আড়ালে? কবিতা জাগল মনে।

উৎপল-প্রসন্ন আঁখি নয়তো উপহার। সাদামাটা
কুতকুতে চোখ। কান খাড়া খাড়া, ল্যাজটি
জিলিপি। ইহাতেই মুগ্ধ টোটো। আমিও কি নই?
স-লোম নির্লোম কান-খাড়া
কান-ঝোলা বিপুচ্ছ শ্রীপুচ্ছ ছাই-রংগা
নাক-বোঁচা যাহোক একটা
যোষিৎ হলেই হল।
দেখা হইলেই বাড়ায়ে দুবাহু
আকুতি-আকুল-কণ্ঠে উঠিব ডাকিয়া—
আতুত, আতুত। ছাতে জানালায়
রাজপথে অলিতে গলিতে
সার বেঁধে চলিয়াছে শত শত
পিঠ-কাটা-ব্লাউসধারিণী।
বংশবনে অন্ধ ডোম সম খাইতেছি ঘুরপাক
হস্তে লয়ে ভোঁতা কাটারিটি।

প্রণয়-রঙ্গে ভঙ্গ দিয়ে হঠাৎ টোটো ছুটে বেরিয়ে এল পার্ক থেকে, আরও দুটো ষন্ডা কুকুর তাড়া করেছে তাকে। মরি-বাঁচি ছুট দিয়ে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল সে। ক্যাঁচ করে একটা মোটর ব্রেক কষল। একটা ঠেলার তলা দিয়ে এসে হাজির হল সত্যেনের কাছে। এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। সত্যেন ছাতুর দলাটা দিল তাকে। গপ করে খেয়ে ফেলল। কয়েকটা কশাই একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনের একজনের মাথায় এক ঝাঁক মুরগী। হর্ন দিতে দিতে এগিয়ে এল প্রকান্ড একটা লরি। লরিতে বস্তাবন্দী হাড়। একটা হাড় বেরিয়ে আছে। ফুটপাথে একটা ফলওয়ালী একটু পিছন ফিরে বসে স্তন্যদান করছে তার শিশুকে...সবাই চলেছে কিন্তু কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, পাশাপাশি চলেছে কিন্তু চেনে না কেউ কাউকে, চিনতে চায় না। একটা অতি বৃদ্ধা কুঁজো লাঠি ঠক ঠক করতে করতে বেশ দ্রুতবেগে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বলল—কিছু দেবে বাবা? সত্যি বড্ড গরীব আমি।

সত্যেন এক নয়া পয়সা দিলে তাকে। তার পরই উঠে পড়ল।

'টোটো চল এখান থেকে—'

মনে পড়ল পঙ্কার সেই উপদেশটা। পঙ্কা বলেছিল—কোলকাতার রাস্তায় কোথাও দাঁড়াস নি। ভিক্ষে চাইবে ধাক্কা মারবে, ঠিকানা খুঁজে দিতে বলবে, মাথায় আবর্জনা ফেলবে, পকেট কাটবে। কোলকাতার রাস্তায় দাঁড়াতে নেই। চলতে হয় ছুটতে হয়।

সত্যেন হন্ হন্ করে ছুটতে লাগল
টোটোও চলেছে তার পিছু পিছু।
কিন্তু কোথা যাবে তারা?

যাবার জায়গা কোথাও নেই। কলেজ স্ট্রীট পাড়াটাকে সে এড়িয়ে চলছিল। মনে হত—তার বিগত জীবনটা, যে জীবনে সে মামার পয়সায় পড়াশোনা করত, মামার পয়সায় রেস্তোরাঁয় বসে চপ কাটলেট খেত, কফি-হাউসে গিয়ে রাজনীতির তর্ক করত—সেই জীবনটা এখনও বোধহয় ওত্ পেতে বসে আছে সেখানে। সেখানে গেলেই হয়তো খপ করে তাকে চেপে ধরবে। দেখা হয়ে যাবে কোনও চেনা বন্ধুর সংগে বা প্রফেসরের সংগে বা সেই চায়ের দোকানের মালিকের সংগে যার কাছে এখনও হয়তো কিছু দেনা আছে তার। কিম্বা মির্জাপুর স্ট্রীটের দ্বিতল বাড়ির জানলায় যে মেয়েটি একদা তার মনোহরণ করেছিল, কিন্তু যার সংগে সে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পায় নি—এরা হয়তো এখনও আছে সেখানে। তাদের কাছে ভিখারীর বেশে সে যাবে কি করে? না, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় সে যেতো না। কোলকাতায় স্ট্রীটের অভাব নেই গলির অভাব নেই, কলেজ স্ট্রীটকে সে এড়িয়ে চলত। প্রায়ই কিন্তু তার মনে হতো এর জন্য কে দায়ী? এই যে জঘন্য চোরের মত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, ভিক্ষে করে খেতে হচ্ছে—এর জন্যে কে দায়ী? সে নয়। তার মামা তাকে স্কুলে ঢুকিয়েছিলেন, সে একটার পর একটা পরীক্ষা পাস করে গেছে। কোনও কোনও পরীক্ষায় বেশ ভালই করেছে কিন্তু যেই লেখা-পড়া শেষ হয়ে গেল অমনি তাকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হল কেন? কারণ সে চাকরি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

সে নোটবুক থেকে মুখস্থ বলতে পারে চন্দ্রগুপ্ত কজন ছিল। রোম কখন গ্রীসকে আক্রমণ করেছিল। এলিজাবেথের স্প্যানিশ আর্মাডার প্রেরণা কে ছিল, বৈদিক সভ্যতা আর ঔপনিষদিক সভ্যতার তফাৎ কি? এই সব তার কণ্ঠস্থ আছে কারণ সে ইতিহাসের বই অনেক পড়েছিল। কণ্ঠস্থ ছিল কারণ ভেবেছিল কণ্ঠস্থ করলে ডিগ্রী পাওয়া যাবে আর ডিগ্রী পেলে চাকরি। কিন্তু গোলামখানার গেটে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ের ভিড়! সবাই চাকরি চায়। ঘুষ, তদ্বির, নেপটিজম্, দালালির নানা খেলা চলছে সেখানে। চাকরি পাওয়া যাবে না। কিন্তু চাকরি না পেলে সে করবে কি? নোটবুক মুখস্থ করা বিদ্যে ছাড়া আর তো তার কোন সম্বল নেই। সে জুতো শেলাই করতে জানে না, দর্জিগিরি জানে না, ছুতোরগিরি জানে না, ফিরি করতে পারে না, মোট বইতে পারে না, ছাত পিটতে পারে না—রাঁধতে পারে না, যারা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, যারা প্লাম্বার তাদের দলেও নয় সে। দম্ভভরে সে ওদের নাম দিয়েছে 'ছোটলোক'। ভুলে গেছে যে আসল ভদ্রলোক ওরাই, ওরা নিজের গতর খাটিয়ে নিজের জোরে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। ওরাই স্বাধীন, কারও দ্বারে হাত পাতে না, কারো কাছে মানসম্ভ্রম মনুষ্যত্ব বিক্রি করে চাকরি করে না। বুঝতে পারে না সবচেয়ে অসহায় সে নিজে। সবচেয়ে কৃপাপাত্র। নোট মুখস্থ করা বিদ্যা ছাড়া ইতিহাসের কতটুকু আয়ত্ত করেছে সে? কিছুই না। কেরানীগিরি করা ছাড়া আর কি করতে পারে সে? কিছুই না। কিন্তু তার দোষ কি! তাকে ছেলেবেলা থেকে যেমন করে গড়া হয়েছে তেমনি হয়ে উঠেছে সে। এখন কি করবে...কি করবে... মামার স্কন্ধে আর বেশী দিন থাকতে পারছিল

না সে, মামা-মামীর নীরবতাই যেন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তাই সে পালিয়ে এসেছে। মনে হয় মামা-মামী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন।

কিন্তু এখন কি করবে? ক'দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। টোটোও ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে। এটা বুঝেছে ভিক্ষে করে পেটটা চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু উদ্বৃত্তও থাকে। সেদিন একটা গেঞ্জি কিনেছে। কিন্তু মনের ভিতর আগুন জ্বলছে। হাহাকারের আগুন, জিজ্ঞাসার আগুন, উচ্চাশার আগুন। সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে কলকাতার বাইরে। এখানে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। মাঝে মাঝে মাঠও আছে। গাছও আছে দু'একটা। একটা গাছের তলাতেই বসেছিল সে। টোটো একটু দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। যখনই সে বিশ্রাম নেয় কোথাও, টোটো ঘুমোয়। হঠাৎ সামনের গাছে একটা পাখী এসে বসল। লেজটি উৎক্ষিপ্ত করে উড়ে গেল আবার। শাদায় কালোয় চমৎকার চেহারা। ওটা যে দোয়েল পাখী তা সে চিনত না। একটু পরেই কিন্তু মনে পড়ল সাতকড়ির কথা। সে যেন এই পাখীরই বর্ণনা দিয়েছিল। এই কি দোয়েল? তারপর হঠাৎ অপূর্ব সুর ভেসে এল তার কানে। দেখলে সামনের বাড়ীর ছাদে একটা বাঁশ রয়েছে, বোধহয় রেডিওর এরিয়েল, সেই বাঁশের উপর বসে গান গাইছে দোয়েল। অপূর্ব সে গান। অবর্ণনীয়। মনে হল সমস্ত পাড়াটা যেন স্বপ্ন দেখছে। সত্যেন একদৃষ্টে চেয়েছিল পাখীটার দিকে। তার এই একাগ্র দৃষ্টির আঘাত সহ্য করতে পারল না সে, উড়ে গেল। সত্যেন মুগ্ধ হয়ে বসে রইল। আশ্চর্য জিনিস একটা মনে হল তার। মনে হল—গুরু পেয়েছি। কবিতা জাগল মনে।

পথ আছে কোটি কোটি।
গুরুও অনেক।
সূর্য তো আকাশভরা।
পথহারা ফিরি তবু আমি।
যে গুরু দেখাবে পথ তার দেখা পেলাম না আজও।
একটিও সূর্য নাই আমার আকাশে,
ধ্রুব-তারা অস্তমিত।
সহসা দোয়েল পাখী বসিল আসিয়া
সামনের গাছটিতে
হয়তো দোয়েল,
আগে তো দেখি নি।
গাহিল অপূর্ব গান।
দোয়েলের ভাষা শিখিনি জীবনে।
তবু মনে হল বুঝিলাম মর্মবাণী তার।
সে যেন বলিয়া গেল,
যাই হোক, গান গেয়ে যাও।
গানই পথ, গানই গুরু।
গানই তো আলো
আরও বলে গেল—
গান গাই বলে বেকার নহি তো আমি।
গোলামি করি না কারও।

অনলস চেষ্টায় জাগ্রত করিয়া রাখি নিজের শক্তিকে।
উপার্জন করি নিজে,
নিজের সামর্থ্যে উড়ি নিজের ডানায়...

গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সত্যেন। হঠাৎ চমকে উঠে পড়ল। কানের পিছনে কি একটা কামড়ে দিয়েছে। তারপর ঘাড়েও কামড়ালো। হাত দিয়ে দেখল লাল পিঁপড়ে। গাছে লাল পিঁপড়ে অনেক। কানে আর ঘাড়ে হাত বুলুতে বুলুতে দেখতে পেল পাশের বাড়ির জানলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ডাগর-ডোগর লাল-শাড়ি-পরা কিশোরী একটি। তাকে দেখেই জানলা বন্ধ করে দিল সে। সত্যেনের হঠাৎ মনে হল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। অনেকক্ষণ থেকে তেষ্টা পেয়েছে। ওই বাড়িতে জল চাইলে দেবে কি? সজ্ঞান মনে জলের তাগিদ ছিল, কিন্তু নির্জ্ঞান মনে ছিল ওই কিশোরীটি। উঠে পড়ল।

বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। ভিতর থেকে সাড়া এল কাংস্যকণ্ঠে—অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর।

'কে গো—কি চাই—'

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল দেবেন একটু?'

খানিকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ নাই।

তারপর বারান্দার জানলাটা খুলল। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল বাড়ির ঝিই বোধ হয়। মাথার চুল পাকা, গাছকোমর বাঁধা। হাতে এক্‌গ্লাস জল।

'ভদ্দরলোকের বাড়িতে কড়া নেড়ে কেউ জল চায় না কি। বেপাড়ার লোক এখানে এয়েছ কেন। তোমাকে তো দেখিনি কখনও।'

সত্যেন উত্তর দিল না, ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলল জলটা।

'এ পাড়ায় কি করছ।'

'আমি ভিক্ষে করে বেড়াই। নানা জায়গায় ঘুরতে হয়।'

'এখন তোমাকে ভিক্ষে দেবে কে। বাড়িতে কেউ নেই। সব আপিস গেছে। কপাট খুলতে মানা—চোর-ডাকাতের উপদ্রব—যাও তুমি—'

বাড়ির ঝি গেলাসটা নিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিল জানলাটা। বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে টোটোও উঠে এসেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। সে-ও বারান্দা থেকে নেমে যাবে ভাবছিল এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে জানলাটা খুলে গেল একটু, তারপর একটা বিশ নয়া টক করে এসে পড়ল বারান্দায়। জানলার কপাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সত্যেনের চোখে জল এসে পড়ল।

জল এল কেন? জানে না কেন।

আবার একটু দূরে গিয়ে আর একটা গাছের তলায় বসেছিল। মনে হচ্ছিল সঙ্গোপনে তার জীবনে অনেক পরীই এসেছে, সঙ্গোপনেই চলে গেছে তারা। আজ একজন শুধু তার মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেল—বিশ নয়া। কবিতার ফুল ফুটতে লাগল মনে।

অতি সঙ্গোপনে আসে যে পরীরা
তাদের দেখিনি কভু। কেবল দেখেছি সেই চিহ্নগুলি
যেগুলি তাহারা রেখে গেছে, ফেলে গেছে—
সবুজ পাতায়—ফুলের পাপড়িতে—
কিম্বা কোনও সন্ধ্যায় স্বপনে।

চিহ্নের নিরিখে তাহাদের পাই।
আজিকার চিহ্ন বিশ নয়া।
বিশ নয়া বলিতেছে বাখানিয়া–
ভিখারী ভিখারী তুমি–পয়সার ভিখারী,
আর কিছু নও।
ওগো নবপরী, তোমার এ রায় মানিয়া নিলাম।
সন্তুষ্ট রব তাই নিয়ে।
এ জীবনে সমগ্রের স্বাদ পাইনি কখনও।
খুব কাছে আছে যারা
তারাও তো পরীর মতন
রহস্যের কুয়াসায় ঢাকা।
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিহ্নগুলি দিয়ে
সৃষ্টি করি তাহাদেরও।
আমার জীবন তাই পরী-সমাকীর্ণ
অপরূপ রূপকথা-লোক।
অপেক্ষা করিয়া আছি
সত্যের স্বরূপ রূপকথা ভেদ করি
দেখা দিবে কবে......

আবার উঠে হাঁটতে লাগল।

পিছনে টোটো।

একটা গলি থেকে বেরিয়েই সে একটা ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। মেলা বসেছে। হ্যাঁ, ফুটপাথেই মেলা বসেছে। তরকারির দোকান, খাবারের দোকান, শরবতের দোকান, আর পুতুলের দোকান। নানা রকম পুতুল চতুর্দিকে। দূরে একটা নাগরদোলা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাতে অনেক ছেলেমেয়ে। বাঁদরের নাচ দেখানো হচ্ছে এক জায়গায়। প্রচুর ভিড় সেখানে। বাঁদর কি করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তাই দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছে একদল লোক। সিনেমার গান বাজাচ্ছে একটা পানওয়ালা লাউড স্পীকার দিয়ে। আর পুতুল। নানা রংয়ের–নানা মাপের–নানা রকম পুতুলকে ঘিরে নানা রকম লোকের ভিড়। ছেলে মেয়ে তো আছেই, বুড়োরাও আছে। পুতুলদেরও নানান ভঙ্গী। নানা চেহারা। লক্ষ্মী সরস্বতী শিব গণেশ তো আছেনই তার সঙ্গে আছেন প্যাঁচা, আরসোলা, টিকটিকি, চিনেবাদাম। মাটির পুতুল কিন্তু সব যেন জীবন্ত। নিঃশব্দও যেন শব্দ করছে। নিস্তরঙ্গের বুকেও যেন তরঙ্গ উঠেছে। যারা গোলমাল করছে চারদিকে–তাদের চেয়েও এরা যেন বেশী মুখর। মনে কবিতা জাগল। ভিড়ের মধ্যে সে একটা পুতুলের দোকানের পাশে বসে পড়ল ফুটপাথে।

...নিঃশব্দও শব্দ করে ভাই।
বুঝিলাম আজ–তারও আছে ছন্দ-তাল।
আছে রাগ, রাগিণীও আছে।
অনুমান-শ্রবণ-মঞ্চেতে শোনা যায় সে নিঃশব্দে।
দিন যবে শেষ হয় সন্ধ্যার আঁধারে,
ক্লান্ত বীণা নীরব যখন,

মুখর বাঙ্ময় যবে মৌন অবাক,
নির্নিমেষ নয়নও যখন দেখিতে পায় না কিছু,
সু-উচ্চ কণ্ঠও যবে পায় না কোন প্রকাশের ভাষা,
তখন নিঃশব্দ হয়ে আসে নিঃশব্দ-চরণে,
নিস্তব্ধ অন্ধকারে।
তার ছন্দ-লয়-তাল—তার রাগ-রাগিনী-মহিমা,
লক্ষ লক্ষ জোনাকীর নিঃশব্দ দীপ্তিতে হয় মূর্ত
অতীন্দ্রিয় অকর্ণগোচরে—
বর্ণনীয় নয় যাহা বাক্য-বন্দী কাব্যের ঝংকারে......

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল সে পুতুলগুলোর দিকে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে টিকলুকে দেখতে পেল। পুতুল কিনছে। হাতে একটা থলি, তাতে পুতুল কিনে কিনে রাখছে। পাশে একটি রূপসী যুবতী মেয়ে, তারই ফরমাশ মতো পুতুল কিনছে টিকলু। টিকলু বিয়ে করেছে না কি? যদিও সে এতদিন আত্মগোপন করে চলছিল, কলেজ স্ট্রীটের ধার দিয়েও যায়নি, তবু টিকলুকে দেখে সে যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস দেখতে পেল। টিকলু প্রাণের বন্ধু ছিল তার। ভালো ছেলে ছিল না, পরীক্ষা দিতে বসে প্রায়ই টুক্‌ত, তবু পাস করতে পারত না। টুকতেও পারত না ভালো করে। দুবার বি-এ ফেল করেছিল। তবু ওকে ভালবাসত সত্যেন। ওর মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ সপ্রতিভতা এমন একটা সরল আন্তরিকতা ছিল যে, ওকে ভাল না বেসে উপায় ছিল না। সবাই ভালবাসত ওকে।

ডাক শুনে টিকলু সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে। চিনতে পারল না। সত্যেনের সারা মুখে গোঁফদাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল লম্বা লম্বা, মুখ শুকনো, চোখ কোটরগত। কলেজের সত্যেনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ। আমি সত্যেন, সতু—'

'সতু! সে কি—'

এক লাফে টিকলু এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'তোর ব্যাপার কি বল দেখি। তোর মামার কাছে গিয়েছিলাম একদিন তোর খোঁজে। তিনি বললেন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কোথায় আছিস এখন?'

'সর্বত্র। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ভিক্ষে করি।'

'বলিস কি!'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। কারো মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না কয়েক মুহূর্ত।

সত্যেন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল এবার।

'ভিক্ষা করি আর কবিতা লিখি।'

'কবিতা লিখিস?'

'হ্যাঁ। একটা খাতা ফুরিয়ে গেছে। আর খাতা কিনিনি। মনে মনেই লিখি।'

'তুই তো আধুনিক কবিতা লিখতিস আমাদের কলেজের ম্যাগাজিনে। আমি বুঝতে পারতাম না সব। এখনও সেই রকম কবিতা লিখিস—?'

সত্যেন কবিতার খাতাটা বের করে দিলে তাকে।

'নিয়ে যা। পড়ে দেখিস। আমার সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে। আমার স্মৃতি

একটা থাকুক তোর কাছে—আমি চললাম—'

'থাম থাম। তোর নাগাল যখন পেয়েছি তখন তোকে ছাড়ছি না।'

টিকলু মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—'তুমি পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি একটু পরে। টাকা আছে তো?'

'টাকা তো আপনার কাছে। ব্যাগটা আপনাকে দিয়েছিলাম।'

'ও আই সি।'

পকেট থেকে একটা ব্যাগ বার করে দুটো দশ টাকার নোট দিলে সে মেয়েটিকে।

'তুমি পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি একটু পরে।'

তারপর সত্যেনের দিকে ফিরে বলল—'চল আমরা একটা চায়ের দোকানে বসি।'

একটা চায়ের দোকানে একটা কোণের টেবিল অধিকার করে বসেছিল তারা। টিকলু চা টোস্ট কেক ওমলেট অর্ডার দিয়ে বললে—'তুই তো চপ ভালবাসতিস, চপ খাবি? চপ পাওয়া যাবে এখন?'

দোকানী উত্তর দিলে—'একটু দেরি আছে। আধঘন্টা পরে পাবেন। চপ গড়া হচ্ছে।'

'বেশ আমরা বসছি। বস—'

কোণের টেবিলে দুটো চেয়ারই ছিল। দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। বেয়ারা টেবিলে চা টোস্ট কেক দিয়ে গেল। কেকটা নিয়ে উঠে পড়ল সত্যেন।

'এটা টোটোকে দিয়ে আসি—'

'টোটো কে?'

'আমার বন্ধু।'

টোটো বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে।

কেকটা ছুঁড়ে দিতেই গপ করে ধরে ফেলল সেটাকে।

সত্যেন ফিরে এসে দেখল টিকলু তার খাতার প্রথম পাতাটা খুলে ভুরু কুঁচকে বসে আছে।

'এ কবিতা তুই রাস্তা চলতে চলতে লিখেছিস? এ তো সাংঘাতিক কবিতা দেখছি। এর মানে কি?'

'ও কবিতাটা বাড়িতেই লিখেছিলাম। শেষের দিকের কবিতাগুলো রাস্তায় লেখা—'

'কিন্তু এ কবিতার অর্থ কি!'

এই বলে টিকলু পড়তে লাগল—

> 'দ্বৈত-অদ্বৈতের দ্বন্দ্বে
> শত্রুভিষা-স্বাতী মেতেছিল মহানন্দে।
> স্থবির ফানুসে আর নবীন বুদ্বুদে
> বাধিল বিবাদ কালো কালো লঘু মেঘে
> শ্রাবণের গোধূলিতে সহসা একদা।
> তারপর তুমি এলে,
> আমি তো ছিলামই।
> তোমার চোখের ভাষা
> আমার বুকের শ্লেটে যে গান লিখিল
> তাহার উত্তর আমার দৃষ্টির প্লেন

কতবার গাহিল সখি লো,
তব ক্ষুব্ধ গিরিশিখরের উন্মুখ চূড়ায়;
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
দ্বৈত-অদ্বৈতের সত্য
সমাধান হল না তো তবু–'

'কবিতা পড়া শেষ করে টিকলু হাসি মুখে বললে–'এর উত্তরে আমারও কবিতায় বলতে ইচ্ছে করছে–

কিন্তু সবসুদ্ধ মিল এ কি হল দুর্বোধ্য হেঁয়ালি কহ কবিবর। দ্বৈত-অদ্বৈত সহ শতভিষা-স্বাতী, বুদ্বুদ, ফানুস, শ্লেট, প্লেন গিরিশিখরের লেংগি শ্রাবণের গোধূলিতে কালো কালো মেঘ–এ কি এ দুষ্পাচ্য ছ্যাঁচড়া বানাইলে হে আজব চেফ্। হজম করিবে এরে যে ভীম ভবানী, তিনি তো সেকেলে দুর্গে বন্দী আজও, লয়ে তার ভস্ম কীটটিরে। কাহার গুষ্টির পিন্ডি চটকাইলে তুমি কহ কবিবর–'

বলেই হো হো করে হেসে উঠল সে। তারপর বলল–'নে খা। আর একটা অমলেট দিতে বলব?'

'না। তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস। যে কাঁচের গ্লাসটা ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে তারই ভাংগা কাঁচগুলোর মধ্যে খুঁজেছিস তুই আগেকার গ্লাসটা। সেটা নেই, আছে টুকরোগুলো--either you accept them or reject them–আসল গ্লাস আর নেই।'

'আহা চটছিস কেন? এই আর একটা করে অমলেট আর কেক দাও–'

গব্ গব্ করে খেতে লাগল সতোন। খাওয়া শেষ করে বলল–'আমি কিন্তু ভাংগা গ্লাস থাকব না। সাবেক গ্লাস হব। যে মন্ত্রবলে সেটা হবে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা যেমন পরশ পাথর খুঁজে বেড়িয়েছিল।'

'টিকলু তার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল। কোন উত্তর দিলে না।'

'অমন করে চেয়ে আছিস কেন?'

'তোর রোগটা কি ধরতে পেরেছি। আমাকেও ওই রোগে ধরেছিল–'

'রোগ? মানে?'

'ব্যাধি। আমরা কেউ নর্মাল নই। খেতে পাই না, ভোগ করতে পাই না, আমরা বঞ্চিত বুভুক্ষু পরশ্রীকাতর।'

'আমি ভিক্ষে করি বটে। কিন্তু খেতে পাই।'

'তোর চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে তুই বুভুক্ষু। তোর কবিতা প্রমাণ করছে তুই রিরংসার ঘোরে প্রলাপ বকছিস। তোকে দোষ দিচ্ছি না, দেহের ক্ষুধা না মিটলে সবারই ওরকম হয়। যাদের হয় না, তারাই মহাপুরুষ। তারাই মহামানব, তারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দলের। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষেরা তা পারি কি? পারি না। কাবু হয়ে পড়ি, কেতরে যাই। আমাদের খিদের সময় খাবার চাই, তা না পেলেই বখেড়া। আমিও বখেড়ায় ভুগেছি। আমি তোর মতন কবিতা লিখতাম না, রাস্তায় মেয়েমানুষ দেখে বেড়াতাম। কিন্তু আমি এখন সামলে গেছি, খিদে মিটিয়ে নিয়েছি। তুইও আয় আমার সংগে তোর খিদে মিটিয়ে দেব–'

সতোন অবাক হয়ে চেয়ে ছিল টিকলুর মুখের দিকে।

'তুই চাকরি পেয়েছিস বুঝি। তোর বউ তো বেশ সুন্দরী দেখলাম–'

'রং! আমি চাকরিও পাইনি, ও আমার বউও নয়।'

'কি করিস তাহলে–'

'দালালি করি। মেয়েমানুষের দালালি। অনেক হোমরা-চোমরা ধনী লোক লম্পট প্রকৃতির। কিন্তু বাইরে তাঁরা সচ্চরিত্র সেজে থাকতে চান। গোপন জায়গায় তাঁদের জন্য আমি ভালো ভালো মেয়েমানুষ যোগাড় করে দি। বেশ্যারাও ভালো খদ্দের পাওয়ার জন্যে উন্মুখ। তাই দু'দিক থেকেই আমি বেশ মোটা কমিশন পাই। চৌরঙ্গীতে গ্র্যান্ড হোটেলে থাকি। তুইও আমার কাছে আয়। তোর সব খিদে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব আমি।'

'আমি লম্পট নই টিকলু। আমার প্রিয়া বেশ্যা নয়।'

'মেয়েমানুষ তো?'

'তা যে কি তা তোমাকে বোঝানো যাবে না। তা বোঝবার বুদ্ধিও তোমার নেই।'

'মানছি, তোমার কবিতা বোঝবার বুদ্ধি আমার নেই কিন্তু কবিতার পিছনে কি আছে, কি তোমাকে নাচাচ্ছে তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে থাকবি চল দিনকতক, সব ঠিক হয়ে যাবে–আমার সন্ধানে ভালো ভালো মেয়ে আছে–উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ক্লিওপেট্রা, তিলোত্তমা–নানারকম–'

'যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে ছিল সে পুতুল কিনছিল কেন? তার ছেলেপিলে আছে না-কি।'

'না। কিনছিল ওর ভাই-বোনদের জন্যে। একগাদা ভাই-বোন আছে ওর। বিরাট সংসার। ও-ই তাদের পালন করে। ওর বাবুটি বেশ বড়লোক–'

সত্যেন সবিস্ময়ে চেয়ে রইল টিকলুর মুখের দিকে।

টিকলু বলতে লাগল–'অমন হাঁ করে' আছিস কেন। যা বলছি তা ফ্যাক্ট। তুমি ফিক্‌শনের জগতে বাস করছ! যদি বাঁচতে চাও ফ্যাক্টের সঙ্গে মুখোমুখি হও।'

'ফ্যাক্ট মানে কি নোংরামি?'

'নোংরামি কিনা জানি না। ফ্যাক্ট হচ্ছে আমরা সবাই পশু। আমাদের নানারকম খিদে আছে। সেগুলো আগে মেটানো দরকার। সেটা মিটলে তবে অ-পশুসুলভ মহত্ত্বের কথা ভাবতে পারবি, তার আগে নয়। আগে খিদে-তেষ্টাগুলো মিটুক।'

'ননসেন্স। তোমার থিয়োরি নিয়ে তুমি থাক, আমি চললুম–'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সত্যেন। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হল হঠাৎ সে যেন একটা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পালিয়ে না গেলে এখনই তলিয়ে যাবে।.....

'কোথা যাবি।'

টিকলু হাত চেপে ধরল তার। এতে আরও ভয় পেয়ে গেল সত্যেন। তার অন্তরবাসী আর একটা সত্তা যেন বলতে লাগল–টিকলু যা বলছে, তা ঠিক, তুমি রাজী হয়ে যাও।

চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল সে।

টিকলু আবার বলল–'পাগলামি করিস না। চল আমার সঙ্গে। আমার ঘরটা বেশ বড়। সেইখানে তুই থাকবি–'

'কারো স্কন্ধে আমি থাকতে চাই না। আমি চললাম। হাত ছেড়ে দে–'

'স্কন্ধে থাকবি কেন, পেইং গেস্ট হয়ে থাকবি। তোকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেব আমি। অনেক হোমরা-চোমরা লোকের 'টাচ'-এ আমাকে আসতে হয়। সেদিনই তো একজন বলেছিলেন–ভাল একটা প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে চান–দুশো টাকা মাইনে দেবেন। সেটা আমি যোগাড় করে দেব তোকে। চল–'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'তা আমি ঠিক জানি না। চিঠি-পত্তর লিখতে হবে। তাঁর বক্তৃতাও লিখে দিতে হবে হয়তো। অনেক জায়গায় বক্তৃতা দেন তিনি। একটা হাত-নুড়কুৎ সঙ্গী হতে হবে আর কি। সর্বোপরি তাঁকে খুশী রাখতে হবে।'

সত্যেনের মনে হল একটা অদৃশ্য জাল যেন ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাকে। এতদিন সে চাকরিই তো খুঁজছিল। কত জায়গায় কত দরখাস্ত করেছিল। এখন তার হঠাৎ মনে হল, না, আমি কারও দাসত্ব করতে পারব না। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি তা অপূর্ব। যে পথের জনতা এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে অথচ আমার স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করেনি সে পথকে আমি ত্যাগ করব না। ওই পথের স্রোতেই ভেসে বেড়াব। ঐ পথই হয়তো আমাকে কোনদিন স্বাধীন কাজ দেবে।

'না ভাই' ওসব আমার পোষাবে না। আমি চললাম—'

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সত্যেন। টোটো বাইরে কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিল। সত্যেন রাস্তায় নামতেই তার পিছু পিছু চলতে লাগল।

'সতু, শোন শোন—'

টিকলুর গলা শোনা গেল। কিন্তু সত্যেন আর ফিরল না। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে দেখল মোটরের সারি। ট্রাফিক পুলিস আটকেছে। একটা মোটরের জানালায় একটা মেয়ের মুখ দেখা গেল। বৃদ্ধা। কিন্তু এককালে রূপসী ছিলেন মনে হয়। ধপধপ করছে রং, টানা টানা চোখ, মাথার শাদা চুলে সিঁদুর।

মা—

হাত পেতে তার কাছে দাঁড়াল সত্যেন। মহিলাটি একটি রেশমের থলি খুলে পঁচিশ নয়া দিলেন তাকে।

প্রণাম করে চলে গেল সত্যেন। খুঁজতে লাগল মোটরের সারির মধ্যে আর কোন মহিলার মুখ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। সে বুঝেছে মেয়েরাই পয়সা দেয়। পুরুষেরা দেয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ উপদেশ দেয়, কেউ কোন কথাই বলে না। মেয়েরাই এই মেয়েরই, ভিখারীদের বাঁচিয়ে রেখেছে। হঠাৎ রাস্তার আলো নিবে গেল। মোটরের সারি অবলুপ্ত হল। লোড শেডিং হচ্ছে আজকাল। অন্ধকারের মধ্যে সব যেন কিলবিল করতে লাগল পোকার মতো। ধীরে ধীরে সে-ও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। রাতটা কোথায় কাটাবে? কাছাকাছি পার্ক আছে কি কোনও? কিম্বা কারও বাড়ির বারান্দা?

শুধু আলোই নিবে যায়নি। বৃষ্টিও হয়েছিল। দুটো প্রকান্ড বাড়ির মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ গলি ছিল, তারই ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল সত্যেন। টোটোও বসেছিল গলির মুখটাতে। সমস্ত রাত ভিজেছিল দুজনে। সত্যেন ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়েছিল। সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল, গলিটা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, তবু ঘুমিয়েছিল সে। চোখ বুজে শুয়েছিল এক ধারে, পাশ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছিল, তবু ঘুমিয়েছিল সে। সমস্ত দিন শ্রান্ত ছিল, অত অসুবিধার মধ্যেও নিদ্রাদেবী কৃপা করেছিলেন তাকে।

সকালে রোদ উঠল। সত্যেন ঘুম থেকে উঠে দেখে রোদে চারদিক ঝলমল করছে। বেরিয়ে এসে রোদে বসল সে। গায়ের জামা-কাপড় ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। রাস্তা দিয়ে লোক আসছে যাচ্ছে। আসা-যাওয়ার বিরাম নেই কারো। একটা আপাদ-মস্তক ভিজে অদ্ভুত মানুষ যে ফুটপাথে বসে আছে না দেখে কৌতূহল জাগছে না কারো। সবাই তাকে দেখে দেখে চ'লে যাচ্ছে, কিন্তু থামছে না কেউ। সকলেই যেন গা বাঁচাতে চায়। সকলেরই

ভাবটা যেন—কি কাজ বাবা ওকে ঘাঁটিয়ে? কি ফ্যাসাদে পড়ে যাবে কে জানে। হঠাৎ একটা চার-পাঁচ বছরের মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরনে লালপাড় শাড়ি। বার বার খুলে যাচ্ছে শাড়িটা, বাঁ-হাত দিয়ে সামলাচ্ছে শাড়িটা, ডানহাতে একটা আধখানা খাওয়া পেয়ারা।

'আমার ছেলের বিয়েতে তুমি বরযাত্রী যাবে?'

পুলকিত হয়ে উঠল সত্যেন। তার দেহমনের সুপ্ত আনন্দ যেন জেগে উঠল সহসা।

'নিশ্চয় যাবো। কত দূর যেতে হবে—'

'ওই তো পাশের বাড়ি। বাবা, দাদা, ছটু, কমল কেউ যেতে চাইছে না। সবাই বলছে কাজ আছে। বাবার আপিস, দাদার কলেজ, কমলের বাসন মাজা বাকী। কিন্তু আমার ছেলের বিয়েটি কি করে হয় তাহলে বল—। বরের সঙ্গে বরযাত্রী না গেলে কি বিয়ে হয়—'

'বেশ চল, আমি যাই। কখন যেতে হবে—'

'এখনই। দাঁড়াও, আমি বরকে নিয়ে আসি তাহলে।'

এক ছুটে চলে গেল সে সামনের বাড়িটায়। সোৎসুকে চেয়ে রইল সত্যেন। টোটো ঘুমুচ্ছিল, সে-ও উঠে বসল। সে-ও যেন টের পেয়েছিল নতুন রকম কিছু একটা হচ্ছে। একটু পরেই উলুধ্বনি শোনা গেল। তারপর দুটি মেয়ে ছোট্ট একটি কাঠের পালকি নিয়ে বেরিয়ে এল। পালকির ভিতর বর বসে আছে সাজ-সজ্জা করে। কাগজের ছোট্ট টোপরও আছে একটি তার মাথায়।

'বরযাত্রী, তুমি বরের সঙ্গে সঙ্গে এস—'

সত্যেন গেল তাদের পিছু পিছু। টোটোও গেল।

বেশীদূর নয়। পাশের বাড়ি। সেখানে যেতেই আবার উলুধ্বনি শোনা গেল। শাঁখ বাজাতে বাজাতে একটি হাসি-খুসী মেয়ে এসে কপাট খুলে দিল।

মুগ্ধ হয়ে গেল সত্যেন তাকে দেখে। রং ফরসা নয়, কিন্তু কি অপরূপ লালিত্য ফুটে উঠেছে মেয়েটিকে ঘিরে! মনে হল যেন মহাভারতের কৃষ্ণা।

'বরযাত্রী, তুমি বারান্দায় বস। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

যে মেয়েটি শাঁখ বাজাচ্ছিল সে হেসে বললে—'মা গো মা। এই বুঝি তোমার বরযাত্রী! কোথা থেকে জোটালে একে!'

'বাবা দাদা কমল কেউ আসতে রাজি হল না। ও আমাদের বাড়ির সামনে বসেছিল। ওকে বলতেই ও রাজি হয়ে গেল। খুব ভালো লোক। ওকে খেতে দাও—'

বাড়ির কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরেই শালপাতা নিয়ে প্রবেশ করল একটা চাকর।

'আরে এ যে একটা ভিকিরি দেখছি—'

পিছনে খাবার নিয়ে আর একজন দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—'ভিকিরি হোক আর যাই হোক, ও বরযাত্রী এখন। দিদিমণি ওকেই খাবার দিতে বলেছে। পাতাটা পেতে দাও তুমি। এক গ্লাস জল নিয়ে এস—'

পাতার উপর ফুলকো লুচি, আলুর ছোকা, মাছের কালিয়া, ফিস্ ফ্রাই, চাটনি, দই, পায়েস, সন্দেশ আসতে লাগল একে একে।

টোটোও উদ্গ্রীব উন্মুখ হয়ে বসেছিল সামনেই। তাকে মাঝে মাঝে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল সত্যেন। প্রচুর খাওয়া হল।

ছোট্ট মেয়েটি বেরিয়ে এল।

'পেট ভরে খেয়েছো তো?'

'খেয়েছি। বিয়ে কখন হবে?'

'বিয়ে রাত্রে। লগ্ন সাতটার পর। এই নাও পান দু খিলি।'

পানও এনে দিল সে।

'সন্ধ্যের পর বিয়ে। তুমি এসো। আসবে?'

সত্যেনের ইচ্ছে হল বলে আসবে। কিন্তু ওই কালো মেয়েটিকে দেখবার পর থেকেই তার মনে যে অপূর্ব স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার ভয় হতে লাগল। বেশী ঘনিষ্ঠতা করলে তা হয়তো ভেঙে যাবে। প্রতিমার ভিতর থেকে মাটি-খড় বেরিয়ে পড়বে হয়তো। এখানে না থাকাই ভালো।

'না, আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। আমি আসতে পারব না বিয়েতে।'

'দাঁড়াও তোমাকে আর একটা জিনিস এনে দিচ্ছি।' মেয়েটি ছুটে গিয়ে দুটো লজেন্স নিয়ে এল। তারপর ফিস ফিস করে বললে—'মেয়ের মা হাড়কিপটে। লজেন্স দিয়ে তত্ত্ব করেছে।'

সত্যেন স্বর্গলোক থেকে বিদায় নিয়ে আনমনে চলেছিল রাস্তা দিয়ে। এই কলকাতা শহরে এরকম স্বর্গলোকও আছে তাহলে। হঠাৎ তার মনে হল নদীর উপরে যে সব ময়লা ভাসছে তাই দেখে আমরা ভুলে যাই নদীর গভীরে নির্মল স্বচ্ছ জল আছে। তার কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গেল—এ জাত মরবে না। তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য সংগোপনে সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে ঘরে ঘরে।

কিছুদূর গিয়ে দেখল গরুর গাড়ির সারি চলেছে। হঠাৎ একটা গাড়ির গাড়োয়ান চেঁচিয়ে উঠল।

'আরে সত্তুবাবু নাকি! মোচ-দাড়ি রেখেও ছিপাতে পারলেন না হামার কাছে।'

সত্যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

'আরে হামি ভিকু আছে। আপনাদের কালেজে নোকর ছিলাম। আর নোকরি করি না, নিজের গাড়ি চালাই—'

দুহাতে রাশ টেনে সে থামিয়ে দিলে তার বড় বড় বয়েল দুটোকে।

'আইয়ে বৈট যাইয়ে—'

উঠে বসল সত্যেন। কিন্তু তার ভারি লজ্জা করতে লাগল। যার চক্ষে সে একদিন বাবু ছিল তার চক্ষে আজ সে এ কি দীনবেশে হাজির হল। গাড়ি চলতে লাগল। টোটো আসতে লাগল গাড়ির পিছু পিছু। সত্যেন কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল।

ভিকু কিন্তু নীরব থাকবার লোক নয়।

'সত্তুবাবু আপকা চেহারা কুছ দমক গিয়া। ক্যা বাত হ্যায়?'

মিছে কথা বলল সত্যেন।

'অসুখ করেছিল কিছুদিন আগে—এখনও তাই দুবলা আছি—'

'আচ্ছা করকে খানাপিনা কিজিয়ে, আউর ডনড বৈঠক। সব ঠিক হো যায়গা—'

চুপ করে বসে রইল সত্যেন।

'আপ কিধার যাইয়ে গা—'

সত্যেনের অস্বস্তি হচ্ছিল। বললো—'আমি চৌমাথাতেই নেমে যাচ্ছি। তুমি কোথা যাবে—'

'হাওড়া টিশন। মাল গোদাম—'

'আমি শ্যামবাজারে যাব। এইখানেই বাস পাব–' মিথ্যা ভাষণ করে একটু অস্বস্তি হতে লাগল। শেষে নেমে পড়ল সতোন। বলিষ্ঠ সরল লোকটার কাছে বসতে লজ্জা হল। গরুর গাড়ির সারি চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে সে আবার খালি জায়গা পেয়ে গেল একটা। তিনকোণা জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংয়ের ভিতর একটা সমাধি বোধহয়। বুঝতে পারল না ঠিক কি। এক জায়গায় কিছু ফুল আর মালা রয়েছে দেখল। রেলিংয়ের ধারের চারপাশ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখান দিয়ে লোক চলছে না। সেখানে গিয়ে বসল সতোন। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বসল। বসে আবিষ্কার করল সেই কৃষ্ণা মেয়েটি এখনও তার মনের অলিন্দে যেন দাঁড়িয়ে আছে। নাগালের বাইরে। কিন্তু মনে হতে লাগল তার দিকেই চেয়ে আছে সে। যে মেয়েকে ভালো লাগে সে যেন মন থেকে যেতে চায় না। রিরংসা? না, না টিকলুর কথা সে মোটেই মানবে না। রিরংসা হয়তো আছে নেপথ্যে, কিন্তু রিরংসাই সব নয়। যে অবর্ণনীয় মাধুরী পুষ্পিত হয়েছে ওর সর্বাঙ্গে তা কেবল মাংস নয়, তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু অলীকও নয়। তা ওর মনের দীপ্তি, তা ওর ব্যক্তিত্ব, তা অবাস্তব অথচ বাস্তব। হঠাৎ মনে হল সত্যিই ও যদি কাছে আসে? ওই অসীমাকে সে কি ধরতে পারবে? খুব যদি ছোট হয়ে আসে? না, তাহলেও পারবে না। তাহলে?

কবিতা জাগতে লাগল মনে।

অসীম হোয়ো না তুমি। নাগাল পাব না। অতিশয় সীমাবদ্ধ অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাও যদি, তাহলেও পাব না তোমাকে। বেশী বাড়াবাড়ি হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আমার চেতনালোক নয় ভূমা সম। নয় অতি বড়, অত্যন্ত ছোটও নয়, নয় তাহা আণুবীক্ষণিক। আকাশ প্রান্তর নদী পুষ্পিত বনানী আছে সেথা, এমন কি সমুদ্র পর্বতও আছে কিছু কিছু। লেক আছে, ঝরণা ঝরে। মরুভূমি আলোড়িত করি লু-রাক্ষসী মাঝে মাঝে প্রতপ্ত তাণ্ডব তোলে। মধ্যবিত্ত আমার চেতনালোক। ময়ূরপঙখীতে চেপে আসিবে কি সেথা তুমি? আস যদি মোর নদনদী, আকাশ-সমুদ্র তোমার সে ময়ূরপঙখীরে সমাদরে করিবে বরণ। আমি কিন্তু রব না সেথায়। আমার খুশীর ঝড়ে আমি উড়ে যাব সেই স্বপ্নলোকে—যেথা তব মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, আদিভূমি, জন্মভূমি—যেথা তুমি ছিলে, কিন্তু নাই। খুঁজিব তোমাকে সেথা, কেবল খুঁজিব।

কবিতাটাই আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে অনেকক্ষণ। হঠাৎ কিন্তু ভেঙে গেল সব। কে যেন তাকে চুলের মুঠি ধরে আছড়ে ফেলে দিল কোলকাতার রাস্তার উপর।

'আমাদের দাবী মানতে হবে—আমাদের দাবী মানতে হবে'—

বিরাট মিছিল চলেছে। এক হাতে পতাকা—আর এক হাত মুষ্টিবদ্ধ।

কে ওরা?

কোথায় চলেছে?

যে ওদের দাবী মানবে সে কোথায়? সে কি ওই ভোট-ভিখারী মন্ত্রীরা? না পুঁজিপতি কোনও বিরাট ধনী? ওরা কি আমাদের দাবী মেটাতে পারবে? আমার দাবী আমি ছাড়া আর কেউ কি মেটাতে পারে? হঠাৎ এই অসম্ভব অবাস্তব কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগল তাঁর মনে। মনে হল আমরা সব যেন সেই আলিবাবা নাটকের মর্জিনা। নাচবার জন্যে—জঞ্জাল খুঁজছি। জঞ্জাল না পেলে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গান গেয়ে নাচ দেখানো যায় না। এ দাবী কি মানুষ হবার দাবী? আদর্শ বাঙালী হবার দাবী? টিকলুর কথাটা আবার মনে পড়ল, ক্ষিধে না মিটলে মানুষ হওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত মানুষরাই কেবল কি ছটফট করছে তাহলে

চারদিকে ? ক্ষুধার আগুনে আদর্শ, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, সব পুড়ে গেল ? মনে হল ওরা যেন বলছে—

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল বলেছিল নর্তকী মর্জিনা। সে মর্জিনা নাই আজ। নূতন যুগের মোর নূতন মর্জিনা। ছন্দে তালে সর্বাঙ্গ দুলায়ে কহিতেছি—দাও, দাও কোথায় জঞ্জাল। জঞ্জাল না পেলে মোরা সবাই বেকার। জঞ্জালের মঞ্চে মোরা চাহি যে নাচিতে, জঞ্জালে অঞ্জলি ভরি চাহি যে পূজিতে জঞ্জাল-সম্রাটে। পরিচ্ছন্ন, সুপবিত্র তোমরা যাদের বল—তারা সব পৌরাণিক রূপকথা, চিরশিশু চিরমুগ্ধ অবাস্তব জীব। মোরা শিশু নই, বৃদ্ধ নই, যীশু নই। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মোরা। জঞ্জালেরই মাঝে খুঁজি খাদ্য, খুঁজি তৃপ্তি, খুঁজি মুক্তি, খুঁজি উন্মাদনা। আমাদের দাবী জঞ্জালের মাঝে মোরা খুঁজে পাব মোক্ষ-মণি। অকস্মাৎ মৃত আলিবাবা দেখা দিবে চাকরি-দাতারূপে, চাকরির লক্ষ মোহর ছুঁড়ে দিবে চারিদিকে, 'নাও নাও চাকরি নাও' এ নব চিচিং ফাঁক খুলে দিক পাষাণ-কপাট চাকরি-গুহার। প্রেক্ষাগৃহ হাততালি মুখরিত হোক........

সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সত্যেন। তার চোখের সামনে এক নূতন মিছিল চলছিল। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী সূর্য সেন বাঘা যতীন অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—আরও কত লোক। সবাইকে চেনে না সে—জ্যোতিষ্কের মিছিল একটা—চারিদিক আলোয় আলো—ওই যে ভিড়ের মধ্যে রয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র, তর্ক করছেন যেন কার সঙ্গে—বঙ্কিমচন্দ্রও চলেছেন এক ধার দিয়ে দৃঢ় পদে কোনও দিকে না চেয়ে। তন্ময় হয়ে বসে রইল সত্যেন। মনে হল সে যেন অন্য জগতে চলে গেছে।

কিন্তু কলকাতা শহর কাউকে বেশীক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে দেয় না। গগন-বিদারী গর্জন করে একটা লরী এসে থামল। লরিতে বন্দুকধারী মিলিটারি রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে খাকি পোশাক, হাতে বন্দুক। লরির পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে একটা অচল মোটরকার। কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ, ড্রাইভার সেলফ দিয়ে চলছে অবিরত, গাড়ি চলছে না। দুপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। রাস্তা খুব চওড়া নয়। মোটর লরি এগুতে পারছে না। রাস্তার দুপাশে পশরা বিছিয়ে নির্বিকার বসে আছে হকারের দল। একটা লোক মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, ছে ছে পয়সা দু দু আনা। নানা রকম প্ল্যাসটিকের ছোট ছোট পুতুল, থালা, হাঁড়ি, গ্লাস, চামচে, পেয়ালা, ডিস স্তূপীকৃত রয়েছে তার সামনে। দুটো রিকশাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটাতে বসে আছে এক মাড়োয়ারী স্থূলকায়া বৃদ্ধা, অন্যটিতে চোং প্যান্ট পরা ছেলে একটি....

মিলিটারি লরি হর্ন দিয়ে চলেছে, অচল মোটরকারের ড্রাইভার নেবে হ্যান্ডেল মারছে গাড়িতে, কিন্তু গাড়ি চলছে না। লরির পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে মোটরের সারি, মাঝে মাঝে—ছে ছে পয়সা দু দু আনা—বিকট গর্জন করে একটা প্লেনও উড়ে গেল। টোটো কিন্তু ভিড়ের মধ্যে যায়নি। দূরে সিমেন্টের উপর কান-খাড়া করে বসে আছে চুপ করে। হঠাৎ কয়েকজন মিলিটারি জোয়ান লরি থেকে নেবে গেল। অচল মোটরকারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে রাস্তা থেকে। দেখতে দেখতে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ল যেন নীল আকাশ।

সামনের ফুটপাথের উপর একটা শুকনো গাছের ডালে দুটি শালিক পাশাপাশি বসে আছে তাদের দেখা গেল। ভিড়ের গোলমালে এতক্ষণ ওদের দেখা যায়নি। বেশ নির্বিকার ভাবে বসে আছে ওরা। সত্যেনের মনে হল—আহা মানুষ না হয়ে যদি পাখী হতাম! ফুরফুরে হাওয়া বইতে লাগল। 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা' বলে যে ছোঁড়াটা চেঁচাচ্ছিল দেখা

গেল সে-ও বিড়ি ধরিয়ে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তার পাশে যে একটি সঙ্গিনী ছিল এতক্ষণ দেখা যায়নি। সে ওই ভিড়ের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে ছিল ফুটপাথেরই উপর। দু দিকে বেণী ঝোলানো ডগমগে ছিটের জামা পরা মেয়েটি ভারি সপ্রতিভ বলে মনে হল।

তারপরই ছুটতে ছুটতে এল একটা ছেলে, এসেই একটা বাড়ির পাঁচিল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তার পিছু পিছু যারা ছুটে আসছিল তারা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। শোনা গেল খুন হয়েছে। এক পার্টির লোক আর এক পার্টির লোককে গুলি করেছে।

বাজারের থলি হাতে করে দুজন ফতুয়াপরা ভদ্রলোক সত্যেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। একজন বেঁটে একজন লম্বা। দুজনেরই মাথায় টাক।—'বুঝলে গঙ্গা, সব পাগল হয়ে গেছে। একটা পাগল আর একটা পাগলকে খুন করছে।'

গঙ্গা বললেন—'পাগল হতে যাবে কেন! নেতায় নেতায় যুদ্ধ হচ্ছে, ছোঁড়াগুলো ওদের সোলজার। একদল মনে করছে বিপক্ষ দলকে যদি কাত করতে পারি তাহলে আমরা হু হু করে চাকরি পেয়ে যাব। উজির নাজির হয়ে যাব, চলতি বাংলায় একে বলে খেওখেয়ি।'

'না, না, বুঝতে পারছ না, ওরা পাগলই হয়ে গেছে। ক্ষিধেয় পাগল। শুধু ক্ষিধে নয়। নানা অভাব পাগল করেছে ওদের। ওরা চাকরি পায়নি, বল পায়নি, শিক্ষা পায়নি, কিছু পায়নি। ওরা খালি কিলবিল করছে আর যখন তাও অসহ্য হয়ে উঠছে তখন হত্যা করছে পরস্পরকে। এতগুলো পাগলাকে কি কোন গভর্ণমেণ্ট সামলাতে পারে? পারবে না, সুতরাং এ চলবেই। এই গণ-আত্মহত্যা করে করেই সমাজ হয়তো হালকা হবে একদিন।'

গঙ্গা বললেন—'আরে তোমার বাজে ফিলজফি ছাড়, ওসব পার্টি পলিটিকস। এবার চল। আমাকে মেয়ের কাছে শ্যামবাজারে যেতে হবে—চল চল।'

ওঁরা চলে গেলেন।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। সামনে একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল। সে মোটরের জানলায় যে মহিলাটি বসে ছিলেন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইলে ভিক্ষে পাওয়া যেত। তাঁকে দেখে মনে হয় উনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিছু না-কিছু দেবেনই। লোকের মুখ দেখে তার চরিত্র কি তা বোঝবার ক্ষমতা হয়েছিল সত্যেনের। কিন্তু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল না। পকেটে পয়সা ছিল। পেটও ভরা। মোটর চলে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত রাস্তাটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

ছে ছে পয়সা দু দু আনাও উঠে গিয়ে সামনের দোকানে চা খাচ্ছে। তার সঙ্গিনীটি দোকান আগলে বসে আছে। কি যেন খাচ্ছে মেয়েটিও, টোটোও তার পাশে গিয়ে বসেছে। মেয়েটির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটি মা তার ছোট ছেলের হাত ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছে ওধারের ফুটপাত দিয়ে। ছেলেটির বেশ একটু ভবিযুক্ত ভাব। মা একটা তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে কিছু তেলেভাজা কিনলেন। ঠোঙাটি ডান হাতে ধরে এগিয়ে গেলেন। একটু আগেই এখানে যে এত হই-চই হয়ে গেল তার চিহ্নমাত্র নেই। ক্লিন শ্লেট।

সত্যেনের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, একটু আগে সে যে জ্যোতিষ্কদের মিছিল দেখল—সেই মিছিল কোন্ দিকে গেল—কোথা থেকে এল। যাদের সে দেখল তারা কেউ তো এপারে নেই, সবাই তো ওপারে। এপারে ওপারে আনাগোনা আছে নাকি তাহলে? সে শুনেছে আছে। যতীনের মৃত মা তার কাছে আসত বার বার। যতীন মরেই গেল শেষে একদিন। সবাই বলল তার মা তাকে নিয়ে গেছে। এপারে ওপারে

আনাগোনা আছে এর প্রমাণ অনেক বিদ্বান লোকও নাকি পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় সে ওপার ?

এপারে ওপারে আনাগোনা হয় শুনিয়াছি বহুকাল ধরে। সকলেই শুনিয়াছে। ওপার কোথায় ? দিকচক্রবাল রেখা ঘন বন সমাচ্ছন্ন। কখনও দেখায় মেঘ; কখনও কুয়াশা, কখনও পর্বতমালা, সন্ধ্যা উষা কখনও কখনও। অন্ধকার আলো দেখেছি ওপারে, দেখেছি নৌকাও। কিন্তু সে নৌকায় সে ওপারে যায় না তো, যাওয়া যে-ওপার ঠিকানাবিহীন, যাহার ইশারা ভেসে আসে মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট পথ বেয়ে, সে-ওপার হয়তো বা আছে এপারেই, কিন্তু তবু অদৃশ্য যা, স্বতন্ত্র রহস্যলোকে অস্তিত্ব যাহার। শুধু জানি এপারে ওপারে আনাগোনা হতেছে সর্বদা......

আরও একটা অবর্ণনীয় ভাব মনে জাগছিল, তাকে সে ভাষা দিতে পারলে না। তারপর হঠাৎ চমকে উঠল। ঢাক বাজাতে বাজাতে একদল লোক হাজির হল কোথা থেকে। কোন দিকে না চেয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে চলে গেল তারা। তাদের পিছু পিছু এল একটি য়িহুদী মেয়ে সাইকেল চড়ে। খুব রোগা, নীল রঙের ফ্রকপরা, কালো চুল কালো চোখ। চোখের দৃষ্টি কিন্তু বুদ্ধিশাণিত। সে-ও কোন দিকে না চেয়ে চলে গেল। তারপর এল একটা মোটর, তার পিছু পিছু আর একটা, তারপর আর একটা, আর একটা—মোটরের সারি জমে গেল আবার।

হঠাৎ সত্যেনের মনে হল আমি ওদের কেউ নই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সেই কাঙালিনীর মতো সে-ও যেন ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

'বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী, কানে তাই পশিতেছে আসি, ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে, দুরাশার সুখের স্বপন......'

খুব জোরে ইলেকট্রিক হর্ন দিয়ে এল একটা সবুজ রঙের ট্রাক, তার উপর বসে আছে একদল নগ্নগাত্র কুলী—কারও হাতে কোদাল, কারও হাতে গাঁইতি। কোথাও কাজ করতে যাচ্ছে ওরা। চলে গেল। সত্যেনের মনে হল আমি ওদের দলেও অপাঙক্তেয়, আমি কোদাল গাঁইতি চালাতে পারি না, আমি স্বপ্নসম্বল অপদার্থ জীব একটা। কিন্তু তাই কি ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সামনের ডাস্টবিনটার দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই টোটোর আর্তনাদ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। দেখল একটা বলিষ্ঠ কুকুর কামড়ে ধরেছে তাকে। আর সেই 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা' লোকটা লাঠি নিয়ে মারছে ওকে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সত্যেন। যখন গিয়ে পৌঁছল তখন বলিষ্ঠ কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। তবু সেটা দূরে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। আর টোটোর কান দিয়ে রক্ত পড়ছে, পিছনের পা দুটো থর থর করে কাঁপছে, তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে সে তার লজ্জিত ল্যাজটা—

'টোটো, চল এখান থেকে যাই আমরা। আয়—' টোটোকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সত্যেন।

হো হো করে হেসে উঠল সেই 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা'।

'আয়া হে অব তেরা দোস্ত, খিলায়েগা রোটি গোস্ত—'

অপমানের চাবুকটা খেয়ে অপমানিত হল সত্যেন। পকেটে যদি যথেষ্ট পয়সা থাকত তাহলে সে সত্যিই গোস্ত রোটি কিনে এনে খাওয়াতো টোটোকে। কিন্তু পকেটে মাত্র চার আনা পয়সা আছে। কিছুদূর গিয়ে একটা ওষুধের দোকান দেখতে পেল।

'আমার কুকুরটার কানে আর একটা কুকুর কামড়ে দিয়েছে, রক্ত পড়ছে। একটু টিঞ্চার

আয়োডিন লাগিয়ে দেবেন?'

'কতখানি নেবেন—'

জিগ্যেস করলে বাঙালী ছোকরাটি। কাউন্টারের এক কোণে বসে বসে সিনেমা-কাগজ পড়ছিল একটা। উঠবার ইচ্ছে ছিল না তার।

সত্যেন বলল—'তুলোয় একটু লাগিয়ে দিন না।'

'তুলোয়? তুলোয় লাগিয়ে আমরা বিক্রি করি না।'

এর পরে চলে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু সত্যেনের মধ্যে কে একটা যেন ক্ষেপে উঠল।

বলল—'যতক্ষণ না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কুকুর নিয়ে আপনার ডিসপেনসারিতে বসে থাকব। আপনার ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?

'সন্ধ্যের পর।'

'ততক্ষণ অপেক্ষা করব। আয় টোটো—'

টোটোকে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ডিসপেনসারির ভিতর।

'এ তো আপনার আচ্ছা জবরদস্তি মশায়।'

সত্যেন কোনও উত্তর না দিয়ে বসে পড়ল। টোটোও বসল তার পাশে।

'খুচরো তুলো বাইরে নেই। আমি কি নতুন প্যাকেট ছিঁড়ব আপনার জন্যে? দাম দিন, ছোট প্যাকেট তুলো দিচ্ছি একটা। আয়োডিন নিয়ে যান—এক ড্রাম—'

'পয়সা বেশী নেই আমার। মাত্র চার আনা আছে, ওতে হবে কি?'

'না—'

'তাহলে আমার এই কাপড় থেকে ছিঁড়ে দিচ্ছি খানিকটা। তাতে আয়োডিন ভিজিয়ে দিন একটু। সেইটেই লাগিয়ে দিই।'

'তা কি হয়, আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন যে। যান এখান থেকে—'

'যাব না। ডাক্তারবাবু আসুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'এ তো মহাবিপদ দেখছি!'

তারপর গলাটা চড়িয়ে বললে—'আপনি যাবেন না? পুলিশ ডাকব নাকি?'

'ডাকুন।'

ঠিক এই সময় খাকি হাফ্‌প্যান্ট-গেঞ্জি পরা একটি ছেলে ডিসপেনসারির সামনে এসে দাঁড়াল!

'কি হয়েছে মাণিকদা—'

'একটা বদমাইস লোকের পাল্লায় পড়েছি—'

'কি হয়েছে—আরে একটা কুকুর রয়েছে এখানে দেখছি। কান দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?'

সত্যেনই তাকে সব কথা খুলে বললে।

'আমি গরীব মানুষ। আমার কাছে পয়সা নেই। ওঁকে বলছি একটু টিঞ্চার আয়োডিন তুলো দিয়ে লাগিয়ে দিন, আমি চার আনা পয়সা দেব। তা উনি দিচ্ছেন না, তাই বসে আছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে।'

'ও; এর জন্যে আর ভাবনা কি। আমি এখনই এনে দিচ্ছি। আমাদের বাড়িতে তুলো, আইডিন, ব্যান্ডেজ সব আছে—'

এক ছুটে চলে গেল ছেলেটি।

তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে এল আবার।

'আপনি আমার বাড়িতে আসুন। দিদি কুকুরটা দেখতে চাইছে। দিদি কুকুর বড় ভালবাসে। আসুন না–'

গেল সত্যেন ছেলেটির পিছু পিছু। পাশেই বাড়িটা। সেখানে গিয়ে দেখল একটা ঢ্যাঁকো লম্বা হাড়-গিল-মার্কা মেয়ে পিঠকাটা ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা অগোছের, কোন লালিত্য নেই। টোটোকে দেখে সে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল–'ওমা, এই রাস্তায় নেড়ি কুত্তোর জন্যে টিঞ্চার আয়োডিন চাই–'

বলেই সে এক ঝটকায় ভেতরে ঢুকে গেল। ছেলেটাও ঢুকে পড়ল তার পিছু পিছু। একটু পরেই টিঞ্চার আয়োডিনে তুলো ভিজিয়ে বেরিয়ে এল সে।

টোটো কিন্তু টিঞ্চার আয়োডিনে আপত্তি জানাল। একবার লাগাতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর দূরে সরে গেল।

সত্যেনের মনে হল টোটোর আত্মসম্মানবোধ আমার চেয়ে বেশী সজাগ। অবজ্ঞার দান ও নেবে না। বেশ একটু দূরে গিয়ে সে উবু হয়ে বসেছিল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল সত্যেন আসছে কিনা। সত্যেন দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। টোটোকে সম্বোধন করে বললে–'ওষুধ লাগালি না, ঘা-টা যদি সেপ্‌টিক হয়ে যায়–'

টোটো ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'চল এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক্‌। কি খাবি?'

টোটো ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'রোক্‌কে–রোক্‌কে–রোক্‌কে।'

একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। ট্যাকসি থেকে নামলেন এক শীর্ণ ভদ্রলোক, এক স্থূলকায়া মহিলা আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে। কেরিয়ার থেকে জিনিসও নামাল নানা রকম। একটি সুটকেস, একটি পুঁটলি, একটি ব্রিফকেস, টিফিন কেরিয়ার, একটা ঝোলা, তা ছাড়া আরও অনেক টুকিটাকি। ট্যাক্সিকে ভাড়া দেবার সময় ভদ্রলোক বললেন–'এই গলির ভিতর আমার বাড়ি, নিয়ে চল না বাবা গাড়িটা–'

গাঁউ গাঁউ করে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সর্দারজি বললেন–'ই চোট্টা ডাকুকা মহল্লা হ্যায়, গলি-ওলি মে নেহি যায়েংগে–'

শীর্ণ ভদ্রলোক আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সি চলে গেল।

শীর্ণ ভদ্রলোক অসহায় ভাবে চারদিকে চেয়ে বললেন, 'মুশকিলে পড়া গেল। এতগুলো জিনিস এখন নিয়ে যায় কে। ঘরে তো তালা দিয়ে বেরিয়েছিলাম, ঝি-মাগী এখনও আসেনি নিশ্চয়। এখানে কুলিও তো দেখছি না একটাও–

সহসা সত্যেন এগিয়ে এল।

'আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনার জিনিসগুলো। তবে সবগুলো একসঙ্গে পারব না। একে একে নিয়ে যাব। কতদূর আপনার বাড়ি–'

'এই গলিতে ঢুকেই অল্প দূর।'

'আমি এই সুটকেসটা আগে পৌছে দিয়ে আসি। আপনারা একজন এখানে দাঁড়ান। আর বাকি সবাই চলুন আমার সঙ্গে–বাড়িটা দেখিয়ে দিন।'

দেখা গেল স্থূলকায়া গৃহিণীটির দেহ স্থূল বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম।

'তুমি বাপু কত নেবে সেইটি বল আগে।'

'যা দেবেন তাই নেব।'

'চার আনার বেশী দিতে পারব না।'

'বেশ তাই দেবেন।'

ভদ্রলোক জিনিস পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সত্যেন সুটকেসটা মাথায় তুলে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভদ্রলোকই সাহায্য করে সেটি মাথায় তুলে দিলেন। সত্যেন বুঝতে পারল বেশ ভারী সুটকেসটি। ভিতরে পাথর আছে নাকি! ঘাড়টা থরথর করতে লগল তার। তবু অতিকষ্টে আস্তে আস্তে সে অনুসরণ করল তাদের, সুটকেসটাকে দুহাতে চেপে ধরে।

অনেক দূর যেতে হল গলির ভিতর। ছোট একতলা বাড়ি। তার কপাট খুলতেই বেশ দেরি করলেন ভদ্রমহিলা। সত্যেনের ঘাড়টা থরথর করে কাঁপছে। কপাট খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে ভদ্রমহিলা বললেন–'নিয়ে এস ভেতরে। ওই বেঞ্চির উপর রেখে দাও।'

একদিকে একটা বেঞ্চি ছিল।

'আপনি একটু ধরুন। আমি নামাতে পারব না–'

'আবার ধরতে হবে নাকি! দাঁড়াও দাঁড়াও, ফেলে দেবে দেখছি–'

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরলেন সুটকেসটা। কোনক্রমে নাবানো হল।

'যাও বাকি জিনিসগুলো নিয়ে এসো এবার। উঃ, ঘরে যা ধুলো জমেছে। ঝিটা কখন যে আসবে কে জানে।'

সত্যেন বেরিয়েই দেখে টোটো দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

'কি রে তুইও এসেছিস? চল।'

বারচারেক যাতায়াত করে সব জিনিসগুলো নিয়ে এল সত্যেন। টোটোও প্রতিবার তার সংগে গেল আর এল।

শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' বললেন–'কত দিতে হবে তোমাকে–'

থলথল করে এগিয়ে এলেন তার গৃহিণী।

'সে আমি আগেই ঠিক করে নিয়েছি। চার আনা দিয়ে দাও–'

চার আনা!

শীর্ণ ভদ্রলোক নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন প্রস্তাবটা শুনে।

চার আনা! চার আনা মজুরী আজকাল আছে নাকি!

গিন্নীর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটা টাকা দিলেন সত্যেনকে।

'তোমার সবটাতেই বাহাদুরি। দাও যথাসর্বস্ব দিয়ে দাও ওকে–'

গৃহিণী দুই হাতে যথাসর্বস্ব দেবার ভঙ্গি করে এবং হাতভরতি সোনার চুড়িতে ঝনৎকার তুলে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

ভদ্রলোকও গেলেন ভিতরে। সত্যেন এগিয়ে গিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়াল আবার। ভাবছিল কোন্ দিকে যাবে।

'ওহে, শোন শোন–'

শীর্ণ ভদ্রলোক তার দিকেই এগিয়ে আসছেন হন্‌হন্ করে।

'ওহে শোন, তুমি আমার ঘরদোরগুলো ঝাড়ু দিয়ে দেবে? আমরা কাশ্মীর গিয়েছিলাম কিনা, বাড়িতে ঝাড়ু পড়েনি অনেকদিন। টিফিন কেরিয়ারের বাটি চারটেও মেজে দিতে হবে। পারবে তুমি?'

'পারব। কত মজুরি দেবেন?'

'কত নেবে বল না–'

'আরও দু'টাকা দিতে হবে–'

যদিও সত্যেন এর আগে এসব করেনি কখনও, তবুও অপটু হস্তে সে সবই করে ফেলতে পারল শেষ পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল তার। সে যে অকর্মণ্য নয়, সে যে কাজ করে রোজগার করতে পারে এই অনুভূতিটা সুরার মতো সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল তার দেহেমনে। স্থূলকায়া ভদ্রমহিলা যদিও বকছিলেন তাকে তার অপটুতা দেখে, তবু তাঁর বকুনির মধ্যেও একটা মমতার সুর বেজে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে।

'কাজের ছিরি দেখ না! আরে ধুলোগুলো ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন–কপাটের দিকে নিয়ে এস। বাইরে ফেলতে হবে তো। বোকারাম একটি। কি করে ঘর ঝাড়ু দিতে হয় জান না?'

'আমি এ কাজ আগে কখনও করিনি মা। বাবু বললেন তাই করে দিচ্ছি। ঠিক করে দেব সব, দেখুন না–'

'আর তুমি করেছো।'

'ঠিক করে দেব দেখুন–'

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েগুলো চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করছিল ক্ষিধের জ্বালায়। গিন্নী গেলেন সেদিকে। তারপর এসে বললেন–'তুমি দেখ তো বাবা উনি কোথায় খাবার আনতে গেলেন। যেখানে যাবেন সেইখানেই তো বাঘের মাসী হয়ে যাবেন। খাবারওয়ালার সঙ্গে হয়তো গল্প জুড়েছেন–তুমি একবার দেখ তো–ছেলেমেয়েগুলো ক্ষিধেয় আনচান করছে।'

সত্যেন বেরিয়েই দেখল শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক একঝুড়ি খাবার নিয়ে আসছেন।

সত্যেন কাজকর্ম সেরে দুটি টাকা নিয়ে যখন চলে যাবার উপক্রম করছে তখন স্থূলকায়া মহিলাটি এলেন আবার।

'নাও তুমিও একটু খাও। তোমার মুখটিও শুকিয়ে গেছে।'

একটি কচুরি এবং আধখানি জিলিপি তাকে দিলেন। টোটো বাইরে রাস্তায় বসে ছিল, সত্যেন তার দিকে আধখানা জিলিপি ছুঁড়ে দিয়ে কচুরিটা মুখে পুরে ফেললে।

'ওকি, ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন জিলিপি?'

'আমার বন্ধু একটি কুকুর বাইরে বসে আছে, তাকে দিলাম।'

ভদ্রমহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন–'ওমা কি কাণ্ড! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শংকরাকে ডাকে–এ যে সেই বৃত্তান্ত দেখছি–'

'চললাম আমি–'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। খেয়ে যাও একটা জিলিপি।'

এবার একটা গোটা জিলিপিই এনে দিলেন তিনি।

'খাও। আমার সামনে দাঁড়িয়ে খাও। তোমার যে রকম মতিগতি দেখছি তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হচ্ছে–'

মুচকি হেসে সত্যেন বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, তার ভিতরে কার যেন আবির্ভাব হয়েছে। কার?

বুঝতে পারছে না ঠিক। মনের ভিতর অন্ধকারও প্রচুর। দেখা যাচ্ছে না তাকে। হঠাৎ অস্ফুটকন্ঠে সে বলে উঠল একবার–'কে তুমি–কে–কে।' তারপর থেমে যেতে হ'ল।

একদল বাঁকওয়ালা তার পথরোধ করেছে। বাঁকের দুধারে বড় বড় ড্রাম ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে একদল বলিষ্ঠ লোক। ড্রামে কি আছে?–দুধ? একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিলে না কিছু। কলকাতার রাস্তায় সবাই পাশাপাশি চলেছে, কেউ কারো বিষয়ে কিছু জানে না। পরস্পর পরস্পরের দিকে যে দৃষ্টিতে চাইছে তাতে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় আর হিংসা।

দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। টোটোও তার পাশে এসে দাঁড়াল। ল্যাজ নাড়তে লাগল। টোটো কারণে-অকারণে ল্যাজ নাড়ে।

বাঁকীরা চলে গেল। তারপর গান করতে করতে চলে এল একদল মাড়োয়ারি মহিলা। তাদের মুখ ঢাকা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে চতুর্দিক নিনাদিত।

দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন।

উদ্বেলিত হয়ে উঠল মনে একটা কবিতা।

তার মনের অন্ধকারে সেই বিরাট আবির্ভাব তখনও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকার যবনিকা-পারে কে তুমি দাঁড়ালে এসে? ডাকিলাম সাড়া তো দিলে না। মনে হয় আমাকেই ডাকিতেছ তুমি নীরব ভাষায়।

মর্মস্পর্শী সুতীক্ষ্ণ সে ভাষা, মূর্তিমতী বেদনার নিস্তব্ধ বিলাপ। সে-ডাকে দিতেই হল সাড়া।

> বাহিরিনু অন্ধকারে কপাট খুলিয়া।
> দেখিলাম অন্য কেহ নাই।
> আমিই দাঁড়ায়ে আছি।
> সেই আমি, যে-আমি বাহিরে সূচীভেদ্য অন্ধকারে
> চির-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি,
> ভিতরের আমির লাগিয়া।
> বাহিরের 'আমি' নিঃশব্দে নিরন্তর ডাকিতেছে
> ভিতরের আমিটারে।
> অথচ দু-জনে দেখা হল না এখনও।
> আজ দেখা হল যদি, দুজনের মাঝে দুলিতেছে
> আঁধারের কালো যবনিকা।
> কেন–কেন–কেন–!

অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল সত্যেন।

'এই শূয়োরকা বাচ্ছা, মরতে চাও নাকি–'

ক্যাঁচ করে একটা প্রকান্ড মোটর ব্রেক কষল।

প্রকান্ড জুলফিদার হামদো-মুখো ড্রাইভার একবার তার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে চেয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল আবার। সত্যেন বেঁচে গেল। অপ্রস্তুত মুখে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল সে।

টোটোও এল এবং উৎসুক দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে। মনে হল টোটো একটু যেন চিন্তিত হয়েছে তার জন্যে।

গালাগালি খেয়ে কবিতার ঘোরটা কেটে গিয়েছিল তার। তবু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আনন্দ হচ্ছিল। পরিশ্রম করে সে আজ তিন টাকা রোজগার করেছে। এই আনন্দে তার সমস্ত মনটা যেন বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

নাঃ—আর ভিক্ষে করব না। রোজগার করব। যেমন করেই হোক করব। হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে ফেলল।

রাস্তা দিয়ে আবার বাস, ট্রাক, টেমপো, মোটর, রিকশা, ঠেলার সারি চলতে শুরু করেছিল। আবার দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিচিত্র জনস্রোত। এর মধ্যে সে কর্মী বাঙ্গালী একজনকেও দেখতে পেলে না। যারা কাজ করছে তারা প্রায় অবাঙালী। সমস্ত বাঙালী জাতটা হয় বন্দী হয়ে আছে আপিসে আপিসে, না হয় বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে! কিম্বা নাচ গান খেলা আড্ডা নিয়ে, না হয় পলিটিকাল পার্টিতে ঢুকে খুনোখুনি করছে। ওরা অসহায়, ওরা জানে না ওরা কি করছে; জানে না যে নানারকম পরাধীনতার গ্লানিতে আষ্টেপৃষ্ঠে ওরা বাঁধা তাই ছটফট করছে, তাই নানারকম পোশাক পরে, নানা ধাঁচের চুল-দাড়ি-গোঁফ জুলফির বাহার দেখিয়ে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চাইছে ওরা। ওরা অসহায়। বড্ড অসহায়। ওদের বাঁচাতে হবে। কে বাঁচাবে? আমি। আমি আগে নিজে বাঁচব, তারপর ওদের বাঁচাব।

হঠাৎ সব অবলুপ্ত হয়ে গেল। আলোকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সত্যেন দেখল সেই জ্যোতিষ্কদের মিছিল আবার আসছে। তার দিকেই আসছে। সামনেই রয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর দুপাশে দুটো সায়েব। চিনতে পারল সত্যেন—ছবি দেখেছিল। একজন এডিসন, একজন ফোর্ড। সকলেই উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে। তারপর হঠাৎ একটা গুঁতো লাগল তার পিছন দিকে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল টোটো। সত্যেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রকান্ড একটা ষাঁড় তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

নির্বিকার নন্দী মহারাজ একটি। সরে গেল সত্যেন। তারপর হনহন করে হাঁটিতে লাগল।

অনেক দূর হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামনে দেখতে পেল একটা দোকানে গরুর মাংস টাঙানো রয়েছে। টোটো কই? দেখল টোটো ঠিক পিছনেই রয়েছে।

'গোস্ত রোটি খাবি টোটো? আজ তোকে গোস্ত রোটিই খাওয়াব। পকেটে পয়সা আছে। ও লোকটা তখন ঠাট্টা করেছিল, ভেবেছিল গোস্ত রোটি খাওয়াতে পারি না তোকে। আয় খাওয়াব। চল—'

এক টাকায় বেশ খানিকটা মাংস পাওয়া গেল। পাশের দোকানে রুটিও পাওয়া গেল একটা। টোটো মহানন্দে খেতে লাগল।

॥ ৬ ॥

সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াল সত্যেন। অনেক করুণাময়ী রমণীর মুখ দেখতে পেল সে মোটরের জানালায়। ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা পেত। কিন্তু হাত বাড়ায় নি সে একবারও। প্রতিজ্ঞা করেছে আর ভিক্ষা করবে না। ক্ষিদেয় কিন্তু পেট জ্বলছে।

টোটো পিছনে পিছনে ঘুরছে শুষ্কমুখে।

মানিকতলা বাজারের উত্তরদিকে দাঁড়িয়েছিল সে। সামনেই বাজারে ঢোকবার গেট। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢুকতে হয়, সোজা ঢোকা যায় না।

সামনেই ফলওলা বসেছিল একটা। লেবু আর কলা নিয়ে। তার পাশে তরকারিওয়ালি

একজন। তার পাশে ছুরি-কাঁচি। তার পাশে জটলা করছে কতকগুলো চোং-প্যান্ট-পরা ছেলে, হাসাহাসি করছে; অঙ্গ-ভঙ্গী করছে—উপলক্ষ্য একটি কিশোরী মেয়ে, সে একটু দূরে একটা দোকানে কি যেন কিনছে। তার পাশে বসে রয়েছে কতকগুলো ঝাঁকামুটে। কতকগুলো কদর্য চেহারার লোক মাথার পাগড়ি খুলে তাই দিয়েই হাওয়া করছে নিজেদের। দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে কপাল থেকে, ঘাড় থেকে।

তাদেরই কাছে গেল সত্যেন। একজনকে বললে—'এ ভেইয়া, হামরা একটো উবকার করনে শেকে গা?'

'ক্যা, কহিয়ে।'

'হাম মোটিয়া হোনে মাংতে হেঁ।'

'সেকিয়ে গা?'

'হাঁ, জরুর—'

'তব একটো ঝাঁকা খরিদকে বৈঠ যাইয়ে হিঁয়া। কি বাজারকা ভিতর ঘুস যাইয়ে। কুছ না কুছ মিল যায় গা—'

'ঝাঁকা তো নেহি হ্যায়। কাঁহা মিলে গা?'

'শিয়ালদ!'

'দাম কেতনা লেগা?'

'আচ্ছা ঝাঁকা চার পাঁচ রূপেয়া লাগ যায় গা—'

'ওতনা পয়সা তো নেহি হ্যয়।'

আর একটা ছোকরাগোছের ঝাঁকাওলা হেসে বলল—'তব রাস্তা মে টহলিয়ে—'

প্রথম ঝাঁকাওলাটি কিন্তু একটু আগ্রহান্বিত হল ওর সম্বন্ধে।

'পহলে আপ কেয়া কাম করতে থে।'

'কুছ নেই : কলেজ মে পড়তে থে। নোকরি নেহি মিলা। আব ঠিক কিয়া হায় মুটিয়া গিরিমে লগ যায়েংগে—'

'ঘর মে কোই নেহি হ্যায়? বাপ মাই, মামা চাচা—'

'মামা হায়। মগর হুঁয়া সে হাম ভাগকে চলা আয়া। নোকরি নেহি মিলা, বড়া লাজ লাগতা থা—'

স-সম্ভ্রমে বলে উঠল ঝাঁকা-ওলা—'কালিজ মে পড়তে থে? মোটিয়া হোনে মাংতে হেঁ!'

'হরজা কিয়া। ফির আচ্ছা কুছ মিল যায়গা তো করেংগে—'

সেই ছোকরাটা বললে—'ঝাঁকা লাইয়ে পহলে—'

সত্যেন হেসে বললে—'ঝাঁকা কিননে কা পয়সা ভি রোজগার করনে পড়ে গা ভাই।'

প্রথম ঝাঁকা-ওলাটি ধমকে দিলে ছোকরা ঝাঁকাকে।

'বইঠো বাবু।'

একটু সরে বসল সে।

'হমকো বাবু নেই কহিয়ে। হম তুমহারা ভাই হ্যয়। ছোটা ভাই। কুছ উপায় কর দিজিয়ে।'

'বৈঠিয়ে—'

তারপর সে পাশের লোকটাকে বলল—'নাগিনা তো বেমার বা। ওকরা ঝাঁকা কাঁহা?'

'হমারা পাশ—'

রামু সেদিকে কর্ণপাত করল না। সত্যেনকে ভিড় বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে এল বিবেকানন্দ রোডের উপর।

'অব ট্যাকসি বোলাইয়ে–'

ঝাঁকাটা নামিয়ে দিল সে মাথা থেকে। তারপর চলে গেল। অনেক ছুটো ছুটি করে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করলে সত্যেন।

তারপর মালপত্র গাড়িতে উঠিয়েও দিল। মহিলা কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত আট আনা দিলেন না। ছ'আনা দিয়ে বললেন–'ওই বহুৎ হুয়া।'

চলে গেল ট্যাক্সি।

সত্যেনের মনে হল–এরাই সত্যিকারের দরিদ্র। বাইরেই শাড়ি ব্লাউজের জলুস, ভিতরটা একেবারে অন্ধকার।

তখনই মনে হল–এদের বলছি কাদের?

আমরাই তো এরা!

প্রায় সংগে সংগে ঝাঁকা-ভরতি মোট নিয়ে বেরিয়ে এল রামু।

'ভিতর যাইয়ে। বহুত লোক ঝাঁকা খোঁজতা হায়–আজ লগন হ্যায়।'

সত্যেন আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

নূতন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল তার।

একবেলায় সে প্রায় তিন টাকা রোজগার করে ফেলল।

বেরিয়ে দেখল টোটো বসে আছে তার অপেক্ষায়। তাকে দেখে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল সে। একটা পাঁউরুটি কিনে দিলে তাকে। নিজেও খেল একটা। তারপর ঝাঁকা আর বাকি পয়সা সে রামুকে দিয়ে বললে–'আপকা পাস রাখ দিজিয়ে। ঝাঁকা কাল মিলেগা তো ফির কুছ রোজগার হোগা–'

'নাগিনা ঘর চলা গিয়া। ওহি ঝাঁকা সে কাম চলাইয়ে আভি। আপনা পাস রাখ দিজিয়ে। আপ রাতমে কাঁহা শোয়ে গা?'

'ফুটপাথমে।'

'তব ঝাঁকা হামরা জিম্মা মে দে দিজিয়ে। আপ শো-যাইয়ে গা, কই শালা চোরা লেগা– বহোত্ চোর হ্যায় চারো তরফ।'

বাজারের ভিতর শুয়েছিল সত্যেন আলুওলার দোকানের নীচে। টোটোও এসে শুয়েছিল তার কাছে গুটিসুটি হয়ে। সত্যেনের মনে হল–কুকুর কখনও অকুকুর হয় না। মানুষই অমানুষ হয়, ওইখানেই মানুষের বিশেষত্ব। মানুষই ভোল বদলায়, কোল বদলায়, ঝোলের দিকেই তার কেবল লক্ষ্য। এই ভোল বদলাবার বাহাদুরিই তার সভ্যতার ইতিহাস। মনে মনে এই পর্যন্ত কবিতা লিখে সে ভাবছিল আর কি লিখবে। এমন সময় তার মনে হঠাৎ ছবি ভেসে উঠল একটা। একটি তরুণী যেন ভ্রূ-ভংগী করে চেয়ে আছে তার দিকে আর বলছে–'বুদ্ধ, যীশু, শংকর, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা?'

সত্যেন চোখ বুজে মনে মনেই উত্তর দিলে–'ওঁরাও ভোল বদলেছেন। কিন্তু সে বদলানোটা আমাদের মনোমত হয়েছে বলেই আমরা ওঁদের বাহবা দিচ্ছি, ওঁদের ছবি ঘরে টাঙাচ্ছি। কিন্তু ওকথা থাক আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে একটু চা করে দেবে?'

চোখ খুলে দেখল কেউ কোথাও নেই।

টোটো গোল হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সত্যেনও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল–আইনস্টাইন তাকে বলছেন,

উত্তর দিলে একটা রোগা-গোছের লোক।

'দে-দে উঠো বাবুয়া কো-'

'আগর লেকে ভাগে-'

'নেহি ভাগে গা। হম জামিন রহা--লাও ঝাঁকা-'

একটু পরেই ঝাঁকা এসে গেল একটা।

'অব চলিয়ে বাজার কা ভিতর-'

নিজেও উঠে দাঁড়াল সে। প্রৌঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তি। পা দুটো ফাটা ফাটা। কাঁচা-পাকা গোঁফ। ঘাড়টা একদিকে একটু কাত-করা।

মাথায় পাগড়িটা বেঁধে নিল।

'চলিয়ে-'

তার পিছু পিছু মানিকতলা বাজারে ঢুকে পড়ল সত্যেন। টোটোও ঢুকতে যাচ্ছিল। মানা করল তাকে সত্যেন।

'তুই এইখানে বসে থাক।'

গেটের সামনে বসে পড়ল টোটো।

'আপকা কুত্তা হ্যয় বাবু?'

'রাস্তাকা কুত্তা। হমারা সাথ দোস্তি হো গিয়া-'

'বহুত আচ্ছা।'

হো হো করে হেসে উঠল সে।

'আপকা নাম কিয়া, ভেইয়া-'

'রামেশ্বর। রামু-রামু কহতা হ্যয় সব কোই।'

'ঝাঁকা-ঝাঁকা-এই ঝাঁকা--'

একটি ভদ্রমহিলার কন্ঠ শোনা গেল। অনেক তরকারিপাতি কিনেছেন, আকুলভাবে ঝাঁকা খুঁজছেন।

'আপ চলা যাইয়ে-'

রামু চুপি চুপি বলল।

সত্যেন এগিয়ে যেতেই ভদ্রমহিলা বললেন--'একটা ট্যাক্সিতে এগুলো তুলে দিতে হবে। কত নেবে?'

রামুই জবাব দিল-'আট আনা মাইজি-'

'ওতনা লেগা? কিছু কম কর বাবা।'

'নেহি মাইজি। আট আনা সে এক পয়সা কম হোবে না।'

মহিলা হয়তো আর একটু দরদস্তুর করতেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা লোক ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা সাফ করতে শুরু করে' দিলে। মহিলার ভয় হল তাঁর শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে।

'চল চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে কিন্তু-'

রামুকে আর একজন ডাকাডাকি করছিল। রামু কিন্তু গেল না। জিনিসগুলি সত্যেনের ঝাঁকায় গুছিয়ে তুলে দিল।

'অব উঠাইয়ে-'

ঝাঁকাটা তুলে দিল তার মাথায়।

'চলিয়ে। ধীরে ধীরে '

'এই ঝাঁকা-'

থিয়োরি অব রিলেটিভিটি তুমি তো পড়েছ। তবে ঘাবড়াচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্বপ্ন দেখল, কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে সে যেন বক্তৃতা করছে। বলছে, বাঙালী জাতকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। বাঁচতে হবে শ্রমজীবী হয়ে, চাকুরীজীবী হয়ে নয়। ইংরেজরা সমস্ত বাঙালী জাতটাকে কেরানীর জাত করে দিয়ে গেছে, নূতন স্লেভ ডাইনাষ্টি সৃষ্টি করেছে মেধাবী বাঙালীদের দিয়ে। আমরা সবাই কেরানী—কেরানী হবার জন্যেই আমাদের পড়াশুনা—জ্ঞানলাভ করবার জন্যে নয়। আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করতে শিখেছি, আর কিছু শিখিনি। আমরা মূর্খ প্রভুপদলেহী দাস, আর কিছু নই। আমাদের কোট-প্যান্ট, সুট-বুট মোটর রুম-কুলার দাসত্বের ভূষণ। চাকরি গেলেই আমরা ফতুর। কিন্তু সত্যিই কি আমরা অত নির্বীর্য, অত হীন? না, না, নিশ্চয় নয়। আমরা মোহগ্রস্ত। এই মোহের ছলনায় আমরা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছি। আমি যখন মোট বইতাম, তখন রামু ছিল আমার ভাইয়া, রমজান ছিল আমার চাচা, ফলওয়ালী ছিল আমার দিদি। আমি চিরকাল মোট বইনি, ব্যবসা করেছি, ব্যবসায়ে উন্নতি করেছি, অনেক টাকা রোজগাব করেছি, তোমাদের প্রকৃত শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় করেছি—তোমরা সব এস, প্রকৃত মানুষ হও, চাকরি করবার জন্যে লেখাপড়া শিখবে না, মানুষ হবার জন্যে লেখাপড়া শিখতে হবে। উপার্জন কর শ্রম দিয়ে। পেশীর শ্রম দিয়ে, মস্তিষ্কের শ্রম দিয়ে, স্বাধীনভাবে, মাথা উঁচু রেখে। ভেবে দেখেছ কি কতকগুলো অসাধু লোকের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে কী অমানুষ হয়ে গেছ তোমরা? তোমাদের মানুষ হতে হবে। মানুষের মতো মানুষ, যে মানুষ পৃথিবীর গর্ব হবে। বাঙালীর ছেলেরা কি না পারে। তোমরাও পারবে, নিশ্চয় পারবে—

'আরে এখানে শুয়ে আছে কে হে। ওঠ, ওঠ। আলুর বস্তা নামাব!'

'কে তুমি—'

'আমি ঝাঁকামুটে!'

'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছ?'

সত্যেন উঠে বাইরে চলে গেল। লজ্জা হল তার।

সেই দিনই বেলা পাঁচটার পর।

রাস্তায় খুব ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে চলেছিল সত্যেন ঝাঁকা মাথায় নিয়ে। ঝাঁকায় অনেক জিনিস। চাল ডাল তরকারি মসলা একটা তরমুজ একটিন তেল। বেশ ভারী। ঝাঁকাটা দুহাত দিয়ে ধরে টলতে টলতে যাচ্ছিল সত্যেন। সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি গাড়ি পার্ক করেছিলেন একটু ফাঁকা জায়গায়। বেশ দূর সেটা। হয়তো সত্যেন সেখানে পৌঁছে যেত, কিন্তু পারলে না। একটা লরি এসে ধাক্কা মারলো তাকে। পড়ে গেল সে। তারপর কি হল—তার মনে নেই। কিন্তু মন তার নিষ্ক্রিয় ছিল না। ছবি আঁকছিল।...দলে দলে ছেলে ঘিরে ধরেছে তাকে। তার বিদ্যালয়ে ঢুকতে চায়—তার মানুষ হবার বিদ্যালয়ে—সেখানে পরীক্ষা নেই, ডিগ্রি নেই—একটি সুন্দরী তরুণী অভ্যর্থনা করছে তাদের। বলছে. তোমরা বস, কিছু খেয়ে যাও, সব্বাইকে ভরতি করব আমরা, কেউ ফিরে যাবে না—বিরাট একটা ময়ূরপঙ্খী ভেসে চলেছে সমুদ্রে—নূতন যুগের চাঁদ সদাগর সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে.. প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে বসে আছে বিজ্ঞানীর দল—হ্যাঁ তারই ছাত্র সব-আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন, বলছেন তুই-ই আমার স্বপ্ন সফল করালি শেষ পর্যন্ত। আদর করে পিঠে একটা ঘুঁষি মারলেন।..বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান ভিকুও

এগিয়ে এল, সে তার নাইট স্কুলে রোজ পড়াশোনা করে, গানও করে তুলসীদাসের রামায়ণ। টিকলুও এসেছে। বলছে—আমার দেহের ক্ষিধে মিটে গেছে। মনের ক্ষিধে মেটেনি কিন্তু। তুই তার ব্যবস্থা করে দে। রামায়ণ মহাভারত ? না, আমি পড়িনি। তাই পড়ব ? বেশ। হঠাৎ তামা এসে বলল, আমিই আপনাকে পড়াব। আসুন না। সাতকড়ি দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। বলছে অনেক পাখীর ছবি যোগাড় করেছি আমি। আমাদের দেশের সব পাখীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমাদের। শুধু ছবি দেখলে চলবে না কিন্তু, আমার সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে। দলে দলে ছেলে আসছে......দলে দলে মেয়ে......

বাঙালী জাত জেগে উঠেছে...বাঙালী জাত জেগে উঠেছে...আরও কি সব হিজিবিজি...দূরে যেন তার মামী দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। মামা বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন। কপালের ওপর হাত রেখে দেখছেন অবাক হয়ে। ওদিকে ও কে ? সেই ছাতুওলিটা হাসছে আর বলছে—আমি সুরপতিয়া। ছাতু এনেছি। আমাকে ভুলে গেলে ?... ছবির পর ছবি আসছে আর যাচ্ছে... ছবির পর ছবি...রাস্তায় ভিড়... অনেকগুলো মোটর হর্ন দিচ্ছে...

তার যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে মাথায় হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা। একটি কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক তার নাড়ি দেখছেন।

'আমি কোথায় আছি ?'

'হাসপাতালে।'

'আপনি কি ডাক্তারবাবু ?'

'হ্যাঁ—'

সত্যেন হঠাৎ আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—'আমি বাঁচব তো ডাক্তারবাবু! আমি না বাঁচলে যে বাঙালী জাতকে বাঁচাতে পারব না। বলুন, আমি বাঁচব তো ?'

'নিশ্চয় বাঁচবে, ভয় কি! একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি—ঘুমোও এখন।'

ইনজেকশন দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন।

'আমার টোটো কোথায় বলতে পারেন ?'

'টোটো কে ?'

'আমার কুকুরটা।'

'জানি না তো—'

টোটো হাসপাতালের সিঁড়ির কাছে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিল।

সাত সমুদ্র তেরো নদী

॥ ১ ॥

অদ্ভুত একটা যোগাযোগ হয়েছে এ গল্পটাতে। এই গল্পে যাঁরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সাতজন পুরুষ আর তেরো জন নারী। পুরুষদের নাম–সব সমুদ্রের নাম আর নারীদের নাম সব নদীর। কেন এরকম হোল তা কল্পনা দেবীই বলতে পারেন–তাঁর খামখেয়ালীর তো আদি অন্ত নাই।

যে গল্পটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটাও কেমন যেন জট-পাকানো। কোথা থেকে আরম্ভ করি ভাবছি। গল্পটা শুরু কোথায় হয়েছে তা জানি না। কম্প জ্বরের মত সেটা যেদিন আত্মপ্রকাশ করল সেই দিন থেকেই শুরু করি। আগেই একটা কথা বলে রাখছি গল্পটা ঠিক আধুনিক যুগের গল্প নয়। পৌরাণিক গন্ধ আছে। তবে পৌরাণিক গন্ধ থাকলেও এ যুগের সংগে মিলও আছে প্রচুর। যুগে যুগে মানুষের বাইরের চেহারাটাই বদলায়–ভিতরটা বিশেষ বদলায় না। সেকালের রাগী মানুষ আর একালের রাগী মানুষে বিশেষ তফাত নেই। সেকালেব দিলদরিয়া ভদ্রলোক একালের দিলদরিয়া ভদ্রলোকের মতই। তারা কি ভাষায় কথা বলতেন ঠিক জানি না। তাই আমাদের ভাষাই তাদের মুখে দিচ্ছি। বেমানান হবে না, কারণ আগেই বলেছি, যে ভাবকে ভাষার দ্বারা আমরা প্রকাশ করি, সে ভাব আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। মানুষের মন বদলায় নি। এবার গল্পটা শুরু করি।

সেদিন রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে--যে লক্ষ্মীপেঁচাটা রোজ রত্নাকরের বাগানে ডেকে ওঠে–সে ডেকে সেদিন চলে গেছে। রত্নাকরের স্ত্রী তাপ্তি রত্নাকরের পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রত্নাকর হঠাৎ তাকে উঠিয়ে দিলে ধাক্কা দিয়ে। ঘুম ভেঙে গেল তাপ্তির।

"কি বলছ ?"

"গন্ধ পাচ্ছ ?"

"কিসের গন্ধ ?"

"কলার ?"

"কলার ?"

আগুনের ফুলকি ছুটল তাপ্তির চোখ থেকে।

"ফল্গু তার বাগান থেকে যে কলার কাঁদিটা পাঠিয়েছিল সেটা তো পাশের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে। সেটা পাকল বোধহয়। ফল্গু বলেছিল পাকলেই গন্ধ ছাড়বে। আর সংগে সংগেই খেয়ে দেখো। তখন যে স্বাদ পাবে, অন্য সময় পাবে না। নিয়ে এসো না কয়েকটা–"

মিনতির সুর ফুটল রত্নাকরের কণ্ঠে।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি।" উঠে বসল তাপ্তি। রত্নাকরের মুখে মৃদু হাসি।

"ফল্গুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে পাকবামাত্র খাব। আমার কথার খেলাপ কখনও হয় না। তুমি যদি না এনে দাও আমি উঠছি—"

রত্নাকর উঠে বসল।

অপূর্ব সুন্দর চেহারা তার। গোঁফ না থাকলে মেয়েমানুষ বলে ভ্রম হয়।

হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলেছি। এখানেই বলে' রাখি। এ গল্পের নায়ক-নায়িকারা যদিও সবাই যুবক-যুবতি কিন্তু কারও ছেলেপিলে নেই। নায়িকাদের মধ্যে কুমারী বিধবা সধবা সব রকমই আছে। আর যে রাজ্যে তারা বাস করে তার নাম বাংলা, বিহার, আসাম বা উড়িষ্যা নয়। দেবতার নাম। ওদের দেশের নাম ছিল মহেশ্বর। সে দেশে প্রত্যেক গ্রামে নগরে মহেশ্বরের মন্দির। প্রত্যেক লোক মহেশ্বরের কাছেই নিজের দুঃখ বেদনা কামনা বাসনা নিবেদন করে। মহেশ্বরের দ্বারে ধর্না দেয় অনেকে। প্রত্যাদেশও পায়। প্রতিদিনই কোনও না কোন সময়ে সবাই মন্দিরে গিয়ে গোপনে জানায় তাদের প্রার্থনা। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, অপূর্ব সুন্দর চেহারা রত্নাকরের। খুব বড় লোকও সে। দেশ-বিদেশে নানা রকম ব্যবসা করে। চাল, চিনি, মশলা, সোনা, রূপো, হীরে, জহরতের। আরও কত কি। মনও তার খুব উঁচু। তাপ্তি তাকে পূজো করে মনে মনে।

রত্নাকরের জেদ দেখে তাপ্তি তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

"এত রাত্রে কলা খেতেই হবে?"

"হ্যাঁ, ফল্গুকে কথা দিয়েছি। পুরুষের কথা আর হাতির দাঁত অনড়।"

"বাবা বাবা বাবা। কি জেদি লোক—" তাপ্তি উঠে পড়ল।

"কটা আনব? একটু আগেই তো ভাত খেয়েছ—"

"এক ছড়া আন না, দুজনে মিলে খাওয়া যাক।"

"আমি খাব না।"

মুচকি হাসল রত্নাকর। বলল—"তোমাকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন তুমি ছিলে তন্বী শ্যামা। এখন মোটা হয়ে যাচ্ছ। তাই খাওয়া কমাতে চাইছ নাকি? খাওয়া কমিয়ে কিছু হবে না, পুকুর থেকে ঘড়া ঘড়া জল নিয়ে এসো, বাসন মাজো, ঘর মোছো। খাওয়া কমিয়ে কেউ রোগা হয় না। দুর্বল হয়। দেখ না, ওপাড়ার বাচ্চুকে, বেচারি কিছু খায় না। অথচ হু হু করে মুটিয়ে যাচ্ছে—"

"যত বক্তৃতাই দাও, আমি তোমার ফল্গুর কলা খাব না—"

তাপ্তি বেরিয়ে গেল। একটু পরে তিন ছড়া পাকা কলা নিয়ে ফিরে এল সে।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রত্নাকরের মুখ। "কলার কি রূপ দেখেছো! যেন সোনা দিয়ে তৈরী।"

"সবগুলো খাবে না কি।"

"রাখ তো আগে—"

একটি ছোট সুদৃশ্য ঝুড়ি করে কলা এনেছিল তাপ্তি। সেটি বিছানার উপর রেখে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

রত্নাকর একটি কলা ছাড়িয়ে কামড় দিয়ে বলে উঠল—"বাঃ, এ যে জমানো ক্ষীর দেখছি— "

একে একে সমস্ত কলাগুলিই খেয়ে ফেলল সে। খেতে খেতে ফল্গুর কথা মনে পড়ল তার। ছিপছিপে রোগা আশ্চর্য মেয়ে ফল্গু। কথা-বার্তা বেশী বলে না। কিন্তু তার চোখ

দুটি দেখে মনে হয়, সর্বদা সে যেন অন্তঃসলিলা বইছে। ভ্রূর সামান্য ভঙ্গীতে, চোখের পাতার সামান্য কম্পনে, মুখের মৃদু হাসিতে সে নিজেকে প্রকাশ করে। রত্নাকরের বন্ধু সুবলীশঙ্কর ব্যবসায় উপলক্ষে যখন বালী সুমাত্রা গিয়েছিল তখন কিনে এনেছিল মাতৃপিতৃহীনা বালিকা ফল্গুকে কোথাকার এক হাট থেকে। নিঃসন্তান সুবলী ওকে কন্যাবৎ পালনও করেছে, তার বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণীও করে গেছে ফল্গুকে। ফল্গু বিয়ে করে নি। তার বাগানের শখ। কত রকম গাছই যে লাগিয়েছে সে তার বাগানে। লবঙ্গর গাছ, গোলমরিচের গাছ, চন্দনের গাছ এসব তো আছেই তার বাগানে, নানা রকম নামহীন বন্য গাছগাছড়াও আছে। একটা গাছ আছে দিনের বেলা তাতে সোনালি ফুল ফোটে। সেই ফুলই রাতের বেলা রূপোলি হয়ে যায়। জ্যোৎস্নার ছোঁয়া লাগলে আতরের গন্ধ বেরোয়। ঝাঁপড়ালো অনেক গাছে সে ছোট ছোট ঘর বানিয়েছে গাছের উপর। মাঝে মাঝে শোয় সেখানে। বাগানে কখন যে কোথায় থাকে তা ভিন্‌ট্রু ছাড়া আর কেউ জানে না। ভিন্‌ট্রুও জানে না অনেক সময়। ভিন্‌ট্রু বিশাল-কায়া, অনেকটা রাক্ষসীর মত দেখতে। গায়ে জোরও খুব। সেই ফল্গুকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রবল প্রতাপ তার। ফল্গু খেতে আপত্তি করলে জোর করে তার ঘাড় ধরে মুখে ভাত গুঁজে দেয়। প্রায়ই দেখা যায় ফল্গু হরিণীর মতো ছুটে পালাচ্ছে আর ভিন্‌ট্রু তার পিছু পিছু ছুটছে। কিন্তু রাত্রে ভিন্‌ট্রুর কোলে মাথা রেখে না শুলে ঘুম আসে না ফল্গুর। ভিন্‌ট্রু দিনেও ফল্গুকে সর্বদা আগলে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। মেয়েটার এমন স্বভাব, কেমন যেন ফস্‌কে ফস্‌কে পালিয়ে যায়! বিরাট বাগানের গাছ-পালার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়! বাগানের মালীরা সংখ্যায় অনেক–তারাও বলতে পারে না ফল্গু বাগানের কোনখানে আছে। কিংবা বাগানে আছে কি না। তবে ভিন্‌ট্রু জানে রাত্রে সে ফিরে আসবেই। তার কোলে মাথা না রাখলে ঘুম আসবে না তার। ছোট খুকীর মত গান গেয়ে মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াতে হয় তাকে। তবু ভিন্‌ট্রুর ওকে নিয়ে স্বস্তি নেই। মেয়েটা কোথায় যেন চলে যায় মনে মনে–কি যে ভাবে সর্বদা–কোন আকাশে যে ভেসে বেড়ায় তা ধরতে পারে না সে। এ সব রত্নাকর ভিন্‌ট্রুর মুখেই শুনেছে। সুবলীশঙ্কর যখন বিদেশে যেতেন, যখন ফল্গুকে বিদেশের হাট থেকে কিনে আনেন, তখন রত্নাকরের বয়স পঁচিশ। ফল্গুর বয়স তখন দশ। মেয়েটা লতার মত তরতর করে বেড়ে উঠল তার চোখের সামনে। সুবলী মারা যাওয়ার পর যখন সে বিষয়ের মালিক হল তখন সে বৈষয়িক সব কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল তার কাছে। বলেছিল–"আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন। আপনিই এগুলো রেখে দিন। আমার যখন যা দরকার হবে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।" সে কিন্তু কোনদিন টাকা চাইতে আসে নি। ভিন্‌ট্রুটা মাঝে মাঝে এসে টাকা-কড়ি নিয়ে যায়। সুবলীর ব্যবসা এখন রত্নাকরই দেখে। যা লাভ হয় ফল্গুর নামে জমা করে দেয়। ফল্গুর ব্যবসার দিকে মন নেই। কোনও খবরও নেয় না। মাঝে মাঝে মেঘের মত হঠাৎ আসে, ঘুরে ফিরে আবার চলে যায়। বাগানে ভালো ফল বা ফুল হলে নিয়ে আসে। ফল্গুর কথা ভাবতে ভাবতে রত্নাকরের মনে হোল–তাপ্তি এখনও আসছে না কেন? উঠে পাশের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল, তাপ্তি বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে' ফুলে' কাঁদছে। রত্নাকর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে একটি হাত-পাখা নিয়ে এসে তাপ্তির মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করতে লাগল তাকে।

ফল হল। তাপ্তি হঠাৎ তার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল–"আর

সোহাগ জানাতে হবে না। পুরুষ জাতটাই নিষ্ঠুর–"

রত্নাকর কোনও জবাব দিল না এর। আত্মপক্ষ সমর্থন করল না। একটু পরে বলল– "দূর দেশে এবার সমুদ্র যাত্রা করব। একটা ভিন্ন মহাদেশে যাব। সেখানে অনেক গজদন্তের সন্ধান পেয়েছি। সে দেশে প্রচুর হাতী। ফিরতে অনেকদিন লেগে যাবে। তাই ভাবছি তোমাকে সংগে নিয়ে যাব। আমাদের জাহাজ নৌকো তো অনেক থাকবে, তার সংগে আমাদের ময়ূরপংখীটাও নিয়ে যাব। আমরা আলাদা থাকব তাতে।",

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তাপ্তি।

"সত্যি ?"

"সত্যি !"

তাপ্তির চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটল যা অবর্ণনীয়। সে বলতে লাগল "সত্যি, চল আমরা এখান থেকে দূরে চলে যাই। ওই ফল্গু, নর্মদা, গংগা, যমুনা, মন্দাকিনী, বিতস্তা, ইরাবতী, ভোগবতী, ব্রাহ্মণীরা দিনরাত তোমার কাছে আসা যাওয়া করে--ভালো লাগে না আমার। অথচ ওদের বলা যায় না কিছু। পালাই চল এখান থেকে–"

"বেশ তাই চল–অম্বুধিকে একটা শুভ দিন দেখতে বলি।"

"অম্বুধিকে বোলো না যেন কোথা যাবে। আমরা ময়ূরপংখী নিয়ে যাচ্ছি শুনলেই অম্বুর বউ ইরাবতী আর ধিংগী শালী কাবেরী যেতে চাইবে–"

" না, না, কোথা যাচ্ছি কিছু বলব না। শুধু বলব একটা শুভ দিন দেখে দাও–। চল, এখন শোবে চল।"

দুজনে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যা ঘটল তাতে পন্ড হয়ে গেল সব! পেট ব্যথা করতে লাগল রত্নাকরের। প্রথমে একটু একটু; তারপর ভয়ানক। তাপ্তি বলল–"কলা পেটে গিয়ে ছুরির ফলা হয়েছে। দাঁড়াও একটু সেঁক দিয়ে দি–।"

অত রাত্রে উনুন জ্বেলে জল গরম করে' অনেক কান্ড করলে সে। কোনও ফল হল না। ব্যথার চোটে চীৎকার করতে লাগল রত্নাকর।

তাপ্তিও হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বাড়ির চাকরাণী পদ্মাও এসে কাঁদতে বসে গেল বিছানার কাছে এসে। কাঁদতে কাঁদতে বলল–"মা কালীর মন্ত্র-পড়া তেল আছে, সেটা মালিশ করে দেবো ?" তাপ্তি বলল–"নিয়ে আয় আমি মালিশ করে দিচ্ছি–"

পদ্মা বলল–"আমি ছাড়া আর কেউ মালিশ করলে ফল ফলবে না–"

"তোকে মালিশ করতে হবে না। তুই কবরেজ মশাইকে খবর দে। উমাচরণকে বল গাড়ি নিয়ে যাক–"

পদ্মা উঠে গেল। পদ্মা তাপ্তির বাপের বাড়ির ঝি। যদিও কালো, তবু কিন্তু রূপসী সে। এবং যুবতীও। কালো পাথরে কোঁদা অজন্তার মূর্তি যেন একটি। তাপ্তি তাকে রত্নাকরের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। পদ্মা কিন্তু কোন-না-কোন ছুতোয় আসার চেষ্টা করে।

॥ ২ ॥

জলধি কবিরাজ লম্বা শুঁটকো, তিরিক্ষি মেজাজের লোক। তার বৈশিষ্ট্য কেউ তাকে ডাকতে এলেই বলে, যাব না। যারা তার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আসে, তাদেরও গালাগালি দিয়ে বলে–"তোরা পাপী, তোদের মা-বাবারাও পাপী–তাই অসুখে পড়েছিস।

আমি কি করব। যা পালা এখান থেকে।"

জলধি কবিরাজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিন্তু সত্যিই পারঙ্গম পন্ডিত ব্যক্তি। চিকিৎসা করে টাকা নেয় না, ওষুধও বিনামূল্যে দেয়। তার সংসার চলে চাষ থেকে। প্রচুর জমির মালিক জলধি শর্মা। কবিরাজী গাছগাছড়ারও প্রকান্ড বাগান আছে। নানা রকম দুর্লভ গাছগাছড়া লাগিয়েছে সেখানে। এই সব গাছগাছড়া সংগ্রহের জন্য অনেক সময় বিদেশেও গিয়েছে। আসল শিলাজতু সংগ্রহের জন্য হিমালয়েও গিয়েছিল। রত্নাকরের বাণিজ্যপোতে চড়ে' অনেক দ্বীপেও ভ্রমণ করেছে সে। প্রকৃতই পন্ডিত লোক জলধি। কিন্তু অত্যন্ত খিটিখিটে। সমস্তক্ষণ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র আর ওষুধের খুঁটিনাটি নিয়েই কাটে। বাধা পড়লেই ক্ষেপে যায়। সে সুশ্রুতের একটা গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে পড়ছিল, এমন সময় তার স্ত্রী নর্মদা এসে প্রবেশ করল। তার কাপড় গাছ কোমর করে' পরা, নাকের উপরও একটা গামছা বাঁধা। হাতে একটি মুষল। সে পাশের ঘরে উদূখলে গোলমরিচ কুটছিল। জলধির বিশ্বাস স্ত্রীলোকদের সর্বদা কাজে নিযুক্ত না রাখলে তাদের মন উড়ু উড়ু করে এবং শেষকালে তারা যা করে তা কাজ নয়, অকাজ। জলধি নিজে বাড়িতে ওষুধ তৈরি করে এবং নর্মদাকে সেই সব ব্যাপারে নিযুক্ত রাখে। একালের মেয়ে হ'লে বিদ্রোহ করত, পালিয়ে যেত, কিন্তু সেকালের মেয়েরা ভাবতেও পারত না এসব। নর্মদা এসে বলল "রত্নাকরের খুব অসুখ করেছে। গাড়ী এসেছে তার বাড়ি থেকে। আর পদ্মাও এসেছে। সে কান্নাকাটি করছে খুব। রত্নাকর নাকি খুব কষ্ট পাচ্ছে। তুমি গিয়ে দেখে এস একবার।"

জলধি বলল—"বলে' দাও যাব না। রত্নাকরের অসুখ তো হবেই। ওর পিছু পিছু পাল পাল মেয়ে মানুষ ঘুরছে সর্বদা। মহাপাপী ও—।"

নর্মদারও দুর্বলতা ছিল রত্নাকর সম্বন্ধে। কাণ দুটো লাল হয়ে উঠল। সে বলল "পাপী তো তোমার চোখে সব্বাই। ওর মত উপকারী বন্ধু আমাদের কিন্তু আর কেউ নেই। তোমার ওষুধ দেশ-বিদেশ থেকে ওই এনে দেয়। ওর নৌকোয় চড়ে' তুমিও কত জায়গায় গেছ—"

হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে চীৎকার করে' উঠলেন জলধি—"যাব যাব যাব যাব যাব—তুমি একটু থামো দিকি।"

রত্নাকরের বাড়িতে গিয়ে জলধি দেখল তার শোবার ঘরে একগাদা মেয়ে মানুষ কিলবিল করছে। কাঁদছে অনেকে, কান্নার ভাণ করছে কেউ কেউ। তাপিত স্বামীর মাথা কোলে করে বসে আছে বিছানায়। তার চোখে ধারা নেমেছে। আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল জলধির। বলে উঠল-"কি কান্ড। এত ভীড় কেন? হাটের মধ্যে কি রুগী দেখা যায়। এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও সবাই।"

একে একে সবাই বেরিয়ে গেল।

তাপিত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—"আমিও যাব কি?"

"তুমিও যাও।"

তাপিত বেরিয়ে গেল। রত্নাকর চোখ বুজে শুয়েছিল। সবাই চলে যাবার পর সে চাইলে জলধির দিকে।

"তোমার পেটের কোনখানটায় ব্যথা?"

রত্নাকর বাঁদিকে বুকের একটু নীচে হাত দিয়ে দেখালে।

"যে জায়গাটা দেখাচ্ছ সেটা তো হৃদয়ের স্থান। হৃদয়-বেদনায় ভুগছ নাকি?"

মৃদু হাসল রত্নাকর। উত্তর দিল না।

"জিভ দেখাও।"

রত্নাকর জিভ দেখাল।

"জিভ তো পরিষ্কার। দাও নাড়ীটা দেখি–।"

নাড়ী ধরে চোখ বুজে একটা ঘণ্টা বসে রইল জলধি। ভ্রূ কখনও কুঞ্চিত হচ্ছে, কখনও মসৃণ হয়ে আসছে। নাসারন্ধ্র কখনও বিস্ফারিত হচ্ছে, কখনও হচ্ছে না।

এক ঘণ্টা পরে নাড়ী ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন–"ও ব্যথা কলার নয়, কলা তোমার হজম হয়ে গেছে। কিন্তু নাড়ী থেকে বুঝলাম তোমার বায়ু প্রকুপিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাগলও হয়ে যেতে পারো। তোমার ও ব্যথা বায়ুর ব্যথা–"

"ওষুধ দেবে?"

"দেব না। ওর ওষুধ নেই আমাদের ভাণ্ডারে। ওর ওষুধ মহেশ্বর। মন্দিরে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। রোজ যাই।"

"ওঁকেই প্রার্থনা কর। মদন-দমন উনিই। আমার মনে হচ্ছে মদনকে কেন্দ্র করেই তোমার মনে কোনও মতলব জেগেছে। তাই বায়ু প্রকুপিত। এর কোনও ওষুধ নেই। একটা তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি পেটে মালিশ কর, কিছুটা উপশম হবে কিন্তু সারবে না।"

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নর্মদা ঘরে ঢুকল। জলধি লক্ষ্য করলেন বর্মা থেকে অদ্ভুত যে দুলজোড়া রত্নাকর এনে নর্মদাকে দিয়েছিল সেই দুলজোড়া পরেই এসেছে সে। সে এসেই জলধিকে বলল–"তুমি শীগ্গির বাড়ি যাও। অশ্বিধ আর ভোগবতী আবার মারামারি করে রক্তারক্তি কাণ্ড করেছে। ভোগবতী অশ্বিধর গালে কামড়ে দিয়েছে। আর অশ্বিধ ঘুষি মেরেছে তার চোয়ালে–যাও শীগ্গীর তুমি–"

জলধি চেঁচিয়ে উঠল–"ওরা মরুক। আমি যাব না–।"

"ওরা মরবে না। ওরা অমর। ভোগবতী সাতাশটা সতীনকে তাড়িয়েছে। ও একাই ভোগ করবে স্বামীকে। আর অশ্বিধ কিছুতেই ওর দিকে মন দেবে না–নিজের মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে দিনরাত আছে। ভোগবতী কাছে এলেই চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে বের করে দেয় ঘর থেকে। দুজনের গায়েই অসুরের মত শক্তি।"

জলধি চেঁচিয়ে উঠল–"ওসব পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটছ কেন? ওসব তো আমি জানি। পৃথিবীতে কেউ অমর নেই। রাবণ বীরবাহুরাও মারা গেছে–। ওরাও মরবে। আমি বলছি, প্রার্থনা করছি–শীগ্গির মরুক।"

"কিন্তু অশ্বিধর মত গুণী যদি মরে যায় তোমার যে ডান হাত ভেঙে যাবে। গাছ, পালা, শিকড়, বাকড়, ফুল, ফল, তামা, পারদ, লোহা কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা একনজরে দেখে বলে দেবার মতো লোক আর আছে কি এদেশে? আর ভোগবতী না বাঁচলে অশ্বিধ দেশান্তরী হবে, ওরা মারপিট করে বটে, কিন্তু ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে খুব। একদণ্ড কেউ কারও চোখের আড়াল হ'তে চায় না। তুমি যাও।"

জলধি মুখ গোঁজ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

জলধি বাড়ি ফিরে দেখল অশ্বিধ ভোগবতী চলে গেছে। তার চাকর কৈলাস বলল–

"তারা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে একটা বনতুলসীর গাছ উপড়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন!"

"তাই নাকি।"

হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জলধি। তারপর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে যে বনতুলসী গাছটা সে বাড়ির উঠোনেই লাগিয়েছিল সেইটেই তুলে নিয়ে গেছে। জলধির হাঁ বন্ধ হয়ে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। বলল--"পাপ পাপ পাপ।" তারপর হন হন করে বেরিয়ে গেল সে। অব্ধির বাড়ির দিকেই গেল। অব্ধির বাড়ি বেশি দূর নয়–পাশেই। সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে গেল জলধি। দেখল অব্ধি আর ভোগবতী দুজনেই মাথায় মুখে ন্যাকড়ার ফেট্টি বেঁধে পাশাপাশি বসে চুমুক দিয়ে গরম দুধ খাচ্ছে। দুজনেরই মুখে হাসি। জলধিকে দেখে অব্ধি বলে উঠল–"আমরা আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনাকে পেলাম না। উঠোনে দেখলাম একটা বনতুলসী গাছ রয়েছে। সেইটি উপড়ে নিয়ে এলাম। তার পাতা কয়েকটা চিবিয়ে লাগিয়ে দিলাম ভোগলুর ঘায়ে। তারপর ভোগলু কয়েকটা পাতা চিবিয়ে আমার গালে লাগিয়ে দিলে। তারপর পুরোনো ন্যাকড়া ছিঁড়ে আমি ওকে ফেট্টি বেঁধে দিলাম, ও আমাকে ফেট্টি বেঁধে দিলে। ঠিক করি নি? হ্যাঁ, আপনাকে দুটো দরকারি কথা বলতে হবে। আপনার ঘরে ঢুকেই অনুভব করলাম ঘরে একটা গোখরো সাপ ঢুকেছে। তার গায়ের গন্ধ পেলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না কোথাও। কোনও গর্তে টর্তে ঢুকে আছে বোধহয়। ঘরে গিয়ে খুব ধুনো জ্বালাবেন, পালাবে। সসর্পে গৃহে বাস ঠিক নয়। ঘরের কোণে একটা বড় খল দেখলাম। নতুন কিনেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ",-জলধি বলল--"খলে তোমার নজর পড়ল কেন?"

"কেন তা যদি বলি তাহলে ওটাকে আর খল রূপে ব্যবহার করবেন না আপনি। ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন–।"

"তার মানে--?"

"যেই শুনবেন ওর তলায় একটা দামী হীরে আছে অমনি আপনি ওটা ভেঙে হীরেটা বার করে নেবেন। নেওয়া উচিত। খলটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, তারপর ছুঁয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ছোট একটা হীরে আছে ওর তলার দিকে–"

"ওখানে হীরে কি করে আসবে?"

"আসবার অনেক পথ আছে। কোন পথে এসেছে তা ভোগলু হয়তো বলতে পারবে। ও খড়ি পেতে গুনতে পারে–।"

ভোগবতী গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলে অব্ধির পিঠে।

"তুমি সবাই-এর সামনে আমাকে ভোগলু বলে ডাকবে না–।"

"ভোগবতী নামটা বড্ড বড়--।"

"আমিও তাহলে তোমাকে বলব অবু। অবু, অবু, অবাই–" বলে মুখ ভেংচে পালিয়ে গেল ভোগবতী।

"কি রকম পাজি দেখেছেন? সাধে ওকে মারি?"

তারপর গলার স্বর নাবিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে–"আর একটা গোপন কথা আপনাকে বলছি। আমাদের মন্দিরে দেবতারা গোপনে আনাগোনা শুরু করেছেন। একদিন ইন্দ্রকে দেখলাম, আর একদিন পবনকে। দৈত্যরাও আসছে। ওদের আকৃতি দেখেই বোঝা যায়। একদিন দেখলাম প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের মন্দিরে ঢুকছে–।"

"তুমি দেখলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কখন ?"

"রাত্রে। ব্রাহ্মমুহূর্তে-"

"তখন তুমি জেগে থাকো নাকি-?"

"তখনই তো জেগে থাকি। আমি আর ভোগলু দুজনেই তখন জেগে থাকি।"

"কি কর ?"

"হা হা করে হেসে উঠল অশ্বি।

"সেটি বলব না। যা করি তার জোরেই তো বলতে পারলাম আপনার ঘরে সাপ ঢুকেছে, আপনার থলের ভিতর হীরে আছে-আপনি এবার বাড়ি যান--বনতুলসীর পাতাতেই আমাদের ঘা সেরে যাবে--যদি না সারে আবার যাব আপনার কাছে। দেখি ভোগলু কোথা গেল। আমি চললুম। ওকে ধরে আনি-।"

জলধি বলল-"তোমাকে আমি আর ওষুধ দেব না।"-বলেই হনহন করে চলে গেল জলধি! চীৎকার করে জবাব দিল অশ্বি-"দেবেন, দেবেন আমি জানি নিশ্চয়ই দেবেন।"

অশ্বি লোকটা যে কি তা কেউ জানে না। কেউ বলে যাদুকব, কেউ বলে পিশাচ-সিদ্ধ। আবার কেউ বলে ও নাকি তান্ত্রিক আর ভোগবতী নাকি ওর উত্তরসাধিকা। ভোগবতী আসার আগে সাতাশটি যুবতীকে একে একে বিয়ে করেছিল নাকি অশ্বি। কিন্তু কেউ ওর মনোমত উত্তরসাধিকা হয় নি। তারপর ভোগবতীকে বিয়ে করল। ভোগবতী পাহাড়ী জংলি মেয়ে, দুর্দাম উদ্দাম। কিন্তু উত্তরসাধিকা হিসাবে নাকি প্রথম শ্রেণীর। অশ্বির জীবনে ভোগবতীই এখন একেশ্বরী। ওর আগেকার সাতাশটি স্ত্রী ওর প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে চলে গেছে।

॥৪॥

রত্নাকর এখনও পেটের ব্যথায় কাতর। জলধি কবিরাজের তেল মালিশ করে কিছু হল না। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল তাপ্তি। তার সন্দেহ হল ফল্গুর বাগানের কলা, হয়তো কলাব ভিতর দিয়ে কোনও রকম গুনটুন করেছে মেয়েটা। কথা কয় না, মাঝে মাঝে আসে আর মুচকি হাসে, কি যে ওর মনে আছে ভগবানই জানেন। তাপ্তি ঠিক করলে অশ্বিও তো একজন গুণী লোক, তাকে কলাগুলো দেখাবে। সে হয়ত বলে দিতে পারবে কলার ভিতর কোনও মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দিয়েছে কিনা। তাপ্তির ধারণা নিশ্চয় মন্ত্র আছে। কাবণ রত্নাকর কলা খাওয়ার পর থেকেই বাব বার ফল্গুর কথা বলছে। ফল্গু কিন্তু আসে নি। তাকে রত্নাকর ডাকতেও পাঠিয়েছিল একবার- তবু আসে নি। দেখা পায় নি তার। তাপ্তির ভয়, দূর থেকে মেয়েটা কি যে করছে-ধরবার উপায় নেই।

কলার কাঁদিটা প্রকান্ড। সব কলাই প্রায় পেকে গেছে। গন্ধে চারদিকে ম ম করছে। তাপ্তির নিজের মনটাও কেমন যেন লোভাতুর হয়ে উঠেছে। তবুও সে একটা কলাও খায় নি। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে খুব। যে কলার এমন মনমাতানো গন্ধ, সে কলা খেলে না জানি কি হবে! কবিরাজমশাই বলেছেন-শরীরে কোন ব্যাধি নেই। ব্যাধি মনে। বায়ু প্রকুপিত। এসব শুনে খুবই ঘাবড়ে গেছে তাপ্তি। এক ছড়া কলা নিয়ে সে হাজির হোল অশ্বির বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল কপাট বন্ধ। মনে হোল বাড়িতে কেউ নেই। অনেক ডাকাডাকি

করতে তাদের চাকর আমন বেরিয়ে এল।

"মা বাড়িতে আছেন?"

"আছেন। আসুন আপনি—"

"বাবা?"

"বাবাও আছেন। আসুন আপনি—" আমন তাপ্তিকে ভিতরে নিয়ে গেল।

আমন তাপ্তিকে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে—"আপনি বসুন এখানে। আমি মাকে খবর দি—" তাপ্তি বসল না, ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। কোথাও নানা রঙের পাথরের নুড়ি, কোথাও বা শিকড়, কোথাও হাড়। নানারকম জানোয়ারের খুলিও রয়েছে এক জায়গায়। মানুষের খুলিটা ভয়ংকর। খালি চোখ দুটো যেন গিলতে আসছে। আর এক জায়গায় সাপের খোলস টাঙানো রয়েছে। ভয় করতে লাগল তাপ্তির। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে সে ঘরে থাকতে হল না। আমন ফিরে এসে বলল, "চলুন, মা আপনাকে ভিতরে যেতে বললেন—"

ভিতরে গিয়ে তাপ্তি দেখল ভোগবতী গায়ে মুখে ছাই মাখছে।

"একি! কি মাখছ?"

"ছাই মাখছি, মড়ার ছাই।" তাপ্তি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

ভোগবতী বলল—"তোমার গা ঘিন ঘিন করছে না? আমি যে নাটকে অভিনয় করি সে নাটকে এই সবই বেশভূষা। কখনও কখনও উলঙ্গিনীও হতে হয়। তোমার হাতে কলা কেন?"

"এই কলা ফল্গু আমাদের পাঠিয়েছিল তার বাগান থেকে। উনি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটে ভীষণ ব্যথা। এখনও সারে নি। কবরেজমশাই বললেন—কলা হজম হয়ে গেছে। তাই এঁকে দেখাতে এনেছি কলায় কোনও দোষ নেই তো—উনিই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন—"

"উনি এখন পাশের ঘরে শীর্ষাসন করছেন। কলাটা রেখে যাও। ওঁর মতামত ওঁকে দিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

বলেই হো হো করে হেসে উঠল ভোগবতী। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—"শোন তাপ্তি- স্বামীকে আগলে আগলে রাখা যায় না। ওরা হাওয়ার মত। স্ত্রীর চারদিকেও ঘুরবে, পরস্ত্রীর চারদিকেও ঘুরবে। তারপর সব তো এই হবে—।"

এই বলে এক মুঠো ছাই নিয়ে আবার সে গায়ে মাখতে শুরু করল।

তাপ্তির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। সে কিন্তু মুচকি হেসে বলল—"এখন চলি তাহলে। খবরটা পাঠিয়ে দিও। ওঁকে একলা রেখে এসেছি।" তাপ্তি চলে গেল।

পাশের ঘরে শীর্ষাসন করে উলঙ্গ অশ্বি সূর্যের তপস্যা করছিল। তার মনশ্চক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রদীপ্ত দিবাকর। তাঁকে উদ্দেশ্য করে সে মনে মনে বলছিল- "সমস্ত জ্ঞানের আকর হে জবাকুসুম-সংকাশ, হে জ্যোতির্ময় দেবতা, তুমি আমাদের দেহকে পোষণ কর, মনকে উদ্দীপ্ত কর, অজ্ঞানের অন্ধকার তোমার স্পর্শে বিলুপ্ত হয়, হে মহাজ্যোতিষ্ক শতকোটি প্রণাম তোমাকে। আমার মধ্যে তুমি প্রতিফলিত হও। তোমার কৃপায় যা রহস্যাচ্ছন্ন, যা অস্পষ্ট, যা তমসাবৃত তা আমার কাছে স্বচ্ছ হোক, স্পষ্ট হোক, আত্মপ্রকাশ করুক—তুমি কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর।"

অব্ধির এ তপস্যার কথা অব্ধি ছাড়া আর কেউ জানে না। কেবল জানেন মহেশ্বর। তাঁর কাছে প্রত্যহ আর একটি প্রার্থনাও সে করে কিন্তু সে কথা পরে হবে।

তাপ্তি চলে যাবার পরও ভোগবতী কিছুক্ষণ ছাই মাখল। তারপর হাঁক দিল– "আমন শ্বেত পাথরের কলসীটা আর দুটো বাটি নিয়ে আয়।" তারপর উঠোনে বেরিয়ে দেখল সূর্য মধ্যাকাশে উঠেছে কিনা। সূর্য মধ্যাকাশে উঠলেই অব্দির ধ্যানভঙ্গ হয়। তারপর সে আর অব্ধি খাওয়া-দাওয়া করে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে যায় শ্মশান-মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে। প্রায় এক ক্রোশ হাঁটতে হয়। সেখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রিটা ওখানেই কাটায় তারা। খুব ভোরে আবার বাড়ির দিকে যাত্রা করে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে স্নান করে তারা নিজেদের পুকুরে। হুড়োহুড়ি করে' সাঁতার কাটে দু'জনে। তারপর শীর্ষাসন করে অব্ধি ধ্যান শুরু করে। আর মনে মনে মন্ত্র জপতে জপতে ভোগবতী সাজ-সজ্জা করে। কোনদিন ছাই মাখে, কোনদিন হাড়ের গয়না পরে। কোনদিন কিছুই পরে না, শুয়ে ঘুমোয়।

উঠোন থেকে ফিরে এসে ভোগবতী দেখলে আমন শ্বেত পাথরের কলসী আর দুটি শ্বেত পাথরের বাটি এনেছে। তার পিছনে পিছনে তাদের রাঁধুনী মিশবি ঢুকল দুটি প্রকাণ্ড থালা নিয়ে। শ্বেত পাথরের কলসীটি অনেকটা বোতলের মত দেখতে।

মিশরি প্রকাণ্ড থালা দুটি রেখে–আবার একটা বড় বাটি নিয়ে এল। বেশ বড় জামবাটি একটা। ভোগবতী প্রশ্ন করল– "আজ কি খাবার করেছিস আমাদের জন্য?"

"একটা বড় চিতল মাছ, তার পেটিগুলো ভেজেছি আপনাদের জন্য। আর ব্যাধ ভৈরব চারটে কালো তিত্তির পাখী দিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মশলা মাখিয়ে আগুনে ঝলসেছি। তাছাড়া ক্ষীরও আছে একবাটি।" এই সময় অব্ধি এসে ঘরে ঢুকল।

"বাঃ, প্রচুর খাবার দেখছি আজ। ভৈরব তিত্তির দিয়ে গেছে বুঝি। ওকে একটা লোহার টুকরো দিয়েছিলাম। বলেছিলাম এটা দিয়ে তীরের ফলা তৈরি করিয়ে নিস। যাকে লক্ষ্য করবি অব্যর্থ লাগবে। ভৈরব বলেছিল এ দিয়ে যা মারব আপনাকে তার ভাগ দেব– তিত্তিরগুলো বেশ বড় বড় দেখছি–"

ভোগবতী বলল–"তাছাড়া কলা আছে।"

"কলা কোথা থেকে এল?"

"তাপ্তি দিয়ে গেছে।"

"কেন?"

তখন ভোগবতী সব খুলে বললে অব্ধিকে। অব্ধি কলাগুলো নিয়ে শুঁকল। তারপর খেল একটা।

"বাঃ, এ তো চমৎকার।"

আর একটা খেল।

ফোঁস করে উঠল ভোগবতী, "বা রে– তুমি একাই সব খাবে নাকি? আমাকে দাও–।"

কলা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল দুজনে। হয়তো এ নিয়ে মারামারি হ'ত কিন্তু বাইরে কবি পারাবারের গলা শোনা গেল। সে গাইতে গাইতে আসছে–

"ডাকলে তুমি দাও না সাড়া
ধরা পড়েও দাও না ধরা
ও মোর মিতা অপরাজিতা

ওগো কৃষ্ণা নীলাম্বরা।
প্রজাপতির পাখায় নাচো
আকাশ ভরে ছড়িয়ে আছো
নীল-লোহিতের কন্ঠ-শোভা
ওগো নীলা স্বয়ম্বরা।"

পারাবার এসে ঘরে ঢুকল এবং কবিতায় সম্বোধন করল ভোগবতীকে।

"আজি অসময়ে অতি
ওগো দেবি ভোগবতী,
এসেছি তোমার কাছে ছুটিয়া,
ব্রাহ্মণী রুদ্যমানা
কপালে দিতেছে হানা
শাঁখাটি গিয়াছে তার টুটিয়া।
ছুটিয়া এলাম তব দ্বারে
আর একটি শাঁখা দাও তারে।"

হো হো করে হেসে উঠল অব্ধি আর ভোগবতী দু'জনেই। তারপর বলল—"সাগর শঙ্খ, মুক্তা শঙ্খ, শাদা শঙ্খ, সহজ শঙ্খ,—সব আছে। যেটা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু তার আগে খাও বঁধু হে, খাও কিছু—"

পারাবারকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল তারা দু'হাত তুলে।

পারাবারের বয়স কত বলা শক্ত। চেহারাটি বালকের মত। চোখ দুটি স্বপ্নময়। মুখে সর্বদাই একটা অপ্রস্তুত ভাব, যেন সে এমন একটা কিছু করে ফেলেছে যা করা অনুচিত। অপ্রস্তুত মুখেই সে কলা খেয়ে ফেলল একটা। তারপর বলল—মনে হচ্ছে এ কলা চৌষট্টি কলার উপর টেক্কা দিয়েছে। কোথা পেলে এ অপূর্ব কলা- ?"

"ফল্গুর বাগানের কলা,—"

"ফল্গুর ? তাই এত চমৎকার। ফল্গু তো মানুষ নয়। ও একটা সুর।"

"কিসের সুর ?"

"তা জানি না। সেতারে, এস্রাজে, বীণায়, বেণুতে, তানপুরায় ও বাজতে পারত। কিন্তু কোন ওস্তাদ আজ পর্যন্ত ওকে কোনও যন্ত্রে ধরতে পারে নি। তাই ও আকাশে বাজে। তোমার সঙ্গে আলাপ আছে ?"

"না, ও কারো সঙ্গে আলাপ করে না! ওর বাপের বন্ধু রত্নাকরের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়--।"

"আমি ওকে একদিন একটা কদম গাছের উপরে দেখেছিলাম। দেখলাম একটা ডালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে, আর ওকে ঘিরে আছে রাশি-রাশি রোমাঞ্চিত কদম ফুল। দূর থেকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম একটা কবিতা লিখব। অনেক কাগজ নষ্ট করেছি, পারি নি। ওকে কবিতাতেও ধরা যায় না—"

ভোগবতী বলল—"এখনি যে একটা গান গাইতে গাইতে আসছিলেন—কি গান সেটা ?"

"আজ আমাকে নীল রংয়ে পেয়েছে। নীল রং মোহের নীলাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে আমার কল্পনার চোখে। নীলকে নিয়েই গান গাইছি আজ। আর দেরী করব না কিন্তু। শাঁখা দাও

আমাকে। ব্রাহ্মণী ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে। তার ভয় হয়েছে শাঁখা ভেঙে গেলে আমার বুঝি কোনও অমঙ্গল হবে–"

ভোগবতী প্রকান্ড একটি কড়ির ঝাঁপি এনে দিল পারাবারকে। "আমার সব শাঁখা ব্রাহ্মণীকেই দিলাম। আমি আজকাল শাঁখা পরি না। হাড়ের গয়না পরি। ব্রাহ্মণী খুব ধর্মভীরু, না?"

"খুব। অর্ণবের কাছে মন্ত্র নিয়েছে। দিনরাত জপ পূজো নিয়েই আছে। আর ত্রিবেণী সঙ্গমে যায় রোজ।"

"ত্রিবেণী সঙ্গম? সে আবার কি?"

"গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী নামে তিনটি মহিলা একটি আশ্রম মতো করেছে। সেখানে কেবল ধর্মচর্চা হয়। ব্রাহ্মণী রোজ যায় সেখানে। ওখানে অর্ণব রোজ বক্তৃতা দেয়। ওরা সবাই অর্ণবকেই মনুষ্যরূপী মহেশ্বর মনে করে।–হ্যাঁ, মহেশ্বরের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কাল রাত্রে আমি যখন মহেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি তখন দেখলাম দুজন দিব্যকান্তি যুবক মহেশ্বরের মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, আর দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথা–।"

"তুমি বোধহয় অশ্বিনীকুমারদেব দেখেছ। আমি একদিন ইন্দ্রকে দেখেছি। দেবতারা কেন জানি না মহেশ্বরের মন্দিরে যাতায়াত করছেন। দৈত্যরাও করছেন। আমি একদিন দৈত্যও দেখেছি একটা।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। নেপথ্যে কিছু একটা হচ্ছে বোধ হয়।"

ভোগবতী বলল–"ব্রাহ্মণীর জন্যে দুটো কলা নিয়ে যাও।"

"ফল্গুর বাগানের কলা শুনলে খাবে না। ওরা ফল্গুর উপর ভয়ানক চটা।"

"কেন?"

"ত্রিবেণী সঙ্গমের সবাই ফল্গুর উপর চটা। কারণ ফল্গু রত্নাকরের কাছে যায়।"

"গেলেই বা–"

"ত্রিবেণী সঙ্গমের তিনটি বেণী এবং আমার ব্রাহ্মণী সকলেই রত্নাকরের কৃপাপ্রার্থিনী। ওই আশ্রম রত্নাকরই করিয়ে দিয়েছে। তাঁদের আশা রত্নাকরই তার নৌকোয় চড়িয়ে তাদের কন্যাকুমারিকা তীর্থে নিয়ে যাবে। ফল্গু ওর বাড়িতে আসা যাওয়া করে, এটা ওরা সহ্য করতে পারে না–" ভোগবতী বলল–"আমারও খুব ভালো লাগে রত্নাকরকে। দিলদরিয়া লোক। আমাদেরও ও লঙ্কায় নিয়ে যাবে বলেছে। ওর বউ তাপ্তি কিন্তু ভারি হিংসুটে। খালি সন্দেহ কে ওর স্বামীকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। ফল্গু এই কলা রত্নাকরকে পাঠিয়েছিল, ওর সন্দেহ ফল্গু বুঝি কলার ভিতর কোনও মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দিয়েছে–।"

পারাবার বলল–"তাপ্তিকে আমি দোষ দিই না। রত্নাকরের মত স্বামী যার সে তো সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবেই। শুধু ওর চেহারাই অপূর্ব নয়, মনও অসাধারণ। অগাধ টাকার মালিক কিন্তু কোনরকম স্থূলতা নেই। রসিক লোক রত্নাকর। গানের সমজদার, ছবির সমজদার। অর্ণব শর্মা দিনরাত ধর্ম-শাস্ত্র নিয়ে আছে। কিন্তু রোজগার নেই। ওর সংসার চালায় কে জানো? ওই রত্নাকর। পঁচিশ বিঘে নিষ্কর জমি কিনে দিয়েছে ওকে। তাছাড়া মন্দাকিনী প্রায়ই গিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে আসে। অম্বধি বলেছিল মন্দাকিনীর নাকি মঙ্গল

বিরূপ। ভালো প্রবাল পরা দরকার। রত্নাকর চমৎকার একটা প্রবালের মালা উপহার দিয়েছে ওকে। প্রত্যেকটি প্রবাল পায়রার ডিমের মত। রত্নাকর সত্যিই মহৎ লোক। সবাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং তাপ্তির ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেল। চললুম। পরে দেখা হবে।"

কড়ির ঝাঁপিটি নিয়ে বেরিয়ে গেল পারাবার।

॥ ৫ ॥

আমন অব্দির চিঠি দিয়ে গেছে। পড়ে আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল তাপ্তি। হলদে ভূর্জপত্রে গোটা গোটা অক্ষরে অব্দি লিখেছে—"উৎকৃষ্ট মর্তমান কলা। নির্দোষ এবং নির্মল।" তাপ্তির আশা ছিল কলায় যদি কোন দোষ পাওয়া যায় তাহলে তিন্তিড়ীকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাবে। তিন্তিড়ী ঝাড়-ফুঁকে খুব ওস্তাদ। তার ব্যবসা সিদ্ধির আর গাঁজার. কিন্তু অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে সে। বশিষ্ঠ পন্ডিতের বউকে ভূতে ধরেছিল। দিনরাত গোঁ গোঁ করত। তিন্তিড়ীই তাঁকে সারিয়েছে। অদ্ভুত কান্ড করেছিল তিন্তিড়ী। একটা কালো ষাঁড়ের গোবর শুকিয়ে প্রচুর ঘুঁটে তৈরি করল প্রথমে। তারপর প্রকান্ড একটা কালো রঙের মালসা নিয়ে এল মিঠু কুমোরের কাছ থেকে। কালো গাইয়ের দুধ জমিয়ে ঘি তৈরি করলো কালো কড়াইয়ে তমাল কাঠের আগুনে জ্বাল দিয়ে। রান্নাঘরের কালো ঝুল মেশালো তার সঙ্গে। তারপর সেই ঘি দিয়ে কালো মালসায় ঘুঁটেগুলো ধরিয়ে ফেললে আর সেই আগুনে ফেলতে লাগল কালো জিরে, মেথি, গোলমরিচ, কালো বিছে তিনটে, আর কালো গুবরে পোকা। আর মন্ত্র আওড়াতে লাগল জোরে জোরে। তিন্তিড়ীর ঘাড়টা যদিও বেঁকা কিন্তু গলায় জোর খুব। গাঁজা খায় কিনা, বেশ ভরাট গলা। মন্ত্র পড়তে পড়তে ঝামর দিয়ে ঝাড়তে লাগল বশিষ্ঠের বউকে। ভূত ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল।

।

কিন্তু কলাতে যখন দোষ নেই তখন তিন্তিড়ীর কাছে গিয়ে কি হবে।

হঠাৎ তাপ্তির মনে হল—অম্বুধি তো ভালো জ্যোতিষী। সে হয়ত গুণে বলতে পারবে ব্যাপারটা কি। ও না হয় এসে রত্নাকরের হাতটা দেখুক। কিন্তু আবার একটু দ্বিধাও হল। অম্বুধিকে খবর দিলেই ইরাবতী আর তার বিধবা বোন কাবেরী ছুটে আসবে আগে। দুটো মেয়েই ঢলানী। রত্নাকরকে ঘিরে এমন সব কান্ড করবে যে বাধা দেওয়াও শক্ত, সহ্য করাও শক্ত। ইরাবতীও স্বামীর কাছে গুণতে শিখেছে একটু-আধটু। আর কাবেরী মেয়েটা ফক্কোড়। মুখে মুখে ছড়া বানায় আর হি হি করে হাসে। লজ্জা সরম কিছু নেই। বুকের কাপড় বার বার খুলে যায়, হুঁশ নেই সেদিকে। কিন্তু কি করা যাবে? দুনিয়াটাই এই রকম। রাস্তায় ধুলো আছে বলে' তো পথ হাঁটা বন্ধ করা যায় না। তাছাড়া গবজ বড় বালাই। রত্নাকরকে যেমন করে' হোক ভালো করতেই হবে। তাপ্তির রাতে ঘুম হচ্ছে না। সারারাত পাখা হাতে করে বসে থাকে। রত্নাকর যদিও বার বার বলে—"তুমি শুয়ে পড়, ঘুমোও।" কিন্তু ঘুমোও বললেই কি ঘুমোনো যায়? যে মানুষ একটু আগে বলল—এবার আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ময়ূরপংখীতে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করব গজদন্তের সন্ধানে—সেই মানুষ কিনা পেটের ব্যথায় ছটফট করছে। আর সব চেয়ে মুশকিল, কি হয়েছে কেউ ধরতে পারছে না। এতবড় নামী কবিরাজ জলধি, অমন নামজাদা গুণী

অম্বিধ—এরা বলছে কলায় কোন দোষ নেই। তবে পেট ব্যথা করছে কেন? কলা খাওয়ার পরই তো ব্যথা হল। জলধি বলছেন—বায়ু প্রকুপিত হয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছে না তাপ্তি। তাই সে অবশেষে ঠিক করে ফেলল ওই জ্যোতিষী অম্বুধিকেই সে ডাকবে। কিন্তু তাকে ডাকতে হলে সাগরের খোশামোদ করতে হবে। সাগর যেখানে যেতে বলে সেখানেই যায় অম্বুধি। কারণও আছে। অম্বুধির পায়ে বাত, খুব আস্তে আস্তে হাঁটে, কানে শোনেও কম। যেখানে যায় সাগর তাকে কাঁধে করে' নিয়ে যায়। অপরের কথা তার কানে চেঁচিয়ে বলে' শুনিয়ে দেয়। সাগর একজন মল্লবীর। তার গায়ে প্রচুর শক্তি। ডন বৈঠক কুস্তি এইসব নিয়েই দিনরাত থাকে সে। খুব ভক্তি করে সে অম্বুধিকে। তার কোথাও যাবার দরকার হলেই কাঁধে করে নিয়ে যায় তাকে। সুতরাং অম্বুধিকে আনতে হলে আগে সাগরকে বলতে হবে। সাগরের কথা মনে হওয়ার সংগে সংগে মনে পড়ল তার স্ত্রী বিতস্তাকে। অদ্ভুত মেয়ে ওই বিতস্তাও। লিকলিকে রোগা শ্যামবর্ণ ওই মেয়েটা তার ওই পালোয়ান স্বামীকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে। বিতস্তার কথায় সাগর উঠে বসে। যদিও কালো তবু সুন্দর একটি শ্রী আছে মেয়েটির। রাঁধেও খুব ভালো। সাগরও খাদ্য-রসিক লোক। খাইয়েই বশ করেছে ওকে বিতস্তা। মেয়েটি সত্যিই রাঁধতে পারে ভালো। রত্নাকরকে এ-অঞ্চলে ভালোবাসে সবাই। রত্নাকর যখন বাণিজ্যের জন্য নৌকো করে বিদেশে যায় তখন প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। সাগরকে একজোড়া চন্দন কাঠের মুগুর এনে দিয়েছে, আর বিতস্তাকে দিয়েছে একটি রূপোর শত-কৌটো। একশটা কৌটো একটার ভিতর আর একটা ঢোকানো। সেই কৌটোয় ভরে ক্ষীর পায়েস নানা রকম মিষ্টান্ন, নানা রকম ব্যঞ্জন, নানা রকম ডাল, নানাবিধ পলান্ন খিচুড়ি রেঁধে পাঠিয়েছিল বিতস্তা। রত্নাকরের খুব ভালো লেগেছিল। রত্নাকরের তো সব ভালো লাগে। সবাইকে ভালো লাগে। কিন্তু এসব ভালো লাগালাগি ভালো লাগে না তাপ্তির। আগুন আর ঘিয়ের উপমাটা মিছে নয়। তাপ্তি পারতপক্ষে কাউকে আসতে দেয় না কাছে। কিন্তু এখন দিতেই হবে। অন্য উপায় নেই। যেতেই হল সাগরের কাছে।

গিয়ে দেখে সাগর মাথায় একজন, ঘাড়ে একজন, দুই প্রসারিত বাহুর উপর দুজনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাপ্তিকে দেখে সবাই নেমে পড়ল। সাগর বলল—"তাপ্তি দেবী যে, কি খবর? শুনেছিলাম রত্নাকর অসুস্থ। কেমন আছে সে?"

"সেইজন্যেই তো আসা। পেট ব্যথা হয়েছে ফল্গুর বাগানের কলা খেয়ে। জলধি কবিরাজ বলেছেন বায়ু প্রকুপিত। আর গুণী অম্বিধ বলেছেন কলায় কোনও দোষ নেই—বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। তাই ভাবছি জ্যোতিষী অম্বুধিকে দিয়ে ওর হাতটা দেখাই একবার। তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও ভাই। বিতস্তা কোথায়?"

"বিতস্তা রান্নাঘরে। রান্নাঘরের ভিতর গাছ-কোমর বেঁধে মহা ব্যস্ত সে এখন। মাথার চুল ঝুঁটি করে বেঁধেছে। চারদিকে তরকারী, মাছ মাংস। দুটো শিলে বাটনা বাটছে দুটি চাকর, তরকারী কুটতে কুটতে হিম্-সিম্ খেয়ে যাচ্ছে দুটো ঝি। তাদের মাঝখানে রাজলক্ষ্মীর মতো বসে আছে বিতস্তা। চল—"

"রান্না করছে, সেখানে এখন না-ই গেলাম—"

"রান্নাঘরই তো ওর বৈঠকখানা। তুমি এসে দেখা না করে' চলে গেছ শুনলে

তুলকালাম করবে। কচি বেতের ডগার তরকারি করছে আজ। তোমাকে হয়তো খেতে হবে–চল–"

খেতে হল তাপ্তিকে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এলাহি রান্নার আয়োজন। বিতস্তা গাওয়া ঘি-এ হরিণের মাংস ভাজছে মশলা দিয়ে। অপূর্ব গন্ধ বেরিয়েছে। তাপ্তিকে দেখেই সে তার মিষ্টি হাসিটি হাসল।

"ওমা, কি আমার ভাগ্যি। রত্নাকরের হৃদয় রত্ন গরীবের ঘরে। ওলো সাবি, তুই মাংসটা ভাজ একটু। আমি কথা কই তাপ্তির সঙ্গে–"

প্রকান্ড রান্নাঘর। তারই একপাশে একটা মোড়া পেতে দিলে সে তাপ্তির জন্য

"কি ব্যাপার কি, বল তো। হঠাৎ এ সময়ে এলে যে–"

"বলছি সব–"

সাগর বাইরে চলে গেল। তাপ্তি সব বললে বিতস্তাকে, বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ছলছল করতে লাগল বিতস্তার চোখও। বলল–"কাল অম্বুধিকে নিয়ে যাব আমরা।"

তাপ্তি শঙ্কিত হয়ে পড়ল মনে মনে। অম্বুধির সঙ্গে ইরাবতী কাবেরী তো যাবেই, তার সঙ্গে এ ও যদি যায় তাহলে তো ত্র্যহস্পর্শ হবে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য তাপ্তি বলল–"তুমি এত রাঁধছ, বাড়িতে খাবার লোক তো দু'জন।"

বিতস্তা বলল–"বিশজন। ওঁর আখড়ার সব চেলারা এখানে খায়।"

"ও তাই বুঝি! তোমার কর্তাও খুব খাইয়ে শুনেছি।"

"খাইয়ে মোটেই নয়। একটা জিনিসের বেশী খায় না কিছু। কোনদিন বা মাংস খেলে, কোনদিন বা পায়েস। আমার রাঁধবার বাতিক বলে নানা রকম রাঁধি। রুটি, পরোটা, ভাত, ডাল তরকারি রাঁধবার আলাদা লোক আছে। আমি সৌখীন রান্না রাঁধি। আজ কচি বেতের ডগার ডালনা করেছি। চেখে দেখবে একটু? নুনটা দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না। একটু চেখে দেখ।"

"বেতের ডগা শক্ত হবে না?"

"কাল থেকে মাখনে ডুবিয়ে রেখেছি। খুব নরম হয়েছে–।"

তাপ্তিকে খেতেই হল একটু। খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। কি চমৎকার স্বাদ। বেতের ডগা? মনে হল যেন ছানার টুকরো।

বিতস্তা বলল–"কাল তোমার কর্তার জন্যেও নিয়ে যাব কিছু রেঁধে। আমার রান্না খুব ভালোবাসেন তিনি–"

"এখন পেটে ব্যথা, এখন কিছু নিয়ে যেও না ভাই।"

"বাতাবী লেবুর মিষ্টি আচার বানিয়েছি আনারসের রস দিয়ে। খুব হজমি। ওতে কোনও অসুখ করবে না। অসুখ ভালোও হয়ে যেতে পারে।"

তাপ্তির মোটেই ভালো লাগছিল না এসব প্রস্তাব। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না। অম্বুধি গণককে ওরাই নিয়ে যাবে। ওদের চটানো যায় কি? বিতস্তা লোকও খারাপ

নয়। কিন্তু রত্নাকরের উপর সকলেরই একটু না একটু দুর্বলতা। সে যে কি করবে ভেবে পায় না।

॥ ৬ ॥

তার পরদিন সাগর অম্বুধির বাড়ি গিয়ে দেখে অম্বুধি গাঁজা খেয়ে ভম্ হয়ে বসে আছে মহেশ্বরের মন্দিরের ভিতর। সে কোথাও যেতে পারে না বলে উঠোনেই মহেশ্বরের একটি ছোট মন্দির করিয়েছে। সাগর গিয়ে দেখল তার ভিতর ঊর্ধ্ব নেত্র হয়ে বসে আছে অম্বুধি। তিন্তিড়ী আজকাল যে গাঁজা সরবরাহ করছে তা নাকি অত্যন্ত কড়া।

ইরাবতী আর কাবেরী ব্যস্ত ছিল গুড়ের নাগরি নিয়ে। ওরা আখ কিনে গুড় তৈরী করে চালান দেয়। আজ নৌকো যাবে বিদ্যানগরে। রত্নাকরেরই নৌকা। ওতে ওরা গুড় পাঠাবে। রত্নাকরের বিরাট ব্যবসা। রোজই কোথাও না কোথাও মাল পাঠানো হয়। আজ বিদ্যানগরে মাল যাচ্ছে। সেখানে গুড়ের বাজার ভালো।

সাগব গিয়ে বলল—"বত্নাকরের পেটে ব্যথা। কাল তাম্পিত্র এসেছিল। জলধি আর অব্ধি রোগ ধরতে পারছে না। তাম্পিতর ইচ্ছে অম্বুধিকে দিয়ে ওর হাতটা দেখাবে—।"

"কিন্তু দেখাবে কাকে দিয়ে। ও তো সকাল থেকে শিবনেত্র হয়ে বসে আছে। তাছাড়া ওকে নিয়ে গেলে আমাকেও যেতে হয়—।"

কবেবী সংগে সংগে বলল—"আমিও যাব।"

সাগর বলল—"তোমাদের যাওয়ার দরকার কি—"

"বাঃ, রত্নাকর অসুস্থ এ খবর পেয়ে কি না গিয়ে থাকতে পারি ?"

কাবেরী হেসে ছড়া কাটল—"সম্ভব নয় যা, বলছ কেন তা। তুমি এখন জামাইবাবুর ভাঙাও দেখি ধ্যান, ফেরাও দেখি জ্ঞান-"

সাগর বলল—"দু' কলসী ঠান্ডা জল মাথায় ঢেলে দিলেই জ্ঞান ফিরে আসবে। দাঁড়াও আমি ওকে মন্দির থেকে বার করি আগে—।"

অম্বুধি ছোট খাটো মানুষ। তাকে সাগর পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে এল মন্দিরের ভিতর থেকে। উঠোনের মাঝখানে একটা বড় পিঁড়ের উপর বসানো হল তাকে। ঘরে মাটির কলসিতে পুকুরের ঠান্ডা জল ছিল। সাগর সেই জল হুড় হুড় করে ঢালতে লাগল তার মাথায়। দু' কলসী ঢালবার পর জ্ঞান ফিরল অম্বুধির। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর বলল—"বাবা এ কি করছ মহেশ্বর। সব গরম যে ঠান্ডা হয়ে গেল—।"

সাগর তখন কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল—"মহেশ্বর নয়, আমি জল ঢালছি। রত্নাকরের কাছে যেতে হবে। তার পেট ব্যথা। তার হাত দেখে গুণে বলতে হবে কি হয়েছে ?"

গুম হয়ে রইল অম্বুধি। ইরাবতী একটা গামছা দিয়ে তার মাথা গা মুছিয়ে দিয়ে বলল—"ওঠ শুকনো কাপড় পর একটা।"

অম্বুধি শুকনো কাপড় পরে হঠাৎ বলে উঠল—"গুরুদেব মানা করেছেন, আমি আর হাত দেখব না কারো—"

"গুরুদেব ? তিনি হঠাৎ মানা করলেন কেন ?"

"গুরুদেব বললেন—কপালে যা আছে তা ঘটবেই। যাকে রোধ করা যাবে না তখন

আগে থাকতে তা জেনে কোনও লাভ নেই। লোকের মনে আশা বা হতাশা জাগিয়ে শুধু তাকে অকারণ অশান্ত করা হয়। যা ঘটবার তা ঘটবেই। তাছাড়া আমার মনে একটু সন্দেহ জেগেছে আজকাল। আমরা নবগ্রহ, বারোটা রাশি, আর সাতাশটা নক্ষত্র নিয়ে গণনা করি। আকাশে কিন্তু কোটি কোটি নক্ষত্র। তাদের কি কোনও প্রভাব নেই আমাদের উপর ? জ্যেষ্ঠা বা শ্রবণা যদি আমাদের প্রভাবিত করতে পারে, অগস্ত্য বা লুব্ধক কেন পারবে না ? সপ্তর্ষিমন্ডলের সাতটা বড় জ্যোতিষ্করা ছোট নয়। কেন তারা আমাদের ভাগ্য নির্দেশে সহায়ক হবে না। গুরুদেবকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন—ওসব আকাশ-কুসুম নিয়ে চিন্তা কোরো না। বাইরের আকাশ থেকে দৃষ্টিকে মনের আকাশের দিকে নিয়ে যাও। সেইখানেই সত্য নিহিত আছে। সেইটে উপলব্ধি কর। লোকের হাত দেখে বেড়ানো শুধু সময় নষ্ট।"

সাগর বলল—"তিনি যদি তোমাকে বলেন তাহলে তুমি দেখবে তো ? অন্য লোক হলে পীড়াপীড়ি করতাম না ; কিন্তু রত্নাকরের অসুখে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। তার মত লোক এ অঞ্চলে নেই। তাছাড়া তার সঙ্গে আমরা কোন না কোন বন্ধনে জড়িত। তোমার গুরু অর্ণবের আশ্রম তিনিই করিয়ে দিয়েছেন। সে আশ্রমের ব্যয়ভারও তিনি বহন করেন। সুতরাং তার হাত দেখব না একথা বলা উচিত নয়। তোমার গুড় তার নৌকাতেই বিদেশের হাটে যায়। চল তোমার গুরুদেব অর্ণবের কাছেই যাওয়া যাক—"

ইরাবতী বললেন—"তোমরা তা হলে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে এস। আমি আর কাবেরী নাগরিগুলোতে মা-লক্ষ্মীর সিঁদুর মাখিয়ে দিই। ওরে বহু, তুই তুলসী পাতা এনেছিস ? সবু কোথা ? তাকে সিঁদুর গোলাটা আনতে বল—"

সর্বরূপ আর বহুরূপ দুই ভাই। তাদের মা অম্বুধির বাড়িতে কাজ করত। সে মারা গেছে, তাব দুটি ছেলে এখন তার জায়গায় কাজ করে। তারা চাকরের কাজই করে, কিন্তু তারা চাকর নয়, বাড়ির পরিজন। গুড়ের ব্যবসার সব হাঙ্গামা তাদেরই উপর।

তাদের নিয়ে ইরাবতী আর কাবেরী গুড়ের নাগরী সাজাতে বসল। সাগর অম্বুধিকে কাঁধে করে চলে গেল অর্ণবের কাছে।

॥ ৭ ॥

অর্ণব খুব ফরসা, খুব লম্বা আর খুব রোগা। দাড়ি চুল গোঁফ কালো নয়, সোনালী। চোখের তারা নীল। হাঁটে মাথা উঁচু করে। বসে পিঠ সোজা করে। খুব স্বল্প-ভাষী। আশ্রমে তার শাসন খুব কড়া। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তার তিনজন শিষ্যাকে রোজ শাস্ত্রপাঠ করতে হয় এবং পড়া দিতে হয়। পড়া না পারলে খাওয়া বন্ধ। কবি পারাবারের স্ত্রী ব্রাহ্মণীও অর্ণবের ভক্ত একজন। অর্ণবের কঠোর দিকটা মুগ্ধ করেছে তাকে। অর্ণব রোজ যখন নদীর ধারে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে করজোড়ে তপস্যা করে তখন ব্রাহ্মণীর মনে হয়—অর্ণব নিজেই বুঝি সূর্য। ব্রাহ্মণীকে অর্ণব বলেছে—তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। প্রত্যহ সহস্রবার হরিনাম জপ কর। তারপর একে একে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, উপনিষদ এইগুলো পড়ে ফেল। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমার কাছে এসো বুঝিয়ে দেব। প্রয়োজন না হলে আমার কাছে আসবে না। আর এটা জেনে রাখো তোমার স্বামী পারাবারকে সুখী রাখাই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

এ শুনে ব্রাহ্মণীর ভক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী নাম অর্ণবই রেখেছিল। ওরা হঠাৎ একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হয়েছিল তার কাছে। এসে বলল—"আমাদের আশ্রয় দিন।"

"তোমরা কে?"

গঙ্গা বলল—"আমি পথিক।"

যমুনা বলল—"আমি পথ খুঁজছি।"

সরস্বতী বলল—"আমি পথ হারিয়েছি।"

উত্তর শুনে খুশি হয়েছিল অর্ণব। বলল—"আমি সন্ন্যাসী। আমার স্ত্রী আছে। আমি একাহারী, ফল খেয়ে থাকি। আমার স্ত্রী মাঠে কাজ করে। তোমাদের তিনজনকে আশ্রয় দেবার আর্থিক সামর্থ্য নেই আমার। তবে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে হয় তার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?"

"আধ্যাত্মিক উন্নতিই আমরা চাই।" গঙ্গা বলল।

যমুনা বলল—"কিন্তু মনোমত গুরু পাচ্ছি না। অনেক জায়গায় ঘুরেছি।"

সরস্বতী বলল—"নিষ্পাপ লোক দেখতে পাই নি। সবার চোখের দৃষ্টিতেই কাম আর কলুষ। আপনাকে দেখে আমাদের ভক্তি হয়েছে।"

"কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?"

"আপনার এই কুটিরের বাইরে শুয়ে থাকব রাত্রে। আর দিনে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মাঠে কাজ করব। মাঠ এখান থেকে কতদূর?"

"আমার চারপাশে যে মাঠ দেখছ এসবই আমার বন্ধু রত্নাকর আমাকে কিনে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী মন্দাকিনী জন-মজুর নিয়ে কাজ করে এই মাঠে। ওই যে সব ফসল দেখছো, সব আমাদের।"

গঙ্গা বলল— "তাহলে আমরাও এই মাঠে কাজ করব।"

"কিন্তু রাত্রে শোবে কোথায়?"

"ওই গাছটার তলায় পাশাপাশি তিনজন শুয়ে থাকব।"

"সেটা কি ভালো দেখায়? আচ্ছা আমি রত্নাকরকে বলছি সে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।"

রত্নাকর ওদের আশ্রয় করে দিয়েছিল। এই হল ত্রিবেণী আশ্রমের ইতিহাস। অর্ণব এদের তিনজনকেই মন্ত্র দিয়েছিল আর তিনজনকেই খুব কড়া শাসনে রাখত। ব্রাহ্মণীকে সে উপদেশ দিত। মন্ত্র দেয় নি। বলেছিল, তোমার স্বামীই তোমার গুরু, মন্ত্র যদি নিতে চাও তার কাছেই নাও। রত্নাকরও মন্ত্র নিতে চেয়েছিল তার কাছে। তাকেও মন্ত্র দেয় নি অর্ণব। বলেছিল—খোঁড়া লোকই ঘোড়া চড়ে, তুমি তো খোঁড়া নও। মন্ত্রের ঘোড়া নিয়ে কি করবে তুমি? তুমি পদস্থ স্বাধীন লোক। যেমন আছ থাকো। জ্যোতিষী অম্বুধি কিন্তু ছাড়ে নি। অর্ণবের অনন্য রূপ, অদম্য উৎসাহ, অটল সংযম দেখে অম্বুধির ধারণা হয়েছিল ইনি যদি আমাকে মন্ত্র দেন আমার হিল্লে হয়ে যায়। অর্ণবকে গিয়ে ধরল একদিন।

"আপনি মহাপুরুষ। আমি মূর্খ। সামান্য জ্যোতিষ শিখেছিলাম—"

অর্ণব বলল—"অসামান্য অসাধারণ জ্যোতিষী তুমি। আমার কাছে কি দরকার?"

"আমাকে শিষ্য করুন।"

"মহেশ্বরের মন্দিরে রোজ প্রার্থনা কর তো—"

"করি। কিন্তু কেমন যেন আবোল-তাবোল হয়ে যায়। আমার প্রার্থনার ভাষাটা আপনি ঠিক করে দিন। আমি কানে কম শুনি, ভালো করে হাঁটতে পারি না। আমার অনেক দুঃখ—হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল অম্বুধি। শেষকালে লুটিয়ে পড়ল অর্ণবের পায়ে। নিতান্ত বিব্রত হয়ে অর্ণব শেষকালে রাজি হলেন মন্ত্র দিতে। বলল—"তোমার প্রার্থনাটা আমি লিখে দেব। সেইটে মুখস্থ করে রোজ একাগ্র চিত্তে মহেশ্বরকে সেটা নিবেদন করবে। একাগ্রতাটাই আসল। তুমি মহেশ্বরের কাছে কি চাও —"

"কষ্ট থেকে মুক্তি—।"

"তাহলে সেইটেই সহজ ভাষায় বলো মহেশ্বরকে। তিনি কীটের ভাষাও বুঝতে পারেন। তোমার ভাষাও বুঝবেন।"

অম্বুধি কিন্তু অনড়। বলল, "আমায় মন্ত্র দিন।"

"মন্ত্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এদের কারো একটা নাম বারবার জপ কর। ওরা তিনই এক, একই তিন। ওদের প্রত্যেকেরই অনেক নাম আছে। তুমি যে কোনও একটা নাম জপ কর। আলাদা মন্ত্র নেবার দরকার কি—"

"আপনাকে কিন্তু আমি গুরুপদে বরণ করতে চাই। আমি চলতে পারি না, শুনতে পাই না। আপনি আমার সহায় হোন।"

"বেশ। কিন্তু আমাকে বিনা প্রয়োজনে এসে বিরক্ত করবে না।"

"করব না। যখন আমার মনে কোনও প্রশ্ন জাগবে তখন আসব খালি—"

"বেশ—"

অর্ণবের আর শিষ্য নেই। অর্ণব যখন এখানে এসেছিল সস্ত্রীকই এসেছিল। তার স্ত্রী মন্দাকিনী অপরূপ সুন্দরী। অর্ণবের কোথায় জন্ম, কোথায় সে তপস্যা করেছিল, কেউ তা জানে না। হঠাৎ সে মন্দাকিনীকে নিয়ে এসে বসেছিল ওই মাঠের মাঝখানে বিশাল শিরীষ গাছটার তলায়। গাঁয়ের একটি মেয়ে তাদের দেখে ভেবেছিল—বুঝি ওরা দেবতা। সে তার অন্ধ স্বামীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল নাকি তাদের কাছে। বলেছিল—দেবতা, আমার স্বামীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। অর্ণব তার চোখে হাত বুলিয়ে দিতেই ফিরে পেল সে দৃষ্টি। তারপর শত শত আর্ত আতুরের ভীড় লেগে গেল। অর্ণব আর মন্দাকিনী পালিয়ে গেল একটা বনের মধ্যে। রত্নাকর খবর পেয়ে খুঁজে বার করল তাদের। অর্ণব বলল—"আমি জনপদে যাব না। মানুষের রোগ সারানো আমার কাজ নয়। দৃষ্টিহীন ভগবানের দয়ায় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। ওতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই।" রত্নাকর বলল—"আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করব তাঁকে। তিনি যেন ঘোষণা করে দেন রোগ সারাবার জন্য কেউ যেন আপনার কাছে না আসে। রাজ-ঘোষণা হয়ে গেলে আপনি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবেন। কারণ এদেশে রাজ-ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রাণদন্ড হয়।"

মহেশ্বর অঞ্চলের রাজা ছিলেন পৃথ্বীপতি শংকর দাস। রত্নাকরকে খুব খাতির করতেন তিনি। তিনি ঘোষণা করলেন অর্ণবের কাছে ব্যাধি সারাবার দাবী বা প্রার্থনা নিয়ে যে যাবে তার প্রাণদন্ড হবে। তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। রত্নাকরের অনুরোধেই রাজা তাঁকে পঁচিশ বিঘে নিস্কর জমি দান করতে চাইলেন। অর্ণব বলল—কারো দান আমি নেব না। তখন রত্নাকর রাজ্যের মংগলের জন্য তাঁকে দিয়ে একটা যজ্ঞ করালেন এবং সেই পঁচিশ বিঘে জমি কিনে দক্ষিণাস্বরূপ দিলেন তাঁকে। এতে আপত্তি করে নি অর্ণব।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। অর্ণব আর মন্দাকিনীর সত্য ইতিহাস কেউ জানে না। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গুজব প্রচলিত আছে। তিন্তিড়ী একটা আশ্চর্য গল্প বলে। তার বিখ্যাত গাঁজার জন্য অনেক লোক গাঁজা কিনতে আসে সেখানে। লবঙ্গ দেশের একটি লোক তাকে নাকি বলেছিল যে মন্দাকিনী লোহিত দেশের রাজকন্যা। লোহিত রাজার একমাত্র সন্তানও সে। অপরূপ সুন্দরী এই রাজকন্যাই যে ভবিষ্যতে সিংহাসনে আরোহণ করবে এই কথাই সবাই জানত। কিন্তু নিয়তির বিধানে হয়ে গেল অন্যরকম। রাজকন্যার বয়স যখন বারো বছর তখন হঠাৎ একদিন সর্পাঘাতে মৃত্যু হল তাঁর। রাজপুরী শোকে সমাচ্ছন্ন হল। লোহিতরাজ গণপতি শোকে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন মন্ত্রী বললেন—"মহারাজ ম্লেচ্ছ দেশ থেকে একজন তপস্বী এসেছেন, তিনি বলেছেন, রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর একটি শর্ত আছে। তাঁকে ডাকব?" মহারাজ বললেন "ডাক ডাক এক্ষুণি ডাক।" অর্ণব এসে বললেন—"উনি রাজকন্যারূপে বাঁচবেন না, সন্ন্যাসিনীরূপে বাঁচবেন। রাজকন্যার আয়ু ফুরিয়েছে। উনি যে মুহূর্তে পুনর্জীবন লাভ করবেন সেই মুহূর্তে উনি যদি কোনও সন্ন্যাসীকে পতিত্বে বরণ করেন তাহলে দীর্ঘজীবন লাভ করবেন।" রাজা বললেন—"সন্ন্যাসী পাত্র আমি কোথা পাব? আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি ওকে বিয়ে করবেন?" অর্ণব উত্তর দিলেন—"করতে পারি। আমারও একজন জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন। কিন্তু ওঁকে বিয়ে করবা মাত্রই আমি ওঁকে নিয়ে এদেশ ত্যাগ ক'রে চলে যাব।"

রাজা বললেন—"মন্দাকিনী আমার উত্তরাধিকারিণী। আপনি ওকে বিয়ে করে এ রাজত্বের ভার নিন—"

"সন্ন্যাসী কখনও বিষয়ে লিপ্ত হয় না। যে মুহূর্তে আমি বিষয়ের বিষ পান করব, সেই মুহূর্তে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হবে এবং সেই মুহূর্তে আপনার কন্যা মন্দাকিনীও দেহ ত্যাগ করবে। কারণ ও তখন আর সন্ন্যাসিনী থাকবে না—"

রাজা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। শেষে যখন দেখলেন আর গত্যন্তর নেই তখন রাজি হলেন তিনি। অর্ণব স্পর্শ করবামাত্র বেঁচে উঠল মন্দাকিনী। সেইদিনই তাকে বিয়ে করে লোহিত রাজ্য ত্যাগ করল সে। লোকে বলে লোহিতরাজ নাকি একজন চর নিযুক্ত করেছেন ওদের অনুসরণ করবার জন্য। সে চর নাকি গোপনে মন্দাকিনীকে টাকাকড়ি দিয়ে আসে। মন্দাকিনী যদিও মাঠে জন মজুরের সঙ্গে কাজ করে, গেরুয়াও পরে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা নয়। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যেমন মন্দিরে মন্দিরে পূজো করে, গান করে, ভাগবত পাঠ করে, ব্রত উপবাস করে, রোজ নদীতে স্নান করে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে উপাসনা করে, মন্দাকিনী কিন্তু কিছু করে না। নির্বাক হয়ে সে মাঠে কাজ করে কেবল। কারো সঙ্গে মেশে না। ভ্রূকুটি ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে কাজ করে' যায় খালি। সে কাউকে ধরা ছোঁয়া দেয় না বলে' তাকে নিয়ে নানারকম গুজব রটায় লোকে। কিন্তু তার কাছে যেতে সাহস করে না কেউ। অর্ণবের প্রতি তার সত্য মনোভব কি তা কেউ জানে না। সে যে রোজ অর্ণবের পাদোদক পান করে এ-ও কারও জানা নেই। কারণ একটা বড় হাঁড়িতে জল ভরে অর্ণবকে তাতে পা ডোবাতে বলে সে মাঝে মাঝে। সেই জল খুব ভোরে সে খায় রোজ একটু করে'। এক হাঁড়ি জল চলে অনেকদিন। এটা তার পাগলামি না ভক্তির লক্ষণ তা ঠিক করে বলা শক্ত। অর্ণব তার কোনও কাজেই বাধা দেয় না। যখনই

সে জলের হাঁড়িতে পা ডোবাতে বলে তখনই হাসিমুখে ডান-পা-টা ডুবিয়ে দেয়। অর্ণব বোধহয় ভুলতে পারে না যে সে একদিন রাজকন্যা ছিল। তাই তার কোনও আচরণে বাধা দেয় না সে। লোহিত রাজ্যে মহাদেব নীললোহিত নামে পূজিত হন। মন্দাকিনীর বাবা গণপতির বাড়ির সামনে বিরাট মণিমাণিক্য খচিত নীললোহিতের মন্দির ছিল একটি। সে মন্দিরে মন্দাকিনী রোজ মহাদেবকে পূজো করত। অর্ণবের মাঝে মাঝে মনে হয় সেই নীললোহিতই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীকে তার কাছে পাঠিয়েছেন মন্দাকিনীর সেবা করবার জন্য। সত্যিই তারা মন্দাকিনীকে পরিচারিকার মতো সেবা করে। কুটোটি নাড়তে দেয় না তাকে। রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সব তারাই করে। জমির কাজও করে মন্দাকিনীর সঙ্গে। অর্ণবের মনে হয় নীললোহিতের ইচ্ছাতেই এসব হচ্ছে। মন্দাকিনী এখানেও মহেশ্বরের মন্দিরে রোজ যায়। গভীর রাত্রে যায়। এখানে সকলেই একা মহেশ্বরের মন্দিরে যায়। সে যে সময় মহেশ্বরকে প্রার্থনা করে, সে সময় তার কাছে কেউ থাকে না। সে যখন সময় পায় যায়। মহেশ্বর অঞ্চলে মহেশ্বরের অনেক মন্দির। অনেকে নিজের বাড়ির সামনে নিজের জন্যে মন্দির করিয়ে নিয়েছে। রত্নাকরের নিজের মন্দির আছে। অম্বুধির নিজের মন্দির আছে। আরও অনেকের আছে। শ্মশানের মাঝখানে যে মন্দিরটা আছে সেখানেই মন্দাকিনী যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রার্থনা করে, হে মহেশ্বর, হে নীললোহিত, তুমি রত্নাকরের মঙ্গল কর। রত্নাকর আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। রত্নাকর আমাদের জমি দিয়েছে, সেই জমিতে কাজ করে আমি নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, জমি কর্ষণ করে, তাতে বীজ বপন করে' আমি শত শত শস্যের শিশু অঙ্কুরকে লালন করি। আমার বন্ধ্যা হৃদয় এতে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করে। এসবই সম্ভব হয়েছে রত্নাকরের জন্য। হে বিশ্বেশ্বর, তুমি তার মঙ্গল কর। নিজের জন্য বা অর্ণবের জন্য কোনও প্রার্থনাই সে করে না। তার এ প্রার্থনার খবর আমরা তিন্তিড়ীর কাছে পেয়েছি। সে বিবরণ পরে দেব। মন্দাকিনীর এ প্রার্থনা থেকে যদি কারো মনে হয় মন্দাকিনী রত্নাকরের প্রেমে পড়েছিল, তাহলে আমি তাকে মনে করিয়ে দেব গভীর শ্রদ্ধা আর গভীর প্রেমে খুব তফাত নেই। শ্রদ্ধাই বোধহয় প্রেমের শুদ্ধতম রূপ।

আসল গল্প থেকে কিন্তু কথায় কথায় অনেক দূর সরে এসেছি। মল্লবীর সাগর সেদিন যখন জ্যোতিষী অম্বুধিকে নিয়ে অর্ণবের কাছে এসে হাজির হল তখন অর্ণব নদীর ধারে একপায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে তপস্যা করছিল। সাগরের সঙ্গে ছিল দশজন চাকর। প্রত্যেকের মাথায় এক নাগরী গুড়। ইরাবতী ত্রিবেণী সঙ্গম আশ্রমের জন্য গুড় পাঠিয়েছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ছুটে এল। তিন জনে তিনটে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল সাগরকে আর অম্বুধিকে। মন্দাকিনী কিছু নাড়ু বার করে' এনে খেতে দিল ওদের। বলল— "উনি এখুনি আসবেন। ওঁর খাওয়ার সময় হয়েছে—"

বলে সেও একটা পাখা নিয়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল ওদের।

একটু পরেই এসে পড়ল অর্ণব।

"কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে কেন?"

সাগর বলল—"রত্নাকর অসুস্থ। তাপ্তির ইচ্ছে অম্বুধি গণনা করে বলে দিক তার কি হয়েছে। ভালো হবে কি না। কিন্তু অম্বুধি বলছে আপনি তাকে না কি জ্যোতিষ চর্চা করতে মানা করেছেন। তাই আমরা আপনার অনুমতি নিতে এসেছি অম্বুধি রত্নাকরের হাত দেখবে কি না—" অর্ণব হেসে বলল—"জ্যোতিষ চর্চা করা পাপ নয়। সুতরাং করবে না

কেন? আমি ওকে মানা করেছিলাম কারণ ওতে সময় নষ্ট হয়। অনিবার্যকে নিবারণ করবার সাধ্য যখন কারো নেই তখন তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। যা হবার তা তো হবেই। রত্নাকরের বা তাপ্তির সেটা জানবার যখন কৌতূহল হয়েছে, আর তুমি সেটা যখন বলে' দিতে পারো, দাও। আমি আপত্তি করব কেন। রত্নাকর আমাদের সকলের প্রিয়, সকলের হিতৈষী। সে যখন চাইছে, তখন দাও না তার হাত দেখে। এর জন্য আমার অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। মনে রেখো, শিষ্য গুরুর ক্রীতদাস নয়। কোন গুরু শিষ্যের স্বাধীনতা হরণ করে না। ভগবানের প্রধান গুণ তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন। গুরুর কাজ সেই ভগবানের স্বরূপ শিষ্যের কাছে প্রকাশ করা। শিষ্যকে দাসমনোভাবাপন্ন করা নয়।"

অম্বুধি হাত জোড় করে বসে রইল। কোন উত্তর দিল না। অর্ণব আরও বলল—"আমি এই জন্যেই কারুকে শিষ্য করতে চাই না। শিষ্যরা প্রায়ই নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তাতে মহাক্ষতি—।"

অম্বুধি হাত জোড় করে' বসেই রইল। কোন উত্তর দিল না। অর্ণব কুটিরের ভিতর চলে গেল। সাগর তখন চেঁচিয়ে অম্বুধিকে বলল—"তোমার গুরু তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এবার চল রত্নাকরের বাড়ি যাই।"

॥ ৮ ॥

তাপ্তি সকালে ঘরের জানালা খুলেই চমকে উঠল। ফল্গু আসছে। তার পিছনে একটা চাকর। তার মাথায় প্রকান্ড একটা ঝুড়িতে বড় বড় আনারস। তাপ্তির মনে হোল ফল্গু যেন উল্মনা হয়ে উড়তে উড়তে আসছে। তার মাথায় ঘোমটা নেই। পেছনে বেণী দুলছে। বেণীর শেষ প্রান্তে দুলছে টকটকে লাল একটা ফুল। পরনের শাড়ির রং লাল আর সোনালীতে মেশানো। মনে হচ্ছে সন্ধ্যার একটুকরো মেঘ যেন জড়িয়ে আছে ওর সর্বাঙ্গে। তাপ্তির বুকটা কেঁপে উঠল। ও মেয়েকে তো কিছুই বলা যাবে না। এখনই এসে গলা জড়িয়ে ধরবে।

"কাকীমা কপাট খোল—"

কপাট খুলে দিতেই ফল্গু সত্যই গলা জড়িয়ে ধরল তার।

"কাকুর নাকি অসুখ করেছে। তুমি তো আমাকে খবর পাঠাও নি—কি হয়েছে কাকুর—"

"তোমার কলা খাওয়ার পর থেকে সেই যে পেট ব্যথা শুরু হল তা আজও সারে নি। জলধি, অব্ধি কেউ ধরতে পারছে না কি হয়েছে। সাগর আজ অম্বুধিকে নিয়ে আসবে। অম্বুধি বড় জ্যোতিষী, সে হয়ত কিছু বলতে পারবে—"

"কাকুকে আমি আনারসের রস খাওয়াব। তাহলেই ভালো হয়ে যাবেন উনি। আমি নিজে হাতে রস করে দেব। আমাকে বাটি আর খল নোড়া দাও—"

তাপ্তির অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। যে ফল্গুর কলা খেয়ে রত্নাকর পেটের ব্যথায় ভুগছে সেই ফল্গুই আবার তাকে আনারস খাওয়াতে এসেছে। কি সর্বনাশ। কিন্তু সে জানে ফল্গু কারো বারণ শুনবে না। তবু সে ক্ষীণকণ্ঠে বললে—"এখন আনারস খাওয়াবে? পেটের ব্যাথা সারে নি এখনও।"

"কাকু কি খাচ্ছেন এখন—"

"মৌরলা মাছের ঝোল আর পুরোনো চালের ভাত—"

"দুধ খান না?"

"দুধও খান।"

"কাকু তো ক্ষীর খেতেন রোজ–"

"দুধ একটু ঘন করে দি–"

"তাহলে আনারসের রস খেলে কিছু হবে না। এ শিংগাপুরের ভালো আনারস। হজমী–" আনারসের ঝুড়ি নিয়ে ভিতরে চলে গেল ফল্গু। তাপ্তি গেল পিছনে পিছনে। গিয়ে দেখল রত্নাকর বিছানায় বসে খাতা-পত্র দেখছেন।

"এ কি কাকু, শুনলাম তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। কোথায় ব্যথা–"

"পেটের কাছটায় একটু ব্যথা করে।"

"আনারসের রস করে দিচ্ছি খাও। সব সেরে যাবে–।"

"দাও–।"

তাপ্তি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফল্গু রস করবার জন্য চলে গেল ভিতরে।

একটু পরে একটি স্ফটিকের থালার উপর তিনটি স্ফটিকের বাটিতে আনারসের রস নিয়ে যখন ফল্গু এল তখন তাপ্তি বলে উঠল–"তিন বাটি রস খাওয়াবে?" উচ্ছ্বসিত কলহাস্যে হেসে উঠল ফল্গু।

"এক বাটি তোমার সামনে আমি খাব। আর এক বাটি তুমি, আর এক বাটি কাকু খাবে–। মরি তো তিনজনে এক সংগে মরব।" এর পরই ভিনটির গলা শোনা গেল।

"ফলি এখানে এসেছিস–"

"এসেছি। আমি কাকুর কাছে থাকব এখন, যাব না–"

সে হয়ত থেকেই যেত, কিন্তু এর পর অম্বুধিকে কাঁধে করে সাগর এসে পড়ল। সরবতটা খেয়ে সুট করে সরে পড়ল ফল্গু। ভীড় সে ভালোবাসে না।

অম্বুধি এসে যা বলল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না তাপ্তি।

সে বলল–"আমি রত্নাকরকে উলংগ করে তার সমস্ত শরীরটা পরীক্ষা করতে চাই। শুধু হাত দেখে সব কথা বলা যাবে না। আমি যে বিদ্যা জানি তার নাম দশাংগ বিদ্যা। রত্নাকর কি আমার সামনে উলংগ হয়ে দাঁড়াতে রাজি আছে?"

রত্নাকর বলল–"রাজি আছি। কিন্তু সেখানে আর কেউ থাকবে না–" তাপ্তি সন্তুষ্ট হল না এ প্রস্তাবে। কিন্তু রাজি হতে হল তাকে। অম্বুধি রত্নাকরের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবাইকে সে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল বন্ধ করে দিল রত্নাকর। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে খিল খুলল। অম্বুধি বলল–"এ পেটের ব্যাথার সংগে মনের যোগ আছে। রাজবৈদ্যের ওষুধ খেলে এবং রাজ দর্শন করলে ভালো হয়ে যাবে। মহেশ্বর অঞ্চলের রাজা পৃথ্বীপতি শঙ্কর দাস রত্নাকরের বন্ধু। তার রাজধানী হিরণ্ময়ী নদীর উপর। রত্নাকর নিজের ময়ূরপংখী করে সেখানে চলে যাক।" অম্বুধি জোর দিয়ে আবার বলল–"আমার বিশ্বাস এতে অসুখ সেরে যাবে।"

অম্বুধি চলে যাওয়ার পর তাপ্তি বলল–"আমি কিন্তু তোমার সংগে যাব।"

"সে কথা তো বলাই বাহুল্য।"

হেসে জবাব দিল রত্নাকর।

"ঠিক তো?"

"ঠিক। কিন্তু তুমি ময়ূরপংখীতে থাকবে। রাজার বাড়ি যাবে না।"
"বেশ। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তো?"
"আসব।"

॥ ৯ ॥

পরদিনই রত্নাকরের প্রধান সহচর পরিচয় পাহাড়ী রাজাকে খবর দেবার জন্য একটি পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নৌকা করে'। সেকালেও বিনা খবরে এবং বিনা অনুমতিতে রাজার কাছে যাওয়া যেত না। বন্ধুবান্ধবেরাও যেতে পারত না। চিঠি লেখারও একটা কেতা-দুরস্ত কায়দা ছিল। সেই কায়দা অনুসারেই রত্নাকর লিখল –

মহামহিম মহিমার্ণব
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা পৃথ্বীপতি
প্রবল প্রতাপেষু,
সাষ্টাংগ প্রণামান্তে নিবেদন,
পত্রলেখক আপনার দর্শন-প্রার্থী।
অনুমতি দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন। নিতান্ত প্রয়োজন।
শতকোটি প্রণাম।

সেবক
শ্রীরত্নাকর বণিক।

রাজার জন্য নানারকম উপঢৌকন নিয়ে প্রকাণ্ড একটা বজরা করে' যাচ্ছিল পরিচয় পাহাড়ী হিরণ্ময়ী নদীর উপর দিয়ে। হিরণ্ময়ী নদী মহেশ্বর অঞ্চলের শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চলে' গেছে রাজভবনের দিকে।

বজরার মাঝিরা গান গাইছিল, দাঁড় টানছিল, যদিও তখন রাত দুপুর। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার চারদিকে। অভিজ্ঞ নাবিক পরিচয় পাহাড়ী বসেছিল হাল ধরে'। হাওয়ায় ফুলে উঠেছিল চারখানা পাল। বজরা বেশ জোরেই চলছিল কিন্তু শ্মশানের কাছে এসে থেমে গেল হঠাৎ। পাল চুপসে গেল। মাঝিরা বলল, দাঁড় নড়ছে না, প্রত্যেকটি দাঁড় পাথরের মত ভারি হয়ে গেছে। পরিচয় পাহাড়ী বড় বড় নদী পার হয়েছে, সমুদ্র পার হয়েছে। নানারকম নৌকোয় নানা দেশ ঘুরেছে সে, তার চুল পেকে গেছে, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয় নি। সিঁড়ি বেয়ে বজরা থেকে নেমে পড়ল সে। নেমেই বুঝতে পারল শ্মশানের ধার দিয়ে যাচ্ছে তারা। শ্মশান নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ হাঁটার পর অনেক দূরে সে আলো দেখতে পেল। মনে হ'ল চিতা জ্বলছে বোধ হয়। কাছে গিয়ে দেখল চিতা নয়। চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে উলংগিনী ভোগবতী বসে আছে সর্বাংগে ছাই মেখে। পরিচয় বুঝল ভোগবতীই কিছু করেছে। অম্বি আর ভোগবতীকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে, সবাই ভয় করে। অসাধ্য সাধন করতে পারে তারা। সে হাত জোড় করে প্রণাম করল ভোগবতীকে।

"ঠাকরুণ আমাদের নৌকো কি আপনিই থামিয়ে দিয়েছেন?"
"তোমার নৌকো থেকেই কি অত শব্দ হচ্ছিল নাকি? গান গাইছিল কারা?"
"মাঝিরা–"
"ছপাৎ ছপ শব্দ হচ্ছিল কিসের?"

"দাঁড়ের…।"

"এখন কোনও শব্দ করা চলবে না। অব্ধি শবাসনে ধ্যান করছে। শব্দ করলে ধ্যান ভেঙ্গে যাবে। আর তাহলেই মহা মুশকিল –"

"কেন কি হয়েছে–"

"কাল রাত্রে প্রকান্ড একটা হাঁস এসে বসেছিল মন্দিরের উপর। ব্রহ্মার হাঁস। আজ দেখছি মহেশ্বর মন্দির থেকে অন্তর্ধান করেছেন। অব্ধি শবাসনে বসে' ধ্যানে জানতে চাইছে কেন এরকম হোল। এখন গোলমাল করা চলবে না।"

পরিচয় বলল—"আমি রত্নাকরের একটা জরুরি চিঠি নিয়ে মহারাজ পৃথ্বীপতির কাছে যাচ্ছি। আমার বজরাটাকে ছেড়ে দিন। আমরা নিঃশব্দে পার হয়ে যাব। শুধু পালের জোরেই পেরিয়ে যাব, আপনি হাওয়াটাকে একটু ছেড়ে দিন।"

পরিচয় পাহাড়ীর বয়স যদিও ষাট পেরিয়েছে, পাক ধরেছে চুলে তবুও এখনও সে শক্তিমান। উলঙ্গিনী ভোগবতীকে দেখে তার মনে একটু রিরংসার ভাব জাগল।

ভোগবতী হেসে বলল—"চোখ দুটো কানা করে' দেব এখুনি। শিগগির পালা। বোকা পাঁঠা কোথাকার –"

পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি। গোলমাল না করে' বিদেয় হ –"

হন হন করে চলে গেল পাহাড়ী। বজরায় উঠে দেখল হাওয়া বেশ জোরে উঠেছে। ফুলে উঠেছে পাল চারটে। নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলল তার বজরা রাজপুরীর দিকে।

চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ভোগবতীও তপস্যা করছিল। সে তপস্যা করছিল কবে কি করে সে পাতালে যাবে। আলোর স্বচ্ছতা আর ভালো লাগছে না তার। স্পষ্টতা বিরক্তিকর হয়ে উঠছে তার কাছে। অন্ধকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, অতল কালোর রহস্যের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যেতে চায় সে। কিন্তু অব্ধিকে যে ছেড়ে যেতে পারছে না। অব্ধি বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু নিষ্ঠুর বলেই মনোহর। তার প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় সে। কিন্তু সে প্রহারে কি যে আনন্দ তা বলে' বোঝানো যায় না। সে-ও যখন অব্ধিকে আঘাত করে অব্ধিও রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে পুলকে। সে অব্ধিকে যত আনন্দ দিতে পেরেছে তার সাতাশটা বউ তা দিতে পারে নি। তারা সব ছিল পানসে, জোলো, নিষ্প্রাণ মাংস পিন্ড সব। বাঘের সঙ্গিনী বাঘিনী, সর্পের সঙ্গিনী সর্পিনী হতে পারে নি। অব্ধি বাঘ, অব্ধি সাপ। ওরা সবাই বেমানান হয়ে ছিল, তাই একে একে পালিয়ে গেছে। ভোগবতীর মনও পালিয়ে গেছে পাতালের দিকে। কিন্তু অব্ধিকে ছেড়ে সে যাবে কেমন করে'। যখনই সে অবসর পায় তখনই তাই সে তপস্যা করে ভগবান, অব্ধির মোহ থেকে মুক্ত কর আমাকে। আমি পাতালের রহস্যে বিলীন হতে চাই। অব্ধির ক্ষমতার উৎস মহাকাল মহেশ্বর। কিন্তু ভোগবতী জানে ভোগবতীর সাহায্য ব্যতীত সে উৎসে অব্ধি পৌঁছতে পারবে না। ভোগবতী অব্ধিকে বহন করে' নিয়ে যায় সেখানে, কিন্তু কেমন করে নিয়ে যায়, তার চোখের দৃষ্টিতে, তার দেহের ভঙ্গিমায় তার আলিঙ্গনের মদিরায়—কোথায় সে রহস্য লুকিয়ে আছে তা ভোগবতীও জানে না। শুধু এইটুকু জানে অব্ধি যখন তপস্যা করে তখন তাকে কাছে বসে থাকতে হয়। ভোগবতীর সান্নিধ্য অব্ধির প্রয়োজন।

ভোগবতী বসে বসে তপস্যা করতে লাগল।–আমাকে অব্ধির মোহপাশ থেকে মুক্ত

কর। হে মহেশ্বর, আমাকে পাতালে নিয়ে চল। আলোর স্পষ্টতায় তোমাকে আমি পাই না, অন্ধকারের নিবিড়তায় তোমাকে আমি পাব। অন্ধকারের দেবতা তুমি, তোমাকে আলোয় পাওয়া যায় না।

হঠাৎ তার মাথার উপর পাখা মেলে বিরাট একটা শাদা পেঁচা উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে বলতে লাগল—আমি অন্ধকারের প্রাণী তাই বোধহয় জানি—অন্ধকার অস্পষ্ট নয়, অন্ধকারেও দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া না গেলে আমরা বাঁচতাম না। তুমি আলোর প্রাণী তুমি অন্ধকারে আসতে চাইছ কেন? তুমি বলছ আলো বড় বেশী স্বচ্ছ? আমার কাছে আলো তো স্বচ্ছ নয়। তোমাকে বারণ করছি ভোগবতী অন্ধকারের রাজত্বে তুমি এসো না। অন্ধকার রাজ্যে অন্ধকারের প্রাণীরা গিজ-গিজ করছে, বাইরের লোকের সেখানে স্থান নেই। তুমি এসো না।

চীৎকার করে উঠল ভোগবতী—"তুই দূর হ, দূর হ দূর হ"—ধুনীর একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

চলে গেল পেঁচাটা।

হঠাৎ অশ্বি এসে হাজির হল। বলল—"মহেশ্বর সুমেরু পর্বতে গেছেন। দেবতাদের আর দৈত্যদের সভা হচ্ছে। সেখানে সভা শেষ হয়ে গেছে। মহেশ্বর এখনই ফিরবেন।"

"কিসের সভা?"

"তা মহেশ্বর জানেন। আমার খুব খিদে পেয়েছে। কি খাই বল তো?"

"জানতাম তোমার খিদে পাবে। চাঁদুর ভাঁটিতে খবর দিয়েছি মাংস আর কারণ রাখতে। চল তাহলে সেখানেই যাই—"

হঠাৎ অশ্বি গালটা টিপে দিলে ভোগবতীর।

"মাংস, মাংস, মাংস—কেবল মাংসের লোভ –।"

অশ্বির বুকে একটা ঘুসি মেরে সরিয়ে দিলে তাকে ভোগবতী তারপর ছুটতে লাগল। অশ্বিও ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু।

শ্মশানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দু'জনে।

।। ১০ ।।

আকাশ মেঘ-মেদুর সেদিন। গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে একটা। তান্তির পরিচারিকা পদ্মা কাপড় পাট করছে। তার অন্তরও গুরুগুরু করছে। সে জানে, সে বুঝতে পারে রত্নাকর তাকে ভালোবাসে। রত্নাকর কিছু বলেনি, কিন্তু সে জানে, সে জানে, সে জানে।

আকাশের মেঘ কেটে গেল, বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। চারদিক ভিজে ভিজে। মেঘের ফাঁক থেকে সূর্য উঠছে সোনালি আলো ছড়িয়ে, সেই সোনা চকচক করছে সর্বত্র। জলে, স্থলে, গাছের পাতায়, ফুলের পাপড়িতে, আকাশের নীলে, মেঘের স্তূপে। জলধি কবিরাজের স্ত্রী নর্মদার মনেও। রত্নাকরের কথা ভাবছে সে। রত্নাকর যে দুল-জোড়া এনে দিয়েছিল তাকে, চকচক করছে সে দুটোও। সে চ্যবনপ্রাশ তৈরির আয়োজন করছিল। মনটা কিন্তু পড়েছিল রত্নাকরের কাছে। তার বিদ্বান স্বামীকে সে ভক্তি করে, তার সব

আদেশ পালন করে, কিন্তু রত্নাকরকে সে ভুলতে পারে না। ওর হাসিতে, চাহনিতে, ব্যবহারে কি যে একটা আছে যা আর কোথাও নেই। রত্নাকর মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যা বলেছে, তা শুনেছে নর্মদা। তার বদ্ধ ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আকাশের একটা টুকরো। নর্মদার মনে হচ্ছিল রত্নাকর তার বদ্ধ জীবনে ওই আকাশের টুকরোর মতো। অসীমের ইঙ্গিত বহন করে' আনে, উন্মনা করে দেয়, কিন্তু নাগালের বাইরে।

সূর্য অস্ত গেছে মেঘের স্বর্ণ-স্তূপের মাঝে। স্বর্ণস্তূপকে ঘিরে কমলা রঙের উৎসব হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অপরূপ একটা আলো। ত্রিবেণী সংগমের মন্দিরে পূজো করছিল ব্রাহ্মণী। পূজো সেরে বেরিয়ে এসেই সে এই আলো দেখে মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা তার একজনকে মনে পড়ল। গুরুদেব অর্ণবকে নয়, স্বামী পারাবারকে নয়, মনে পড়ল রত্নাকরকে। রত্নাকরের উপহার বস্ত্রটি পরেই সে রোজ পূজা করে। এখনও করছিল। এই অপরূপ আলোয় সে কাষায় বস্ত্রেও যেন একটা নূতন রং লাগল। ব্রাহ্মণী রূপসী। মনে হল আলোর-বসন-পরা এক অপ্সরী যেন আকাশের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে। সে তার স্বামী পারাবারকে ভালোবাসে। সে তার প্রেমিক। সে কবি। রোজই তাকে নিয়ে কবিতা লেখে। কাল লিখেছে—

তোমার মিষ্টি হাসির চমক
দীপক রাগের গানের গমক
তোমার চলার ভঙ্গীতে যে
খঞ্জনদের চলার চমক।

সে গুরুদেব অর্ণবকেও ভক্তি করে। অর্ণব সত্যিই ভক্তি ভাজন।

কিন্তু তবু অপরূপ আলোয় তার মনে পড়ল রত্নাকরকে। রত্নাকর গুরু নয়, রত্নাকর কবি নয়, রত্নাকর এই আলোর আভা।

থমথম করছে অন্ধকার রাত্রি। জ্যোতিষী অম্বুধি বসে আছে উঠোনে আকাশের দিকে চেয়ে। চেষ্টা করছে পুষ্যা নক্ষত্রটাকে দেখতে। পুষ্যা নক্ষত্র বড় অস্পষ্ট। একটা ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কি যেন একটা রহস্য আছে ওর মধ্যে। রোহিনী বা আর্দ্রার মতো স্পষ্ট নয়। পুষ্যা তার জন্ম নক্ষত্র। কোষ্টি থেকে মনে হয় তার অপঘাতে মৃত্যু হবে। সেই মৃত্যুটাকে সে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করে ওই রহস্যময় কুণ্ডলীর মধ্যে।

ইরাবতী ঘরে একা বিছানায় শুয়ে কাঁদছে। রোজই সে একা শোয়। অম্বুধি তার কাছে শোয় না। অম্বুধি অসমর্থ। কিন্তু এই অসমর্থ স্বামীকে ইরাবতী ছেড়ে যায় নি। দেহে সে অসমর্থ, কিন্তু কি বিরাট তার প্রতিভা। অথচ একেবারে শিশুর মত। ইরাবতী তাকে খাইয়ে দেয়, নাইয়ে দেয়। ইরাবতী অম্বুধির মা। সন্তানকে ছেড়ে সে যাবে কি করে? অম্বুধি তার প্রাণ। কিন্তু মানুষের মনের ক্ষুধা এক রকম নয়। নারী মা হতে চায়। প্রিয়াও হতে চায়। যে ইরাবতী প্রিয়া হতে চায় সে কিন্তু আজও একাকিনী। শুধু একাকিনী নয়, মনে মনে সে গভীর অন্ধকারে চির-অভিসারিকা। অন্ধকারে সে মনে মনে হাঁটছে, কেবল হাঁটছে। পার হচ্ছে প্রান্তর মরু নদী পর্বত। কিন্তু সে জানে তার প্রেমাস্পদকে সে কোনদিন পাবে না। রত্নাকর লুব্ধক নক্ষত্র। প্রোজ্জ্বল, প্রদীপ্ত—কিন্তু বহু দূরের।

তাপ্তিও তাকে পায় নি। ইরাবতী জানে সে-ও তাকে পাবে না। কিন্তু সে তার দিকেই চলেছে। মনে মনে। অন্ধকার রাত্রে একা ঘরে এসে সে যখন শোয় তখন সে অসম্ভবকেই প্রত্যাশা করে। কিন্তু অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না। রত্নাকর কোনও দিন আসে না। ইরাবতী কিন্তু লুব্ধকের উদ্দেশ্যে হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে, ক্রমাগত হেঁটে চলেছে...।

পাশের ঘরে শুয়ে তার বিধবা ভগ্নী কাবেরী কিন্তু ভাবছিল অন্যরকম। তার ধারণা তাপ্তি রত্নাকরকে আগলে আগলে রেখেছে বলে' সে রত্নাকরের নাগাল পাচ্ছে না। একবার নাগাল পেলেই–ব্যস। পুরুষ জাতকে সে চেনে। পুরুষদের সম্বন্ধে একটা ছড়াও বানিয়েছে সে–

বাইরে সবাই হোমরা চোমরা
হোঁৎকা পুরুষ জাত
মেয়েদের নয়ন বাণে
সক্কলে হয় কাৎ।

রত্নাকর একবার বলেছিল সে যখন নৌবহর নিয়ে বাণিজ্যে বেরুবে তখন আমাদের নিয়ে যাবে। তখন কত বন্দরে ওঠা-নামা হবে, তাপ্তি কি তখন সব সময় আগলে রাখতে পারবে তাকে? পারবে না। সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে কাবেরী।

রত্নাকরের অসুখটা ভালো হলেই সে বাণিজ্য করতে বেরুবে। তখন...আর ভাবতে পারে না সে।

অন্ধকার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। পূর্বদিকে দেখা দিয়েছে ঊষার আভাস। ফিঙে পাখী অনেক আগেই ঘোষণা করেছে রাত পোহালো। দু-একটা কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। মন্দাকিনী তার স্বামীর পাদোদক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্নান করবে নদীতে গিয়ে। একাই গিয়ে সে স্নান করে রোজ। হিরণ্ময়ী নদীতে গলা ডুবিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। মনে পড়ে পূর্ব জীবনের কথা। সে যে একদিন রাজকন্যা ছিল তা সে ভুলতে পারে নি এখনও। ভোরের আধো-অন্ধকারে হিরণ্ময়ী নদীতে গলা ডুবিয়ে সে দেখে পূর্ব জীবনের অনেক স্মৃতি, অনেক স্বপ্ন। মনে পড়ে তার বাবার কথা, সহচরীদের কথা, তার বাগানটিকে। কত ফুল ছিল সেখানে। হিরণ্ময়ীর তরঙ্গমালা তার কানে কানে যেন বলে তুমি রাজকন্যা, তুমি সন্ন্যাসিনী নও। মন্দাকিনীর মনে হয় হিরণ্ময়ী বলছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী বলে না, বলে তার মনেরই একটা অংশ। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অংশ প্রতিবাদ করে–আমি হয়তো সত্যি সন্ন্যাসিনী হতে পারি নি। কিন্তু আর আমি রাজকন্যা নই। রাজকন্যার মৃত্যু হয়েছে সর্পাঘাতে। অর্ণব আমাকে বাঁচিয়েছে। অর্ণব আমার প্রাণদাতা, আমি অর্ণবের কাছে কৃতজ্ঞ। হিরণ্ময়ীর তরঙ্গ-মালা প্রত্যুত্তর দেয়–তা জানি। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসিনী নও। অর্ণবের সহধর্মিণীও নও। সে তোমাকে মন্ত্র দেয় নি, তুমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে' তপস্যা কর না। অর্ণবের পত্নীও নও, কারণ অর্ণব ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী। সে তোমার ঘরে শোয় না, রাত্রেও সে তপস্যায় মগ্ন থাকে একা দ্বীপের উপরে। অর্ণব জানে তুমি তপস্যা করতে পারবে না, তাই সে তোমাকে নিজের খুশী মতো চলতে দিয়েছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী–হিমালয়ের তিন কন্যা–অর্ণবের অনুরোধে মহাদেবের আদেশে এসেছে এখানে তোমার সেবা করবার জন্যে তা কি বুঝতে পার না? ওরা কি সাধারণ চাকরানীর মত?

ওরা যে সুরে কীর্তন গায় সে সুর কি মানবীর কণ্ঠে সম্ভব ? ওরা তোমার সংগে যখন মাঠে কাজ করে তখন লক্ষ করেছ কি কত তাড়াতাড়ি কত নিপুণভাবে কাজ করে ওরা ? ওরা যদি সাধারণ জন-মজুর হত তাহলে এমন পারত কি ? মাঠের প্রসংগ উঠলেই রত্নাকরকে মনে পড়ে। সে যদি অতখানি জমি না দিত কি করত মন্দাকিনী ? রত্নাকরের কাছেও মন্দাকিনী কৃতজ্ঞ। রত্নাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর অর্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা—এই দুই কৃতজ্ঞতার কি কোনও তফাত নেই ? আছে। কিন্তু মন্দাকিনী সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট করে বিশদ করতে চায় না। তফাত রঙের। অর্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতার রং ধপধপে সাদা, আর রত্নাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতাটা গোলাপী রঙের। কিন্তু সেটা মন্দাকিনী নিজে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। স্নান করে' সে যখন মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে তখন বার বার বলে—আমি কিছু চাই না। আমি কিছু চাই না, আমি তাকে স্পর্শও করতে চাই না, তাকে দেখতেও চাই না, তুমি শুধু তার মংগল কর, তার যেন কোনও বিপদ না হয়। প্রার্থনার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সে ঢেকে দিতে চায় ওই গোলাপী রং-টাকে। সেটা ঢাকা পড়ে, কিন্তু লুপ্ত হয় না।

গংগা-যমুনা-সরস্বতী—অপরূপা কন্যা তিন জন। তারা প্রায়ই রত্নাকরকে কীর্তন শোনাতে যায়। রত্নাকরকে ঘিরে তাদের মন যেন ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তারা ঝর্ণার মতোই নির্বিকারও। তারা তিনজনই যেন এক প্রকৃতির। কোথাও আটকে পড়ে না, কাউকে আঁকড়ে ধরে না। তারা জলের মতোই তরল, কিন্তু তারা ডোবার জল নয়। রত্নাকর তাদের খুব প্রিয়। কিন্তু রত্নাকরের অভাবে তাদের জীবন শূন্য হয় না, ব্যর্থ হয় না, থেমে যায় না। তারা সদা-প্রবাহিনী। তারা যখন রত্নাকরের কাছে যায় তখন তাপ্তির মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসে। সে মুখে যদিও ভদ্রতা করে কিন্তু তার মনে মনে অস্বস্তি। তার বাইরে ভদ্রতা আর ভিতরে অস্বস্তির কথা টের পায় তারা। টের পেয়ে কৌতুক বোধ করে। রত্নাকরকে সে একা ভোগ করবে ? যা সুন্দর তাকে কি একা ভোগ করতে পারে কেউ ? আকাশ কি কারো একার সম্পত্তি হতে পারে ? গংগা যখন শিবের জটাজালে ছিল তখন কি উমা আপত্তি করেছিল ? যমুনা যে যমুনোত্রীর আশ্চর্য প্রকাশ সে যমুনোত্রী কি যমুনার একার ? সে তো হিমালয়ের অংশ। কত মেঘ, কত তুষার, কত আলো, কত বর্ণ অলংকৃত করেছে তাকে। যমুনা জানে যমুনোত্রী তার একার নয়, সকলের। ব্রহ্মার মানসী সরস্বতীও যে ব্রহ্মা তার একার নয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দিকে কোটি কোটি লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বহুবর্ণ আলোর মতো অহরহ পড়ছে। তাকে ঘিরেও কত ঋষির, কত গুণীর, কত কবির স্তব গুঞ্জিত হচ্ছে অহরহ। সে-ও কারো একার নয়।

কৌতূহলী মন্দাকিনী বার বার তাদের প্রশ্ন করে—তোমরা কে ? তারা তাকে বলে আমরা হিমালয়ের কন্যা। এর বেশী আর কিছু বলে নি। মন্দাকিনীর মনে সত্যটা ধরা পড়েছে কিন্তু। সে বুঝতে পেরেছে তার জন্যই অর্ণব আনিয়েছে এদের। অর্ণবের অনুরোধেই মহেশ্বর এদের পাঠিয়েছেন। কেন মহেশ্বরকে অনুরোধ করেছে অর্ণব ? কেন সে তাকে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রসাধন করতে দেয় নি ? কেন সে তাকে অনুকম্পা করছে ? এসব প্রশ্নের উত্তর সে পায় নি। অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় নি। গংগা যমুনা সরস্বতী কিন্তু মন্দাকিনীর মনের সব খবর জানে। এমন কি সেই গোলাপী রং-এর খবরটাও জানে। জানবেই তো। তারা যে দেবকন্যা। তারা সব জানে। কিন্তু কিছু বলে না।

দিগন্ত রেখায় কিছু মেঘ অনেকক্ষণ থেকেই ছিল। স্বপ্ন দেখছিল তারা। ক্রমশ

তাদের স্বপ্ন যেন রূপায়িত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে কে যেন লাল আবীর বর্ষণ করতে লাগল তাদের উপর। রক্তিম হয়ে গেল মেঘমালা। কালো, সাদা, পাঁশুটে সকলেরই সর্বাঙ্গে ফুটল এক অপরূপ রক্তিম জ্যোতি। মনে হল কে যেন আসছে, তারই নীরব জয়ধ্বনি উঠেছে মেঘে-মেঘে। তারপর অলক্ষ থেকে রাশি রাশি স্বর্ণরেণু যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রক্তিমার উপর। শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ল না, সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে গেল, পরিণত হল রক্তাভ স্বর্ণ-সমুদ্রে। তারপর সেই সমুদ্রে জাগল কত রঙের, কত আকারের দ্বীপ। বর্ণময় একটা মহাদেশ যেন, স্বপ্নের দেশ। তারপর সহসা সমস্তটা ফেটে গেল। সূর্যোদয় হল। জবাকুসুমসঙ্কাশ ধ্বন্তারি সূর্যদেব আলোর প্রপাতে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সব।

বিতস্তা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। রোজই দেখে। রোজই ভিন্ন ছবি দেখে। কিন্তু রোজই দেখে সূর্য উঠছে। মনে পড়ে আর একজনের কথা। এই দেখার মধ্য দিয়েই রোজ সে অর্ঘ্য পাঠায় তাকে। সে তার স্বামী সাগর নয়, তার স্বামীর বন্ধু রত্নাকর। রত্নাকর প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন নয়, রত্নাকর প্রভাতের উদীয়মান তপন, বর্ণবিভূষিত স্বর্ণকমল। সে দিগন্তের ওপারে থাকে। সে বহুদূরের। সাগর কাছের। সাগর বলবান। রত্নাকর রূপবান। সাগরের শক্তিতে সে বিস্মিত হয়, কিন্তু মুগ্ধ হয় রত্নাকরের রূপ দেখে। সাগরের উত্তুঙ্গ শক্তি শিখরের উপর দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে রত্নাকরের দিকে। সাগর এ কথা জানে। রাগ করে না, কারণ সে-ও মুগ্ধ। রত্নাকরের অনিবার্য আকর্ষণ সে স্বীকার করে। তাই সে রাগ করে না। সে শক্তির আধার, শক্তির উপাসক, তাই তার ঈর্ষা নেই। যারা ক্ষুদ্র, যারা দুর্বল, যারা নীচ তারাই ঈর্ষা-ক্লিষ্ট হয়। শক্তিমান সাগর শক্তির মহিমায় মহিমান্বিত। শক্তির তুঙ্গলোকে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ। ঈর্ষা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বিতস্তা সাগরের বৃহত্তকে আজও আয়ত্ত করতে পারে নি। পর্বতারোহীর মতো সে কেবল উঠেই চলেছে। সমস্ত পর্বতটা সে দেখতে পায়নি এখনও।

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা চতুর্দিকে। রত্নাকরের বাড়ির পাশে প্রকাণ্ড যে শিরীষ গাছটা আছে তারই উপর উঠে বসে আছে ফল্গু। সেখান থেকে রত্নাকরের শোবার ঘরটা দেখা যায়। সেখান থেকে সে দেখছে রত্নাকর শুয়ে আছে। আর তাপ্তি হাওয়া করছে তাকে। সে বুঝতে পেরেছে তাপ্তি তাকে সহ্য করতে পারে না। তাই সে আজকাল আর যায় না রত্নাকরের কাছে। কিন্তু সে তাকে না দেখে থাকতে পারে না। সে যে তার কাকাবাবু। শুধু কাকাবাবু নয়, সে তার জীবনে একমাত্র পুরুষ। সে অনেক পুরুষ দেখেছে কিন্তু এমন নির্মল, নিষ্কলুষ সুন্দর পুরুষ আর দেখে নি। তার মনে হয় একটা স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। তাপ্তি তার যাওয়াটা পছন্দ করে না, কিন্তু দেখাটা বন্ধ করতে পারে নি। শিরীষ গাছের ডালপালার আড়ালে বসে ফল্গু গুনগুন করে গান গাইছে, আর দেখছে, কেবল দেখছে। তার সমস্ত সত্তা যেন তার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে গিয়ে স্পর্শ করছে রত্নাকরকে। আর সেই স্পর্শের আনন্দ ভাষা পাচ্ছে তার গানে।

"ফলি তুই কোথা—"

ভিনটির আকুল কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

চুপটি করে বসে আছে ফল্গু। বসে আছে স্বপ্নলোকে, যেখানে ভিণ্টিরা পৌঁছতে পারে না।

তাপ্তি ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে বসে আছে। সে ঠিক করেছে আর কোনও মেয়েকে রত্নাকরের কাছে যেতে দেবে না। রত্নাকর শুয়ে আছে পাশের ঘরে। তাপ্তির ঘর না পেরিয়ে রত্নাকরের ঘরে যাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। রত্নাকর ঘুমুচ্ছে। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ঘুমন্ত রত্নাকরের মুখে একটা প্রসন্ন মৃদু হাসি। মনে হচ্ছে না তার কোনও অসুখ করেছে।

পাশের ঘরে তাপ্তি পাহারা দিচ্ছে খিল দিয়ে। কাউকে ঢুকতে দেবে না সে। বেশী ভয় পদ্মাকে। কপাট খোলা পেলেই কোন না কোন ছুতোয় ঢুকবে এসে।

বিকেলের লাল আলোয় তারও ঘরটা ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে এটা আলো নয়, যেন আরো কিছু। এমন আলো তো আর কোনও দিন দেখে নি সে। মনে হল কার অন্তরের কামনা যেন রূপ ধরেছে।

হঠাৎ ভোগবতী এসে দাঁড়াল। উলঙ্গিনী। চমকে উঠল তাপ্তি।

"ঘরে খিল লাগিয়েও আমাকে আটকাতে পার নি। আমি এসে গেছি–।"

তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল সে। তার স্তন যুগল, তার মাংসল নিতম্ব, তার সমস্ত যৌবন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"কি করে এলে তুমি"–সভয়ে চীৎকার করে' উঠল তাপ্তি।

"কি করে তা তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমি এসেছি তোমার রত্নাকরকে গ্রাস করব বলে' সন্দেশের মত টপ করে মুখে ফেলে দেব বলে'।"

"দোহাই তোমার, ও-ঘরে যেও না। ও-ঘরে যেও না–ও ঘুমুচ্ছে–" দুটো ঘরের মাঝখানে যে কপাট ছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তাপ্তি দু-হাত বিস্তার করে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তার দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভোগবতী। তারপর সেও হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলল–"তাপ্তি তোর দুঃখ আমি বুঝেছি। তুই কিন্তু আমার দুঃখ বুঝলি না। আমি তোকে বলতে এসেছিলাম ঘরে খিল এঁটে তুই রত্নাকরকে রক্ষে করতে পারবি না। রত্নাকর নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে। আমি তোকে ভয় দেখাতে এসেছিলাম। আমার খুব লোভ আছে ওর প্রতি। কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি না। আমি ভালোবাসি অন্ধকারকে। রত্নাকর আলো। ওকে পাবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি পাতালে যাব।"

সহসা অন্তর্ধান করল সে।

॥ ১১ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তিন্তিড়ীর বিখ্যাত গাঁজার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রহরের শেষে শেয়ালরা যখন ডেকে ওঠে তখন তিন্তিড়ী এক ছিলিম গাঁজা খেয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়। গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসে সে। মহাভক্ত লোক তিন্তিড়ী কুম্ভকার। তার পূর্বপুরুষরা সকলেই কুম্ভকার ছিলেন। তিন্তিড়ী কিন্তু একজন শৈব সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়ে শিব-ভক্ত হয়েছে। গুরুর পরামর্শেই তিন্তিড়ী

কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে গাঁজার আর সিদ্ধির দোকান করেছে। গুরুর কৃপায় ব্যবসা ভালোই চলছে। রত্নাকর তার ব্যবসাতে খুব সাহায্য করে। যেখানে ভালো গাঁজা, ভালো সিদ্ধি পায় কিনে নিয়ে আসে তার জন্যে। একবার কোন এক দ্বীপ থেকে শিবের জটার মত যে গাঁজা এনেছিল তা অপূর্ব। সেই গাঁজা এনে এখানেও চাষ করছে সে।

সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর যখন সে ধ্যানে মগ্ন, তখন তার দুয়ারে টোকা পড়তে লাগল। সবাই জানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তার দোকান খোলা থাকে না,—তবু টোকা দিচ্ছে কে? বিরক্ত হল মনে মনে, তবু উঠে কপাট খুলে দিলে সে। দিয়ে চমকে উঠল। যিনি দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর গা দিয়ে আলোর আভা বেরোচ্ছে—মাথার পিছনে একটা জ্যোর্তিমন্ডল। এক হাতে প্রকান্ড কমন্ডলু। অন্য হাতে ত্রিশূল। তাকে তিন্তিড়ী স্বয়ং মহেশ্বর বলেই মনে করত, কিন্তু তাব কুচকুচে কালো রং আর চাপ চাপ দাড়ি গোঁফ দেখে ভড়কে গেল সে। মহেশ্বরের চেহারা তো এরকম হতে পারে না। তবু তিন্তিড়ী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

লোকটি তখন বলল—"আমার গাঁজার কলকেটি পড়ে গেছে। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়াতে পারবে আমাকে? আপনার সমস্ত পরিচয় আমি জানি, আপনি শুধু গঞ্জিকা বণিক নন, আপনি মস্ত একজন শিবভক্ত, সে কথা আমি জানি। রোজই আপনাকে আমি দেখি। এতদিন আত্মপ্রকাশ করবার প্রয়োজন হয় নি। আজ হয়েছে। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়ান আমাকে—।"

তিন্তিড়ী অবাক হয়ে গেল একটু। ইনি রোজ দেখেন আমাকে? আশ্চর্য। সে কিছু না বলে গাঁজা সাজতে বসল।

"আপনি ভিতরে এসে বসুন।"

লোকটি ভিতরে এসে একটি আসনে উপবেশন করলেন।

গাঁজার ছিলিমটি তার হাতে দিয়ে তিন্তিড়ী বলল—"আপনার পরিচয় কি?"

"পরিচয়? পরিচয় জেনে কি করবে? ভয় পাবে।"

"আমার কোন ভয় নেই।"

"ভয় নেই? কেন?"

"আমি কোনও পাপ করি নি।"

লোকটি গাঁজায় একটা টান দিয়ে ভম্ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

ধোঁয়া ছেড়ে প্রসন্ন মুখে চেয়ে রইল লোকটি তিন্তিড়ীর দিকে।

"না, তোমার গাঁজায় কোন ভেজাল নেই। তুমি পাপী নও।"

"আপনার পরিচয়টা দিন।"

"আমি ভৃঙ্গী।"

ভৃঙ্গী? মহেশ্বরের প্রধান অনুচর? সাষ্টাঙ্গে আবার প্রণাম করল তিন্তিড়ী।

"আমি ধন্য। আমার কুটির আজ ধন্য। আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"আমি রোজ আসি।"

"কেন?"

"আপনারা যখন মহেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যান, আমি তখন সে মন্দিরে অদৃশ্য ভাবে থাকি। আপনারা কে কি প্রার্থনা করেন তা শুনি। তারপর লিপিবদ্ধ করে রাখি এই

কমণ্ডলুর মধ্যে। তারপর মহাদেবকে সেগুলি শোনাই–।"

"মহাদেব নিজে শোনেন না?"

"তিনি সর্বদাই সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তখন তিনি কিছু শোনেন না। সমাধি ভঙ্গ হলে কৈলাসে চলে' যান তিনি। তখন আমি তাঁকে আপনাদের প্রার্থনা শোনাই–"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ, আমার কাজই তো আপনাদের প্রার্থনা তাঁর কানে পৌঁছে দেওয়া।"

"আশ্চর্য! এ তো কল্পনা করি নি কখনও।"

ভৃঙ্গী হাসি মুখে চুপ করে রইলেন।

"আমাদের প্রার্থনার কোনও বৈশিষ্ট্য দেখেছেন কি?"

"প্রচুর। অধিকাংশ লোকের প্রার্থনা দু'দিন এক রকম হয় না। আজ বলছে আমার অসুখ সারিয়ে দাও, কাল বলছে আমার জমিতে যেন বেশী ধান হয়, তার পরদিন বলছে, রাজদ্বারে একটা মকোর্দমায় পড়েছি আমাকে জিতিয়ে দাও। তবে এ অঞ্চলের সাতজন লোক একই প্রার্থনা রোজ করে না।"

"কে তাঁরা?"

"তা এখন বলব না। আচ্ছা উঠি এখন।"

ভৃঙ্গী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিন্তিড়ী সবিস্ময়ে দেখল তার মাটির কলকেটা সোনার হয়ে গেছে।

।। ১২ ।।

পরিচয় পাহাড়ী মহাবাজ পৃথ্বীপতির উত্তর নিয়ে ফিরে এসেছে। পৃথ্বীপতি সুগন্ধী ভূর্জপত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন।

বিবিধগুণ-মণ্ডিত বন্ধু শ্রীযুক্ত রত্নাকর বণিক মহাশয়,

আপনি আগামী পূর্ণিমায় আমার এখানে আসুন। আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

শুভাকাঙ্খী
পৃথ্বীপতি

চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হল রত্নাকর। পরিচয় পাহাড়ীকে বজরা সাজাতে বলল।

"তোমার মা-ও আমার সঙ্গে যাবেন। ময়ূরপংখীতে তাঁর থাকবার জন্যেও যেন সব ব্যবস্থা থাকে।"

তাপ্তিকে বলল–"তোমায় কিন্তু ময়ূরপংখীতে থাকতে হবে। রাজা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তোমাকে করেন নি।"

"তুমি রাজার কাছে কতক্ষণ থাকবে? আমি বেশীক্ষণ তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না কিন্তু।"

"কতক্ষণ থাকতে হবে তা তো জানি না। রাজবৈদ্য আমাকে দেখবেন। কতক্ষণ লাগবে কি করে বলব। তবে ইচ্ছে করে দেরি করব না। কাজ শেষ হলেই চলে' আসব।"

পূর্ণিমার দিন সকালে রত্নাকরের সুসজ্জিত ময়ূরপংখী ভিড়ল রাজভবনের ঘাটে। দেখা গেল—ঘাট থেকে রাজভবন পর্যন্ত বিরাট একটা মখমলের গালিচা পাতা রয়েছে। গালিচার দুপাশে মঙ্গলঘট মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত যুবতীরা। স্বয়ং মন্ত্রীমশাই এসেছেন রত্নাকরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। রত্নাকর অবতরণ করবামাত্র তূর্যধ্বনি হল রাজপ্রাসাদ থেকে, অনেক শাঁখ বেজে উঠল।

মন্ত্রীমশাই বজরায় উঠে অভিবাদন করে বললেন—"আপনার জন্য পালকি এনেছি—।"

ঘাটের কাছে একটি অলংকৃত পালকি অপেক্ষা করছিল।

রত্নাকর তাপ্তির ঘরে ঢুকে বললেন—"আমি ঘুরে আসছি তাহলে—।"

মন্ত্রীমশাই প্রশ্ন করলেন—"আর কেউ আছেন না কি আপনার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এসেছেন।"

"ও তাই না কি। আসুন আপনি।"

রত্নাকর পালকি চড়ে চলে গেলেন। একটু পরেই আর একটি সুসজ্জিত পালকি এল। তাতে এলেন স্বয়ং রাজরাণী। তিনি সমাদরে নিয়ে গেলেন তাপ্তিকে। তাপ্তি চলে গেল একেবারে রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে তাকে ঘিরে যে আদর—আপ্যায়নের আতিশয্য শুরু হল তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। তবু তার মনে শঙ্কা জাগছিল রত্নাকর কোথা গেল, কোন ঘরে সে আছে। তার খাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছে এরা। গুরুপাক খাবার তার পেটে তো সইবে না। জিগ্যেসই করে ফেলল শেষে—"উনি কোন ঘরে আছেন?"

"উনি আছেন রাজার কাছে। কেন?"

"ওঁর খাওয়াটা যেন গুরুপাক না হয়। পেটে ব্যাথা কি না—।"

"সব ব্যবস্থা হবে, চিন্তা করবেন না।"

তবু চিন্তিত হয়ে বসে রইল তাপ্তি।

রাজার নিভৃত কক্ষে রত্নাকর বসেছিলেন রাজার সঙ্গে। সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না কেউ।

মহারাজ প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "তোমার বিশেষ প্রয়োজনটা কি? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো?"

"এসেছি অম্বুধি জ্যোতিষীর পরামর্শে। সে আমাকে রাজদর্শন করতে বলেছে, আর রাজবৈদ্যের ওষুধ খেতে বলেছে।"

"তোমার কোনও অসুখ করেছে না কি—" রত্নাকর কোনও উত্তর না দিয়ে হাসি মুখে চেয়ে রইল মহারাজের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"এটা প্রচারিত হয়েছে যে আমি পেটের ব্যাথায় ভুগছি। কোনও ওষুধ খেয়ে সারছে না—।"

"প্রচারিত হয়েছে মানে?"

"আমিই প্রচার করেছি।"

"কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তোমার পেটের ব্যথা হয়েছিল নিশ্চয়—।"

"হয় নি।"

"হয় নি, অথচ প্রচার করেছ হয়েছে—এ কি রকম?"

"মহারাজ আমার আসল রোগ দু'টি। প্রথমত আমি স্ত্রৈণ, দ্বিতীয়ত আমার চক্ষুলজ্জা খুব প্রবল। আমি কারও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারি না—"

"এতো রোগ নয়। দুটিই মহৎ গুণ–"

"এই দুটি গুণই আমাকে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য করেছে–"

"কি রকম ?"

"গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে। আমার বন্ধুর মেয়ে ফল্গু তার বাগান থেকে এক কাঁদি চমৎকার কলা পাঠিয়েছিল। বলেছিল, এ কলা পাকলেই গন্ধে চারদিক ভরে যাবে। আর তখনই এটা খাবেন। তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম খাব। ফল্গু যুবতী, এবং সুন্দরী। আমাকে সে কাকা বলে ডাকে। কিন্তু আমার স্ত্রী তাপ্তির সন্দেহ অন্যরকম। ফল্গু কদাচিৎ আমার বাড়িতে আসে, কিন্তু এলেই তাপ্তির মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। ফল্গুর কলা পাকল রাত দুপুরে–চারদিক গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তাপ্তিকে ওঠালাম। বললাম–কলা নিয়ে এসো, এখুনি খাব; ফল্গুকে কথা দিয়েছি। তাপ্তির মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু সে উঠে কলা এনে দিলে আমাকে। তিন-ছড়া কলা। বললাম এসো দুজনে মিলে খাই। সে বলল–আমি খাব না। রেগে পাশের ঘরে চলে' গেল। আমি খেয়ে ফেললাম, চমৎকার কলা। একটি একটি করে আমি তিনছড়া কলাই শেষ করে ফেললাম। তাপ্তি আসছে না দেখে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি বিছানায় সে উপুড় হয়ে কাঁদছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একটা পাখা নিয়ে তার মাথার শিয়রে বসে' হাওয়া করতে লাগলাম। রেগে আমার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে। বুঝলাম খোশামোদ করে' তার রাগ ভাঙানো যাবে না। হঠাৎ মনে পড়ল কিছুদিন আগে আমার নাবিক পরিচয় পাহাড়ী খবর এনেছিল যে কোনও এক বন্য মহাদেশে না কি প্রচুর গজদন্ত সস্তায় পাওয়া যায়। ঠিক করে ফেললাম নৌ-বহর নিয়ে সেই মহাদেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব। তার সঙ্গে থাকবে আমার ময়ূরপঙ্খী আর তাতে থাকবে আমার স্ত্রী। কথাটা প্রকাশ করে' বলতেই সে হাসি-মুখে উঠে বসল। বলল–সঙ্গে কিন্তু আর কাউকে নিতে পারবে না। থাকব কেবল আমি আর তুমি। বললাম–নিশ্চয়। কিন্তু তখনই মনে পড়ল আর কেউ যদি যেতে চায় তাকে আমি 'না' বলতে পারব কি ? পারব না। অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী, জলধির স্ত্রী নর্মদা, অব্ধির স্ত্রী ভোগবতী, পারাবারের স্ত্রী ব্রাহ্মণী, অর্ণবের স্ত্রী মন্দাকিনী, সাগরের স্ত্রী বিতস্তা, ত্রিবেণী সঙ্গমের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বন্ধু কন্যা ফল্গু–এরা যদি এসে বলে আমরাও তোমার সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করব–তাহলে তাদের আমি তো 'না' বলতে পারব না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। শুধু মধুরই নয়, অতি পবিত্র। তাদের আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি, স্নেহ করি। তাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যাবে না। ইতি পূর্বে তাদের অনেককে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে এবার যখন বড় কোন সমুদ্রযাত্রায় বের হব তাদেরও নিয়ে যাব। তাপ্তি কিন্তু তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে। তাই সমুদ্র যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য পেট-ব্যাথার ভান করলুম। এখনও সেই ভান চলছে। তাপ্তি, বৈদ্য, অবধূত, গণৎকার নিয়ে মেতে আছে। আপনি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক, এখন কি করে' দুকূল রক্ষা হয় তার একটা উপদেশ দিন আমাকে। মহারাজ হেসে বললেন–"জটটি বেশ পাকিয়েছ দেখছি–" তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"শ্রীমতী তাপ্তি দেবী তোমার সঙ্গে যাবেনই এবং একা যাবেন–এই তো– ?"

"হ্যাঁ, আমি কিন্তু কারো অপ্রিয়-ভাজন হ'তে চাই না–।"

মহারাজ চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর হাসলেন একটু। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলেন রত্নাকর তাঁর দিকে।

মহারাজ আর একটু হেসে বললেন—"হয়েছে। এইবার রাজবৈদ্যকে খবর দেওয়া যাক। তোমাকে চুপি চুপি একটা কথা বলছি, উনি যদি কোনও ওষুধ দেন, খেও না। ওঁর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রবল, চিকিৎসা কি করে করতে হয় উনি জানেন না। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র মুখস্থ করে' আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী হয়েছেন, আর আমার মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে রাজবৈদ্য পদটি বাগিয়েছেন। আমি ওঁর ওষুধ খাই না। তুমিও খেও না। তবু ওঁকে ডেকে দেখা যাক উনি কি বলেন—।"

"বেশ।"

মহারাজা দৌবারিককে আদেশ দিলেন বৈদ্য মহাশয়কে ডেকে আনতে। একটু পরেই রাজবৈদ্য এসে অভিবাদন করলেন মহারাজকে। তাঁর গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথার টিকিতে ফুল; কপালে তিলক।

"কবিরাজ মশাই, আমার বন্ধু রত্নাকরের হাতটা দেখুন তো কি হয়েছে।"

কবিরাজ চোখ-বুজে নাড়ী ধরে বসে' রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—"অসুখের তো কোন লক্ষণ দেখছি না। তবে নাড়ী দুর্বল। আপনি কি খান?"

"মৌরলার ঝোল আর ভাত। তার সঙ্গে একটু দুধ—।"

"কেন?"

"আমার পেটে ব্যথা হয়—।"

মহারাজ বললেন—"একটু করে মৃতসঞ্জীবনী সুধা খেলে কেমন হয়—।"

"তা-ও খেতে পারেন।"

"তাই খানিকটা পাঠিয়ে দিন তাহলে।"

"যে আজ্ঞে।"

রাজবৈদ্য বিদায় নিলেন।

একটু পরেই একজন ভৃত্য একটি স্ফটিক-ভৃঙ্গারে মৃত সঞ্জীবনী সুধা একটি সোনার ছোট গেলাস আর একটি রৌপ্য ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এল।

পৃথ্বীপতি বললেন—"আর একটা পানপাত্র নিয়ে আয়। আমিও খাব—।"

ভৃত্য চলে গেল।

পৃথ্বীপতি রত্নাকরের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন।

॥ ১৩ ॥

সেদিন শনিবার। অমাবস্যা রাত্রি। শ্মশান-কালীর পূজা করছিল সেদিন ভোগবতী। একাই সব করছিল। এমন কি পাঁঠা বলিদান পর্যন্ত। একটি কালো পাঁঠা স্বহস্তে বলি দিয়ে সে তার চামড়া ছাড়াচ্ছিল একটা আশ্স্যাওড়া গাছের ডালে টাঙিয়ে। সামনেই কিছু দূরে স্তূপীকৃত কাঠে দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলছিল। ভোগবতী পাঁঠাটা ছাড়িয়ে গোটাই ঝলসাবে সেটাকে। অশ্বি দু'-ক্রোশ দূরে চন্দন-মোহিনী শ্মশানে শবাসনে বসে' তপস্যা করছে। সেখানকার ধূর্জটি মন্দির থেকে নাকি মহেশ্বর অন্তর্ধান করেছেন। অশ্বি গেছে কারণ নির্ণয় করতে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। এসেই খেতে চাইবে। তার জন্যে এক কলসী তাল-রস এনে রেখেছে এবং এখন ঝলসানো মাংস প্রস্তুত করে' রাখছে। একাই সব করছে। কারণ শ্মশান-কালীর মন্দিরে বসে' সে একাগ্রচিত্তে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা

করছিল—"হে দেবাদিদেব মহাকাল, আমাকে মহা-অন্ধকারে যাবার শক্তি দাও। আলো আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমাকে অপমান করেছে। আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। তুমি আমাকে শক্তি দাও।"

ভোগবতীর আশা ছিল, দেবতা আত্মপ্রকাশ করে' তাকে বর দেবেন। তাই সে কাউকে সঙ্গে করে' আনে নি। একাই সব করছিল। পাঁঠার নাড়ী-ভূঁড়িগুলো বার করে' সে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারের ভিতর। একদল শৃগাল এসে সেগুলো কাড়াকাড়ি করে' খেতে লাগল অন্ধকারের ভিতর। একটা অদ্ভুত উপমা জাগল ভোগবতীর মনে। মনে হল—রত্নাকর যেন ওই নাড়িভূঁড়িগুলো—আর তারা যেন সব ওই হ্যাংলা শেয়ালের দল। তাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। তাপিত তো কামড়ে ধরে আছে' কিছুতে ছাড়বে না।

"দূর হ—দূর হ—দূর হ সব—"

একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিলে সে অন্ধকারের দিকে। পালিয়ে গেল শেয়ালগুলো। একটু দূরে অন্ধকারের ভিতর আবার শোনা যেতে লাগল তাদের কোলাহল। তারপর ভোগবতী পাঁঠার রাং চারটে আলাদা করে ফেললে—শেষে মুণ্ডটাকেও ভাল করে পরিষ্কার করে দিয়ে এল মা-কালীর মূর্তির সামনে। তারপর সে মা কালীর সামনে মাথা কুটতে কুটতে নিজস্ব মন্ত্রটি বার বার বলতে লাগল—

ওগো উলঙ্গিনী শিব-শক্তি
শিবকে তুমি হুকুম দাও
নইলে আমার মাথা খাও
মাথা খাও—মাথা খাও।

হঠাৎ আবার শেয়ালদের খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শিয়ালগুলো আবার ফিরে এসেছে। একটা রাং ধরে টানাটানি করছে একটা শিয়াল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে গেল ভোগবতী। তারপর রাং চারটে আর বুক পিঠের মাংস নিবন্ত আংরার উপর লোহার একটা প্রকাণ্ড ঝাঁঝরি বসিয়ে তার উপর রাখলে সে। পাশেই একটা বাটিতে ঘি ছিল। পলা দিয়ে তুলে সেই ঘি একটু একটু ছিটিয়ে দিতে লাগল সে মাংসের উপর। মাঝে মাঝে উলটেও দিতে লাগল মাংসের টুকরোগুলো। এই রকম ভাজা-মাংস অশ্বির খুব প্রিয় খাদ্য। এটি তৈরী করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। ফোঁটা-ফোঁটা ঘি দিয়ে অনেকবার ওলটাতে পালটাতে হয়। পুড়ে গেলে অশ্বি খাবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কাঁচা থাকলেও মুশকিল। মার-পিট করবে। যদিও অশ্বির হাতে মার খেতে তার খুব ভালোই লাগে। তবু আজ তাকে রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না ভোগবতীর। কাল থেকে নিরম্বু উপবাস করে শব সাধনা করছে বেচারি। আজ তার খাবারটা ভালো করে' করতে হবে। নিবিষ্টচিত্তে মাংসটা ভাজছিল সে। হঠাৎ চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভোগবতী চোখ তুলে দেখল—দিব্যকান্তি দু'টি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। দুজনেরই মাথায় মণি-মাণিক্য খচিত মুকুট।

একজন বললেন—"আমি ইন্দ্র।"

আর একজন বললেন—"আমিই বরুণ।"

ভোগবতী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে গিয়ে প্রণাম করল তাদের।

"এখানে এই শ্মশানে কি দিয়ে আপনাদের সম্বর্ধনা করি—।"

ইন্দ্র বললেন—"এক টুকরো করে মাংস দাও। বেড়ে গন্ধ ছেড়েছে। কি হে বরুণ, তোমার আপত্তি নেই তো?"

"না বিন্দুমাত্র না। সমুদ্রের তলায় থাকি সেখানে মাছ ছাড়া আর তো কিছু পাওয়া যায় না।"

ভোগবতী বলল—"এটা আমার স্বামীর জন্য রেঁধেছি, তাঁকে আগে না দিয়ে তো আর কাউকে দিতে পারব না মহাদেবকে দুটো বেল দিয়েছি আজ। সে দুটো আপনারা নিয়ে যান।"

ভোগবতী ছুটে গিয়ে মন্দির থেকে বড় বড় দুটো বেল নিয়ে এল।

"এই বেলে বিচি নেই, আঠা নেই—।"

ইন্দ্র বললেন—"খুশী হলাম।"

বরুণ বললেন—"আমিও।"

তারপর দুজনেই সমস্বরে বললেন—"কিন্তু সব চেয়ে খুশী হলাম তোমার স্বামী ভক্তি দেখে।"

ভোগবতী ঠোঁট উলটে বলল—"স্বামীকে আমি ভক্তি করি না। ভোগ করি।"

ইন্দ্র বললেন—"আরও খুশী হলাম তোমার সরলতার জন্য।"

ভোগবতী প্রশ্ন করল—"আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করিনি এখনও। আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"দেবাদিদেব আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাকে বর দিতে—।"

ভোগবতী বলল—"মা তাহলে আমার প্রার্থনা শুনেছেন। পবনদেব আমাকে বায়ুর উপর আধিপত্য দিয়েছেন—আমি হাওয়া থামিয়ে দিতে পারি, আমি ঝড় তুলতে পারি। আপনি মেঘবাহন ইন্দ্র, আপনি আমাকে মেঘের উপর আধিপত্য দিন। আমি যখন যেখানে চাইব মেঘেরা যেন সেখানে আসে বজ্র-বিদ্যুৎ নিয়ে। আর আপনি বরুণদেব—আপনি সমুদ্রের অধীশ্বর। আপনি আমাকে সমুদ্রের উপর আধিপত্য দিন। যেন আমি যখন খুশী সমুদ্রে তুফান তুলতে পারি। যখন খুশী সমুদ্রকে শান্ত করতে পারি—"

উভয়েই বললেন—তথাস্তু।

ইন্দ্র তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন—"জানতে ইচ্ছে করছে আপনি এসব ক্ষমতা চাইছেন কেন?"

"সংক্ষেপে বললে বলতে হয় শত্রুদমন করবার জন্য।"

"ও।"

বরুণ বললেন—"আপনার একটি কথা শুনে আমার কৌতূহল হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি রাগী মানুষ তাই জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না।"

ভোগবতী হেসে বলল—"ঠিক বলেছেন। সত্যি আমি খুব রাগী। তা আপনি কি জানতে চান বলুন। রাগ করব না।"

"আপনি এখনি বললেন স্বামীকে আপনি ভক্তি করেন না, ভোগ করেন। আপনার ভক্তিভাজন কেউ নেই?"

"আছে বই কি। উলঙ্গিনী কালী আর উলঙ্গ শঙ্কর।"

"এদের ভক্তি করেন কেন?"

"কারণ এরা নগ্ন। এদের কোন কৃত্রিম আবরণ নেই। কোনও ভন্ডামি নেই। তাই

এদের আমি ভক্তি করি।"

"এদের কাছে আপনার প্রার্থনা কি ?"

"আমাকে অন্ধকারে নিয়ে চল।"

ইন্দ্র এবং বরুণ দুজনেই নমস্কার করলেন ভোগবতীকে। তারপর অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

চতুর্দিকে আবার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

একটু পরেই অন্ধকার অট্টহাস্যে কাঁপতে লাগল। অশ্বি আসছে। অশ্বি এসেই ভোগবতীকে স্কন্ধে তুলে নৃত্য করতে লাগল।

"ছাড় আমার উরুতে লাগছে–"

"লাগুক।"

"মাংসটা পুড়ে যাবে। ওটা নাবিয়ে নি–।"

কাঁধের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ভোগবতী। মাংসটা নাবিয়ে নিল আগুনের উপর থেকে।

"ধূর্জটি মন্দিরের মহাদেবের খবর পেলে ?"

"তিনি গেছেন অনন্তনাগের সংগে দেখা করতে।"

"কেন ?"

"তা বোঝা গেল না। দাও খাই কিছু।"

একটা রাং তুলে নিয়ে সে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। কস বেয়ে রক্ত পড়তে লাগল তার। মাংসটা কম ভাজা হয়েছিল। ভোগবতী বললে–"কারণ কিন্তু পাই নি। তালরস এনে রেখেছি–।"

অশ্বি কলসীটা তুলে চোঁ চোঁ করে' খেয়ে ফেললে খানিকটা।

কান্ড দেখে খিল খিল করে হাসতে লাগল ভোগবতী।

॥ ১৪ ॥

দেখতে দেখতে সুসংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রত্নাকর সুস্থ হয়েছে। এইবার সে সমুদ্র-যাত্রায় বের হবে। সাজ সাজ পড়ে গেছে চারি দিকে। বিরাট ময়ূরপংখী সাজানো হচ্ছে, তাছাড়া সংগে যাচ্ছে পাঁচশো নৌকার নৌবহর। পরিচয় পাহাড়ী প্রায় হাজার খানেক দক্ষ নাবিক সংগ্রহ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মহারাজা পৃথ্বীপতি দুই শত বড় বড় বজরা দিয়েছেন, তাতে সশস্ত্র সৈন্য থাকবে। পরিচয় পাহাড়ীও অনেক সৈন্য সংগে নিচ্ছে। সমুদ্র যাত্রায় জল-দস্যুর খুব ভয়।

বাড়িতে ক্রমাগত লোক আসছে। কেউ সংগে যেতে চায়, কেউ কোনও জিনিস বিদেশ থেকে আনবার জন্য অনুরোধ করে। দশ বারোজন মুহুরী খাতা নিয়ে বসে আছে তাদের ফরমাস টোকবার জন্য।

রত্নাকর কাউকে 'না' বলতে পারে না। যারাই তার সংগে যেতে চায় রত্নাকর আপত্তি করে না। বহু পুরুষ তো যাচ্ছেই অনেক মেয়েও যেতে চায়। রত্নাকর বলে, বেশ তো, বেশ তো যাবে।

একদিন ফল্গু এসে হাজির হল। পরনে আগুন-রঙের কাপড়। খোঁপায় অশোক ফুলের গুচ্ছ। হাতে চুড়ি নেই, চুড়ির বদলে লাল কুন্দ-ফুলের মালা জড়ানো, গলায় রক্ত করবীর মালা। এসে সটান বাড়ির ভিতর চলে গেল সে। রত্নাকর বিছানায় বসেছিল, তার পাশে গিয়ে বসল।

"কাকু, তুমি শুনলাম সমুদ্র যাত্রায় বের হচ্ছ?"

"হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছ নাকি?"

"না, আমি যাব না। তুমি যখন থাকবে না, তখন একা একা আমি তোমার বাগানে ঘুরে বেড়াব, তোমার শোবার ঘরে ঢুকব। তোমার বসবার ঘরে বসব। তোমাকে আমি ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলি। তুমি যখন কাছে থাকবে না, তখনই তোমাকে সবচেয়ে কাছে পাই আমি। আমি যাব না তোমার সঙ্গে। তুমি যখন থাকবে না, তোমার চাকররা যেন তোমার বাগানে ঘরে ঢুকতে দেয় আমাকে। আর আমাকে যখন তুমি মনে করবে—এই পোষাকে মনে কোরো। যে আগুন আমার মনে জ্বলছে, যা আমি জীবনে কখনও প্রকাশ করতে পারব না, তারই কিছুটা আভাস আমার এই পোষাকে আছে। কাকীমা কোথায়?"

"সে পূজোর ঘরে আছে।"

"বাইরে আমার চাকর একঝুড়ি আঙুর এনেছে, খেও। নতুন ধরনের আঙুর। গোলাপী রঙের। আমি আর বেশীক্ষণ বসব না। চললুম—।"

প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ফল্গু।

একটু পরে তাপ্তি এসে ঘরে ঢুকল।

"ফল্গু এসেছিল বুঝি।"

"হ্যাঁ।"

"নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে।"

"না। সে যাবে না। বললে, আমরা যখন থাকব না সে একলা আমাদের বাড়িতে বাগানে ঘুরে বেড়াবে।"

"মেয়েটা পাগল। আজ আবার কি ফল এনেছে। খেওনা যেন—।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি চাকর একটি লাল রেশমের থলিতে আঙুর নিয়ে এল।

"কি আছে ওতে?"

চাকর একটি রূপোর থালায় আঙুরগুলি ঢালতেই চমকে উঠল দুজনেই। আঙুরের ভিতর থেকে গোলাপী মেঘের আভা ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

"কি ফল এগুলো" ভ্রূকুঞ্চিত হল তাপ্তির। রত্নাকর বললে— "আঙুর। এ খেলে কিছু হবে না।" বলেই সে কয়েকটা আঙুর মুখে ফেলে দিলে।

"অপূর্ব। খেয়ে দেখ তুমি—"

"আমি খাব না। তুমি যত খুশী খাও।"

রেগে বেরিয়ে গেল তাপ্তি।

রত্নাকর একটু মুচকি হেসে আরও দু-চারটি আঙুর তুলে নিল।

তাপ্তি ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল পদ্মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ হল বোধহয় আড়ি পাতছিল।

"তুই এখানে কি করছিলি?"

"পরিচয় পাহাড়ী এসেছেন। তিনি জানতে চাইছেন ময়ূরপংখীতে মেয়েদের জন্য কটা ঘর রাখতে হবে? আমি বললুম আমি মায়ের সঙ্গে থাকব। আর কে যাবে আমি জানি না।"

"আমি যতদূর জানি আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না।"

পদ্মা ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল—"আমি না গেলে পান সাজবে কে? আমার হাতের

পান ছাড়া আর কারো হাতের পান বাবুর পছন্দ হয় কি ? তোমার মত অবশ্য আমি সাজতে পারি না, কিন্তু তুমি কি ওখানে গিয়ে পান সাজবে খালি ? কর্তার যে মুহুর্মুহু পান চাই–"

"তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"পরিচয় পাহাড়ীকে কি বলব ?"

"তুই পরিচয়কে বাবুর কাছে ডেকে দে। আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

তাপিত ভিতরে চলে গেল। পদ্মা বাইরে গিয়ে পাহাড়ীকে বলল–"পরিচয়দা তুমি ভিতরে গিয়ে কর্তা মহাশয়ের সংগে কথা বল।" তারপর একটু নীচু গলায় বললে–"আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো। পরিচয়দা, লক্ষ্মীটি--"

পদ্মার সম্বন্ধে পরিচয়ের দুর্বলতা ছিল। হেসে বলল–"নিশ্চয় নিশ্চয়, অন্য ঘর না পাই আমার ঘর তো আছেই–"

"দুষ্টু কোথাকার–।"

একটি কোপ কটাক্ষ হেনে পদ্মা বলল, "চল, এখন কর্তা মশায়ের কাছে চল।"

কয়েকটি আঙুর খেয়ে খোশ মেজাজে বসেছিল রত্নাকর।

"কি খবর তোমার পরিচয় ?"

" আমি জানতে এসেছি ময়ূরপংখীতে মেয়েদের জন্যে কটা ঘর প্রস্তুত রাখব ?"

"বড় ময়ূরপংখীতে কটা ঘর আছে ?"

"পঁচিশ-টা।"

"পঁচিশটাই প্রস্তুত করে রাখ। কে কে যেতে চাইবে জানি না তো। কাউকে তো না বলতে পারব না।"

"যে আজ্ঞে।"

খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল নর্মদা। রত্নাকর সমুদ্র-যাত্রায় বেরুবে ? সংগে ময়ূরপংখী আর অনেক নৌকো ? মনটা নেচে উঠল তার। রোজ সেই খাওয়া শোয়া আর কবিরাজী ওষুধ তৈরি ভালো লাগে না আর। রোজ ওষুধ কোটা, ওষুধ বাছা, ওষুধ বাটা, ওষুধ পাক দেওয়া। কোনটা তিন পাক, কোনটা সাত পাক। আর কি বিশ্রী গন্ধ, কি ঝাঁজ। স্বামী দিনরাত লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত। রোগী এলে দেখতে চায় না।

খবরটা শুনে সে জলধির ঘরে উঁকি মেরে দেখল। তন্ময় হয়ে পড়ছে সে।

"ওগো, শুনছ ?"

জলধি তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে। শুনতে পেল না।

"ওগো শুনছ ?"

ঘাড় ফেরাল জলধি।

"রত্নাকর সমুদ্র যাত্রায় বেরুচ্ছে। তোমার তো অনেক ওষুধ ফুরিয়েছে। ভালো গোল মরিচ, লবংগ, চন্দন, শুশুকের তেল, গন্ডারের খড়্গ–সব তো বাড়ন্ত।"

"তাই নাকি। তাহলে তো রত্নাকরের সংগে যেতে হয়। ওসব জিনিস তো এদেশে মেলে না--"

"চল তাহলে রত্নাকরকে বলি গিয়ে। আমিও যাব।"

"তুমি ? তুমি গিয়ে কি করবে ? ঘর বাড়ি কে দেখবে ?"

।

"আমার কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই ?"

"বাড়িতেই সাধ-আহ্লাদ কর না। তোমাদের সাধ-আহ্লাদ তো পরচর্চা আর ঘোঁট। পাড়ার মেয়েদের ডেকে এনে যত ইচ্ছে ঘোঁট করতে পার। আমি তো থাকব না। আর আমার গাছ-গাছড়ার বাগান দেখবে কে ?"

"মালীরা দেখবে। আমি যাবই। আমি সমুদ্র কখনও দেখিনি।"

"সমুদ্র দেখে কি দশটা হাত গজাবে ?"

নর্মদা আবদারের সুরে বলল—"না, আমি যাব—।"

"আমাকে কি রত্নাকরের মতো স্ত্রৈন পেয়েছ, যে স্ত্রীর কথায় ওঠা-বসা করব ?"

এরপর নর্মদা সটান শুয়ে পড়ল জলধির পায়ের উপর।

"দোহাই তোমার। আমাকে বাধা দিও না। আমি যাবই। যদি না যেতে দাও, আত্মহত্যা করব।"

জলধি খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল—"এ তো এক মহাসমস্যায় ফেললে তুমি। আমারই যাবার ঠাঁই হবে কি না ঠিক নেই। আমি আবার শঙ্করাকে নিয়ে যাব কোন আক্কেলে—।"

আমি জানি রত্নাকর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবে না। সে আমাকে ভালোবাসে—।"

নর্মদার মনে পাপ থাকলে সে এ কথা বলতে পারত না। জলধি একথা শুনে বিচলিত হল না। তার স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ নেই। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—" পা ছাড়, পা ছাড়। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন ? যাবে তো ওঠ। কি বিপদ—।" নর্মদা উঠে বসল।

অর্ণব দিনরাত তপস্যা নিয়েই থাকত। হিরন্ময়ী নদীর মধ্যে ছোট একটি দ্বীপের মতো ছিল—সেইখানেই অধিকাংশ সময় কাটত তার। সেইখানেই সে তার ভগবানকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকত। সমাজের সংগে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না তার। একটি ছোট নৌকো ছিল ত্রিবেণী সংগমে। সেই নৌকো করে গংগা যমুনা, সরস্বতী মন্দাকিনী প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একবার যেত তার কাছে খাবার নিয়ে। খাবারটা রেখেই চলে আসত তারা। অর্ণবের তাই নির্দেশ ছিল। সেদিন গংগা কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমাকে কিছু বলবে ?"

"রত্নাকর সমুদ্রযাত্রা করছেন। প্রকান্ড নৌবহর সজ্জিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ময়ূরপংখীও সংগে যাচ্ছে। তিনি কুমারীকা অন্তরীপ ঘুরে আরও দূর দেশে যাবেন। আমাদের চারজনেরই কন্যাকুমারী দর্শন করবার খুব ইচ্ছে—"

অর্ণব একটু হেসে বলল—"এ ইচ্ছে হল কেন ?"

উত্তর দিল সরস্বতী—"হবে না ? নারী জীবনের পরম গৌরব ও চরম হতাশা যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে, যিনি মহাদেবকে স্বামী রূপে পেয়েছিলেন, কিন্তু দেবতাদের ষড়যন্ত্রে তাঁর গলায় মালা দিতে পারেন নি, কিন্তু তবু যিনি ভেঙে পড়েন নি, আজও মালা হাতে করে হিমালয়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখব না ? তার মধ্যে যে নারীত্বের গৌরব, দুঃখ এবং বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে—তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হবে না ?"

অর্ণব বলে উঠলেন—"বাঃ, চল এখুনি রত্নাকরের কাছে যাই। আমাকেও একবার লঙ্কায় যেতে হবে।"

"লঙ্কা ? কেন ?"

"আমি আজকাল রাবণ জননী নিকষার হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। তিনি এখনও লংকার শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর বলছেন—রাবণের মৃত্যুর কারণ রাম নন, মৃত্যুর কারণ তার প্রবল প্রতাপ ও প্রচুর ঐশ্বর্য। তিনি আমাকে বলেছেন আমি এখনও প্রেতিনী হয়ে এখানে আছি। তুমি এসে আমাকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার কর। আর আমার এই বিশ্বাস প্রচার করে যে রাবণের মৃত্যুর কারণ তার প্রতাপ, তার অহংকার, তার ঐশ্বর্য। রোজই এই স্বপ্ন দেখি। তাই ভাবছি লংকায় যাব একবার। রত্নাকরের সংগেই যাব।"

মন্দাকিনী কিছু বলল না। তার সর্বাংগে একটা শিহরণ বয়ে গেল শুধু।

অর্ণব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

"চল এখনই যাই। শুভস্য শীঘ্রম। রত্নাকর আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবার মত স্থান তার ময়ূরপংখীতে বা অন্য কোনও নৌকায় হবে কিনা জানি না। তবে তোমরা যেতে চাইলে সে একটা ব্যবস্থা করবেই। চল, বেরিয়ে পড়া যাক—"

রত্নাকরের বাড়ি পৌঁছে দেখে হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কান্ড। অম্বুধিকে কাঁধে নিয়ে সাগর দাঁড়িয়ে আছে। সাগরের স্ত্রী বিতস্তা মূর্ছিতা। সে রত্নাকরের জন্য ক্ষীর শসা এনেছিল—তা চারদিকে ছড়ানো পড়ে আছে। সাগরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী এবং তার বিধবা বোন কাবেরী। রত্নাকর বারান্দায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে অপ্রস্তুত মুখে। ইরাবতীর উন্মুখ উৎসুক দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ। তার সমস্ত কামনা যেন বিদ্যুৎরেখার মত স্পর্শ করছে রত্নাকরের সর্বাংগ। কাবেরীরও আলুলায়িত বেশ। তার পীন পয়োধরের খানিকটা অনাবৃত। চোখের কটাক্ষে লালসা, মুখের মৃদু হাসিতে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ। সে যেন মূর্তিমতী রতি। রত্নাকর করজোড়ে বলল—"আমার স্ত্রীর অসৌজন্যের জন্য আমি লজ্জিত। আমি বিতস্তা দেবীর কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি যে খাবার এনেছেন তা আমি খাব। আর এ প্রতিশ্রুতিও আমি দিচ্ছি আমার সংগে সমুদ্রযাত্রায় যাঁরা যেতে চান, সকলকেই আমি নিয়ে যাব। আমার ময়ূরপংখীতে ও নৌবহরে স্থানাভাব ঘটবে না।"

হঠাৎ তাপ্তি বেরিয়ে এল গলবস্ত্রে। বলল "এস, এস, সবাই এস। আমাকে ক্ষমা কর। আমি নাকখৎ দিচ্ছি। আমার ঘাট হয়েছে—"

এই বলে সত্যিই সে নাকখৎ দিতে উদ্যত হল। রত্নাকর তাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল আস্তে আস্তে। মন্দাকিনী মৃদুকণ্ঠে অর্ণবকে বলল—"আমরা রত্নাকরের সংগে যাব না। মনে হচ্ছে আমরা সংগে গেলে তাপ্তি অসন্তুষ্ট হবেন।"

অর্ণব বলল—"আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমরা বাড়ি ফিরে যাই চল। তবে রত্নাকরকে সেটা বলে যাই—।"

রত্নাকর সংগে সংগে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অর্ণবকে। তারপর বলল—"চলুন, ভেতরে চলুন—"

"না, এখন আর যাব না। তুমি সমুদ্র যাত্রা করছ শুনে তোমার কাছে এসে ছিলাম। আমার লঙ্কায় যেতে হবে একবার। এরাও কন্যাকুমারীকা দেখতে চায়। ভেবেছিলাম তোমার সংগে যাব। কিন্তু তোমার এখানে এসে যা দেখলাম—তাতে মনে হয় তোমার সংগে যাওয়াটা সংগত হবে না। তাপ্তি দেবী বোধহয় বেশী ভীড় পছন্দ করছেন না। আমি একটা আলাদা নৌকোর ব্যবস্থা করি। তোমাদের পিছু-পিছুই যাব।"

রত্নাকর বলল—"এ অঞ্চলের সব নৌকো পাহাড়ী ভাড়া করেছে। আপনি নৌকো পাবেন না।"

"এত নৌকো নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"দেশটার নাম নাকি উপরিকা। প্রকান্ড অরণ্য সমাকুল মহাদেশ সেটা। সেখানে গজদন্ত আর গজ-অস্থি না কি খুব সস্তায় পাওয়া যায়। আমি পাঁচশো নৌকো নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। পথেও যে সব নৌকো পাব ভাড়া করব—।"

"এত গজদন্ত আর গজ-অস্থি তুমি পাবে কোথায়?"

"যিনি এ খবর নিয়ে এসেছেন তিনি বলেছেন যে সে দেশে হাতীরা মৃত্যুর আগে গভীর বনের মধ্যে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে অন্নজল ত্যাগ করে' বসে' থাকে। বার্ধক্যে তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে। এই রকম কয়েকটি হাতীর শ্মশান আবিস্কার করেছেন তিনি। সেখানে প্রচুর গজদন্ত ও গজ-অস্থি ছড়ানো আছে। আমি তার সাহায্যে সেগুলো সংগ্রহ করব বলে' যাচ্ছি।"

অর্ণব বললেন—"তাহলে তুমি ঘুরে এস। আমি পরে যাব।"

"আপনি আমার একটা নৌকো নিয়ে যান না—।"

"যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু নৌকোর ভাড়াটা তোমায় নিতে হবে। না নিলে মন্দাকিনীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। সে তাপিত দেবীর অস্বস্তির কারণ হতে চায় না।"

রত্নাকর চুপ করে' রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল—"বেশ তাই হবে। আপনার আদেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই। যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গেই যেতে হবে। আপনাকে সঙ্গীরূপে পেলে আমি ধন্য হব।"

অর্ণব মন্দাকিনীর দিকে ফিরে বলল—"এতে তোমার মত আছে তো?"

মন্দাকিনী আশা আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছিল। মাথা নেড়ে জানাল—মত আছে।

কবি পারাবার তাঁর ধানের ক্ষেতে মাচার উপর বসেছিল। চারদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজের সমুদ্র। সে কিন্তু বসেছিল স্বপ্নের সমুদ্রের মধ্যে। অধিকাংশ সময়ই সে তার এই ছোট মাচাটির উপর বসে থাকে। মাচার পাশেই ছোট্ট একটি মাটির ঘর আছে। তাতে আছে লেখবার সরঞ্জাম। পারাবার মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সেখানে কবিতা লেখে। পারাবার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসার চলে তার চাষের আয় থেকে। বেশ ধনী লোক সে। বিদেশের হাটে সে ফসল পাঠায় রত্নাকরের নৌকোয়। এসব ব্যবস্থা করবার জন্য তার বিশ্বাসী চাকর আছে অনেক। তারাই সব করে। পারাবার কবিতা লেখে শুধু, আর নির্জন মাঠের মধ্যে তন্ময় হয়ে বসে' থাকে। তার আর একটি কাজ আছে। সে অন্য পন্ডিত বা কবির লেখা সুন্দর করে' লিখে দেয় ভাল পাতায়। মুক্তোর মত হাতের লেখা তার। এর জন্যে সে পারিশ্রমিক নেয়। কিন্তু পারিশ্রমিক দিলেই সে লেখে না। যে লেখা পড়ে' তার ভালো লাগে তাই সে সুন্দর করে' লিখে দেয়। ব্রাহ্মণী তার জন্যে রোজ দুপুরে খাবার নিয়ে আসে। সেদিন পারাবার লক্ষ করল ব্রাহ্মণী বেশ দ্রুত বেগে আসছে। তার পিঠের বেণী আর বাঁ হাতটা যেন বেশী জোরে দুলছে। ব্রাহ্মণী অপরূপ সুন্দরী। যেন একটি অর্ধ-বিকশিত শ্বেত-পদ্ম। শুধু সৌন্দর্য নয়, পবিত্রতাও বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন। সে অর্ণবের শিষ্যা, পারাবারের পত্নী। তার নিষ্ঠায় কোনও খুঁত নেই, তার স্বামীভক্তিও নিখুঁত, কিন্তু রত্নাকরকে সে ভালোবাসে। সে ভালোবাসার কথা

পারাবারকেও বলেছিল একদিন। তা শুনে পারাবার রাগ করেনি, খুশী হয়েছিল। বলেছিল—"তাহলে তো তুমি একজন বড় শিল্পী দেখছি। শিল্পীরাই সৌন্দর্যকে ভালবাসে। রত্নাকর সুন্দর, রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, তাকে তো ভালোবাসাই উচিত। তোমার শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম।"

ব্রাহ্মণী মুচকি হেসে বলেছিল—"সত্যি কথা বলছ, না কবিত্ব করছ?"

"সত্যি কথা বলছি কিনা জানি না। কারণ সত্য কি তাই জানি না। পৃথিবীর সব জিনিসই বদলায়। সত্যও বদলায়। সাদা স্তূপ মেঘটা কুমীরের মত ছিল একটু আগে, এখন অপ্সরীর মত দেখাচ্ছে। দুটোই সত্য, দুটোই সুন্দর। ওই প্রজাপতিটা দেখ, কি চমৎকার। একটু আগে ওটা গুটিপোকা ছিল। দুটোই চমৎকার। আমি সুন্দরের উপাসক, তাই রত্নাকরকে ভালোবাসি. তুমিও রত্নাকরকে ভালবাস জেনে খুশী হয়েছি। রাগ করব কেন? এ-ও আমি জানি এই ভালবাসা কালক্রমে হয়তো প্রণয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। যদি হয় হোক না—যদি সত্যি সেটা সুন্দর হয়। আমি তোমার প্রণয়ী তাই জানি, প্রণয় বড় সুন্দর। তুমি যদি ভালবেসে ফেল, সে তো ভারি মজা হবে। আমার হিংসা হবে না। কারণ তোমার সুখেই আমার সুখ। আমার হিংসে হবে না. যে সাদা মেঘকে আমি ভালবাসি সে যখন চাঁদকে জড়িয়ে ধরে আমার খুব ভাল লাগে, একটু রাগ হয়না। বরং মনে হয়, আহা, আমি যদি ওদের জড়িয়ে ধরতে পারতাম। কিন্তু পারি না। আমার এই না পারাটা স্বপ্ন হয়ে যায়। কবিতা লিখি।—"

এইসব কথা বহুদিন আগে পারাবার বলেছিল ব্রাহ্মণীকে। ব্রাহ্মণী মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল—"আমি রত্নাকরকে ভালোবাসি, তুমি আমাদের নিয়ে একটা মহাকাব্য লিখে ফেল।"

"প্রণয় এখনও জমে নি। জমলেই লিখে ফেলব। তবে তোমাকে বাহাদুরি দিই, তোমার মাত্র দুটো পা, কিন্তু তিন নৌকোয় পা রেখে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ। অথচ তোমার গায়ে কাদা লাগে নি।"

"তিন নৌকো মানে?"

"এক নৌকো আমি। আর এক নৌকো অর্ণব, তৃতীয় নৌকো রত্নাকর—। অথচ তোমার চরিত্র স্ফটিক-শুভ্র আছে। তোমার ব্রাহ্মণী নাম সার্থক।"

পারাবার নির্নিমেষে চেয়ে রইল ব্রাহ্মণীর দিকে। এত হনহন করে আসছে কেন?

ব্রাহ্মণী হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল শেষে।

"খবর শুনেছ?"

"কি?"

"রত্নাকর সমুদ্র-যাত্রা করছে ময়ূরপংখী নিয়ে। সংগে অনেক নৌকো আছে। এ অঞ্চলের সব নৌকো ভাড়া করেছে সে। সাগর, অম্বুধি, মন্দাকিনী, গংগা-যমুনা-সরস্বতী সবাই গিয়েছিল রত্নাকরের কাছে। রত্নাকর বলেছে সবাইকে নিয়ে যাবে। চল, আমরাও যাই। গুরুদেবও সংগে যাবেন।"

"আমি স্বপ্নের সমুদ্রে সর্বদা ডুবে থাকি, কিন্তু আসল সমুদ্র কখনও দেখি নি। রত্নাকর কি আমাদের নিয়ে যাবে?"

"তুমি বললে নিশ্চয় যাবে। সে খুব খাতির করে তোমাকে। খেয়ে নাও, তারপর চল যাই তার কাছে—"

"তুমি যাও না। আমার হাঁটাহাঁটি করলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। অতদূর গিয়ে হয়তো কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলব। হয়তো বলে বসব—

হে রত্নাকর কোর না ভাবনা
তোমার সঙ্গে যাব না যাব না
এতদূর হেঁটে এসেছি কেবল
নেহারিতে তব বদন কমল।
একটু হাসিয়া চাহ একবার
এর বেশী কিছু চাহিনাক আর।

তুমি যাও, তুমি গেলেই কাজ হবে।

"আমি তার সামনে একটি কথাও বলতে পারব না।"

"তাহলে ব্যাপার বেশ ঘনীভূত হয়েছে বল?"

ব্রাহ্মণী ধমকের সুরে বলল—"বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—।"

পারাবার এবার হেসে ফেললে। এবারও কিন্তু কবিতায় উত্তর দিল—

"লো রূপসী ব্রাহ্মণী
কঙ্কন কন-কনি
কণ্ঠে তুলি কোমল নিখাদ
আদেশ করিলে যাহা
অবশ্য পালিব তাহা
নিশ্চয় পূরাব তব সাধ।"

পারাবার খেতে বসল।

ব্রাহ্মণী তার সামনে বসে ছোট একটা হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল তাকে। সে সঙ্গে একটা ছোট পাখাও এনেছিল। রোজ আনে।

অম্বি আর ভোগবতীও গিয়েছিল রত্নাকরের কাছে। রত্নাকার বলেছে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। অম্বি শ্রান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল। ভোগবতীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সে জানলার ধারে অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। অন্ধকারের ভিতরই সে যেন দেখতে চাইছিল তার ভবিষ্যতকে। সেদিন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না। কৃষ্ণা-অষ্টমীর চাঁদ উঠেছিল। দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' দাঁড়িয়েছিল সে নিস্তব্ধ হয়ে। রত্নাকরের মুখটা মনে পড়ছিল মাঝে মাঝে। পরিচয় পাহাড়ীকে সে বলে এসেছে রত্নাকরের পাশের ঘরটাই যেন তাকে দেওয়া হয়। পাহাড়ী লোভী পশু একটা। সে যে তাকে অনুরোধ করেছে, এতেই কৃতার্থ হয়ে গেছে সে। বার বার বলেছে নিশ্চয়ই রত্নাকরের পাশের ঘরটাই সে রাখবে তাদের জন্য। রত্নাকর আদেশ দিয়েছে যে পুরুষরা সব আলাদা আলাদা নৌকায় থাকবে আর মেয়েরা থাকবে তার ময়ূরপংখীতে। এ সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে ভোগবতী।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। বিরাট একটা পাহাড়ের মত কি যেন এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ির দিকে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠালে অম্বিকে।

"ওঠ, ওঠ, একটা পাহাড় চলে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে—।"

অশ্বি ধড়মড় করে' দাঁড়াল গিয়ে জানলার ধারে। দাঁড়িয়েই নমস্কার করতে করতে বলল—"উনি মহেশ্বরের নন্দী। শাঁখ বাজাও।"

ভোগবতীর মহাশঙ্খ ছিল একটা। সে সেইটে তুলে নিয়ে বাজাতে লাগল। অশ্বি সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল ধ্যানে। পাহাড়টা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর দিক পরিবর্তন করে চলে গেল অন্য দিকে।

সে যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল তখন ভোগবতী বলল—"নন্দী অন্যদিকে চলে গেলেন—।"

অশ্বি তখন ধ্যানে মগ্ন। একেবারে সমাধিস্থ। অশ্বির কোন জবাব না পেয়ে ভোগবতী বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘুরে বেড়াতে লাগল অন্ধকারে। শেষে হাজির হল শ্মশানে এসে। নির্জন শ্মশানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। চাঁদটাও ঢেকে গেল একটা মেঘে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল সব। ভোগবতীর সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগল একটা। সে জাপটে ধরতে চেষ্টা করল অন্ধকারকে। কিন্তু অন্ধকারকে বুকে জাপটে ধরা যায় না। জেদ চেপে গেল ভোগবতীর, অন্ধকারকে সে বুকে চেপে ধরবেই। সারা শ্মশানময় সে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। আর বার বার বলতে লাগল—"অন্ধকার, তুমি আমাকে নাও। অশ্বি আমাকে ভালবাসে না। আমি তার সাধনায় উত্তরসাধিকা মাত্র। আমি তার প্রয়োজনের যন্ত্র। আমি তার প্রেয়সী নই।"

হঠাৎ তার মনে হল মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে, মহেশ্বরের কাছে গিয়ে সে নালিশ জানাবে। তাঁকে বলবে—হে উমানাথ, তোমার ভক্ত আমাকে কেন ভালোবাসে না। উন্মাদিনীর মত শ্মশানেশ্বর শিব-মন্দিরের দিকে ছুটতে লাগল সে। গিয়ে কিন্তু দেখল মন্দিরেব কপাট খোলা, মন্দিরে মহাদেব নেই।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। তার কেমন যেন একটা আতঙ্ক হল। ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। বাড়ি গিয়ে দেখল—অশ্বির ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। সে গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

"শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে মহেশ্বর নেই।"

"তিনি নন্দীর পিঠে চড়ে মহাকূর্মের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"

"মহাকূর্ম কে?"

"যিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে আছেন।"

"তাঁর কাছে গেছেন কেন?"

"সেটা ধ্যানে ধরতে পারলাম না। আন্দাজ করছি নেপথ্যে কিছু একটা ঘটছে। আমি স্বচক্ষে দেব-দৈত্যদের ঢুকতে দেখেছি মহেশ্বরের মন্দিরে। পারাবারও দেখেছে। একটা বিপ্লব বোধহয় আসন্ন।"

"রত্নাকরের সমুদ্রযাত্রার দেরী কত? আমরা তো তার সঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের ভয় কি।"

অশ্বির মুখে হাসি ফুটল। রহস্যময় হাসি। সে কোন জবাব দিল না। কেবল হাসিমুখে চেয়ে রইল সে ভোগবতীর দিকে।

॥ ১৫ ॥

ময়ূরপংখী সাজানো হয়ে গেছে। তার মাথার উপর মহেশ্বরের পতাকা উড়ছে নানা রকম। কোনটা ধ্যানমগ্ন মহাদেব, কোনটা সতীর শব স্কন্ধে মহাদেব, কেউ উমানাথ, কেউ নটরাজ, কেউ মদন ভস্ম করছেন। মহাদেবের পতাকা সব নৌকোতেই উড়ছে। মহেশ্বর অঞ্চলের বহু নরনারী সমুদ্র যাত্রায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই আনন্দিত। আনন্দ নেই কেবল তাপ্তির মনে। ময়ূরপংখীতে একপাল মেয়ে নিয়ে তার সমুদ্র যাত্রা করবার মোটেই ইচ্ছে নেই। অথচ রত্নাকরকে ছেড়েও সে একদন্ড কোথাও থাকতে পারে না। সুতরাং তার মনেই কেবল তুষানল জ্বলছে। তার এই অতি ভদ্র, ধনী, অতিশয় রূপবান স্বামীকে নিয়ে সে অতি বিব্রত। সবাই তাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। বেহায়ার দল সব। ক'দিন থেকে সে রোজই রত্নাকরকে বলছে—"তুমি একাই ঘুরে এস। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি ওই ভীড়ের মধ্যে যেতে পারব না। বিয়ের পর থেকে তোমাকে ছেড়ে কোনও দিন থাকি নি। চেষ্টা করে দেখি পারি কি-না।"

রত্নাকর মৃদু হেসে উত্তর দেয়—"দেখই না কি হয় শেষ পর্যন্ত। সবাই হয় তো যাবে না।"

"যাবে না আবার। মেয়েগুলো তো পা বাড়িয়ে বসে আছে।"

"দেখো, শেষ পর্যন্ত কেউ যাবে না।"

"ময়ূরপংখীর পঁচিশটা ঘরে জিনিস-পত্র এনে রাখতে শুরু করেছে। আমাকে তুমি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

"থাকতে পারবে?"

"হয়তো পারব না। হয়তো মরে যাব। তবু আমি ওই হাটের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে পারব না। তোমার পেয়ারের লোকদের নিয়ে তুমি বেড়িয়ে এসো।"

রত্নাকর হাসিমুখে চেয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

তার পরদিন যা ঘটল তা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত। মহারাজ পৃথ্বীপতি দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন—তাঁর রাজ্যের কোন নারী সমুদ্রযাত্রা করতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজনে যদি কেউ যেতে চান তাঁকে মহারাজের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। এ আদেশ অমান্য করলে প্রাণদন্ড হবে। সেই দিনই একজন বিশেষ রাজদূত একটি সুরঞ্জিত তালপত্রে নিম্নলিখিত পত্রটি দিয়ে গেল রত্নাকরকে। পত্রটি তাপ্তির নামে।

আয়ুষ্মতি রত্নাকর জায়া
শ্রীমতী তাপ্তি দাসী সমীপেষু,
কল্যাণীয়া বধূজায়া,

আপনার স্বামী শুনিলাম বাণিজ্যব্যপদেশে বহুদিনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন। আমি সম্প্রতি বিশেষ কারণে নারীদের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু আপনাকে স্বামীর সহিত যাইবার জন্য বিশেষ অনুমতি দিলাম। মহেশ্বরের কৃপায় আপনাদের সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীপৃথ্বীপতি শঙ্কর সেবক

হৈ-হৈ কান্ড পড়ে গেল চতুর্দিকে। অর্ণব মন্দাকিনীকে বলল—"রাজার আজ্ঞা অমান্য করা অনুচিত। আমাকে নিকষা কিন্তু রোজই স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন। আমাকে লঙ্কা যেতেই হবে। তোমরা থাকো। রাজা পৃথ্বীপতি কেন এ আদেশ ঘোষণা করেছেন বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হয় নিশ্চয় কোনও নিগূঢ় কারণ আছে।"

ওরা চারজনই চুপ করে রইল। পম্মা রাজা পৃথ্বীপতির উদ্দেশ্যে যে ভাষায় গালাগাল শুরু করল তা অশ্রাব্য। অর্পিত তাকে আলাদা একটা ঘরে পুরে তালা লাগিয়ে দিল। খবরটা শুনে ইরাবতী মূর্ছা গেল। আর কাবেরী চলে গেল পরিচয় পাহাড়ীর কাছে। উদ্দেশ্য, যদি তাকে হাব-ভাবে ভুলিয়ে ময়ূরপংখীতে গোপনে উঠে পড়তে পারে। পাহাড়ী বলল—"তা আমি পারব না। ধরা পড়লে তোমারও মৃত্যুদন্ড হবে, আমারও হবে। ও আমি পারব না।" মাথায় কয়েক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে ইরাবতীর মূর্ছা ভাঙানো হল। সে কিন্তু হু হু করে কাঁদতে লাগল। স্ত্রীর কান্ড দেখে অম্বুধি বলল—"আমিও যাব না। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল দ্রাবিড় দেশে গিয়ে সেখানকার বড় বড় জ্যোতিষীদের সংগে আলাপ করব। কিন্তু তুমি যখন এত কাতর হয়ে পড়েছো, আমি আর যাব না।"

এ খবর পেয়ে রত্নাকর তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন—"আপনাকে যেতেই হবে। আমরা সুদূর সমুদ্র যাত্রায় যাচ্ছি। আপনার মত একজন প্রবীণ পন্ডিত জ্যোতিষী সংগে থাকলে আমরা অনেকটা নির্ভয় হব।"

"আমার স্ত্রী, আমার শালী না থাকলে আমার দেখা শোনা করবে কে? আমি নিজে তো কিছু করতে পারি না।"

রত্নাকর খবর পাঠালেন আপনার দেখাশুনো করবার জন্য দুজন ভৃত্য নিয়োগ করা হয়েছে। আপনাকে যেতেই হবে। তাছাড়া মন্দবীর সাগরও আমার সংগে যাচ্ছেন। তিনি সর্বদা আপনার নিকট থাকবেন বলেছেন। সুতরাং আপনার পরিচর্যার কোনও ত্রুটি হবে না।

অম্বুধি রাজি হয়ে গেল। ইরাবতী কাবেরীকে মহারাজ পৃথ্বীপতির দরবারে পাঠিয়েছিল মহারাজের বিশেষ অনুমতি আনবার জন্য। কিন্তু কাবেরী সেখানে কোনও পাত্তাই পায় নি। দ্বারপালরা তাকে ঢুকতেই দেয় নি।

বিতস্তাকে নিয়েও মুশকিলে পড়ল সাগর। মহারাজের আদেশ শুনে বিতস্তা মূর্ছা যায় নি, কান্নাকাটিও করে নি। সে সাগরকে বলল, "তুমি পরিচয় পাহাড়ীকে বলো, আমি পুরুষ বেশে রত্নাকরের রাঁধুনী হয়ে যাব। এর জন্য সে যদি কিছু টাকা চায় আমি দেব –।"

"সে রাজী হবে না। ধরা পড়লে তাঁর প্রাণদন্ড হবে।"

"তাহলে তুমি যেও না –"

"আমাকে যেতেই হবে। 'উপরিকা' দেশের হাতীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি আমি। হাতী জানোয়ারটিকে আমি বড় ভক্তি করি। তুমি এখানেই থাকো না। এখানে তো তোমার প্রচুর কাজ।"

"প্রচুর কাজ সারাজীবন করেছি বলেই ছুটি চাই।"

"বাপের বাড়ি যাও।"

"সেখানে আমার বৌদি মারা গেছে। এক ঘর ছেলেমেয়ে। সেখানে গেলে বিশ্রাম হবে না। তাছাড়া বিশ্রাম মানেই তো ছুটি নয়; বিছানায় শুয়ে থাকলেও বিশ্রাম হয়, কিন্তু ছুটি হয় না। ছুটি একটা বিশেষ আনন্দ। সে আনন্দের সীমা থাকে না যদি রত্নাকর সংগে

থাকে।"

"কিন্তু তুমি যদি পুরুষ বেশে যাও, গোঁফ পরতে হবে। রত্নাকর কি চিনতে পারবে তোমায়?"

"আমার রান্না খেলেই চিনতে পারবে। আখরোটের টুকরো দিয়ে বুটের ডাল হলেই বুঝবেন, বিতস্তা এসেছে–।" সাগর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বিতস্তার দিকে। তারপর বলল—"স্বামী হিসেবে আমার এখন উচিত তোমার চুল ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে একটি আছাড় মারা। কিন্তু তা করতে ইচ্ছে করছে না। বরং মনে হচ্ছে তুমি গেলেই ভালো হ'ত। কেন বল তো–।"

"কারণ আমার মনে পাপ নেই।"

হো হো করে হেসে উঠল সাগর।

"তোমার মনের খবর ষোল আনা জানি না। কিন্তু নিজের মনের খবর রাখি। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার খুব ভালো লাগত।"

দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে। সাগর বলল—"কিন্তু রাজ-আজ্ঞা রদ করা যাবে না। তোমাকে থাকতেই হবে এখানে।"

"কিন্তু মন আমার তোমাদের পিছু পিছু যাবে।"

"সাগর আছো?" বাইরে অশ্বিধর ডাক শোনা গেল।

"এসো, এসো, ভিতরে চলে এসো।"

অশ্বিধর হাতে একটি চমৎকার চকচকে ছোট কৌটো ছিল। "রাজার ঘোষণা শুনেছো তো? মেয়েরা কেউ যেতে পাবে না। ভোগলু তো রেগে টং হয়ে বসে আছে। আমি তাকে এই অষ্টধাতুর মন্ত্রপূত কৌটোটা দিয়ে বললাম তোমার দেহটা যখন যেতে পাবে না, তোমার মনটাই এই কৌটোর ভিতর পুরে দাও। আমি সেটা রত্নাকরকে দিয়ে দেব। সে সর্বদা তোমাকে মনে করবে। ভোগলু কৌটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমি ভাবলাম বিতস্তারও তো এই দশা তাই কৌটোটা কুড়িয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম। বিতস্তা যদি চায় তার মনটা এর ভিতর পুরে দিতে পারি।"

"পার নাকি? কি করে?"

"এই কৌটোটা দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে বসে থাকো খানিকক্ষণ। একটু পরেই কৌটোর ভিতর থেকে ভোমরার গুঞ্জন শোনা যাবে। তখনই বুঝবে তোমার মন কৌটোর ভিতর বন্দী হয়ে গেছে। সেই কৌটো আমরা রত্নাকরকে দেব। রত্নাকর প্রতি মুহূর্তে তোমাকে স্মরণ করবে।"

বিতস্তা স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বলল—"দিন।"

সাগর বলল—"তুমি না হয় না-ই গেলে। ভোগবতী রেগে গিয়ে কি যে করে ফেলবে তার ঠিক নেই। তার মাথায় গোলমাল তো–।"

অশ্বি বললে—"তার মাথার ভিতর একটা আগ্নেয়-গিরি আছে। কিন্তু আমাকে 'উপরিকা' দেশে যেতেই হবে। যে লোকটি রত্নাকরকে হাতীর খবর দিয়েছে, সেই আমাকে বলেছে যে সে দেশে চামরী, ভামরী, ঝামরী আছে, উগ্রচন্ডা দেবী আছে। গভীর অরণ্যে তারা থাকে। তাদের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, তারা উলঙ্গিনী, তারা অদ্ভুত নাচে, অদ্ভুত সুরে অদ্ভুত ভাষায় গান করে। তারা নাকি হারানো জিনিস খুঁজে আনতে পারে—আমি তাদের

কাছে এই বিদ্যেটা শিখে নিতে চাই। আমার সাতাশটা বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাদের আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। আমাকে রত্নাকরের সংগে 'উপরিকা' দেশে যেতেই হবে –।"

বিতস্তা কৌটোটা নিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে অব্ধির হাতে দিল সেটা।

"নিন।"

অব্ধি কৌটোটা কানের কাছে নিয়ে শুনল একটু।

"বাঃ, চমৎকার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দেব রত্নাকরকে।"

বিতস্তা চলে গেল ভেতরে। তারপর বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মনটা সত্যি হালকা হয়ে গেছে।

জলধি কবিরাজের স্ত্রী নর্মদা যা করল তা অন্য কেউ পারত না। সে হন হন করে হেঁটে চলে গেল রাজ-বৈদ্যের বাড়ি। জলধি ও অঞ্চলের নামজাদা কবিরাজ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। রাজবৈদ্য তাঁকে খাতির করেন খুব। জলধির বাড়িতে তিনি এসেছেনও কয়েকবার। নর্মদার অভ্যর্থনায় এবং সেবা যত্নে মুগ্ধ হয়ে গেছেন প্রত্যেক বারই। তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল নর্মদা। বলল—"আপনি মহারাজকে বলে আমার জন্য একটা বিশেষ অনুমতি-পত্র জোগাড় করে দিন।"

রাজবৈদ্য একটু বিব্রতবোধ করলেন। কিন্তু রূপসী তরুণীদের প্রতি তাঁর বিশেষ একটু দুর্বলতা আছে। তাছাড়া জলধি কবিরাজের পত্নীর অনুরোধ উপেক্ষা করবার মত মনের জোরও পেলেন না তিনি। তিনি মহারাজকে গিয়ে অনুরোধ করলেন।

মহারাজ বললেন –"তাঁকে নিয়ে আসুন আমার কাছে।"

নর্মদা গিয়ে সাষ্টাংগে প্রণাম করে বসল মহারাজের সামনে।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"আপনি সমুদ্রযাত্রা করতে চাইছেন কেন?"

"আমার স্বামীর সমস্ত ওষুধ আমিই স্বহস্তে তৈরি করি। অনেক জিনিস পিষতে হয়, কুটতে হয়, গুঁড়ো করতে হয়। আমার স্বামী দিনরাত পড়াশোনা করেন। আমার একটু বিশ্রাম নেই, জীবনে আনন্দ নেই। রত্নাকর সমুদ্রযাত্রা করছেন। আমার স্বামীও যাবেন তাঁর সংগে। সেই সংগে আমিও যেতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন।" মহারাজ বললেন—"সমুদ্র যাত্রার অনুমতি দিতে পারব না। তবে আপনার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার একটা ছোট ময়ূরপংখী আছে। সেটা নিয়ে আপনি জলপথে যত খুশী ঘুরে বেড়ান। আমাদের দেশে বড় বড় নদ নদী আছে। আপনার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নদী পথে আমাদের দেশটা দেখে আসুন আপনি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি–"

নর্মদা মনে মনে হতাশ হল। বাইরে কিন্তু তাকে বলতে হল—"তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আমার কিন্তু একটু সংকোচ হচ্ছে, আমার জন্যে এত হাংগামা নাই বা করলেন–।"

মহারাজ বললেন—"মহারাজ হলে প্রজাদের জন্য হাংগামা পোয়াতেই হয়। আর এতে কোনও হাংগামাই নেই। অনেকগুলো মাঝি-মল্লা বেকার বসে মাইনে নিচ্ছে। তারা একটু কাজ করুক না। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে ময়ূরপংখীতে। বিছানাও আছে। আপনাদের সংগে কয়েকজন গায়িকাও দিচ্ছি। আনন্দে সময় কাটবে।"

নর্মদা আর কিছু বলতে পারল না। বলল—"বেশ তাই হবে।" বলে প্রণাম করে' বেরিয়ে এল। ফিরতে হল তাঁকে মহারাজের নৌকোতে। মহারাণী তার সঙ্গে অনেক উপঢৌকন দিলেন।

॥ ১৬ ॥

রত্নাকরের ময়ূরপংখী চলে গেছে সমুদ্র যাত্রায়। তার সঙ্গে গেছে অর্ণব, জলধি, অব্ধি, সাগর, অম্বুধি আর পারাবার। এদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা নৌকোর ব্যবস্থা করেছে রত্নাকর। প্রকান্ড ময়ূরপংখীতে আছে কেবল তাপ্তি। তাপ্তি আনন্দে ডগমগ। সে যে কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তার মুখের শোভা যেন বিকশিত হয়েছে পদ্মের মত। ময়ূরপংখীর বিস্তৃত খোলা বারান্দায় সে বসে' আছে রত্নাকরের পাশে। হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া বইছে। সিন্ধু শকুনরা দলে দলে উড়ছে; তাপ্তি রত্নাকরের পাশে বসে পান সাজছে। আর মাঝে মাঝে বলছে "এত হাওয়ায় বসে' থাকা ঠিক নয়, চল ঘরের ভেতর যাই।"

"চল যাই।" অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় রত্নাকর। তার মনে পড়ছে বিতস্তাকে। তার ছোট কৌটোটা তার পিরানের বুক পকেটে রয়েছে। সমানে গুঞ্জন করে' চলেছে সেটা। বিতস্তার সঙ্গে মনে পড়ছে ইরাবতীকে, কাবেরীকে, নর্মদাকে, ভোগবতীকে, ব্রাহ্মণীকে মন্দাকিনীকে। তাদের উৎসুক, উন্মুখ মনগুলি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মনের আশে-পাশে। মনে পড়ছে ফল্গুকে। সে হয়ত তার খালি বাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। এদের জন্য মন কেমন করছে তার। ওরা সবাই তাকে ভালবাসে। কিন্তু কেন বাসে? ও তো তাদের সঙ্গে মেশেনি, তাদের প্রশ্রয় দেয়নি। বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে যতটুকু ভদ্রতা করা শোভন তাই করেছে শুধু। ওরা কিন্তু সবাই উতলা। চুম্বকের টানে লৌহকণা যেমন আকৃষ্ট হয়, ওরাও তেমনি হয়েছে। ভদ্রতাটা কি চুম্বক? তার মনে হচ্ছে পুরুষ না হয়ে সে যদি নারী হত তাহলে কি ওরা আকৃষ্ট হত? হত না। তাপ্তিকেই সে ভালবাসে। তাদের ভালবাসা এর মধ্যে এসে জুটে গেছে। কারণ সে রূপবান পুরুষ এবং ভদ্রলোক।

মহারাজা পৃথ্বীপতি এ কৌশল না করলে তার সমুদ্র-যাত্রা জটিল সমস্যা হয়ে উঠত। তাপ্তি খুব খুশী হয়েছে। রত্নাকরের কিন্তু মন কেমন করছে ওদের জন্য। বিচিত্র মানুষের মন।

ময়ূরপংখীতে ছোট একটি মহেশ্বরের মন্দির ছিল। রত্নাকর সেই মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাপ্তির ইচ্ছে ছিল ঘরে গিয়ে বিছানার উপর বসে' রত্নাকরের সঙ্গে পাশা খেলবে। কিন্তু তা আর হল না। রত্নাকর মহেশ্বরের মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাপ্তির মনে হল—রত্নাকর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। কেন? এই প্রশ্নের পিছু পিছু তার মনে যে ছবি ফুটে উঠল তাতে তার দুঃখও হল, আনন্দও হল। সে বুঝল ওই বেহায়া মেয়েগুলোর জন্যেই তার স্বামীর মন কেমন করছে। দুঃখে ভরে গেল মনটা। কিন্তু তারপরই মনে হল ওদের সে কাছে ঘেঁসতে দেয় নি। কিছুদিন দেখতে না পেলেই ভুলে যাবে ওদের। মহারাজা পৃথ্বীপতিকে মনে মনে প্রণাম করল বার বার। তারপর সহসা তার মনটা খুশীতে ভরে উঠল। ঘরে গিয়ে করতাল বাজিয়ে সে গান ধরে দিল—মোহন মতির মালা কেবল আমার গলায় দুলবে। তাপ্তি খুব ভালো গায়িকা। সহসা তার সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

॥ ১৭ ॥

মহাশ্মশানে চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ভোগবতী বসে' আছে একা। ধ্যান করছে চোখ বুজে। তার গলায় হাড়ের মালা। কোলের উপর খুলি। সে মাঝে মাঝে খুলিটাকে তুলে চুমু খাচ্ছে। তার মাথার ভিতর থেকে একটা লাল রঙের শিখা বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা রক্ত-গোক্ষুর লকলক করে' ফণা বিস্তার করছে। সহসা একটা ঝাঁকড়া চুল-ওলা রোমশ বলিষ্ঠ লোক আবির্ভূত হল শূন্য থেকে। তার চোখ দুটো জ্বলছে। অগ্নি-গোলকের মতো। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। ধুনীর থেকে কিছু দূরে দুটো বাঘ থাবা পেতে বসে' আছে নিস্পন্দ হয়ে।

ভোগবতী বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে মাঝে মাঝে কেবল মড়ার খুলিটাকে চুমু খাচ্ছে। যে লোকটি শূন্য থেকে নেমে এসেছে, তার সম্বন্ধেও সে উদাসীন। তখন সেই লোকটির ভিতর থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরুতে লাগল। তখন ভোগবতী তার দিকে চেয়ে দেখল।

"কে তুমি ?"

"আমি মহা-ঝঞ্ঝা। বরুণ দেবের আদেশে আপনার কাছে এসেছি। আপনি যা বলবেন, তাই আমি করব।"

"আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। রত্নাকর, অব্ধি, আর তাপিত আমাকে অপমান করেছে। আমাকে না নিয়ে ময়ূরপংখী ভাসিয়ে প্রকান্ড নৌবহর নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেছে তারা। তুমি বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় তাদের উপর। তাদের নিশ্চিহ্ন করে' দাও। তারা বুঝুক যে ভোগবতীকে উপেক্ষা করা যায় না।"

লোকটি বলল—"বেশ তাই হবে।" বলেই সে অন্তর্ধান করল। তারপরেই আবির্ভূত হল আর একজন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি তার। অমাবস্যার অন্ধকারের সংগে তার দেহটা যেন একাকার হয়ে গেছে। চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার সর্বাংগে বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে মাঝে মাঝে।

"তুমি কে ?"

"আমি মহামেঘ। আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন—আমি তাই করব। আপনি মহাঝঞ্ঝা দেবকে এখুনি যে আদেশ দিলেন তা আমি শুনেছি। আমাকেও কি তাই করতে হবে ?"

"হ্যাঁ, তাই করতে হবে। ময়ূরপংখী আর নৌবহর আমি ধ্বংস করতে চাই। তুমি মহাঝঞ্ঝা দেবের সহকারী হও—।"

"আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হবে।"

মহামেঘ অন্তর্ধান করল।

ভোগবতী অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল—"রক্তদশনা মহাকালী এবার আমাকে ধ্বংস কর। আমার এই যৌবন, আমার এই রূপ, আমার এই হাস্য-লাস্য, অব্ধিকে বাঁধতে পারেনি। রত্নাকরকে মুগ্ধ করেনি। এ সব ধ্বংস কর, ধ্বংস কর।" তার মাথায় যে রক্ত গোক্ষুর ফণা তুলে বসেছিল সে দংশন করল ভোগবতীকে। আর সেই নিস্তব্ধ বাঘ দুটো লাফিয়ে পড়ল তার উপর। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার দেহ। তারপর ভীষণ একটা শব্দ হল। শ্মশানের খানিকটা ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে বসে' গেল সেটা, ভোগবতী পাতালে চলে গেল।

॥ ১৮ ॥

তিন্তিড়ী বিমর্ষ হয়ে বসেছিল নিজের ঘরে। সমুদ্রের উপর যে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে তার ঝাপটা এ অঞ্চলেও এসেছে। সমুদ্রের উপর ঝড়-বৃষ্টির যে তুমুল তান্ডব হয়ে গেছে সে খবরও পেয়েছে তিন্তিড়ী। রত্নাকর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার জন্যে উৎকৃষ্ট গাঁজা সে নিয়ে আসবে। কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে যে প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে তার কবল থেকে রত্নাকরের নৌবহর রক্ষা পেয়েছে কি ? এ অঞ্চলের অনেক লোক গেছে রত্নাকরের সঙ্গে। সকলের বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। অবশ্য সঠিক খবর কেউ পায়নি। সেকালে খবরের কাগজ ছিল না। তবে সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তিন্তিড়ীর আর একটা অসুবিধা হয়েছে। গাঁজার খদ্দের অনেক কমে' গেছে। অনেক গাঁজাখোর চলে' গেছে রত্নাকরের সঙ্গে। তার ভান্ডারে গাঁজাও বাড়ন্ত। এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না যে রাখমপুরের বাজার থেকে গাঁজা এনে দেয়। খুব ভালো গাঁজা অবশ্য খানিকটা আছে, কিন্তু সে গাঁজার দাম এত বেশী যে তার চাহিদা বেশী হয় না। গাঁজাটা কড়াও খুব। অনেকে সহ্য করতে পারে না। ঝানু গাঁজাখোর হরিশ্চন্দ্র দ্বিবেদী একটান খেয়ে তিনদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তিন্তিড়ী ঘরে বসে এইসব ভাবছিল। এমন সময় হুম, হুম, হুম করে ডেকে উঠল পেঁচাটা। তিন্তিড়ী বুঝল রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ভাবল এবার কপাট বন্ধ করে' শুয়ে পড়া যাক। যদিও শুলে এখন ঘুম আসবে না, কিন্তু তবু শুয়ে পড়াই ভালো। চোখ বুজে মহেশ্বরের ধ্যান করতে করতে ঘুম এসে যাবে একটু পরে। কপাট বন্ধ করতে গিয়ে দেখে কপাটের সামনে কমন্ডলু হাতে ভৃঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো রং। তিন্তিড়ীকে দেখে ভৃঙ্গী আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হাসলেন। মনে হল একটা কুচকুচে কালো বড় মুক্তকেশী বেগুনের পেঠটা কেটে কে যেন ফাঁক করে' দিল সেটা।

"কি তিন্তিড়ী আমাকে চিনতে পারছ ?"

তিন্তিড়ী তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তাঁকে।

"আপনাকে কি ভুলতে পারি। আপনাকে গঞ্জিকা সেবন করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলাম একদিন।"

"আজও খাওয়াও। বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে মহেশ্বরের আদেশে। প্রথমে গেলাম মন্দর পর্বতের সম্মতি নিতে। অনেক ইতস্তত করে তিনি সম্মতি দিলেন। তারপর গেলাম অনন্তনাগের কাছে। অনন্তনাগের সম্মতি পেয়ে গেলাম সহজে। তারপর গেলাম মহাকূর্মের কাছে। তিনিও সম্মতি দিলেন। এখন যেতে হবে সুমেরু পর্বতে। সেখানে মহেশ্বর, বিষ্ণু, আর ব্রহ্মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাদের খবর দিতে হবে—যে এঁরা তিনজনই অবশেষে সম্মত হয়েছেন। প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না—।"

"ব্যাপার কি, বুঝতে পারছি না।"

"সমুদ্র-মন্থন হবে।"

"সমুদ্র-মন্থন ? কেন ?"

"দেব এবং দৈত্যরা মহাদেবকে গিয়ে ধরেছিলেন—আমরা সুধাপান করে অমর হতে চাই, আপনি তার ব্যবস্থা করুন। মহাদেব বললেন, প্রত্যেক জিনিসই নিজের বীর্যবলে অর্জন করতে হয়। সুধা আছে সমুদ্রের তলায়। সমুদ্র-মন্থন করো, সুধা পাবে। দেবতারা

দৈত্যরা একথা শুনে হকচকিয়ে গেল। বলল—সমুদ্রকে মন্থন করব কি করে? মহাদেব বললেন, আচ্ছা, ভেবে বলছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সুমেরু পর্বতে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন কি করে' এ দুরূহ কাজ সম্ভব করা যায়। সভার পর সভা বসতে লাগল। ভালো কথা, তুমি আগে এক কলকে সাজো দেখি। বড় শ্রান্ত লাগছে। এক টান দিয়ে তারপর বাকীটা বলব।—"

ভৃংগী ঘরের ভিতর ঢুকে তিন্তিড়ীর খাটের উপর বসলেন। তিন্তিড়ী তখন লক্ষ্য করল ভৃংগীর সর্বাংগে বড় বড় লোম রয়েছে। গোঁফ দাড়ি তো আছেই। তিন্তিড়ী তাড়াতাড়ি একটা বড় কলকে নিয়ে সাজতে বসে' গেল।

প্রকান্ড একটা টান দিয়ে দম বন্ধ করে' বসে রইলেন ভৃংগী। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন নাক দিয়ে। সব ধোঁয়া যখন বেরিয়ে গেল তখন তিন্তিড়ীর পিঠ চাপড়ে বললেন—" বাঃ, খাসা মাল রেখেছ তুমি।এক টানেই চাংগা করে দিয়েছে আমাকে। আমার গাঁজা একদম ফুরিয়ে গেছে। দীর্ঘজীবী হও।"

"আপনার গল্পটা এবার বলুন।"

"গল্প কি হে, এ সত্যি কথা। শোন তবে। ওঁরা তিনজনে মিলে শেষে ঠিক করলেন যে মন্দর পর্বত ছাড়া আর কেউ মন্থন-দন্ড হতে পারবে না। মন্দর পর্বত এগারো হাজার যোজন উঁচু, আর মাটির নীচেও পোঁতা আছে এগারো হাজার যোজন। কিন্তু এ পর্বতকে তুলে সমুদ্রের ধারে আনবে কে? আর মন্থন-রজ্জুই বা কোথা পাওয়া যাবে?"

বিষ্ণু বললেন—পরম ভক্ত অনন্তনাগ মহাতপস্বী এবং মহাশক্তিশালী। সে যদি রাজী হয় মন্দর পর্বতকে উপড়েও আনতে পারবে। মন্থন রজ্জুও হতে পারবে। মহেশ্বর যদি অনুরোধ করেন তাহলে সে সম্ভবত রাজী হয়ে যাবে। ব্রহ্মা এইবার বাগড়া লাগালেন। বললেন, সমুদ্র মন্থন করলে কত প্রাণী হত্যা হবে তা হিসেব করেছ? এরা সুধা খেয়ে অমর হবে বলে আমার সৃষ্টিটা কি তোমরা তছনছ করে' দেবে? সমুদ্র মন্থন করলে তো মহা প্রলয় হবে। সমুদ্রের ভিতর যে সব অপূর্ব প্রাণী আমি সৃষ্টি করেছি একটাও বাঁচবে না। আর একটা কথা তোমরা ভেবে দেখছ না। আমার চোখে দেবতা আর দৈত্য দুইই সমান। অদিতি এবং দিতির বংশধর এরা। কিন্তু দৈত্যরা বেশী বলবান। তারা যদি সুধা পান করে' অমর হয় তাহলে তো দেবতাদের মেরে ছাতু করে' দেবে। তারা মরবে না, ছাতুর স্তূপ হয়ে থাকবে। সেটা কি বাঞ্ছনীয়? ভালো করে' ভেবে দেখ তোমরা।

মহেশ্বর বললেন—বেশ ভেবে দেখা যাক। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। দেবতাদের মধ্যে এবং দৈত্যদের মধ্যে অনেকে আমাদের পরম ভক্ত। অনেককে আমি খুব ভালবাসি। তাদের একটা আবদার যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে দেবাদিদেব হয়েছি কেন? শূন্যকুম্ভ হয়ে পূর্ণকুম্ভের অভিনয় আমি করতে পারব না। আমার আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্য আমি একটা কেন দশটা মহাপ্রলয় করতেও পিছুপা নই। বিষ্ণু বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখা যাক। এইভাবে সভার পর সভা হতে লাগল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হয় না। ব্রহ্মা শেষে বললেন—আমরা মহেশ্বরের উপর ভার দিয়ে দিচ্ছি, সেই যা ভালো মনে করে করুক। একটা সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেললে আর একটা অভিনব সৃষ্টি আমি করতে পারব। কিন্তু আর সভার পর সভা আমি করতে পারব না। আমি চললাম। ব্রহ্মা চলে যাবার পর বিষ্ণু বললেন—আপনি যা ঠিক করবেন তা আমিও মেনে নেব। মহাদেব চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখি। এই নিয়ে ভাবাভাবি দিন

কয়েক চলল। মহাদেব হঠাৎ কাল আমায় আদেশ দিলেন—তুমি গিয়ে ভালো করে জেনে এস মন্দর পর্বত, অনন্তনাগ আর মহাকূর্ম ঠিক রাজি আছে কিনা।

"মহাকূর্ম কি করবে ?"

"মহাকূর্ম বিরাট বিশাল কাছিম একটা। সে সমুদ্রের ভিতর নেবে যাবে। তারপর অনন্তনাগ মন্দর পর্বতকে তার উপর বসিয়ে জাপটে ধরবে তাকে। তারপর মুখের দিকে দৈত্যরা আর ল্যাজের দিকে দেবতারা ধরে' মন্থন করবে সমুদ্রকে। আমি আজ ওদের তিনজনের কাছে গিয়েছিলাম। ওরা সম্মত হয়েছে। এই খবরটি মহাদেবকে দিতে যাচ্ছি। তুমি আর এক কলকে সাজ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দিচ্ছি। এতবড় একটা কান্ড হবে, আমি দেখতে পাব না ?"

"তুমি দেখতে চাও, তোমাকে দেখাব। নিয়ে যাব তোমাকে সুমেরু পর্বতে। সেখানে বসে সব দেখতে পাবে তুমি। তবে কবে যে মন্থন শুরু হবে তা তো জানি না। মহেশ্বর যেদিন ঠিক করবেন সেইদিনই হবে। সেইদিন তোমাকে সুমেরু পর্বতে নিয়ে যাব।"

"আমি কি যেতে পারব ?"

"আমার অনেক চেলা আছে। তারা তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। তুমি ভেবো না। তাড়াতাড়ি সেজে ফেল আর এক কলকে। আমাকে এখন কৈলাসে যেতে হবে। মহেশ্বর সেখানে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

তিন্তিড়ী তাড়াতাড়ি আর এক দলা গাঁজা হাতে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে দলতে লাগল।

॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণী নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল তার ঘরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। তার মনে যে বিপ্লব চলছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। মাটিতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে তার কপাল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের দাঁত দিয়ে দুহাত কামড়ে কামড়ে হাত দুটোকেও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। নিজেকে শাস্তি দিচ্ছিল সে। সে এখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল সে অসতী। পারাবারের মত দেব চরিত্র লোকের স্ত্রী হবার যোগ্যতা তার নেই। সে সারাজীবন স্বামীর সঙ্গে ভন্ডামি করে এসেছে। যদিও রত্নাকর কোনও দিন তার অঙ্গ স্পর্শ করে নি, তবু মনে মনে সে তাকে অহরহ কামনা করছে। সে মনে মনে অসতী। হঠাৎ সে নিজের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে লাগল। ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল তার দুচোখ দিয়ে। কপালের রক্ত আর চোখের জল মিশে সমস্ত মুখটা বিভৎস হয়ে উঠল।

হঠাৎ সে দেখতে পেল পারাবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অশরীরী স্বচ্ছ পারাবার। চীৎকার করে উঠল ব্রাহ্মণী—"তুমি ছুঁয়ো না আমাকে। আমি অসতী, আমি ছাগী, আমি কুক্কুরী। আমি পাপীয়সী। আমাকে স্পর্শ কোর না। তুমি কবি, তুমি সুন্দরের উপাসক, তুমি স্রষ্টা, আমি তোমার যোগ্য সহধর্ম্মিণী হ'তে পারিনি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—" ক্রমাগত মাথা কুটতে লাগল সে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সবাই দেখল ব্রাহ্মণী আত্মহত্যা করেছে। ঘরের আড়কাটা থেকে তার

উলঙ্গ দেহটা ঝুলছে। নিজের শাড়ি পাকিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে সে।

জলধির স্ত্রী নর্মদা তার স্বামীর ওষুধগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছিল।

সে-ই দিবারাত্রি খেটে এসব তৈরী করেছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি তার অনুরাগ আছে বলেই নয়, করেছিল সে স্বামীকে ভালোবাসে বলেই। তার খামখেয়ালী স্বামী যে কত বড় প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কত বড় পন্ডিত, কত রকম নূতন ওষুধের স্রষ্টা তা সে জানত। আদা, নিম, মধু, আর গোলমরিচ দিয়ে সে যে অদ্ভুত বড়ি তৈরী করেছিল তাতে বহু রোগী দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে—তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ওষুধ সে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করবার জন্য দিবারাত্রি কত পড়াশোনা করেছে তা নর্মদার থেকে আর বেশী কে জানে। লেখাপড়ায় ব্যস্ত স্বামীকে দেখলে তার মনে হত ও সাধারণ লোক নয়—ও তপস্বী। চিকিৎসা জগতের দুর্গম অরণ্যে তন্ময় হয়ে বিচরণ করতে দেখেছে তাকে নর্মদা। জোর করে তাকে নাওয়াতে হ'ত, খাওয়াতে হত। এই একনিষ্ঠ সত্য-সন্ধী দেবতাকে সত্যিই ভক্তি করত নর্মদা। তাঁর আদেশে তাই সে অনেক কটুগন্ধ ভেষজ বেটেছে, কুটেছে, সিদ্ধ করেছে—তার কষ্ট হত খুব, তবু সে করেছে স্বামীকে ভক্তি করত বলে, ভালবাসত বলে।

রত্নাকরকেও সে ভালবাসত। সে ভালবাসায় কোনও লুকোচুরি ছিল না, গ্লানি ছিল না। রত্নাকরের রূপে, গুণে, ভদ্রতায় সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার সান্নিধ্য তার ভাল লাগত। তার কাছে গেলে মনে হত কোনও সুগন্ধ ফুলবাগানে সে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে দোষ কি? মহারাজা এরকম একটা আদেশ দিলেন কেন? তাপ্তিকে বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন, আর কাউকে দেন নি কেন? এছাড়া তিনি মহারাজা হয়েছেন বলে কি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করবেন? আমরা কি তার বাঁদী? মানব না তাঁর এ আদেশ। সমুদ্র-যাত্রা তিনি করতে দেবেন না? আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে যাব। দিবারাত্রি হাঁটব। মহেশ্বরের রাজত্ব পার হ'য়ে গিয়ে নৌকা ভাড়া করব। সেই নৌকো করে' আমি রত্নাকরের নৌবহরকে ধরবই।

"ফাগুন—"

ডাক শুনে তাদের বাগানের মালী ফাগুন এসে দাঁড়াল। বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ় শবর একজন।

"তুমি এই বাড়ি নিয়ে থাকো। আমাদের জমি থেকে যা আয় হয় তা তোমরাই নিও। আমি কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে বেরুচ্ছি—।"

"যে আজ্ঞে। আমি ভার নিলাম। আপনি কিসে যাবেন?"

"আমি হেঁটে যাব। তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো?"

"আছে—।"

"গাছপালা গুলোতে সার জল দিও। আকন্দ গাছে অনেক ফুল হয়েছে। সেগুলো তুলে শুকিয়ে রেখে দিও।"

"রাখব।"

ফাগুন চলে গেল। নর্মদা পেটিকা থেকে কিছু অর্থ বার করে এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। হন হন করে হাঁটতে লাগল হিরন্ময়ী নদীর দিকে। হিরন্ময়ী সাগরে গিয়ে মিশেছে।

অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী এবং তার বিধবা বোন হঠাৎ যেন বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের

দুজনেরই মনে হল মস্ত বড় একটা দাঁও ফসকে গেল যেন। রত্নাকরের মন ধনী দিলদরিয়া রূপবান লোকের সঙ্গে তার ময়ূরপংখীতে চেপে দীর্ঘকাল সমুদ্রের উপর ভাসতে ভাসতে যে মজা তারা লুটবে ভেবেছিল তা হঠাৎ নাগালের বাইরে চলে' গেল। কাবেরীর মনোভাব মৎস শিকারীর মত। সে মনে মনে কল্পনা করছিল যে একটা বড় রুইমাছ তার বঁড়শি গিলেছে, আস্তে আস্তে এবার খেলিয়ে তুলতে হবে। হঠাৎ মাছটা যে এক ঝটকায় সূতো ছিঁড়ে পালাবে এ সে ভাবতেও পারেনি। রত্নাকরের নৌবহর যখন চলে গেল তখন ইরাবতী বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কাবেরী কাঁদল না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বসে রইল নীরব হয়ে। চোখের দৃষ্টি থেকে আগুনের হলকা বেরুতে লাগল। সে ঠিক করে ফেলল এখানে আর থাকবে না। নিজের শ্বশুর বাড়ি ফিরে যাবে। সেখানে তার এক বিপত্নীক দেওর আছে। আছে যদু পুরোহিতের ছেলে মাধব। আছে জমিদার নায়েব কান্তি-শশাঙ্ক। এদের অতি মনোযোগের ধাক্কাতেই সে পালিয়ে-এসেছিল তার দিদির কাছে। এসে দেখেছিল রত্নাকরকে। দেখে মজেছিল। কিন্তু রত্নাকর ফসকে গেল। এখন শ্বশুরবাড়িতেই-ফিরে যাওয়া যাক। যৌবন তো চিরকাল থাকবে না। দেহ বুভুক্ষিত, মন পিপাসিত। এখানে থেকে লাভ কি।

সে ইরাবতীকে বলল—"দিদি, আমি রঙ্গনপুরে ফিরে যাচ্ছি। এখানে আর ভালো লাগছে না।"

ইরাবতী চুপ করে রইল। তারপর বলল—"যেতে চাও, যাও। আমি তোমাকে বারণ করব না। তুমি নিজেই এসেছিলে, নিজেই চলে যাচ্ছ। আমার বলবার কিছু নেই।"

"তুমি কি করবে?"

"আমি স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকব। আমাদের এত জমি, এত বড় গুড়ের ব্যবসা—তাই নিয়েই থাকব আমি।"

কাবেরী যখন চলে' গেল, তখন চুপ করে' বসে রইল ইরাবতী। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তার অসমর্থ অসহায় স্বামীকে সে তার পান্ডিত্যের জন্য খুব শ্রদ্ধা করত। শুধু জ্যোতিষ শাস্ত্রেই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরাট পন্ডিত অম্বুধি। বিবাহের পর ইরাবতীকে সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রও শিখিয়েছিলেন কিছু কিছু। ইরাবতী তাঁর পত্নীই নয় কেবল, শিষ্যাও ছিল। ইরাবতী সত্যিই শ্রদ্ধা করত তাঁকে। সে তার প্রণয়িনী হতে পারেনি। সে তাকে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসায় প্রণয়ের উন্মাদনা ছিল না, ছিল জননীর স্নেহের স্নিগ্ধতা। ওই পঙ্গু অসহায় বিদগ্ধ লোকটিকে ঘিরে তার মাতৃত্বই যেন সদাজাগ্রত ছিল। রত্নাকরকে প্রথম যেদিন সে দেখে সেদিনই সে প্রথম বুঝতে পেরেছিল প্রেম কি। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা যেমন নিমেষে সোনা হয়ে যায়, অনেকটা তেমনি হল যেন তার। তাকে ঘিরে সে কত সোনার স্বপ্নই যে রচনা করেছে। আশা ছিল এই সমুদ্র যাত্রায় সে তার আর একটু কাছে আসতে পারবে। হয়ত তার হৃদয়ও জয় করতে পারবে। রাজার আদেশে হঠাৎ নাগালের বাইরে চলে' গেল সব। রত্নাকর আবার কবে ফিরবে, তার স্বামীর সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা এ সবই কেমন যেন অনিশ্চিতের অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রে নাকি ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। রত্নাকরের নৌবহর সে ঝড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে কি না কে জানে। ইরাবতীর মন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। যার জন্যে এত আশা করে বসে আছি সে কি আর আসবে না? সহসা জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা মনে পড়ল—

পততি গতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযাণং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্হানম্।

এই শ্লোকটি মনের মধ্যে গুঞ্জরন করে উঠল সহসা। তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করতে লাগল সে কবিতাটি। তার মনে হল তার দয়িতকে সে ওই কবিতার মধ্যেই যেন পেয়েছে। রত্নাকরই যেন বনমালী, তার অপেক্ষায় যমুনা তীরে নির্জন কুঞ্জবনে শয্যা রচনা করে অপেক্ষা করছে। তার মানস লোকের সেই যমুনা তীরে সে মনে মনে চলে গেল, দেখতে লাগল রত্নাকর তার অপেক্ষায় বসে' আছে। তার জন্যে শয্যা রচনা করছে—। কাব্যের ভিতর দিয়ে রত্নাকরের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল ইরাবতী। তারপর সহসা একটা পথও পেয়ে গেল সে। কাব্যের ভিতর দিয়েই সে রত্নাকরকে স্পর্শ করবে। খুঁজে খুঁজে বের করল গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, আর অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, স্বপ্নবাসবদত্তা। ঠিক করল এদের ভিতর দিয়েই আমি মিলিত হব রত্নাকরের সঙ্গে। কোনও রাজার আদেশ সে মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সে মেঘদূত খুলে বসল।

বিতস্তাও হতাশ হয়েছিল। কিন্তু তার বেশী মন কেমন করছিল তার মল্লবীর স্বামীর জন্যে। বিতস্তাকে নিয়ে লোফালুফি করত সে। যখন বুকে চেপে ধরত—মনে হত পিষে ফেলবে বুঝি। দম বন্ধ হয়ে যেত। তার জীবনের সাধনা ছিল শক্তি। সে মনে করত যার শক্তি নেই, সে অমানুষ, সে কৃপার পাত্র। সে বার বার বলত—শক্তির উপরই মহত্ত্বের আসন। শক্তিই পৃথিবীতে সমস্ত মহত্ত্বের ভিত্তি। শক্তিই পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য। বিতস্তাকে মাঝে মাঝে বলত—তোমার বিতস্তা নামটা খারাপ নয়, কিন্তু একটু সৌখীন গোছের। তোমার নাম কালী, দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী হলে আমি আরও খুশী হতাম। সারাজীবন শক্তির চর্চাই করছে সে। তার এই বীর শক্তিমান স্বামীকে সে নিত্য নূতন রকম রান্না করে খাওয়াত। সাগর একটি জিনিস খেত রোজ। কোনদিন ডাল, কোনদিন পায়েস, কোনদিন ছানার ডালনা—রোজ নূতন কিছু হওয়া চাই। তার একটি প্রকান্ড রুপোর গামলা ছিল। সেই গামলায় এক গামলা খাবার দিতে হত তাকে। যেদিন মাংস খেত সেদিন তারজন্য আলাদা একটি ছাগ-শিশু বলি দিতে হ'ত মা-কালীর মন্দিরে। পুরোটাই খেয়ে ফেলত সে। তার এই স্বামীর জন্যেই বেশী কষ্ট হতে লাগল তার।

বিতস্তা শ্যামবর্ণা, ছিপছিপে গড়ন, অপরূপ মুখশ্রী, এক পিঠ চুল। হাসিটি সুন্দর, দাঁতগুলি মুক্তোর মত। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়। সে শিল্পী। কি করে তার স্বামীকে নিত্যনূতন খাবার খাওয়াবে এই চিন্তাই তার একমাত্র চিন্তা ছিল এতদিন। কিন্তু সে রত্নাকরকেও ভালোবেসেছিল। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের মধ্যে সে দেখত রত্নাকরকে। শুধু দেখত না, পূজো করত মনে মনে। সে পূজোর মধ্যে কাম বা লালসা হয়ত প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সেইটাই তাকে অভিভূত করে নি। অজ্ঞাতসারে সে সব কথা তার মনেও হয় নি কখনও। মনে মনে সে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকত—ওই সূর্য্যেরই দিকে। মনে মনে বলত—তুমি সুন্দর, তুমি উজ্জ্বল, তুমি মহৎ, তুমি বৃহৎ, তুমি জ্যোতির উৎস। তুমি বর্ণের জন্মদাতা। তোমার কাছে আসতে পেরেছি, তোমাকে রেঁধে খাইয়েছি, তুমি আমাকে বন্ধুপত্নীরূপে সমাদর করেছ, এতেই আমি ধন্য। তুমি আমাকে তোমার ময়ূরপংখীতে

নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করবে বলেছিলে—যা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল, সেই সম্ভাবনার আশ্বাস দিয়েছিলে তুমি। আনন্দে আত্মহারা করেছিলে আমাকে। হঠাৎ সব ভেঙেগ গেল। এই সব কথাই সে ভাবছিল বসে বসে। এমন সময় বান্ধবী উল্‌কি এল।

"আজ রান্নাঘরে যাও নি যে—"

"কার জন্যে রাঁধব বল। যার জন্যে রোজ রান্নাঘরে যেতাম সে তো আমাকে ফেলে চলে গেছে।"

উল্‌কি তার পাশে এসে বসল। চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। সে কুম্ভকার কন্যা। কুমারী এবং শিল্পী। পুতুল গড়ে, প্রতিমা গড়ে, মূর্তি গড়ে। এই জন্যেই বিতস্তার সঙেগ তার ভাব। বিতস্তার শিল্পীমন মুগ্ধ হয়েছিল উল্‌কির শিল্প-প্রতিভা দেখে। গরীবের মেয়ে উল্‌কি। বিতস্তার কাছেই সে খায় দু-বেলা। রাত্রে শোয় তার পিসেমশায়ের বাড়িতে। পিসেমশাই বিশ্বম্ভর মাটির বাসন তৈরি করে নানারকম। তার বাবাও বিতস্তার বাড়িতে খায়। অনেক লোক খায় সাগরের বাড়িতে। তাদের জন্য আলাদা রন্ধন-শালা আছে, আলাদা রাঁধুনী আছে।

উল্‌কি হঠাৎ বলল—"তুমি এতদিন আমাকে রেঁধে দিয়েছ। আজ আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াই। কেমন?"

"খাওয়াও। আমার নিজের কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। কি রাঁধবি তুই?"

"আমি তো তোমার মত রাঁধতে পারব না। মটরশুঁটি দিয়ে মুগের ডালের খিচুড়ি রাঁধি। আর তার সঙেগ ব্যাসন দিয়ে বেগুনি। তোমাদের রান্না ঘরে মৌরলা মাছ এসেছে দেখলাম। সেখান থেকে তাই নিয়ে আসি কিছু। খিচুড়ির সঙেগ মৌরলা মাছ ভাজা—।"

"উনি না ফেরা পর্যন্ত মাছ আমি খাব না। তবে তোর যদি খেতে ইচ্ছে হয় নিয়ে এসে ভাজ কিছু।"

"তুমি সধবা মানুষ, মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে? স্বামীর অমঙগল হবে যে তাতে।"

"আমার কেন যেন মনে হচ্ছে উনি আর বেঁচে নেই। রত্নাকরের নৌ-বহর ঝড়ে ডুবে গেছে। রত্নাকরও বেঁচে নেই। তাঁকেও ভালোবাসতাম দেবতার মত। আমার স্বামীকে আগে খাইয়ে তবে আমি খেতাম। ভাল খাবার করলেই পাঠিয়ে দিতাম রত্নাকরকে। তাঁদের জন্যেই রান্না করতাম। ওঁরা ভালো বললে আমার কি আনন্দ যে হত তা তোকে বোঝাব কি করে? আমার নিজের জন্যে কোনও ভালো রান্না আমি আর করব না এজীবনে। কারণ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আর ফিরবেন না।"

উল্‌কি বলল—"আমার গুরু-ঠাকুর বলেন মানুষের দেহটাই মরে যায়। আত্মার মৃত্যু নেই। তিনি একদিন বলছিলেন আমরা মাটির ঠাকুরের ভিতর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি ভক্তির জোরে। ভালোবাসার টানে দেবতা যদি আসতে পারেন মানুষও পারবে না কেন?"

উৎসুক হয়ে উঠল বিতস্তা। বলল—"দেবতারা মাটির প্রতিমায় আসেন এটা কি সত্যি?"

"সত্যি! আমি দেখেছি আমার ঠাকুর মশাই যখন তাঁর ইষ্টদেবতা নারায়ণকে প্রণাম করেন তখন নারায়ণ ঝুঁকে আশীর্বাদ করেন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে। আমি আড়াল থেকে দেখেছি একদিন।"

"সত্যি?"

"সত্যি। আমি তোমার স্বামীর মূর্তি গড়ব। তুমি তাঁর সামনে বসে ধ্যান কর। আমার

বিশ্বাস তিনি আসবেন আমার মূর্তির ভিতর। তখন তুমি তাঁকে রান্না করে' ভোগ দিও তারপর তাঁর প্রসাদ পাব আমরা দুজনে।"

"তুই পারবি মূর্তি গড়তে?"

"নিশ্চয় পারব।"

"রত্নাকরের মূর্তি?"

"তা—ও পারব।"

"তাহলে দুটো মূর্তি গড়। রত্নাকরকেও আমি ভালবাসি তাঁকেও রান্না করে' খাইয়েছি। তাঁর জন্যেও মন কেমন করছে—।"

"বেশ, দুজনেরই মূর্তি গড়ে দেব আমি। তুমি তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর।"

"মূর্তি করতে তো সময় লাগবে।"

"তা লাগবে বই-কি—।"

"তা হলে আজ থেকেই শুরু কর। যতদিন মূর্তি তৈরী হচ্ছে ততদিন আমি দুধ আর ফল খেয়ে থাকব। মূর্তি তৈরী হলে রান্না ঘরে ঢুকব। তুই কি খাবি? আমি রাঁধুনিকে ডেকে পাঠাই—।"

"আমিও দুধফল খাব।"

"চল তাহলে তোর বাড়িতে যাই। দুজনেই আরম্ভ করে দিই।"

"মূর্তি তোমার বাড়িতেই গড়ব। আগে মাটি তৈরি করতে হবে। আমি মাটি নিয়ে আসি। একটা চাকর বরং দাও আমার সংগে। দু'-ঝুড়ি মাটি আনতে হবে। আমি এক ঝুড়ি আনব। আর—"

"আর এক ঝুড়ি আমি। চল আর দেরী করিস নি। আজই আরম্ভ করতে হবে।"

দুজনেই বেড়িয়ে পড়ল। সাগরের ঘরের বারান্দায় সেইদিনই শুরু হয়ে গেল মূর্তি তৈরি। উল্কির নির্দেশমত বিতস্তাও সাহায্য করতে লাগল তাকে। বিতস্তার সমস্ত মন শুধু একাগ্র নয়, পুষ্পিত হয়ে উঠল যেন। তারপর মূর্তি দুটি যখন আস্তে আস্তে মূর্ত হতে লাগল, বিতস্তা দুরুদুরু-বক্ষে নির্ণিমেষে চেয়ে রইল তাদের দিকে। আসবে কি সত্যি ওরা?

মন্দাকিনী স্বল্প-ভাষিণী। সে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। আশ্রমের সঙ্গিনী তিনজন—গংগা, যমুনা, সরস্বতী—হতাশ হয়েছিল, কিন্তু অতটা মুষড়ে পড়ে নি। তারা আশ্রমের কাজকর্ম বন্ধ করে নি। রান্নাবাড়া করছিল, আশ্রম পরিষ্কার রাখছিল, মাঠে যাওয়া বন্ধ করে নি। মন্দাকিনী একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে ফুরিয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রচালিতবৎ স্নানাহার করছিল সে। চোখ বুজে শুয়েও থাকত সে অনেকক্ষণ, ঘুমোত না কিন্তু। কথা বলছিল না একেবারে। সে ভাবছিল এবার তার কি করা উচিত। সে একদিন রাজকন্যা ছিল। একটা বিষাক্ত সাপের দংশনে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল তার জীবন। সন্ন্যাসী অর্ণব তাকে বাঁচালেন, বিবাহ করলেন, সন্ন্যাসিনী জীবনে দীক্ষিত করলেন, তার বাবাকে বললেন—রাজকন্যারূপে আপনার কন্যার আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসিনীরূপে সে এখন বেঁচে থাকতে পারে।

লোহিতরাজ্য থেকে নিয়ে এলেন তাকে এখানে। তারপর যা ঘটলো তা আশ্চর্য। তা অলৌকিক। তাকে সেবার করবার জন্য হিমালয় কন্যারা নেমে এলেন। তার

ভরণপোষণের জন্য পরম গুণবান, পরম রূপবান রত্নাকর প্রচুর জমি দান করলেন তাঁকে, আশ্রম বানিয়ে দিলেন। মহাতপস্বী অর্ণবের নাগাল পাওয়ার জন্য সে দিবারাত্রি কৃচ্ছ্র-সাধন করতে লাগল। চিরকাল আদরে লালিত রাজকন্যা ভূমি শয্যায় শুয়েছে, একবেলা আহার করেছে, পরিধান করেছে এমন বস্ত্র যা তাদের বাড়ির দাসীরাও পরে না। তার বাবা গোপনে দুজন ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন তার খবর রাখবার জন্য, পাঠিয়েছিলেন অর্থ। কিন্তু সে গ্রহণ করে নি কিছু। ফিরিয়ে দিয়েছে চাকরদের। কেন? কারণ সে আশা করেছিল অর্ণবের নাগাল পাবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে বুঝতে পারল অর্ণব মহাকাশ, সে সামান্য ঘুড়ি। আকাশকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার সাধ্য তার নেই। কোনও কালে হবে না। কিছুদিন আগে লোহিতরাজ্য থেকে আবার দুজন ভৃত্য এসেছিল। তখনও তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল সে। তখন রত্নাকরের মহত্ত্বে তার মন অভিভূত। সহসা আজ তার জীবনের সূর্য-চন্দ্র দুই-ই নিবে গেল। এখন সে কি করবে? নির্বাক হয়ে এই কথাই ভাবছিল সে। অনেক ভেবে ঠিক করলে বাবার কাছে লোহিতরাজ্যেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে রাজকন্যার জীবনই যাপন করবে। অর্ণব বলেছিলেন তাহলেই মৃত্যু হবে। তাই হোক। এখন আর বেঁচে লাভ কি। হঠাৎ একদিন সে গঙ্গাকে বলল—"আমাকে তোমরা লোহিতরাজ্যে নিয়ে চল। এখানে আমি আর থাকব না?"

"কেন?"

"এখানে আর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে এখানে থাকার আর সার্থকতা নেই। আমি বাবার কাছে ফিরে যাই।" যমুনা আর সরস্বতীও সেখানে ছিল। একটু রহস্যময়ভাবে তারা তিনজনই চেয়ে রইল তার দিকে। মনে হল কি যেন একটা গোপন করতে চাইছে।

"লোহিতরাজ্যে কোনদিক দিয়ে যেতে হয় তা তোমরা জান কি?"

যমুনা তখন বলল—"জানি। তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতেও পারতাম। কিন্তু লোহিতরাজ্যে গিয়ে এখন লাভ হবে না।"

"কেন? সেখানে আমার বাবা আছেন। সে দেশের রাজা তিনি—"

"কয়েকদিন আগে লোহিতরাজ্য থেকে তোমাদের একটি চাকর এসেছিল। তাকে আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিই নি—"

"কেন?"

"সে দুঃসংবাদ এনেছিল একটি।"

"কি দুঃসংবাদ?"

"গঙ্গারাঢ়িরা তাদের বিপুল হস্তী-বাহিনী নিয়ে লোহিতরাজ্য আক্রমণ করেছিল। তোমার বাবাকে তারা হত্যা করেছে। লোহিতরাজ্য এখন তাদের দখলে।"

এ খবর শুনে বজ্রাহতবৎ বসে রইল মন্দাকিনী। তারপর করুণ কণ্ঠে বলল—"কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন।"

হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল—"কি করি এখন, কি করির এখন কি করি এখন—।"

তারপর আশ্চর্য একটা কান্ড হল। হঠাৎ সে পাখী হয়ে গেল। পাখী আকাশের মহাশূন্যে উড়ে গেল আর উড়তে উড়তে ক্রমাগত বলতে লাগল—'কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন—।" গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী হিমালয়ে ফিরে গেল।

রত্নাকরের প্রকান্ড ফুল-বাগানে একা-একা রোজ ঘুরে বেড়াত ফল্গু। অনেকক্ষণ ঘুরে

বেড়ানোর পর নানারকম ফুল তুলত একমনে। মালা-গাঁথত গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। মালাটা গাঁথা হয়ে গেলে সেটা টাঙিয়ে দিত একটা গাছের ডালে। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে দেখত সেটা। মুখে ফুটত ছোট্ট একটু হাসির আভাস।

॥ ২০ ॥

আবার একদিন গভীর রাত্রে তিন্তিড়ীর গাঁজার দোকানে হাজির হলেন ভৃংগী। তিন্তিড়ী দ্বার খুলতেই তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

"সমুদ্র মন্থন দেখতে চাও যদি এক্ষুণি আমার সংগে সুমেরু পর্বতে যেতে হবে। সেখান থেকে বেশ ভালো দেখতে পাবে। আগে এক ছিলিম সাজ। চাংগা হয়ে নি। দুটো সিংহ আর একটা সাপ হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে আমাকে। তোমার সেই ভালো গাঁজা আছে তো?"

"আছে, প্রচুর আছে। ও গাঁজা তো বেশী বিক্রী হয় না।"

"যা আছে সেটা সংগে নিয়ে যেতে হবে। সুমেরু পর্বতে কন্‌কনে ঠান্ডা। সেখানে ঘন ঘন গাঁজা খেতে হবে। এখন এক কলকে সাজ।"

তিন্তিড়ী গাঁজা সাজতে বসল। বলল—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সিংহ সাপের পাল্লায় পড়লেন কি করে?"

মহেশ্বর সমুদ্রমন্থন করবেন কি-না একটু ইতস্তত: করছিলেন। দেবতাদের আর দৈত্যদের ডেকে একদিন বললেন—"তোমরা অমর হতে চাইছ? বায়না ধরেছ সুধা খাবে। কিন্তু তার আগে একটি কথা জেনে রাখ। সুধা খেলে অমর হবে বটে কিন্তু ষড়-রিপুর কবল থেকে মুক্ত হবে না। সুতরাং জীবনে নানারকম দুর্গতি ভোগ করতে হবে। যারা অমর নয়, মৃত্যু তাদের মুক্তি দেয়। কিন্তু তোমরা যদি অমর হও তাহলে অমরত্বের বেড়াজালে ঘেরে ষড়্-রিপু অসীম যন্ত্রণা দেবে তোমাদের। ভেবে দেখ জিনিসটা ভালো ক'রে। দেব-দৈত্য তোমরা কেউ ষড়-রিপু মুক্ত নও। সুতরাং ভেবে দেখ ভাল করে।"

দেবতারা আর দৈত্যরা কিন্তু না-ছোড়। তারা অমরত্বই চাইতে লাগল। মহেশ্বর তবু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝড়ে রত্নাকরের নৌবহর সব ডুবে গেল। সে নৌবহরে মহাদেবের সাতজন ভক্ত ছিলেন। রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, অব্ধি, পারাবার, সাগর আর অর্ণব। এরা যখন সমুদ্রে তলিয়ে গেল তখন মহাদেব বিচলিত হয়ে উঠলেন। সমুদ্রকে খবর পাঠালেন আমার সাতজন ভক্তকে অবিলম্বে তীরে উঠিয়ে দাও। ওরা আমার পরম ভক্ত। সমুদ্র উত্তর দিলেন—দেবাদিদেব তা আমার সাধ্যাতীত। কে কোথায় তলিয়ে গেছে আমার পক্ষে তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এই উত্তর শুনে ক্ষেপে উঠলেন মহেশ্বর। বললেন—তোমাকে আমি মন্থন করব। ওদের আমি তুলবই। সুতরাং সমুদ্র-মন্থন হবে এবার। গাঁজার কলকেটি ভৃংগীর হাতে দিয়ে তিন্তিড়ী বললেন—"যাদের নাম করলেন তারা তো আমাদের অঞ্চলের লোক। সবাইকে আমি চিনি—।"

ভৃংগী বলল—"তা তো চিনবেই। ওদের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমি জানি। ওরা একই প্রার্থনা রোজ করছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি প্রত্যেকের প্রার্থনা রোজ সংগ্রহ করি। ওদের প্রার্থনা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একই প্রার্থনা দিনের পর দিন করছে ওরা। দেখাব তোমাকে সব।"

কলকেতে সুদীর্ঘ টান দিলেন ভৃংগী। দমবন্ধ করে' বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর

ধোঁয়াটি ছাড়লেন ধীরে ধীরে।

তিন্তিড়ী বলল—"সিংহ আর সাপের কথা বলছিলেন যে—।"

"ও হ্যাঁ, মন্দর পর্বতে মহাদেবের অতি প্রিয় একটি সাপ আর দুর্গার অতি প্রিয় আদরের দু'টি সিংহ থাকে। মহাদেব আমাকে বললেন, ওদের ওখান থেকে নাবিয়ে আন। মন্দর পর্বত মন্থন-দন্ড হবে, ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হবে তাকে। সেখানে দুর্গার দুটি প্রিয় সিংহ আছে আর আমার প্রিয় সাপ আছে একটি। তাদের তুমি ওখান থেকে নাবিয়ে নিয়ে এস। ওখানে থাকলে বাঁচবে না ওরা। ওদের পিছনেই ছুটোছুটি করছিলাম। অতি কষ্টে নাবিয়েছি একটু আগে। অনেক দেরী হয়ে গেল। গাঁজাগুলো গুছিয়ে নাও। আর দেরী করা চলবে না। চল বেরিয়ে পড়ি।"

"আমি যাব কি করে?"

"দশাঙ্গীকে এনেছি। তার মাথার উপর বসবে। সে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

"দশাঙ্গী? সে কে?"

"প্রেত। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গই দশগুণ বড়। মাথাটা একটা প্রকান্ড ঝুড়ির মত। হাত দুটো প্রকান্ড ডানা। নাকটা ঠোঁটের মত। দেখতে ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভারি ভাল মানুষ। তোমার ঘরে ঢুকতে পারবে না সে। মাঠে ব'সে আছে। চল যাই—।"

মাঠে বিরাটকায় দশাঙ্গী বসেছিল। সত্যিই ভয়ঙ্কর দেখতে।

ভৃঙ্গী বললেন—"দশাঙ্গী হেঁট হ। ইনি তোমার পিঠ বেয়ে মাথায় চড়বেন। তুমি এঁকে সোজা সুমেরু-পর্বতে নিয়ে যাও। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।" তিন্তিড়ী দশাঙ্গীর পিঠ বেয়ে মাথার উপর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ করে আকাশে উড়ল দশাঙ্গী। ভৃঙ্গীও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করলেন। মনে হল শূন্যে মিলিয়ে গেলেন যেন।

॥২১॥

সুমেরু পর্বতের এক গুহার ভিতর বসেছিল তিন্তিড়ী আর ভৃঙ্গী। সেখান থেকে বিরাট সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল সমুদ্রতীরে সমবেত দেবতাদের আর দৈত্যদের। কত কোটি যে তার ঠিক নেই। কিলবিল করছিল যেন। মন্দর পর্বত স্থাপিত হয়েছিল সমুদ্রের ভিতর। বিরাট অনন্তনাগ জড়িয়ে রয়েছেন নভশ্চুম্বী মন্দর পর্বতকে। তখনও মন্থন আরম্ভ হয় নি। ভৃঙ্গী বললেন, এই ফাঁকে রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, সাগর, পারাবার, অব্ধি আর অর্ণবের প্রার্থনাগুলো তোমাকে শুনিয়ে দিই। মহেশ্বর ওদের প্রার্থনা শুনবেন কি না জানি না। কিন্তু প্রার্থনাগুলো বড় অদ্ভুত। আর এই এক প্রার্থনাই ওরা রোজ করেছে, বছরের পর বছর।

প্রকান্ড কমন্ডলু থেকে ভৃঙ্গী প্রার্থনার অনুলিপিগুলি বার করতে লাগলেন।

রত্নাকরের প্রার্থনা শোন।

"হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। আমার ব্যবসা বিশ্বব্যাপী হয়েছে। আমার পত্নী তাপ্তি সতী সাধ্বী পতিব্রতা। সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী। সে আমাকে একদন্ড ছেড়ে থাকতে পারে না। আমার কাছে অন্য কোনও রমণীর সান্নিধ্যও সহ্য করতে পারে না সে। কিন্তু ভগবান আমাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে মেয়েরা স্বতঃই আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। আমি

ভদ্রতাবশত তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারি না। চক্ষুলজ্জাবশত তাদের কোনও অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না। আপনি জানেন তাদের কারো সম্বন্ধে আমার কোনও মোহ নেই। আমি কেবল তাদের সঙ্গে ভদ্রোচিত ব্যবহার করি। তাপ্তি কিন্তু এতে বড় কষ্ট পায়। তাই আপনার নিকট আমার প্রার্থনা পরজন্মে আপনি আমাকে নারী করে সৃষ্টি করুন। আমার নারী দেহে তাপ্তির রূপ যেন মূর্ত হয়। তাপ্তিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমাদের দুজনকে আপনি অবিচ্ছেদ্যরূপে মিলিত করে দিন। এই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা। রত্নাকর এই প্রার্থনা প্রত্যহ করেছে।"

তারপর তিনি কমণ্ডলু হাতড়াতে লাগলেন আবার।

"বহু লোকের প্রার্থনা ঢুকেছি তো রোজ। সব হোণ্ডল-মণ্ডল হয়ে গেছে। দাঁড়াও ওদেরগুলো খুঁজে বার করি।"

হ্যাঁ, এই হচ্ছে অব্ধির। এটা শুনে নাও। অদ্ভুত প্রার্থনা।

"হে মহেশ্বর; আমার অসংখ্য প্রণতি গ্রহণ করুন। আমি পিশাচ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করব বলে অনেক রকম সাধমা করেছি। অনেক রকম সিদ্ধিলাভও করেছি। এই সাধনার জন্য অনেক সময় উত্তরসাধিকার প্রয়োজন হয়। আমি একে একে সাতাশজন নারীকে বিবাহ করেছিলাম এই জন্য। তারা সকলেই আমাকে ভালবাসত খুব। কিন্তু উত্তরসাধিকা রূপে তারা একজনও যোগ্য ছিল না। তারপর হঠাৎ পেয়ে যাই ভোগবতীকে। সে নিজে পিশাচ সিদ্ধ। কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তাকে আমি যখন বিয়ে করলাম তার অত্যাচারে আমার সাতাশজন পত্নীই আমাকে ছেড়ে গেল। তাদের আর কোনও খবর পাই নি এতদিন। সম্প্রতি মা কালী একদিন আমাকে বললেন—তারা মরে গেছে এবং দক্ষ রাজার সাতাশ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। ভোগবতী শক্তিময়ী। কিন্তু উন্মাদিনী। আমার সঙ্গে রোজ তার হাতাহাতি হয়। মনে হয় সেও আমাকে ছেড়ে যাবে। হে মহেশ্বর। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার সেই সাতাশ পত্নীকে আপনি আবার ফিরিয়ে দিন। তারা আমাকে ভালোবাসত। আমি তাদের এখনও ভালবাসি। আপনি আমাদের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিন প্রভু। আমি আর কিছু চাই না। আমি সারাজীবন আপনার সেবক, আপনি আমাকে যদি কোনও বর না দেন তাহলেও আমি আপনার সেবক থাকব। শুধু আমার অন্তরের গোপন কামনাটুকু আপনাকে নিবেদন করলাম।"

এটি পাঠ করে' ভৃঙ্গী বললেন "বাবাকে ভাল মানুষ পেয়ে এদের স্পর্ধা কত বেড়ে গেছে দেখ। যার যা খুশী তাই আবদার করছে। এই অদ্ভুত প্রার্থনা রোজ করে যাচ্ছে লোকটা—।"

ভৃঙ্গী আবার কমণ্ডলুর ভিতর হাত ঢোকালেন এবং খানিকক্ষণ পরে খুঁজে পেলেন পারাবারের প্রার্থনা।

"পারাবারের প্রার্থনা পেয়েছি। শোন। এ যে কি চায় তা বোঝাই যায় না। মনে হয় একটা হেঁয়ালী। শোন।"—"হে মহেশ্বর, হে সঙ্গীত-শাস্ত্রের উৎস, হে সর্বজ্ঞানের আকর, হে মহানন্দ স্বরূপ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। সারাজীবন আপনার তপস্যা করছি, আপনার মহিমার সীমা নির্ণয় করতে পারি নি। আমি কবিতার প্রেরণা হয়ে আপনার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছি, রোজই করি, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ি। শুনেছি সেবকদের আপনি বর দান করেন। আমার কাম্য ধন, মান, রূপ, আয়ু বা সামর্থ্য নয়। যদি আপনি অনুগ্রহ করে কখনও কিছু আমাকে দেন, সেই ক্ষমতা দিন যার

দ্বারা আমি সকলকে উদ্দীপিত করতে পারি, আবিষ্ট করতে পারি, আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারি। আমি কবি, আমার কবিত্ব যেন অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যেও তাঁকে কবি করে তোলে।"

পড়া শেষ করে ভৃংগী বললেন—"এর মানে কিছু বুঝলেন ?"

তিন্তিড়ী বললে—"না পারলাম্ না—।"

"আমিও পারি নি।"

আবার কমন্ডলুতে হাত ঢোকালেন। বার করলেন এক গাদা প্রার্থনা-পত্র (অবশ্য ভূর্জপত্র) তার ভিতর পাওয়া গেল অম্বুধি আর অর্ণবের প্রার্থনা।

"অম্বুধির প্রার্থনাটাই আগে শোন। এও এক অদ্ভুত প্রার্থনা করেছে। রোজই করে। শোন—"হে মহাদেব, হে আশুতোষ, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করি। আপনার মহিমার কিয়দংশ আমি ওই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মধ্যেই অনুভব করছি। কিন্তু আমি পংগু চলতে পারি না। দৃষ্টির জ্যোতিও ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমি সম্পূর্ণভাবে পর-নির্ভর হয়ে পড়েছি। আমার দুর্দশার অন্ত নেই। হে সর্বশক্তির আধার, হে দেবাদিদেব, আমাকে শক্তি দান করুন। আমাকে বলবান অশ্বের মত তেজোদ্দীপ্ত বলশালী করুন। হে উমাপতি, আমি আর কিছু চাই না।"

পড়া শেষ করে ভৃংগী বললেন—"আশ্চর্য, মানুষ ঘোড়া হতে চাইছে। এইবার অর্ণবেরটা শোন। সে খুব সংক্ষেপে রোজ একই কথা বলে। "হে মহেশ্বর, আমি নারায়ণের বক্ষলগ্ন হয়ে থাকতে চাই। আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না। আপনি কৃপা করুন, আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়।"

ভৃংগী আবার কমন্ডলুর ভিতর হাত ঢোকালেন। প্রার্থনার অনুলিপি বার করলেন অনেকগুলি।

হরিশ্চন্দ্র, কালীসেবক, লৌহ মিত্র, ঈশ্বর দাস—জলধি দেবশর্মা।

জলধিরটা পাওয়া গেছে। শোন এটা।

"হে পরম পিতা, হে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আদি প্রবক্তা, আমি আপনার দীন দাসানুদাস। আপনার নির্দেশ অনুসরণ করে আমি সারাজীবন আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করেছি। কখনও রোগী বাঁচে, কখনও বাঁচে না। যখনই কোন রোগীর মৃত্যু হয় তখনই আমি হতাশ হয়ে পড়ি। প্রকৃতির কাছে এই পরাজয় স্বীকার করতে অপমানে আমার মাথা কাটা যায়। মনে হয় যতদিন আমরা মানুষকে অমরত্ব দান না করতে পারব ততদিন আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। আমি সারাজীবন এটা নিয়ে গবেষণা করেছি, কিন্তু এখনও কৃতকার্য হতে পারি নি। আপনার কৃপা ভিন্ন তা পারবও না। আমার প্রার্থনা, হে মহেশ্বর, আমি যেন সকলকে অমরত্ব দান করতে পারি। আমাকে আপনি সেই বর দিন। এ ছাড়া আমার আর কিছু কাম্য নেই।"

ভৃংগী বললেন—"এর সাহসটা দেখ। সব মানুষ যদি অমর হয় কি কান্ডটা হবে ভেবে দেখ দিকি—।"

আবার কমন্ডলুতে হাত ঢোকালেন ভৃংগী। এবার বেশী খুঁজতে হল না। মল্লবীর সাগরের প্রার্থনা পত্র বেরিয়ে পড়ল।

ভৃংগী বললেন "এর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত।" শোন। "হে শিব, হে শঙ্কর, আমি সারা-জীবন শক্তির সাধনা করেছি। ফল যা হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি মাতংগের

মত বলশালী হতে চাই। আপনি আমাকে সেই বর দিন। আর কিছু আমি চাই না।" এই সাতজনই মহাদেবের প্রিয় ভক্ত। কিন্তু এদের অদ্ভুত আবদার শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেছি। ওহে, দেখ, দেখ, সমুদ্র-মন্থন শুরু হয়েছে। তিন্তিড়ী চেয়ে দেখল মন্দর পর্বত ঘুরতে আরম্ভ করেছে। অনন্তনাগের মুখের দিকে দৈত্যরা আর পুচ্ছের দিকে দেবতারা ধরে মন্থন শুরু করছেন। তুমুল একটা শব্দ হচ্ছে। মন্দর পর্বতের উপর যে সব পাখী ছিল সেগুলি উড়ে আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। শব্দও করছে তারা নানারকম। মন্দর পর্বতের উপর যে সব বন্য-জন্তু ছিল তারা ভীত ত্রস্ত হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করছে। তাদের হুংকার এবং গর্জনে চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে। তারা অনেকেই ব্যাকুল হয়ে সমুদ্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। সাঁতরে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে বারম্বার আবর্তিত হচ্ছে কেবল। মন্দর পর্বতের মন্থন-আবর্তে শত শত জলচর প্রাণীও ধর্ষিত হতে লাগল। বড় বড় হাঙগর, কুমীর, তিমি, তিমিঙ্গিলও এই ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত থেকে পালাবার জন্য নিজেদের শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে যা করতে লাগল তা যুগপৎ করুণ ও ভয়ঙ্কর। সেই ঘূর্ণাবর্তে আবার পড়ে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারা। বড় সামুদ্রিক সর্পরা মন্দরকে আঁকড়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। সেই বিরাট ঘূর্ণাবর্ত তাদেরও গ্রাস করে ফেলল। একটা অবর্ণনীয় গর্জনে, চিৎকারে, আর্তনাদে, সমুদ্রের কল্লোলে, চারদিক যেন কাঁপতে লাগল। নভশ্চুম্বী মন্দর পর্বতের উপর অসংখ্য বৃক্ষ, অসংখ্য লতা, অসংখ্য গুল্ম। ঘূর্ণনের বেগে তারাও বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ল।

গাছে গাছে ঠোকাঠুকি হয়ে অনেক গাছের শাখা ভেঙে গেল, কোনও গাছ সমূলে উৎপাটিত হল, প্রবল ঘর্ষণের জন্য অনেক গাছের ছাল উঠে গিয়ে রস গড়িয়ে পড়তে লাগল। মন্দর সবেগে ঘুরতে লাগল। কয়েকটি কিন্নরও ছিটকে পড়ে মারা গেল এবং সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে লাগল। ক্রমশ বড় বড় পাথরও বিক্ষিপ্ত হতে লাগল মন্দর পর্বতের গা থেকে। যেন মনে হতে লাগল ছোট ছোট এক একটা পাহাড় খসে পড়ছে। অনেক গাছে গাছে ঘষাঘষি হয়ে আগুন লেগে গেল। দাবানল সৃষ্টি হল মন্দর পর্বতের উপর। মন্দর তবুও সবেগে ঘুরে যাচ্ছে। দেবতারা আর দৈত্যরা অক্লান্ত। ক্রমাগত টেনে যাচ্ছেন তারা মন্থন-রজ্জু। অনন্তনাগের খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু তিনি নিজের বিষ সম্বরণ করে মহাদেবের আদেশ পালন করে যাচ্ছেন। মন্দর পর্বতের উপর দাবানলের ধূমে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হল। আগুনের লকলকে শিখা আকাশ স্পর্শ করল। শেষ কালে ইন্দ্রদেব মেঘদের আহ্বান করলেন। আদেশ দিলেন তোমরা বারি বর্ষণ করে' এ আগুন নেবাও। প্রচুর বৃষ্টি হতে লাগল। তারপর দেখা গেল বহু মৃত পশুপক্ষীর অর্ধদগ্ধ দেহ ছিটকে ছিটকে পড়ছে মন্দরের শরীর থেকে। নদীর স্রোতের মত নেবে আসছে বহু ওষধি আর বনস্পতির নির্য্যাস। মন্দর কিন্তু একদন্ড থামছে না। ঘুরে চলেছে।

হঠাৎ ভৃঙ্গী বলে উঠলেন—"আর পারছি না। কানে তুলো দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকি। তুমি এক কলকে সাজো দেখি।"

তিন্তিড়ীও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসেছিল।

সে বললে—"আমাকেও একটু তুলো দিন প্রভু। এত শব্দ আর শুনতে পারছি না। দু'কলকে সাজছি। আমিও ঠান্ডা মেরে গেছি।"

তিন্তিড়ী দুটো বড় বড় কলকে বার করে গাঁজা সাজতে বসল। সব সাজ সরঞ্জাম সে সঙ্গে এনেছিল। চকমকি পর্যন্ত।

ভৃঙ্গী বললেন—"দেবতা এবার বোধ হয় সংহার মূর্তি ধরেছেন। প্রলয় করে ছাড়বেন। দেব দৈত্য নর বানর ভূত প্রেত কেউ আর রক্ষে পাবে না—। তুরীয় মার্গে চড়ে বসে থাকি। তারপর যা অদৃষ্টে আছে, হবে।"

তিন্তিড়ী চটপট দু'কলকে গাঁজা সেজে ফেললে। তারপর দু'জনেই গাঁজায় টান দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল কানে তুলো দিয়ে।

গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে বসে রইল তারা কিছুক্ষণ। কিন্তু নেশা বেশীক্ষণ থাকে না। একটু পরে ভেঙে গেল। আবার চোখ খুলতে হল। চোখ খুলে যা দেখল তাতে আবার অবাক হয়ে গেল দুজনেই। নীর সমুদ্র ক্ষীর সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি চলে খালি ক্ষীর আর ক্ষীর। আর সেই ক্ষীর সমুদ্রে মন্হন করে চলেছে মন্দর। দেব দৈত্য অনন্তনাগ কেউ ক্লান্ত হন নি এখনও। মহাদেব সুমেরু পর্বতের আর একটি সু-উচ্চ শিখরের উপরে বসে আছেন বিরাট হিমাদ্রির মত। মাঝে মাঝে বলছেন—"মন্হন থামিও না। আমার সাতটি প্রিয় ভক্তকে আমি উদ্ধার করবই। এর জন্য সমুদ্রকে যদি শুকিয়ে ফেলতে হয়, শুকিয়ে ফেলব। সুধা উঠুক বা না-ই উঠুক—অব্ধি, রত্নাকর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, সাগরকে আমি চাই। এদের প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। এদের সেই মূর্তি আমি দেখতে চাই। তারা মরে নি। তারা সমুদ্রের ভিতরেই আছে। সমুদ্র তাদের ফিরিয়ে দিক। যতক্ষণ না দিচ্ছে ততক্ষণ মন্হন চলবে—।"

মহাদেব নাসা বিস্ফারিত করে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

মন্হন চলতে লাগল।

এর পরই কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ক্ষীর ক্রমশ গলতে লাগল। তারপর অপরূপ একটা গন্ধ ছাড়ল। উৎকৃষ্ট ঘিয়ের গন্ধ। ক্ষীর সমুদ্রমন্হনের ঘূর্ণাবেগে ঘৃত সমুদ্রে পরিণত হল। ঈষৎ স্বর্ণাভ সেই ঘৃত-সমুদ্রে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে অপরূপ দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক। মনে হল এইবার বুঝি অসম্ভব সম্ভব হবে।

হ'লও।

খানিকক্ষণ মন্হনের পর অপরূপ শোভায় চাঁদ উৎক্ষিপ্ত হলেন স্বর্ণ-সান্নিভ ঘৃত-সমুদ্র থেকে। হর্ষধ্বনি করে উঠল দেব-দৈত্য সকলেই। শীতাংশু চন্দ্রের অপরূপ কান্তি দেখে ভৃঙ্গী বললেন—"এ যে অভূত-পূর্ব হে।" তারপরই মহাদেবের গম্ভীর কণ্ঠরব শোনা গেল।

"বৎস অব্ধি, তোমার তপস্যায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যা চেয়েছিলে তাই তোমায় দিলাম। তোমার সাতাশ পত্নী মহাকাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি মহাকাশে চলে যাও। তুমি আমার পরমাত্মীয় হলে কারণ তোমার সাতাশ পত্নীর দিদি ছিলেন সতী। তুমি আমার শিরোভূষণ হয়ে থাকবে।"

চাঁদ মহাকাশে চলে গেলেন। আবার মন্হন চলতে লাগল। প্রায় সংগে সংগে উঠলেন, লক্ষ্মী। তিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা। গৌরবর্ণা, সুরূপা, স্বর্ণালংকার-ভূষিতা, ডানহাতে পদ্ম, বাঁ-হাতে রত্নময় একটি ঝাঁপি। মনে হ'ল একটি আশ্চর্য জীবন্ত অনন্য প্রতিমা যেন মূর্ত হ'ল মহাশূন্যে। তিন্তিড়ী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল লক্ষ্মীর মুখের আদল ঠিক যেন তাপ্তি দেবীর মুখের মত। মহাদেব মন্দ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"বৎস রত্নাকর, তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত। ভয় হয়েছিল সমুদ্র বুঝি তোমাকে গ্রাস করল। তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। তোমার মহিমা, তোমার সৌন্দর্য

স্ত্রীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তোমার পত্নী তাপ্তী তোমার সর্বাঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তুমি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ কর।" বিষ্ণু নিকটেই ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। লক্ষ্মী তাঁর বাঁ-পাশে গিয়ে উপবেশন করলেন।

সমুদ্র মন্থন চলতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সমুদ্র থেকে যা উৎক্ষিপ্ত হল তা জীবন্ত একটি অগ্নি শিখা। সেটি মহাকাশে সঞ্চরণ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে লাগল তার বর্ণ। আরও মনে হতে লাগল একটা নীরব উদ্দীপনাময় সংগীত যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই যাদুকরী শিখার সর্বাঙ্গ থেকে। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে একটা আনন্দঘন মদিরতা যেন আবিষ্ট করে ফেলল চরাচরকে। তার কখনও মৃদু, কখনও উদাত্ত, কখনও গম্ভীর, কখনও চটুল প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠল দেবদৈত্যরা। মহাদেব ঘোষণা করলেন—"কবি পারাবার, তুমি যা প্রার্থনা করেছ তা আমি দিতে পেরেছি কিনা জানি না। তুমি অনন্য প্রতিভাবান স্রষ্টা, তুমি কবি, তুমি সুরের জনক, তাই তোমাকে আমি সুরা-রূপে সৃষ্টি করলাম। তুমি যার সংস্পর্শে আসবে তাকে উদ্দীপ্ত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কল্পনার তুঙ্গলোকে। ভুলিয়ে দেবে তার পার্থিব সুখ-দুঃখ। সে ও ক্ষণিকের জন্য কবি হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার প্রতিভা পাবক স্বরূপ। তুমি ছাড়া আর কেউ তা সহ্য করতে পারবে না। অধিকাংশ লোকই পুড়ে যাবে। তুমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেখানে ইচ্ছে সঞ্চরণ করতে পার।"

।

সুরা বিচিত্র লীলায় লীলায়িত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। মহাদেব আদেশ দিলেন—মন্থন চলুক। সুরার প্রভাবেই সম্ভবত দেব এবং দৈত্যরা খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারা সবেগে আবার মন্থন করতে লাগলেন। একটু পরেই বিপুল হ্রেষারব করতে করতে সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠল বিরাট একটি অশ্ব। তার গ্রীবাভঙ্গী, তার পেশল জঙ্ঘা, বিস্তৃত বক্ষ, তার ভাষাময় প্রদীপ্ত চক্ষু, তার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র তার সমস্ত অঙ্গের ক্ষিপ্র সতেজ ভঙ্গিমা—সমস্ত আকাশকেই যেন চঞ্চল করে তুলল। মহাদেব ঘোষণা করলেন—বৎস, অম্বুধি, নররূপে তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না। তুমি যা চেয়েছিলে আমি তাই তোমাকে করেছি। তুমি আর পঙ্গু-পর-নির্ভর অম্বুধি নও, তুমি আজ থেকে হলে হয়-রাজ উচ্চৈঃশ্রবা। মহাকাশে পরিভ্রমণ করে তুমি জ্যোতিষ্কদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ কর। স্বয়ং ইন্দ্রদেব তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। উচ্চৈঃশ্রবা মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—মন্থন চলুক।

আবার মন্থন শুরু হল। অনেকক্ষণ মন্থন করবার পরও কিন্তু আর কিছু সমুদ্র থেকে উঠল না।

ভৃঙ্গী বলল—"তিন্তিড়ী আর এক কলকে সাজ। এ কাণ্ড কতক্ষণ চলবে কে-জানে।"

তিন্তিড়ী পুনরায় গাঁজা সাজতে বসল।

দেব-দৈত্যরা সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল—"সুধা কই, সুধা কই।"

মহাদেব উত্তর দিলেন—"মন্থন করে যাও, সুধা উঠবে।"

মন্থন চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে চতুর্দিকে আলোকিত করে সমুজ্জল জ্যোতিষ্কের মত উদিত হলেন একটি মণি।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—"পরম তপস্বী অর্ণব, এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম। তুমি নারায়ণের বক্ষলগ্ন হতে চেয়ে ছিলে, তাই তোমাকে মণি-রূপে সৃষ্টি করলাম। আজ থেকে মণি-শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ মণিরূপে বিখ্যাত হবে।"

কৌস্তব মণি উত্তর দিলেন—"প্রভু, আমি যদি আপনার বক্ষলগ্ন হই, আপনি কি আপত্তি করবেন?"

"করব। আমার অঙ্গে কোন ভাল জিনিস নেই। আমি সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখি, হস্তী-চর্ম পরিধান করি। আমার গলার হার সাপ। পৃথিবীতে সবাই যা পরিহার করে আমি তাই গ্রহণ করি। তুমি নারায়ণের বুকে যাও। সেখানেই তোমাকে মানাবে ভালো।"

নারায়ণ নিকটেই ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। কৌস্তভ তার বক্ষে গিয়ে শোভমান হলেন।

দেবতা এবং দৈত্যরা আবার চিৎকার করে উঠলেন—"সুধা কই, সুধা কই—"

মহাদেব সেই একই উত্তর দিলেন—"মন্থন কর, আরও মন্থন কর।"

আবার মন্থন চলতে লাগল।

এরপর সমুদ্র থেকে উঠলেন এক সৌম্যকান্তি পরম রূপবান দেবতুল্য ঋষি। তাঁর হাতে একটি বৃহৎ কমণ্ডলু।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—"বৎস জলধি, তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। তোমার হাতে যে কমণ্ডলু আছে তা সুধায় পরিপূর্ণ। এ সুধা যে পান করবে সেই অমর হবে। তুমি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী একজন। তাই তোমার হাতেই সুধা বিতরণের ভার দিলাম। আজ থেকে তোমার নামকরণ হল ধন্বন্তরী। তুমি যাকে খুশী অমরত্ব দান কর—।"

ধন্বন্তরী সুধার কমণ্ডলু হাতে নিয়ে দেবতাদের দিকে চলে গেলেন। মহাদেব ঘোষণা করলেন—"আরও মন্থন কর। সমুদ্র এখনও অনেক জিনিস লুকিয়ে রেখেছে।"

আবার শুরু হল মন্থন। প্রবল বেগে শুরু হল। ঘৃত-সমুদ্র ফেনায়িত হয়ে উঠল। মনে হল যেন আর্তনাদ করছে। মন্থন-রজ্জু অনন্তনাগও আর যেন নিজেকে সম্বরণ করতে পারছিলেন না।

হঠাৎ সমুদ্রের ভিতর থেকে বিরাট একটি স্তম্ভ নির্গত হল। তারপরই বিশালকায় এক শ্বেতহস্তী উল্লম্ফন দিয়ে বেরিয়ে এল সাগরের ভিতর থেকে। তাঁর গগন-বিদারী বৃংহিত, তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারটি দাঁত, তার নভশ্চুম্বী বিরাট শুঁড়, তার শ্বেত চন্দনের মত শুভ্র বর্ণ, তার রত্নোজ্জ্বল রক্তাভ চক্ষু যুগল, তার বলিষ্ঠ বিশাল স্তম্ভাকৃতি পদচতুষ্টয় দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল খানিক ক্ষণের জন্য। মহাদেব ঘোষণা করলেন—"আমার প্রিয় ভক্ত মল্লবীর সাগর, তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ তো? তুমি যা প্রার্থন করেছিলে তাই দিয়েছি আমি। জানি না দেব দৈত্য কে তোমাকে পালন করবে। তোমার নতুন নামকরণ করেছি। আজ থেকে তুমি ঐরাবত বলে খ্যাত হবে—।"

দেবরাজ ইন্দ্র এগিয়ে এলেন। বললেন—"মহামাতঙ্গ ঐরাবত, আমি তোমাকে পালন করব। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।"

ঐরাবত হাঁটু গেড়ে বসল এবং শুঁড়টি বেঁকিয়ে তুলে ধরল। ইন্দ্র সেই শুঁড়ে পা রেখে ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলে গেলেন। এর পরই বিষ উঠল। অনন্তনাগ বিষ বমন

করতে লাগলেন। চতুর্দিক কটুগন্ধে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

ভৃংগী তিন্তিড়ী দুজনেই মূর্চ্ছা গেলেন। দৈত্যদের মধ্যেও মারা গেল কয়েকজন। বিরাট ঘৃত সমুদ্র বিষ-সমুদ্রে পরিণত হয়ে গেল। আকাশ নীল কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করল।

ব্রহ্মা এতক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। তিনি বললেন—"মহেশ, তুমি কি আমার সৃষ্টিটি একেবারে লোপ করে' দিতে চাও?"

এরপর মহাদেব একটি অত্যাশ্চার্য কান্ড করলেন। এক চুমুকে সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন। তার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়ে গেল।

সমুদ্র আবার শান্ত হল। মহাদেব আবার সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। ধর্ম্মা, পারিজাত প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য উঠেছিল সমুদ্র থেকে। কিন্তু সে কাহিনী আমার গল্পের অন্তর্গত নয়। অব্ধি, রত্নাকর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, আর সাগরের কাহিনীই আমি বলতে শুরু করেছিলাম, সে কাহিনী এখানেই শেষ হল।

॥২২॥

এর পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। গংগা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, ইরাবতী, ব্রাহ্মণী, কাবেরী, বিতস্তা, পদ্মা, ফল্গু, এরা সবাই সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। মন্দাকিনীও উড়তে উড়তে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছেছিল। ইন্দ্রাণী শচী দেবী তার কষ্ট দেখে তাকে মন্দাকিনী নদী করে দিয়েছিলেন এবং মর্ত্তের গংগার সংগে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। সেও সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। ভোগবতী পাতালে গিয়ে পাতাল-গংগা হয়েছিল। তারও সমুদ্রের সংগে মিলন ঘটেছে। সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। তারা যে রত্নাকরকে ভালবেসেছিল, তাকে পেলে তারা যে আনন্দ পেত সে আনন্দ কি তারা সমুদ্রে গিয়ে পেয়েছে? জানি না।

হরিশ্চন্দ্র

মুগমটর গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী নিজের প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে নগ্নগাত্রে বসিয়া ভড়াক ভড়াক করিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন। তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া একটি ভৃত্য তাঁহার মাথায় হাওয়া করিতেছিল। বারান্দায় একটি চাকর কয়েকটি লণ্ঠন, দুইটি হ্যাজাক বাতি এবং অনেকগুলি রেড়ির তেলের প্রদীপ লইয়া ব্যস্ত। সন্ধ্যা আসন্ন। এখনি ঘরে ঘরে আলো দিতে হইবে। হরিশ্চন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নাই। কল নাই। আছে দুইটি কূপ এবং বাড়ির পিছনে আছে প্রকাণ্ড একটি পুষ্করিণী। তিনি গোয়ালার দুধ বা টিনের দুধ কিনিয়া খান না। বাড়িতে অনেকগুলি গাই মহিষ পুষিয়াছেন। বাড়িতে রেডিও নাই। তিনি কিন্তু খুব সংগীতপ্রিয় আমুদে লোক। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়িতে গানের আসর বসে। পাড়ার ছেলেরা আসিয়া গানবাজনা করে। যেদিন গানবাজনা হয় না সেদিন কথকতা হয়। গ্রামের পঞ্চানন পণ্ডিত আসিয়া কথকতা করেন। তাঁহার গলাটি সত্যই সুমধুর। হরিশ্চন্দ্রই তাঁহার সংসারের ভরণপোষণ করেন। কলিকাতায় তাঁহার একজন অধ্যাপক বাল্যবন্ধু আছেন। হরিশ্চন্দ্রের নির্দেশমত তিনি প্রতি মাসে একখানি করিয়া ভাল বাংলা বই তাঁহাকে ভি. পি. যোগে পাঠান। বইটি পড়িয়া ভাল লাগিলে সেটি সযত্নে তুলিয়া রাখেন। ভাল না লাগিলে পুড়াইয়া ফেলেন। বলেন, ঘরে রাবিশ রাখিবার জায়গা নাই।

হরিশ্চন্দ্র চাষী লোক। অনেক জমি আছে। বাজার হইতে কিছু কিনিয়া খাইতে হয় না। পুকুরে মাছ আছে, ছাগলও আছে অনেকগুলি। কিন্তু মাছ মাংসে তাঁহার রুচি কম। যেদিন পুকুরে জাল ফেলা হয় সেই দিনই বাড়িতে মাছ হয়। বৃথা মাংস তিনি খান না। বাড়িতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা হয়। সেই সময়ই তিনি মায়ের প্রসাদী মাংস খান। মুর্গী পুষিয়াছেন ব্যবসার জন্য। প্রথম জীবনে কুড়ি বছর বয়সে একটি দশ বছরের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের এক বছর পরেই বিপত্নীক হন তিনি। আর বিবাহ করেন নাই। একটি নোলকপরা মেয়ের আবছা স্মৃতি অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবনের প্রায় চল্লিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্রবাবুকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। অনেকে বলিতেন, আপনি পিতার একমাত্র বংশধর, আপনি বিবাহ না করিলে আপনার বংশ লোপ পাইবে।

হরিশ্চন্দ্র বলিতেন, 'আমার পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকেই একাধিক বিয়ে করেছিলেন। সুতরাং আমাদের বংশ লোপ পাবে না। তা ছাড়া আমার জন্মের দশ বছর আগে আমার একটি ভাই হয়েছিল। সে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখতে গিয়েছিল আমার মামার সংগে। সেই মেলায় সে হারিয়ে যায়। তার কোন খবর আর পাওয়া যায় নি। সে হয়তো বেঁচে আছে এবং বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। সুতরাং আমার বংশের জন্য আমি চিন্তিত নই।

তোমরাও ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। বিয়ে করা মানেই একটা সংগীন বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। আমি ওর মধ্যে যেতে চাই না। তা ছাড়া আমার বউ তো আছে। উপানন্দের মত বউ তোমাদের কারো নেই। ছেলেবেলা থেকে রোজ ওর সংগে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, তবু এখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি। এখনও রোজ দুজনে দুজনকে না দেখে থাকতে পারি না। ও পন্ডিত লোক, আমি মুখ্যু চাষা, তবু আমাদের প্রেম অটুট আছে। ওর কলকাতায় বাড়ি আছে। কিন্তু সেখানে ও কখনও গিয়ে থাকে না। সে বাড়িতে গ্রামের ছেলেরা থেকে পড়াশুনা করে। উপানন্দ আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ও আমার মত বিয়ে করে নি। আমার তবু একবার বিয়ে হয়েছিল, ওর একবারও হয় নি। ও বলে, আমি বিয়ে করতে পারি এমন মেয়ে জন্মায় নি। সুন্দরী আছে, বিদুষী আছে, গাইয়ে, বাজিয়ে আছে—ওদের স্টেজে ভাল লাগে, ওদের বউ করা যায় না। আমরা তাই দুজন দুজনকে নিয়ে আছি। ওরও প্রকান্ড গোঁফ, আমারও প্রকান্ড গোঁফ, তবু ও আমার বউ, আমি ওর বউ—', বলিয়া হাসেন তিনি। খিত্ খিত্ করিয়া শব্দ হয়। রোমাবৃত স্তনযুগল আন্দোলিত হইতে থাকে।

হরিশ্চন্দ্র দেখিতে সুন্দর নহেন। রং কালো, বুকভরা লোম। হস্ত দুইটি কমনীয় নহে। খসখসে। আংগুলগুলি মোটা এবং গাঁট গাঁট। ইহার কারণ তিনি মাঠে প্রত্যহ গিয়া চাষীদের সহিত কাজ করেন। মুখটা গোল এবং সগুম্ফ। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। পা দুটিও চাষাড়ে। বাড়িতে শুধু পায়ে থাকেন। মাঠে যখন কাজ করেন তখনও জুতা পরেন না। গ্রাম্য মুচি নির্মিত এক জোড়া মহিষের চামড়ার জুতা আছে, কোথাও যাইতে হইলে তাহাই পরিধান করেন। খদ্দরের জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু পরেন না। গ্রামে তিনি অনেক চরকা বিতরণ করিয়াছেন এবং তাঁতও বসাইয়াছেন। গ্রামে ছোটখাটো একটা খদ্দরের ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু তাঁত নয়, কয়েকটি ঘানিও বসাইয়াছেন তিনি গ্রামে। সরিষার তেল এবং রেড়ির তেল দুইই গ্রামে হয়। বাহির হইতে আমদানী করিতে হয় কয়লা এবং কেরোসিন তেল।

আগেই বলিয়াছি হরিশ্চন্দ্র সুরূপ নহেন, কিন্তু তাঁহার চলনে-বলনে, চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা পৌরুষ এবং মহিমা আছে যে তাঁহাকে দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয় একটা সরল বলিষ্ঠ আভিজাত্য যেন তাঁহার সর্বাংগ দিয়া বিকিরিত হইতেছে। ও অঞ্চলে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কেহই তাঁহার কথা অমান্য করে না। নিজের রাজত্বে তিনি মুকুটহীন রাজা।

তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুপী গুন্ডা কি ফিরেছে?'

'আজ্ঞে না, এখনও ফেরে নি।'

'তুই আমাকে আর এক কলকে তামাক সেজে দিয়ে উপার বাড়িতে যা। দেখ সেখানে কোনও খবর এসেছে কিনা—'

'যে আজ্ঞে।'

গোপী পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। হরিশ্চন্দ্র বাজার হইতে তামাকও কেনেন না। নিজেরই জমিতে ভাল তামাকের চাষ করেন। সেই তামাক পাতা হইতে গোপী তামাক প্রস্তুত করে। সে এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ লোক। নানারূপ সুগন্ধ মশলা মিশাইয়া যে তামাক সে তৈয়ারি করে তাহা অম্বুরি তামাককেও হার মানাইয়া দেয়। পাশের ঘরটি তামাকেরই ঘর। সেখানে অনেক হুঁকা, শটকা, গড়গড়া ছাড়াও নানা আকারের প্রায় পঁচিশ

ত্রিশটি কল্‌কে আছে। প্রত্যেকটিতে তামাক সাজা আছে। কয়েকটিতে তাওয়া দেওয়া। হরিশ্চন্দ্র তাওয়া-দেওয়া কল্‌কেতে তামাক খান। গোপী একটি তাওয়া-দেওয়া কলিকার টিকাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া উপানন্দবাবুর বাড়িতে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার আড়মোড়া ভাঙিলেন। তাহার পর কয়েকবার উঠবোস করিয়া ডাক দিলেন, 'জংগী, জংগী—'

একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ ভৃত্য দ্বারে দেখা দিল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'স্নান করব। জল তোল।'

পাশের উঠানে বেশ বড় ইঁদারা। ইঁদারার পাশেই একটি বাঁধানো চৌতারা। হরিশ্চন্দ্র সেখানে গিয়া বসিলেন। জংগী তাঁহার মাথায় জল তুলিয়া ঢালিতে লাগিল। দশ বালতি ঠান্ডা জল ঢালিবার পর হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। জংগী তাহার হাতে একটি খদ্দরের গামছা দিল। গা মুছিয়া তিনি একটি খদ্দরের লুংগী পরিধান করিলেন। যখনই কোন কারণে তিনি চিন্তিত বা বিষণ্ণ হইয়া পড়েন তখনই তিনি বার কয়েক উঠবোস করিয়া ঠান্ডা জলে স্নান করিয়া ফেলেন। ইহাতে তাঁহার মনের গ্লানি কাটিয়া যায়।

ভিতর হইতে আর একটি চাকর আসিয়া বলিয়া গেল, 'মা আপনাকে ডাকছেন—।' হরিশ্চন্দ্র মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। হরিশ্চন্দ্র শৈশব হইতেই মাতৃহারা। তাঁহার এক দূর সম্পর্কের মাসী তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন। সেই মাসীকেই তিনি 'মা' বলেন। বাড়ির ভিতর যাইবামাত্র মা বলিলেন, 'অসময়ে চান করলি কেন? এখন খাবি আয়।'

'গরম লাগছিল। চান করে বেশ ভাল লাগছে। উপা আসুক না। একসংগে খাব।'

'উপা বাঘ শিকার করতে গেছে। কখন ফিরবে তার ঠিক কি। তুই খেয়ে নে।'

'তেমন ক্ষিদে পায় নি এখনও।'

'পাবে কি করে। ঘি-গরমমশলা দেওয়া ঘন বুটের ডাল দু বাটি খেয়ে ফেললে—'

'তা অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। আর এক বাটি দাও তো এখুনি খেয়ে ফেলতে পারি। চমৎকার হয়েছিল ডালটা। অনেক দিন এত ভাল বুটের ডাল তুমি রাঁধ নি।'

'হয়েছে, হয়েছে। পুঁইশাকের ঘন্টটা তো ছোঁও নি। সেটা কি খারাপ রান্না হয়েছিল?'

'তুমি এত রকম তরকারি কর যে সব খাওয়া যায় না, আর জানই তো পুঁইশাক আমি তত ভালবাসি না।'

'বাড়িতে কতগুলি লোক খায় রোজ। বেশি তরকারি রাঁধতেই হয়। আর বাড়ির চারদিকে অত শাকসব্জির ক্ষেত করেছ। রাঁধতে আমার খুব ভাল লাগে। আজ নারকেল পাড়িয়েছি অনেকগুলো। নাড়ু বানিয়েছি। তাই খা এখন। চান করেছিস, কিছু না খেলে পিত্তি পড়বে। আয়—'

মাসীমা হাঁক দিলেন, 'নকু, খাবার ঘরে ঠাঁই করে দাও। হরুকে খেতে দেব—'

মাসী ভান্ডার ঘরের দিকে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র একটু বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন।

মাসীর বয়স ষাটের কোঠায়। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি এখনও যেন তন্বী যুবতী। মাথার চুল একটিও পাকে নাই। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখে জরার চিহ্ন নাই। ঠোঁটদুটি খুব পাতলা। মুখভাবে এমন একটা তীক্ষ্ণতা আছে, চোখের দৃষ্টি এমন গম্ভীর অথচ স্নেহময় যে সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। চাকর-বাকর আত্মীয়-স্বজন দরিদ্র-আশ্রিত লইয়া হরিশ্চন্দ্রের পরিবারে পঞ্চাশজন লোক। সকলেরই প্রতি মাসীর

সমদৃষ্টি। যদিও তাঁহার তিন চারজন সাহায্যকারিণী আছে, কিন্তু বাড়ির সমস্ত রান্না তিনিই করেন। বাহির হইতে কিছু ফেলা হয় না। জলখাবারও বাড়িতে প্রস্তুত হয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে। চিঁড়ে মুড়ি, নানা রকম নাড়ু, ছাতু, আটা সব বাড়িতেই হয়। দুধের নানারকম খাবারও প্রায় প্রত্যহই হয়। এ জন্য একজন ভাল হালুইকর বহাল করিয়াছেন মাসীমা। বাড়িতে প্রচুর দুধ। হরিশ্চন্দ্র গাই মহিষ দুই-ই পুষিয়াছেন। প্রত্যহ পনেরো কুড়ি সের দুধ হয়। দুধ তিনি বিক্রয় করেন না। বাড়ির সকলেই প্রত্যহ একটু করিয়া দুধ খায়। বাকি দুধে ছানা, ক্ষীর, দই হয়। সন্দেশও হয় নানারকম। হরিশ্চন্দ্রের সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ঐ সংসারের গৃহকর্ত্রীও ওই মাসী, যাহাকে সকলে 'মা' বলিয়া ডাকেন। হরিশ্চন্দ্রের মায়ের এক দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন ইনি। বাল-বিধবা। তাঁহার বাবার মৃত্যুর পর হরিশ্চন্দ্রের মা তাঁহাকে নিজের কাছে লইয়া আসেন। কারণ শৈশবেই কনক নিজেই মাকেও হারাইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মায়ের নাম ছিল স্বর্ণলতা, মাসীর নাম কনকলতা। খুব বন্ধুত্ব ছিল দুইজনের। স্বর্ণলতার বড় ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র যখন কুম্ভ মেলায় হারাইয়া গেল তখন তিনি বড় কাতর হইয়া পড়েন। সেই সময় হরিশ্চন্দ্রের বাবা রামচন্দ্র কনককে এ বাড়িতে লইয়া আসেন। কনককে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অভিভাবক কেহ ছিল না। হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল ইহার দশ বৎসর পরে এবং তাহার কিছুদিন পরেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হইল। স্বর্ণলতাও বিধবা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না, এক বৎসর পরে স্বামীর অনুগমন করিলেন। সেই সময় হইতেই কনকের ওপরই হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত ভার। তাঁহার কনক নাম সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। এ সংসারে এখন তাঁহার নাম 'মা'।

খাবার ঘরে গিয়া হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন একটি কাঁসার রেকাবিতে চারটি বেশ বড় বড় সন্দেশ এবং গোটা দুই কলা রহিয়াছে।

'এ সময়েই তো রোজ খাস। না খেলে পিত্তি পড়বে। উপা শিকারে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই—'

হরিশ্চন্দ্র আর আপত্তি করিলেন না। মা রাগিয়া গেলে একেবারে চুপ করিয়া যান এবং উপবাস করিতে থাকেন। তাই সহজে কেহ তাঁহাকে রাগাইতে চায় না। মা খুব কম খান। একাহারিণী। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর বেলা দুইটার সময় ভাতে ভাত, দুধ, কিছু ফল এবং মিষ্টান্ন ভোজন করেন।

এই স্বল্পভাষিণী রোগা পাতলা মহিলাটি হরিশ্চন্দ্রের বিশাল সংসারের প্রাণস্বরূপিণী। হরিশ্চন্দ্র খাইয়া বাহিরে আসিতেই রহমৎ আসিয়া সেলাম করিল। রহমৎ তাঁহার মুরগি এবং হাঁসের রক্ষক। মাইল দুই দূরে বিরাট যে পোলট্রি আছে রহমৎ তাহারই দেখাশোনা করে। কার্যত সে-ই পোলট্রির মালিক। প্রতি মাসে পোলট্রি হইতে যাহা আয় হয় তাহা সে হরিশ্চন্দ্রকে আনিয়া দেয় এবং হরিশ্চন্দ্র ঘোড়ায় চড়িয়া সেদিন পনের মাইল দূরবর্তী ব্যাংকে গিয়া জমা দিয়া আসেন। রহমৎ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পায়।

হরিশ্চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'রহমৎ, তুমি এ সময়ে এলে কেন?'

'মা ডেকে পাঠিয়েছেন—'

মা খাবার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

'হাঁ, আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছি। উপার যে বন্ধুটি কোলকাতা থেকে এসেছেন তার সঙ্গে বাঘ শিকার করবেন বলে, তিনি নাকি রোজ মাংস খান। আমাদের বাড়িতে তো

মাংস হবার উপায় নেই। তাই রহমৎকে বলছি ও কিছু মুর্গি রান্না করে নিয়ে আসুক। উপা আর তার বন্ধু খাবে। রহমৎ তো রান্নাও করতে পারে ভাল। বাড়িতে অতিথি এসে খাবে, সে যা খায় তার ব্যবস্থা করতে হবে—'

'শুনেছি সে মদও খায়', হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তার ব্যবস্থাও করবে না কি—'

'না। কিন্তু সে যে খাবার রোজ খায় তার ব্যবস্থা না করলে অন্যায় হবে। রহমৎ, তুই পারবি তো—'

'হ্যাঁ মা, পারব। দুটো ভাল ব্রয়লার রেঁধে আমি নিয়ে আসছি একটু পরে। বাবুরা খাবেন কখন?'

'তারা এখনও শিকার থেকে ফেরেন নি, দশটা নাগাদ হলেই হবে—'

মা সব বিষয়েই পুরাতনপন্থী। কিন্তু হাতে একটি রিস্টওয়াচ আছে। সেটি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'এখন ছ'টা বেজেছে—'

রহমৎ বলিল, 'দশটার মধ্যে আমি দিয়ে যাব—'

রহমৎ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'মা, দাবা খেলবে নাকি এক হাত—'

'না বাবা, এখন আমার সময় নেই। বাড়িতে অতিথি খাবেন। আমি এখন রান্নাঘরে যাব—'

'উপা না থাকলে আমার সন্ধেটা কাটতে চায় না। সেতার বাজাই একটু—'

মা আর একবার তাহার হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। দাবা খেলায় তিনি সুদক্ষা। হরিশ্চন্দ্র তাঁহারই কাছে দাবা খেলা শিখিয়াছেন এবং প্রায়ই তাঁহার কাছে হারিয়া যান।

বাহিরে গিয়া বৈঠকখানা ঘরে দেখিলেন গড়গড়ার উপর আর একটি কল্কে বসাইয়া গুপী অপেক্ষা করিতেছে। হরিশ্চন্দ্র চেয়ারে উপবেশন করিতেই গুপী গড়গড়ার নলটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। হরিশ্চন্দ্র এক টান দিয়া প্রশ্ন করিলেন—'গুন্ডা এখনও ফেরে নি?'

'না—'

গুন্ডা তাঁহার একটি ঘোড়ার নাম। তাহার পিঠে একটি সহিসকে উপানন্দের খবর লইতে পাঠাইয়াছেন। উপা যে বনে শিকার করিতে গিয়াছে তাহা মৃগমটর গ্রাম হইতে আট ক্রোশ দূরে। উপা এবং তাহার বন্ধু কাল বৈকালে মোটরে করিয়া সেখানে গিয়াছে। দিন তিনেক আগে একটি মহিষের বাচ্চাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটি মহিষ শাবকটিকে মারিয়াছে। তাহার নিকটে একটি মাচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উপানন্দ এবং তাঁহার বন্ধু ডক্টর সোম কাল বৈকালে গিয়া সেই মাচায় আরোহণ করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের ফিরিবার কথা। কিন্তু তাঁহারা ফেরেন নাই। হরিশ্চন্দ্র চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'জামুকে আর টহলকে ডাক—'

হরিশ্চন্দ্রের ছয়টি বড় বড় ঘোড়া আছে।

জামু আর টহল দুই জন সহিস।

তাহারা আসিতেই হুকুম দিলেন, 'তিনটি ঘোড়া কস্। আমি একটাতে যাব, আর তোরা দুজন আর দুটোতে যাবি। সঙ্গে গোটা দুই বোরা আর কিছু শক্ত দড়ি নিতে হবে। আমরা থাম্বা জঙ্গলে যাব, যেখানে উপাবাবু বাঘ শিকার করতে গেছেন। আমাদের মোষের গাড়িটাকেও রওনা করে দে এক্ষুনি। বিলটা কোথা? তাকে ডাক, তাতেও দু'একজন লোক

চলুক। বীরু আর রাম চলুক। দুটো আলোও নে—হ্যাজাক।'

একটু পরেই হরিশ্চন্দ্র সদলবলে থাম্বা বনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে থাম্বা জঙ্গলে পৌঁছিয়া দেখা গেল—বাঘ মারা পড়িয়াছে, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে মোটরটাকে লইয়া। সেটাকে কিছুতেই স্টার্ট করা যাইতেছে না। উপানন্দের ড্রাইভার নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু মোটরটিকে স্টার্ট করিতে পারে নাই। অনেক সময় মোটরকে কিছুদূরে ঠেলিয়া লইয়া গেলে মোটর স্টার্ট লয়। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়াও কিন্তু উপানন্দের মোটর স্টার্ট লইতেছে না। পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি ভাল মোটর মেকানিক আছে। তাহার নিকট লোক পাঠান হইয়াছে, সে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন মরা বাঘটার কাছে বসিয়া দুই বন্ধু সিগারেট ফুঁকিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র নামিয়াই বলিলেন, 'যন্ত্রের দাসত্ব কর ছ তো? তোমার মেকানিক তো সমরু? তার কাছে ঘোড়ায় করে একজন চলে যাক, আর তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসুক।'

উপানন্দ উদ্ভাসিত মুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না।

ডক্টর সোম বললেন, 'আপনিও চলে এলেন?'

'এলাম, তার কারণ উপা আমাকে মনে মনে ডাকছিল। ওরে, হ্যাজাকদুটো জ্বেলে ফেল। তোমরা এতক্ষণ বসে বসে কি করছিলে?'

'কিছু পক্ষী শিকারও করেছি। দুটো হরিকান এবং দশটা হরিয়াল পেয়েছি—'

হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'ওহো, বড় ভুল হয়ে গেল একটা। তোমাদের জন্যে কিছু খাবার আনলে হত। তোমরা তো অনেকক্ষণ খাও নি—'

হরিশ্চন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে হরিশ্চন্দ্রের জুড়ি গাড়িটি প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া হাজির হইল।

কোচোয়ান গণোরি নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, 'মা আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

দেখা গেল গাড়ির ভিতর আর একটি চাকর তিনটি বড় টিফিন কেরিয়ার এবং এক কলসী জল লইয়া বসিয়া আছে।

উপানন্দ বলিলেন, 'আর একটা মুশকিলে পড়া গেছে। বাঘটা বেশ বড়। ওটাকে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়? দুটো গরুর গাড়ি ডাকিয়েছিলাম। বাঘ দেখেই গরুগুলো ভড়কে পালাচ্ছে।'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। আমার মোষের গাড়িটা আসছে। আমি সঙ্গে কিছু বোরা আর দড়িও এনেছি। বাঘটাকে বোরা দিয়ে ঢেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল। বাঘের চেহারা দেখলে গরু মোষ ঘোড়া—সবাই ভড়কে যাবে। ওটাকে বোরার মধ্যে পুরে ফেল। ওর জন্যে চিন্তা নেই, এখন মা যা পাঠিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার কর।'

একটু পরেই মেকানিক সমরু একটি জিপ গাড়ি করিয়া আসিয়া হাজির হইল।

হরিশ্চন্দ্র ও উপানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি যন্ত্রপাতি সব নিয়ে এসেছি। দেখি কি হয়েছে।'

খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'কারেন্ট আসছে না। মনে হয় ডিস্ট্রিবিউটারে কোনও গন্ডগোল হয়েছে। ঠিক করতে একটু সময় লাগবে। কতক্ষণ লাগবে তা না খুলে

বলতে পারছি না। মোটরটা এখন আমার জিম্মায় রেখে যান। আমি আমার গাড়ি করে আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। আপনার ড্রাইভার বেচু সিং এখানে থাক। গাড়ি ঠিক হয়ে গেলে সে নিয়ে যাবে।'

উপানন্দ বলিল, 'বাঘ যাবে কিসে? বাঘ না নিয়ে আমি যাব না।'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'আমার মোষের গাড়িটা এখুনি এসে পড়বে। সেটার উপর বাঘটাকে চাপিয়ে আমরা রওনা হয়ে যাব। বাঘকে ওরা বোরায় প্যাক করে ফেলেছে।'

'এখানে আর কে থাকবে ড্রাইভার ছাড়া?'

প্রশ্ন করিলেন ডক্টর সোম।

'দুটো ঘোড়া আর মহিষ থাক। মোষের গাড়িতেও লোক আসবে কয়েকজন। ওই যে এসে গেছে মোষের গাড়ি।'

মা প্রচুর খাবার পাঠাইয়াছিলেন। তিনজনে মিলিয়া একটি টিফিন কেরিয়ারও তাঁহারা শেষ করিতে পারেন নাই। অবশিষ্ট খাবারগুলি তাঁহারা চাকরদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

মহিষের গাড়িতে আরও কিছু বোরা এবং দড়ি ছিল। সেগুলি দিয়া বাঘটিকে আর একবার আবৃত করা হইল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বাঘের গন্ধ পাইলেও মহিষ দুইটি চঞ্চল হইতে পারে।

'তোরা মোষদুটোকে খুলে দূরে নিয়ে যা।'

মহিষ দুইটাকে দূরে লইয়া যাইবার পর বাঘের বস্তাটাকে গাড়ির উপর চাপানো হইল। দারোয়ান বস্তার উপর কয়েকটা গাছের ডালও চাপাইয়া দিল। সঙ্গে দা ছিল, বনে গাছেরও অভাব ছিল না। অনেকগুলি ডাল কাটিয়া বাঘটিকে ঢাকা দেওয়া হইল। তাহার পর মোষ দুইটিকে আনিয়া গাড়িতে জুড়িয়া দিয়া হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তোরা এগিয়ে যা, আমরা পিছু পিছু আসছি। আমি ঘোড়ায় যাব। ওরা মোটরে আসুক—'

একটু পরেই জিপে চড়িয়া এবং মারা পাখিগুলিকে লইয়া উপানন্দ এবং তাঁহার বন্ধু ডক্টর সোম রওনা হইয়া গেলেন।

সবাই চলিয়া যাইবার পর হরিশ্চন্দ্র ঘোড়ায় চড়িয়া থাম্বা জঙ্গলের ওপারে হিংচা গ্রামের দিকে গেলেন। হিংচা গ্রামের মোড়ল সূর্য মণ্ডলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সূর্যি, তুমি কয়েকজন লোক নিয়ে জঙ্গলের ওপারে যাও। উপানন্দের মোটরটা খারাপ হয়ে গেছে। সমরু সেটা সারাচ্ছে। তোমার উপর মোটরটার ভার দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সেখানে চলে যাও। মোটর সারানো হয়ে গেলে তুমি মোটরটা নিয়ে উপানন্দের বাড়িতে পৌঁছে দিও। তোমার উপর এই ভারটা দিয়ে গেলাম—'

সূর্য মণ্ডল বলিল, 'আমি এখুনি যাচ্ছি। বাঘটা বড় উপদ্রব করছিল। সেটাকে মেরে বাবু আমাদের অনেক উপকার করেছেন—'

'তোমার উপর ভার দিয়ে চললাম তাহলে—'

'আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'কিছু ভাল ধানের বীজ আনিয়েছি। তুমি যদি চাও, দেব তোমাকে। কাল গিয়ে নিয়ে এস—'

'যে আজ্ঞে।'

সূর্য মণ্ডল প্রণত হইল।

হরিশ্চন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গল্পটার কাল ইংরেজ রাজত্বের শেষ ভাগে। হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধু উপানন্দ দুইজনেই বড় জমিদার। তাঁহাদের জমিদারি পাশাপাশি। ইংরেজ আমলে অনেক অত্যাচারী জমিদার এদেশে ছিলেন। কিন্তু এই গল্পে যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা ছিলেন ব্যতিক্রম। প্রজাদের হিতৈষী বন্ধু। জমিদারদের যেমন কাছারি নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি থাকিত ইঁহাদেরও সে সব ছিল। তাঁহারা খাজনা আদায় করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন, গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, কিন্তু প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাঁহাদের কোন হাত ছিল না। সে ভার ছিল হরিশ্চন্দ্র এবং উপানন্দের উপর। উপানন্দ নির্ভর করিত হরিশ্চন্দ্রের উপর। হরিশ্চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে দুইটি জমিদারিরই মালিক ছিলেন। তিনি যাহা করিতেন তাহাই হইত। হরিশ্চন্দ্র নিজে সব করিতেন না। দুইটি জমিদারিতে একশতটি গ্রাম ছিল এবং প্রত্যেক গ্রামের স্ব নির্বাচিত মোড়ল ছিল একজন। সেই মোড়লই গ্রামের ছোটখাটো বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার করিতেন। গ্রামের মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তাও তাঁহাকে করিতে হইত, প্রয়োজন বুঝিলে তিনি হরিশ্চন্দ্রের সহিত যোগাযোগ করিয়া সমস্যার সমাধান করিতেন। বছরে একবার করিয়া একশত গ্রামের একশত মোড়লের সভা হইত মৃগমটর গ্রামে। সভাটির নাম শতরঞ্জি। এই সভায় যে কোনও প্রজার যোগদান করিবার অধিকার থাকিত। এই সভাতেই গ্রামগুলির বিবিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন হরিশ্চন্দ্র প্রত্যহ সকালবেলায়। বৈকালে খেলাধূলা কুস্তি প্রভৃতি হইত। সন্ধ্যার পর হইত নাচ গান। সাতদিন ধরিয়া দীয়তাং ভূজ্যতাং চলিত। বহু লোক খাইত, বহু তাঁবু পড়িত। বহু হালুইকর ও রাঁধুনীরা আসিত। অনেক খড়ের ছোট ছোট গৃহ প্রস্তুত হইত গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য। হাজার লোক বসিয়া যাত্রা বা নাচ গান উপভোগ করিতে পারে এরূপ প্রকাণ্ড একটি স্থানকে ত্রিপল দিয়া এবং বাঁশ দিয়া ঢাকা দেওয়া হইত। চারিদিক বাঁশ পুঁতিয়া মোটা কানাতে দিয়া আবৃত করা হইত। বহু ঝাড় লণ্ঠনে মোমবাতি জ্বলিত। উপানন্দের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র ইলেকট্রিসিটি জ্বালিতে দিতেন না। তাঁহার মতে, মৃদু স্নিগ্ধ আলোতেই নৃত্যগীত ভাল জমে। উগ্র আলো শিল্পের স্বপ্নকে নষ্ট করিয়া দেয়। অক্ষয় তৃতীয়া হইতে সাতদিন পর্যন্ত শতরঞ্জি হইত। গ্রামের লোকেরাই ছয়দিন নিজেরাই যাত্রা কথকতা গান বাজনা আবৃত্তি প্রভৃতি করিত। সপ্তম দিনে বাহির হইতে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক বা গায়িকা আসিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের প্রাপ্য প্রণামী দিতেন এবং উপানন্দ দিতেন কোন বিশেষ উপহার। কখনও দামী আংটি, কখনও শাল, কখনও বা আরও কিছু। আর প্রত্যেককে একটি মূল্যবান সেতার, এস্রাজ বা তনপুরাও দেওয়া হইত।

হরিশ্চন্দ্র ঘোড়া করিয়া কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, জিপ গাড়িটি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাছে গিয়া দেখিলেন, মোটরের একটি টায়ার ফাটিয়াছে, টায়ারটি বদলানো হইতেছে।

হরিশ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

'কতক্ষণ দেরি হবে?'

'আধঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।'

'বর্গীটা কি ফিরে গেছে?'

'বোধহয় ফেরে নি। আমরা অন্তত দেখি নি সেটাকে।'

'আমিও তো দেখলাম না সেটাকে আসবার সময়। গণোরি তাহলে নিশ্চয় তাড়িখানায় গেছে। ফিরবে এখুনি, এই রাস্তা দিয়েই যাবে। তোমাদের গাড়ি যদি ঠিক না হয়—ওই যে গণোরি আসছে।'

হরিশ্চন্দ্র ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। গণোরি এবং সহিস উভয়েই তাড়ি পান করিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'তোরা এখানেই থাক। মোটর যদি ঠিক না হয় তো বাবুকে নিয়েই তুই আয়। আমি এগোচ্ছি।'

হরিশ্চন্দ্র ঘোড়া ছুটাইয়া আগাইয়া গেলেন।

তিনি হয়তো মোটর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটি আশঙ্কা জাগিতেছিল, আসিবার সময় তিনি মাকে বলিয়া আসেন নাই। মা হয়তো মনে মনে রাগ করিয়া বসিয়া আছেন। রাগ করিলে তিনি বকেন না, চেঁচামেচি করেন না, উপবাস করিতে আরম্ভ করেন। বেশী রাগ হইলে এক নাগাড়ে দুই-তিনদিন পর্যন্ত তাঁহাকে উপবাস করিতে দেখিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র। তিনি মাকে বলিয়া আসেন নাই, তাহার কারণ, মা তাঁহাকে আসিতে দিতেন না। অথচ উপানন্দের জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল। তাই মাকে না বলিয়াই তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন। মা কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে পারিয়াছেন এবং গাড়ি করিয়া খাবার পাঠাইয়াছেন। তিনি মনে মনে চটিয়াছেন কি?

হরিশ্চন্দ্র বাড়ি পৌছাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া অন্দরমহলে গেলেন।

'মা।'

ভাড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন কনকলতা।

'কি; বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল? কোথা সে?'

'আসছে এখুনি। তার মোটর খারাপ হয়েছে।'

'আসছে এখুনি। তার মোটর খারাপ হয়েছে।'

'সে আসবে কিসে?'

'চল, সব বলছি।'

হরিশ্চন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। কণ্ঠস্বরে রাগের উত্তাপ নাই।

॥২॥

পরদিন সকালেই আহ্নিক করিয়া হরিশ্চন্দ্র মাঠে বাহির হইয়া গেলেন। মাঠে চাষীদেব সঙ্গে কিছুক্ষণ কাজ না করিলে হরিশ্চন্দ্রের ভাল লাগে না। উপানন্দ তাঁহার বাঘের চামড়া ছাড়ানো লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। কয়েকজন মুচির সাহায্যে চামড়াটি ছাড়াইয়া, তাহার ভিতর নুন মাখাইয়া সব আজই কলিকাতা পাঠাইতে হইবে। সেখান হইতে সেটিকে পাঠানো হইবে কানপুরে। ডক্টর সোমকে লইয়াও উপানন্দ প্রায় সমস্ত দিনই ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। অচেনা-অজানা গাছের সন্ধানে তিনি নানা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। অচেনা, অজানা গাছ দেখিলে তিনি তাহার রঙীন ফোটো তোলেন। তাহাদের ফুল ফল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার ধারণা, আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এখনও এমন গাছ আছে যাহাদের পরিচয় এখনও অনাবিষ্কৃত। তাহাদের আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেন এবং এজন্য প্রচুর অর্থও

ব্যয় করেন। উপানন্দের কাছে আগেও আসিয়াছেন কয়েকবার। উপানন্দ তাঁর সহপাঠী। আর একটি আকর্ষণ, উপানন্দ একজন ভাল ফোটোগ্রাফার। তাহার বাড়িতে রঙীন ছবি প্রিন্ট করিবার একটি চমৎকার 'ডার্করুম' তো আছেই, এনলার্জ করিবার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাও আছে।

উপানন্দ বাঘের চামড়াটাকে দুইজন লোকের সংগে কলিকাতায় একজন ট্যাক্সি-ডারমিটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি চামড়াটি লইয়া কানপুরে পাঠাইয়া দিবেন। লোক দুইজন চামড়াটি লইয়া স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। মৃগমটর রেলওয়ে স্টেশন কয়েক মাইল দূরে।

উপানন্দ আসিয়া ডার্করুমের দরজায় টোকা দিলেন।

সংগে সংগে বাহির হইয়া আসিলেন ডঃ সোম।

'আমার কাজ হয়ে গেছে। চামড়াটা পাঠিয়ে দিলে?'

'হ্যাঁ। চল, এবার হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি যাই। সে এতক্ষণ মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। আমরা গেলে তবে খাবে।'

'তোমার এ বন্ধুটি একটু ছিটগ্রস্ত বলে মনে হয়।'

'একটু নয়, বেশ ছিটগ্রস্ত। ওই ছিটের জন্যই আমি ওকে ভালবাসি। ওর চরিত্রে এমন একটি রং আাছ, যা দুর্লভ। সে রং সবাই দেখতে পায় না।'

'কি রকম?'

'কোন জমিদারকে কি তুমি মজুরদের সংগে কাজ করতে দেখেছ?'

'ওইটেই তো মাথা খারাপের লক্ষণ।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, ওটা মহাপুরুষের লক্ষণ। ওর সংগে আলাপ করলে বুঝতে পারবে, ও আলাদা জাতের লোক। ওর ওখানে তো আজ নিমন্ত্রণ আছে আমাদের।'

'অসাধারণ লোককে আমি ভয় করি ভাই। নিমন্ত্রণ করেছেন যখন অবশ্যই যেতে হবে।'

উপানন্দ হঠাৎ ইংরেজিতে বলিলেন, He is a wonderful man. ও ইচ্ছে করলে আমাদের মত বড় বড় ডিগ্রী আনতে পারত, কিন্তু ও গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর পড়া ছেড়ে দিলে। বললে, এর বেশি বিদ্যের আমার দরকার নেই।'

'কোন্ ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে?'

'ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কিন্তু তারপর আর পড়লে না। বললে, গ্রাম ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওর চিন্তাধারা আমাদের মত নয়। ও তাদের সংগেই মেশে যাদের আমরা ছোটলোক বলি। ও বলে, আমাদের ভারতবর্ষ ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে। ওর মতে, আমরা সে ভারতবর্ষকে ক্রমশ ইংলণ্ড বা আমেরিকা করবার চেষ্টা করছি। আমাদের জমিদারিতে সবরকম পূজাপার্বণ ধুমধাম করে হয়, এমন কি শীতলা পূজা পর্যন্ত। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া করেছে ও। ফুটবল ক্রিকেট খেলার চেয়ে কপাটি খেলা, ধাপসা খেলায় ওর বেশী উৎসাহ। আমাদের জমিদারিতে অনেক 'কপাটি টিম' আছে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ও প্রকাণ্ড একটা শিল্ড (shield) দিয়েছে, তার জন্যে—'

'আমাদের জমিদারি ও-ই দেখে, আমি খালি খরচ করি, আর কিছু করি না।'

এমন সময় অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শোনা গেল। ঢং-ঢং শব্দে গাড়ির ঘণ্টাটা বাজিয়া উঠিল।

সহিসের চীৎকার শোনা গেল, 'সাম্‌হালকে।'

'ওই হরিশ্চন্দ্রের গাড়ি এসে গেল।'

একটু পরেই সহিস টহল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।' 'বাবু, গাড়ি পাঠিয়েছেন।'

'আচ্ছা।'

টহল পুনরায় সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

উপানন্দ ডক্টর সোমকে বলিলেন, 'জামাকাপড় বদলাতে চাও তো বদলে নাও। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ও যাবে না।'

একটু পরেই তাঁহারা দুইজন হরিশ্চন্দ্রের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হরিশ্চন্দ্র খালি গায়ে খালি পায়ে বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্কন্ধে শুভ্র উপবীত, পরিধানে খদ্দরের ধুতি। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ডক্টর সোমকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

'এখন আপনি স্নান করেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, মাঠ থেকে ফিরে স্নান করি এই সময়। আসুন, ভেতরে বসা যাক।'

'আমি উপানন্দের বন্ধু, আমাকে আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন।'

'ঘনিষ্ঠতা বাড়ুক, তুই বলব।' হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। খিত্‌-খিত্‌ করিয়া শব্দ হইল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করব না, এখন থেকেই আরম্ভ করব। চল, ভেতরে চল।'

এবার সজোরে হাসিয়া ফেলিলেন হরিশ্চন্দ্র এবং বলিলেন, 'তোর ডাক নাম কি?'

'ডাক নাম ভুতু। ভাল নাম নয়নানন্দ।'

'ওরে বাপরে! আমি ভুতু বলেই ডাকব।'

সকলকে লইয়া হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বিরাট বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। ডক্টর সোম দেখিলেন, আধুনিক ধরনের সৌখিন ড্রয়িংরুম নয়। এক ধারে দুইটি বড় বড় চৌকি রহিয়াছে, আর এক পাশে বেঞ্চিও আছে গোটা দুই। আর আছে বলিষ্ঠ আকৃতির কয়েকটা চেয়ার। চেয়ারে ছোট-ছোট গদি। গদি খদ্দরের। টেবিলও আছে গোটা দুই। টেবিলের উপর রহিয়াছে সিগারেট, সিগার, একটি দেশলাই বাক্স এবং একটি বড় অ্যাশট্রে। সবগুলিই রহিয়াছে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে সাজানো। আর একটি প্রকান্ড গড়গড়া নিঃশব্দে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল।

'এস, বসা যাক সকলে।'

সকলে গিয়া ভিতরে বসিলেন। নকু চাকর আসিয়া প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল 'চা আনব না কফি—'

'কফিই আন', উপানন্দ বলিলেন।

একটু পরেই কফির সরঞ্জাম লইয়া নকু ও হীরু প্রবেশ করিল। তাহার পিছু পিছু আসিল আর একটি চাকর, মহেন্দ্র। তাহার হাতে একটি শ্বেতপাথরের গ্লাস। সেটি সে হরিশ্চন্দ্রের হাতে দিল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'ওটা আবার কি? তুমি কফি খাবে না?'

'এটা গুড়ের শরবৎ। আমি চা বা কফি খাই না।'

'গুড়ের শরবৎ কেন, চিনিও খাও না?'

'না। চিনি এখনও আমরা তৈরি করতে পারি নি। একটা দেশী চিনির কারখানা বসাবার চেষ্টায় আছি। এখনও কিন্তু পেরে উঠি নি। তবে চিনিকে একেবারে বয়কট করতে পারি নি। আমার মা নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি করেন, তার জন্য চিনি কিনতে হয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব চা-কফি খান, তাঁদের জন্যও চিনি কিনতে হয়। আমি কিন্তু গুড়টাই বেশী পছন্দ করি। নিজের জমিতে আখ হয়, তার থেকেই গুড় তৈরি করি। ওটা ঘরের জিনিস, তাই ওর প্রতি আমার বেশী পক্ষপাতিত্ব। তোমরা কফি খাও, আমি এটা খেয়ে ফেলি।'

এক নিঃশ্বাসে তিনি শরবৎটা শেষ করিয়া ফেলিলেন। মহেন্দ্র গ্লাসটি লইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ার নল তুলিয়া একটি টান দিলেন।

ডক্টর সোম কফির কাপে একটা চুমুক দিয়া বলিলেন, 'তাহলে খুব মানাতো যদি ওটা তুমি মাটির গ্লাসে খেতে।'

'ঠিকই বলেছ। আগে তাই খেতাম। মা গত বছর গয়া থেকে কিনে এনেছেন ওটা। উপহার দিয়েছেন আমার জন্মদিনে। ওটাও হোম-মেড বলতে পার। সমস্ত ভারতবর্ষকেই আমি আমার 'হোম' মনে করি। খাগড়ার কাঁসার বাসন, মালদহ-মুর্শিদাবাদের রেশমের কাপড়, বেনারসের বেনারসী কাপড় আমি বর্জন করি নি। আমার কোন শুচিবাই নেই। আমি স্বদেশীশিল্পের উৎসাহদাতা।'

উপানন্দ এতক্ষণ কোনও কথা বলেন নাই। এইবার বলিলেন, 'আমরা তাই নাম দিয়েছি স্বদেশী বাবা।'

হরিশ্চন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন। একটু পরেই তিনটি পাখা আসিয়া উঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার পর আরও কয়েকটি চাকর ঘরে কয়েকটি লণ্ঠনও দিয়া গেল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তুমি এ যুগে ইলেক্‌ট্রিসিটি বর্জন করেছ এটা বড় আশ্চর্য। উপানন্দের বাড়িতে আছে অথচ তোমার বাড়িতে নেই এটাও কম আশ্চর্য নয়। উপানন্দের বাড়ি থেকেই অনায়াসে তুমি কনেক্‌শন নিতে পার।'

উপানন্দ মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'ও ইলেক্‌ট্রিসিটি চায় না, স্বাধীনতা চায়।'

'তার মানে?'

এইবার উত্তর দিলেন হরিশ্চন্দ্র। 'তার মানে ইলেক্‌ট্রিসিটি নিলে এমন একটি যন্ত্রের অধীনে থাকতে হবে, যার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, যার যন্ত্রপাতি এদেশে পাওয়া যায় না, যার মিস্ত্রি এদেশে দুর্লভ। সুতরাং ও বাতি মাঝে মাঝে নিভবে। ও পাখা মাঝে মাঝে থেমে যাবে। তখন তোমাকে খোসামোদ করতে হবে ওই মিস্ত্রিদের, ছোটাছুটি করতে হবে সেই সব জিনিসের জন্য, যা এখানে পাওয়া যায় না। উপানন্দের আলো বার বার নিভছে। ওকেও এক সেট লণ্ঠন রাখতে হয়েছে। যন্ত্রের অধীন হলে দুর্গতি অনিবার্য।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তোমার লণ্ঠনও একটা যন্ত্র।'

'লণ্ঠন প্রদীপ ঢিবরি—সবাই যন্ত্র। কিন্তু ও যন্ত্র খারাপ হলে আমরা ঠিক করতে পারি। ওসব যন্ত্র সস্তাও, বেশী খারাপ হলে ফেলে দিয়ে আর একটি কিনতে পারি। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটার খারাপ হলেই মুস্কিল। কাল তোমাদের মোটর নিয়ে কি দুর্গতি হয়েছিল ভেবে দেখ। তোমার মোটর ঠিক হয়েছে?'

'না। বলছে ডায়নামাটা খারাপ হয়েছে।'

'ও এখন অনেক ভোগাবে। যন্ত্রের অধীন মানেই যন্ত্রনা।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আধুনিক যুগটাই তো যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রকে বন্ধ দিয়ে কি চলতে পার তুমি?'

'আমি চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব বাদ দিয়ে চলতে। ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে, কিন্তু মোটর রাখতে হলেই একটি মেকানিকের কবলে পড়ে গেলে তুমি। সে লোকটি যদি ভাল হয় তো ভাল, কিন্তু সে যদি অসৎ হয় তো তোমাকে ভোগাবে।'

'তোমার কোচোয়ান, সহিস কি সব সৎ?'

'অসৎ হলে তাদের দূর করে দি, তার বদলে আর একটা সহজে পাওয়া যায়। যন্ত্রের আর একটা কি দোষ জানো? যন্ত্র আমাদের পঙ্গু করে দেয়। ইলেক্‌ট্রিক লাইটের জোর আলোতে অভ্যস্ত হয়ে আমরা কম আলোয় আর দেখতে পাই না। আমাদের দেশে আগে আমাদের দিন আরম্ভ হত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা সূর্যালোকেই সব কাজ করতাম। সন্ধ্যার পর ছিল বিশ্রামের সময়। তখন আমরা গল্প-গুজব করতাম, গান-বাজনা করতাম, তারপর সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়তাম। উঠতাম ব্রাহ্মমুহূর্তে। উঠে স্নান করতাম, পূজা করতাম। তারপর ভোর হতে না হতেই নিজের নিজের কাজে লেগে পড়তাম। অনেক বয়স পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি ঠিক থাকত। ইলেকট্রিক আলো আমাদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। আজকাল ওই প্রখর আলো জ্বেলে দিন-রাত কাজ করছে সবাই। এত কাজ করে কি হবে? কতকগুলো মালটিমিলিয়নিয়ার আরও বড়লোক হবে।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'হোক না তাতে ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি শেষ পর্যন্ত অ্যাটম বম। এই যন্ত্রসভ্যতাই আমাদের ধ্বংস করবে শেষ পর্যন্ত। মনুষ্যজাতি দেহে-মনে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমরা স্বাধীন নই, সব দিক থেকে পরাধীন। আমরা হাঁটতে পারি না, চোখে দেখতে পাই না, খেয়ে হজম করতে পারি না, জোরে কথা পর্যন্ত বলতে পারি না, মাইক চাই। আমাদের পূর্বপুরুষরা শক্তিমান পুরুষসিংহ ছিলেন। স্বাধীন ছিলেন। বীর ছিলেন। তোমরা কাল যে বাঘটা মারলে এতে বীরত্ব কোথায়? লুকিয়ে দূর থেকে বন্দুক ছোঁড়ার মধ্যে বীরত্ব নেই। আমাদের পূর্বপুরুষরা লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে বাঘ মারতেন। অনেকে বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি সম্মুখসমর করে জয়ী হতেন। তোমাদের শিকার-কৌশল আছে, বীরত্ব নেই। কৌশলের জোরে আমরা নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালিয়ে অনেক পশুপক্ষীকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। এবার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করবার যন্ত্রও বেরিয়েছে। ভবিষ্যতে কি যে হবে কিছু বলা যায় না। গোটা কয়েক পাগলা প্লেনে করে উড়ে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে হয়তো!'

হরিশ্চন্দ্র চোখ বড় বড় করিয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন।

উপানন্দ এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, হাসিমুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়াছিলেন। এইবার বলিলেন, 'আমার মতে, সুতরাং যতক্ষণ বেঁচে আছি জীবনটাকে ভালভাবে ভোগ করে নি।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমারও তাই মত। যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।'

হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ায় ভড়াক-ভড়াক করিয়া টান দিলেন, তারপর প্রচুর ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'আমরা তা ছাড়া আর করছি কি? সবাই তো জীবনকেই উপভোগ করছি। কিন্তু ওরই মধ্যে রুচির তারতম্য আছে। গরু ঘাস খেয়ে জীবন উপভোগ করে, বাঘ কিন্তু জীবন উপভোগ করে ওই গরুর ঘাড় মটকে তার রক্ত পান করে, শিকারীর আনন্দলাভ ওই

বাঘকে গুলি দিয়ে মেরে, তার চামড়া দিয়ে নিজের বৈঠকখানা সাজিয়ে। গরু বা বাঘ যা করে, তা না করে তার উপায় নেই। মানুষ বুদ্ধিমান স্বাধীন জীব, সে বহু কোটি বৎসর স্বৈরাচার চালিয়ে বুঝেছে যে, স্বৈরাচারে সুখ নেই। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ তাই ধর্ম বিবেক নিঃস্বার্থপরতা স্বাবলম্বীতা প্রভৃতি গুণকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছে তার চরিত্রে এবং ফুটিয়ে তুলে সুখ পেয়েছে। সুখই আমাদের কাম্য। মানুষ এটা বুঝেছে যে, সুখের জন্য স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, কিন্তু সে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হলে চলবে না, সে স্বাধীনতাকে সংযমের অঙ্কুশ দিয়ে শাসন করতে হবে। যন্ত্রযুগে নিজের বুদ্ধির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে মানুষ কিন্তু অসংযত হচ্ছে ক্রমশ। তার মধ্যে পশুভাব বেড়ে যাচ্ছে এবং সেইটেই ভয়ের কথা। জীবনকে ভোগ কর কিন্তু কতকগুলো যন্ত্রের অধীন হয়ে শরীর মনকে পঙ্গু করে অসংযত ভোগের পক্ষপাতী আমি নই।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তাহলে তুমি কি চাও বিজ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাক?'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি যদি মনুষ্যত্বের অগ্রগতিকে রোধ করে, তাহলে সে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কি করব? মরব?'

'মৃত্যু যদি অনিবার্য হয় মরতেই হবে।'

'অনিবার্য মানে?'

'বিজ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ করবে কি করে? যে মানুষ এককালে গরুরগাড়ি বানিয়েছিল, সেই মানুষই এখন রকেট চালিয়ে মহাকাশে যাচ্ছে। তার বুদ্ধি, তার প্রতিভা শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। একটা কথা কিন্তু সুনিশ্চিত, মানুষ থামবে না, তার কৌতূহল কমবে না, বাড়বে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'সে ও জানে। ওর বক্তব্য হচ্ছে, যতদিন সম্ভব ও নিজের চাষের তামাক নিজের গড়গড়ায় নিজের মনের মত করে খাবে।'

ডক্টর সোম হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হরিশ্চন্দ্রও খিত্-খিত্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'উপা ঠিকই বলেছে। পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করবার সাধ্য আমার নেই। আমি কেবল আমার জীবন আমার পছন্দ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে চাই। আমি এটা বুঝেছি, যন্ত্রের অধীন হলে সুখ বাড়ে না, কমে। যত স্বাবলম্বী হতে পারা যায় তত সুখী হবো, এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা। আমি মোটরে চড়ে ডায়নামার এবং মিস্ত্রির পাল্লায় পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকতে চাই না। হাঁটতে যদি পারি, সবচেয়ে ভাল, না পারি, ঘোড়া বা পালকি চড়ব।'

এমন সময় ভিতর হইতে একটি চাকর একটি ট্রে-তে সাজাইয়া তিনটি রেকাবিতে সন্দেশ এবং আরও তিনটি রেকাবিতে কাজু-বাদাম লইয়া প্রবেশ করিল।

ডক্টর সোম বলিয়া উঠিলেন, 'আবার খাবার কেন?'

চাকরটির পিছনে পিছনে মা নিজে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'খেতে একটু রাত হবে বাবা। তোমরা এখন কিছু খেয়ে নাও, তারপর গানের আসরে বসো। বেশী কিছু দিই নি তো।'

মা আবার ভিতর বাড়িতে চলিয়া গেলেন।

'মায়ের আদেশ অমান্য করা যাবে না। খাও।'

কাজু খাইয়া ডক্টর সোম পুলকিত হইলেন।

'বাঃ! এমন চমৎকার কাজু এখানে পেয়েছ?'

'আমার জমিতে হয়। আমি পারতপক্ষে বাইরের জিনিস খাই না।'

উপানন্দ মন্তব্য করিলেন, 'ও দারুণ স্বাধীন এবং নিদারুণ স্বাবলম্বী এবং সুখী।'

তাঁহার চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিভরা দৃষ্টিতে তিনি হরিশ্চন্দ্রের দিকে তাকাইলেন। হরিশ্চন্দ্রের চোখ দুইটিও হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আর তোমার বন্ধুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল কুঁড়ের বাদশা।'

উপানন্দ বলিলেন, 'না, সবটা বলা হল না।'

'এ ছাড়া আবার কি?'

'বল, এবং সুখী। তুমি যখন খুব ভোরে উঠে স্নান কর, আমি তখন ঘুমোই, তুমি যখন মাঠে চাষীদের সঙ্গে কাজ কর, আমি তখন সেতার বা বেহালা বাজাই, তুমি যখন জমিতে পচা সার দিতে ব্যস্ত, তখন আমি গোঁফে আতর লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ি। আমার জমিদারির সমস্ত ঝঞ্ঝাট তুমি যখন সামলাও, আমি তখন ছবি আঁকি, না হয় রেডিওতে গান শুনি। আমি ঠিক তোমার উল্টো, কিন্তু আমিও সুখী।'

'আমি যখন থাকব না, তখন মজাটা বুঝতে পারবে।'

'তখন আর কেউ জুটে যাবে। স্বাবলম্বী হলে সুখী হওয়া যায়, পরনির্ভরশীল হলেও যায়। শিশুরা মায়ের উপর নির্ভরশীল। তারা কি অসুখী? তারা বিষয় চিন্তা করে না, কেবল আনন্দের খোঁজে থাকে।'

ঠিক এই সময়ে বাহিরে মাদলের শব্দ পাওয়া গেল।

'সনাতন এসে গেছে।'

সনাতন একজন সাঁওতাল মাঝি। হরিশ্চন্দ্রের প্রজা। ভাল মাদল বাজাইতে পারে।

'এস সনাতন। ওরাও এসেছে তো?'

'আজ্ঞা হাঁ। শুকরি, শিমুল আর চেরা এসেছে।'

'আয়, ভেতরে এসে বস্ তোরা। কলকাতার বাবুকে তোদের গান শুনিয়ে দে।'

শুকরি, শিমুল—দুইটি যুবতী সাঁওতাল কন্যা। তাহাদের হাতে বাঁশী। বাঁশের তৈরি।

'তোরা কিছু খেয়ে নে আগে।'

'আমরা খেয়ে এসেছি। পেট বেশী ভরা থাকলে গান গাওয়া যাবে না। আমরা মায়ের কাছে পরে গিয়ে খাব।'

ইহারা যদিও সাঁওতাল, কিন্তু বাংলা কথা বলিতে পারে, যদিও কথার টান একটু সাঁওতালী ধরনের।

'তোদের খরমুজ কি রকম হয়েছে?'

'খুব ভাল।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমি একবার সাঁওতালী গান শুনেছিলাম, সে কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে।'

'সেখানে গানের সঙ্গে নাচও ছিল নিশ্চয়। এখানে এরা শুধু গান গাইবে।'

একটু পরেই গান আরম্ভ হইয়া গেল। শিমুল, শুকরী দুইজনের গলাই অপূর্ব। বাঁশী ও মাদলের সহযোগে গান জমিয়া উঠিল।

হরিশ্চন্দ্র মাদলের তালে-তালে অঙ্গ দুলাইতে লাগিলেন।

গানের রচয়িতা সনাতন।

ঝিঙা ফুল হলুদ বরণ.
শসা ফুল শাদা,
দুই ভাল দুই ভাল দুই ভাল।
মহুয়া মাথায় টিপ পরে
ঝুমরি কানে দুল,
ওহো! দুইই ভাল দুইই ভাল দুইই ভাল।
মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে
সূয্যি থেকে রোদ,
আহা, দুইই ভাল দুইই ভাল দুইই ভাল রে।
তুই যদি মন্দ হ'স
মন্দ হবে সব,
তা না হলে সব ভাল সব ভাল সব ভাল রে সব।

মাদলের বাজনা, বাঁশীর সুর, শিমুল শুকরীর অংগভংগী সহকারে সুমিষ্ট গান একটা অপরূপ সুরলোক সৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

বিশেষভাবে মুগ্ধ হইলেন ডক্টর সোম। বলিলেন, 'খুব ভাল লাগল। গানের সরল ভাব মেয়ে দুইটির অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরে চমৎকার লাগল।'

গান শেষ করিটা তাহারা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'উপা, তুমি বেহালা বাজাও একটু। ওরে, ও ঘর থেকে আমার বেহালাটা দিয়ে যা তো।'

একজন চাকর বেহালা দিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তুমি খালি ইমন আলাপ কর। আমি চোখ বুঁজে শুনি।'

বেহালায় উপানন্দ ইমন আলাপ শুরু করিলেন। হরিশ্চন্দ্র চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর সোম তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন। এমন তন্ময়ভাবে গান শুনিতে তিনি আর কাহাকেও দেখেন নাই। মনে হইল, হরিশ্চন্দ্রের তৃষিত-সত্তা যেন অমৃত পান করিতেছে।

ডক্টর সোমও যেন ধীরে ধীরে সম্মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল যে যদিও তিনি সংগীতজ্ঞ নহেন, গান-বাজনার বিশেষ কিছু বোঝেন না, তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী মাত্র, তবু এই ইমনের আলাপ তাঁহার মনে এমন একটা আনন্দ সঞ্চারিত করিতে লাগিল যাহা বর্ণনা করিবার নয়, কিন্তু কাহার প্রভাবে তাঁহার মন অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ রসে নিমগ্ন হইয়া গেল? মনে পড়িল, বহুকাল পূর্বে ভূমধ্যসাগরে জাহাজের ডেকে বসিয়া দিগন্তপ্লাবিত পূর্ণিমা রাত্রির অবর্ণনীয় শোভায় এই রকমই কিছু একটা যেন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তখন মনে হইয়াছিল, অবর্ণনীয় অসীম যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল, এ যুগের বিখ্যাত ঋষি আইনস্টাইনও বেহালা বাজাইতেন। আর একটা কথাও তাঁহার মনে পড়িল, লন্ডনে যখন তিনি ছাত্র, তখন 'লিসা'র প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার মন যে অপূর্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত, তাহাই যেন উপানন্দ আজ বেহালায় আলাপ করিতেছে।

বেহালা শেষ হইবার পর তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। হরিশ্চন্দ্র অনেকক্ষণ চোখ বুঁজিয়াই রহিলেন। যখন চোখ খুলিলেন, মনে হইল, চক্ষু দুইটি সজল।

কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। চোখের জলও মুছিলেন না। দ্বারের দিকে চাহিয়া তাঁহার নজরে পড়িল, দুইটি স্কুলের ছেলে বসিয়া আছে।

'ও, শিবু রামু এসেছিস! আয়, ভেতরে আয়।'

বালক দুইটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

'তোরা কি মুখস্থ করে এনেছিস আজ?'

শিবু বলিল, 'আমি হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে মুখস্থ করেছি।'

রামু বলিল, 'আমি করেছি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে।'

'বেশ, বল শুনি।'

বালক দুইটি গড়গড় করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেল। খুশী হইলেন হরিশ্চন্দ্র। বলিলেন, 'বাঃ! কাল সকালে এসে গম নিয়ে যাস। আমি গুপীকে বলে দেব।'

ছেলে দুইটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'এরা কে?'

উপানন্দের চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কিন্তু কোন জবাব দিল না।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'ওরা স্কুলের ছেলে। আমি প্রতি মাসে প্রাইজ দি কবিতা মুখস্থ করবার জন্যে। আগে নগদ এক টাকা করে দিতাম। পন্ডিত মশায় মানা করলেন। বললেন, ওই পয়সায় ছেলেরা বিড়ি কিনে খাচ্ছে। এখন পয়সা দিই না। গম দিই পাঁচ সের। এতে ওদের বাপমায়েরাও খুব খুশী। গুপী, তামাক দে।'

উপানন্দ একটি কথাও বলেন নাই, হাসিমুখে ডক্টর সোমের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি নীরবে যেন বলিতেছিলেন, দেখ, আমার বন্ধুটিকে ভাল করিয়া দেখ। পাশের ঘরেই তামাক সাজিবার ব্যবস্থা। গোপী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক কলিকা তামাক দিয়া গেল। সুগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র মৃদু একটি টান দিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। বেহালার সুরের প্রভাব তখনও তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, উপানন্দ প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাই তাহার হাতে বেহালা অত সুন্দর বাজে। তাহার মন মোটেই বৈষয়িক নহে, তাহার অত বড় জমিদারিটার ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কখনও জানিতেও চাহে না, কোন্ বছর কত আয় হইল। তাহার ব্যাঙ্কের পাশবুক, খাতাপত্র সব আমার কাছে। টাকার প্রয়োজন হইলে সে আমার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠায় এবং আমি তাহাকে নগদ টাকা পাঠাইয়া দিই। আমার ম্যানেজারবাবুই সব হিসাব রাখে, সে একদিনও হিসাব দেখিতে চাহে নাই। বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার মনই নাই। সে নিজের খেয়ালেই মত্ত হইয়া আছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোক এমন সুন্দর বেহালা বাজায়, সেই আবার থাম্বা জঙ্গলে গিয়া সমস্ত রাত মাচায় বসিয়া বাঘ মারে। হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

'আচ্ছা উপা, এবার শতরঞ্জির সময় তুমি লক্ষ্ণৌ থেকে একজন ভাল বাঈজী আনিয়ে দেবে বলেছিলে, সে কথা মনে আছে তো?'

'খুব মনে আছে। আমি চিঠি দিয়েছি আমার বন্ধুকে। সে উত্তর দিয়েছে, বাঈজীটি সত্যিই খুব ভাল। সে কিন্তু মৌখিক নিমন্ত্রণ করলেই আসবে না। তাকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করতে হবে এবং তোমার আমার দুজনেরই সই চাই।'

'বেশ, তুমি চিঠি একটা লিখে নিয়ে এস, আমি তাতে সই করে দেব। বাঈজীটি সত্যিই ভাল তো? সিনেমার হাব-ভাব-ময়ী কোন ঢঙী নয় তো? কত নেবে?'

'পাঁচ হাজার টাকার কম তিনি কোথাও যান না। তাছাড়া, রাহা খরচ দিতে হবে। ওঁর

বাবা একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর কাছেই উনি নাচ-গান সব শিখেছেন। ওঁর বাবা নাচ-গান শিখিয়ে এবং বড়লোকদের বাড়িতে গান গেয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করতেন। মেয়েটির বিয়ে দেন নি, তাকেও নাচ-গান শিখিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। মেয়েটি বাড়িতেই নাচ-গানের চর্চা করে। পারতপক্ষে বাইরে কোথাও যেতে চায় না। কিন্তু আমাদের কথা শুনে এখানে আসতে রাজি হয়েছে, তবে আমাদের স্বাক্ষরিত চিঠি চাই।'

'মেয়েটির সঙ্গে তোমার বন্ধু দেখা করেছেন?'

'মেয়েটি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর একজন অভিভাবিকা আছেন, নাম ইমন বাঈ, তিনি প্রবীণা। তাঁর সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে। তিনিও ওঁর সঙ্গে আসবেন। উনি একা কোথাও যান না।'

'তুমি উত্তর দিয়ে দিয়েছ?'

'দিয়েছি। লিখেছি, ওঁদের সব দাবীই আমরা পূরণ করব। ওঁদের থাকবার জন্য আলাদা বাড়িও আমরা দেব। তবে তোমার আর আমার সই করা চিঠি এখনও পাঠানো হয় নি।'

'কালই পাঠিয়ে দাও। আর আমার 'লক্ষ্মীভবন'টা ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

'বেশ!'

ডক্টর সোম এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার কথা বলিলেন। 'তোমাদের এত জমি, তোমরা যদি ট্র্যাক্টর আনিয়ে মডার্ণ পদ্ধতিতে চাষ-বাস কর, অনেক টাকা রোজগার করতে পার।'

হরিশ্চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমরা টাকা চাই না, সুখ-শান্তি চাই। যন্ত্র আনলেই নানারকম যন্ত্রীদল আসবে, যন্ত্র সারাবার জন্যে মিস্ত্রির দল আসবে, তাদের মোটা মাইনে দিতে হবে, তাদের ধর্মঘট সামলাতে হবে। ওসব আমাদের পোষাবে না ভাই। এ আমরা বেশ আছি। আমাদের ফাল-লাঙল আমরাই তৈরী করি, ভেঙে গেলে নিজেরাই সারিয়ে নি। একবার বিদেশী সার আনিয়ে কিছু জমিতে দিয়েছিলাম। ঢাউস-ঢাউস পেঁয়াজ আলু হল, কিন্তু সব বিস্বাদ। কিছু জমি খারাপও হয়ে গেছে। আবার সেখানে গরু মোষ বসাচ্ছি –'

হরিশ্চন্দ্র হয়তো আরও বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু বাহিরে খোলের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলেন।

'গোবিন্দ নাকি? এস, এস।'

কীর্তনিয়া গোবিন্দ দাস তাঁহার দলবল লইয়া প্রবেশ করিলেন।

'তোমরা সব চৌকিতেই বস।'

চৌকিতে উপবেশন করিয়া গোবিন্দ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কি গান গাইব?'

'আজ 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব' গানটা গাও।'

গান শুরু হইয়া গেল এবং একটু পরে খুব জমিয়া উঠিল। একটু পরেই পীতাম্বর কবিরাজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সকলকে নমস্কার করিয়া একপাশে বসিয়া রহিলেন। গান শেষ হইলে তিনি হরিশ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, 'আমাকে স্মরণ করেছিলেন কেন?'

'স্মরণ করেছিলাম আমাদের এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। ইনি একজন বড় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। এঁর বিশ্বাস, আমাদের দেশে অনেক গাছ আছে যার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। ইনি অনেক অচেনা বুনো গাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান।

তাদের ফোটো তোলেন, তাদের ফল ফুল বীজ সম্বন্ধে এঁর কৌতূহলের অন্ত নেই। আপনিও তো এ বিষয়ে অনেক জানেন, আপনারা এ বিষয়ে একটু আলাপ করুন। ইনি উপা'র বাড়িতে আছেন। অনেক গাছপালার রঙীন ফোটো তুলেছেন।'

'বেশ তো, আমি কাল সকালেই যাব ওঁর কাছে। আমি যতটুকু জানি তা বলব ওঁকে, আর ওঁর কাছে শিখবও অনেক কিছু।'

ডক্টর সোম হাসিয়া বলিলেন, 'আপনাকে শেখাবার মত বিদ্যে আমার নেই। আমি কতকগুলো পরীক্ষায় পাশ করেছি, আর নানারকম গাছ-গাছড়ার ফোটো তুলেছি। অনেকে যেমন টিকিট সংগ্রহ করে, আমি তেমনি নানারকম নাম-না-জানা গাছের পাতা ও ফুলের ছবি সংগ্রহ করি।'

পীতাম্বর খুব আনন্দিত হইলেন।

'বাঃ! কাল যাব আমি। এখন তবে উঠি।'

হরিশ্চন্দ্র হাঁক দিলেন, 'ওরে হীরু, একটা ঝুড়িতে করে কয়েকটা নারকোল কবিরাজ মশাইকে দে। তুই গিয়ে দিয়ে আয় ওঁর বাড়িতে। একটা লাউও দিস।'

পীতাম্বর বলিলেন, 'এবার চমৎকার লাউ হয়েছে আপনার।'

'খালি গোবর-সার দিয়েছি।'

হরিশ্চন্দ্রের চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পীতাম্বর বলিলেন, 'গরু জানোয়ারটিকে আমরা যে এত খাতির করি, তার কারণ ও রকম উপকারী জানোয়ার আর দ্বিতীয় নেই। ওর কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী।'

'কিন্তু গরুর যত্ন আমরা করি না। আমরা মুখে ওদের মা ভগবতী বলি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে ব্যবহার করি চন্ডালের মত। ওদের ক্রমাগত খাটাই, একটুও বিশ্রাম দিই না। ওদের বাছুররা ওদের মা-র দুধ পেট ভরে খেতে পায় না। আমি ওদের জন্য প্রকান্ড একটা বন কিনেছি। সেখানে ওরা থাকবে। ঠিক করেছি, প্রত্যেক বাছুর অন্ততঃ তিনমাস মায়ের দুধ খাবে। তিনমাস বয়স না হলে কোনও গাই আমরা দুইব না। যে সব গরু লাঙল টানে তাদের সপ্তাহে একদিন করে বিশ্রাম দিতে হবে। বুড়ো গরুরা সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাবে। তাদের আর কাজ করতে হবে না। সেই জঙ্গলে ভাল ভাল ষাঁড়ও রাখব আমরা।'

পীতাম্বর বলিলেন, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। কোথায় কিনেছেন বনটা?'

'উপার জমিদারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গভর্ণমেন্টের প্রায় দুশো বিঘে এবড়োখেবড়ো পতিত জমি ছিল। শুনলাম, কলকাতার কোনও বড়লোক জমিটা কিনছেন ওখানে একটা মিল করবেন বলে। খবরটা পেয়েই আমি চমকে উঠলাম। সর্বনাশ, আমাদের জমিদারির পাশে মিল হবে! উপার এক সহপাঠী তখন ও অঞ্চলে কমিশনার। তিনি সাহায্য না করলে ও জমি বেহাত হয়ে যেত। তাঁর সাহায্যে জমিটা পেয়েছি। এখন ওখানে একটা আদর্শ গো-নিবাশ তৈরী করতে হবে।'

ডক্টর সোম বলিলেন, 'আমার চেনাশুনা একজন ভালো ভেটেরিনারি ডাক্তার আছেন। সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন সম্প্রতি, গো-নিবাসের পরিচালক হিসাবে খুব ভাল হবেন বলে মনে হয়। যদি বল তো খবর দিই তাঁকে।'

হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার গো-নিবাসের কর্তা হবে কিন্তু আমাদের হাবু গোয়ালা। সে বাল্যকাল থেকে আমাদের গরু চরাচ্ছে। সারাজীবন আমাদের গরু নিয়েই আছে। তাকেই গো-নিবাসের মালিক করে দেব। তোমার ভেটেরিনারি ডাক্তার যদি আসতে চান, তাঁকে হাবুর অধীনে কাজ করতে হবে। তিনি রাজী হবেন কি?'

'তাঁকে লিখে দেখব। তবে বিলেত ফেরত লোক ...'

'ও বাবা! তাহলে চাই না। বিলেত ফেরত লোকেরা প্রায়ই নাক-উঁচু হয়। একমাত্র উপাকেই দেখছি বিলেত গিয়েও নাকটা উঁচু হয় নি।'

এমন সময় ভিতর হইতে একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, 'মা ডাকছেন, খাবার দেওয়া হয়েছে।'

সবাই উঠিয়া পড়িলেন।

আহারের আয়োজন দেখিয়া ডক্টর সোম বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলেন হরিশ্চন্দ্রের মাকে দেখিয়া। মাথায় আধ ঘোমটা দেওয়া, ধপধপে সাদা থান কাপড় পড়া, নিরাভরণা কনকলতার মধ্যে তিনি এমন একটি অপূর্ব ব্যক্তিত্ব দেখিলেন যাহা তিনি আগে কখনও দেখেন নাই। ওই স্বল্পভাষিণী স্নেহময়ী মহিলাটির মধ্যে তাঁহার মনে হইল, যেন ভারতীয় সংস্কৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বর কিছু নাই, তাহা নিতান্তই সাদাসিধা অনাড়ম্বর বলিয়াই যেন বেশী সুন্দর। তাঁহার নিজের মাকে মনে পড়িল। তাঁহার মধ্যেও তিনি এইরূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের একটি মাত্র 'ফোটো' তাঁহার কাছে আছে। সেটি সর্বদাই তাঁহার কাছে থাকে। এখানেও আনিয়াছেন। চেহারার মিল নাই, মিল আছে মুখের ভাবে। বিনয়, ভদ্রতা, স্নেহ, কর্তব্যবোধ, আত্মসম্মান, অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তির অনবদ্য প্রকাশ অনাড়ম্বর মহিমায় যেন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে সে-মুখচ্ছবিতে। ডক্টর সোম বড়লোকের একমাত্র ছেলে। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি আর সংসার পাতেন নাই। নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ইংলন্ডে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, জাপানে, চীনে সর্বত্র গিয়াছেন। বিলাতে পড়িবার সময় উপানন্দের সহিত তাঁহার আলাপ। খুব ভালো লাগিয়াছিল তাহাকে। তাই মাঝে মাঝে এখানে আসেন। কনকলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'মা, এত খাবার তো খেতে পারব না।'

'যা পার খাও বাবা। তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি, কম করে কি দিতে পারি? যা পার খাও।'

'আপনি কোন্‌টা রেঁধেছেন?'

'মুর্গিটা ছাড়া আর সবই আমি রেঁধেছি।'

'আমি তাহলে শুধু তরকারিগুলো খাই।'

'বেশ। শেষে পায়েসটা খেও।'

সেদিন রাত্রে ভূরিভোজনের পর ডক্টর সোম উপানন্দের বাড়িয়ে গিয়া নিজের শুইবার ঘরে গিয়া খিল বন্ধ করিলেন। তাহার পর ইলেকট্রিক আলো ও পাখাটা চালাইয়া দিলেন। ইলেকট্রিসিটিহীন হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রগতিবিরোধী মনোবৃত্তি মোটেই ভালো লাগে নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, সে যেন এক মধ্যযুগীয় জমিদারের বাড়িতে সমস্ত সন্ধ্যাটা কাটাইয়া আসিল। যদিও তাঁহার পিছনে একজন চাকর একটা পাখা লইয়া সর্বদা হাওয়া করিতেছিল, যদিও কেরোসিনের আলোগুলি ভালোই ছিল, তবু তাঁহার মন সেকেলে মনোবৃত্তিকে মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। হরিশ্চন্দ্র লোকটিকে কিন্তু তাহার ভালো লাগিয়াছিল। হঠাৎ তাহার মাকে মনে পড়িল, তিনিও কি সেকেলে ছিলেন না? গোবর, গঙ্গাজল, পাদোদক, মানত, ব্রত, উপবাস, জাতিভেদ—সবই তো তিনি মানিতেন। ডক্টর সোম বাক্স খুলিয়া মায়ের ছবিটি বাহির করিলেন। গরদের একটি বিশেষ থলিতে ভেলভেটের বাক্সের ভিতর

ছবিটি তিনি রাখিতেন। বাক্সটা বাহির করিয়া আবার তাঁহার মনে হইল, তিনিও কি সংস্কারমুক্ত? মায়ের ছবি রাখিবার জন্য গরদের একটা থলি কেন করাইয়াছিলেন? তাহার পর মনে হইল, মায়ের মৃত্যুর অনেক পরে লিসার প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার ধারণা, মা বাঁচিয়া থাকিলে এ বিবাহে তিনি আপত্তি করিতেন এবং তাহার আপত্তি সত্ত্বেও বিবাহ করিলে মনে নিদারুণ কষ্ট পাইতেন। তাই তিনি তাহাকে বিবাহ করেন নাই। এটা কি কুসংস্কার? তিনি বিবাহই করেন নাই। লিসাও বিবাহ করে নাই। সে আমেরিকায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং পড়ায়। তাঁহারই জন্য তাঁহাকে বছরে দুইবার আমেরিকা যাইতে হয়। লিসার ছুটির সময় যান তিনি।

দুইজনে দেশভ্রমণ করেন। ইয়োরোপের সব দেশে এবং আমেরিকায় তাঁহার ব্যাঙ্ক-একাউন্ট আছে। অনেকগুলি দেশের ভাষাও তিনি শিখিয়াছেন। লিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ায় এবং নিজে অন্য ভাষা পড়ে। কুড়িটি ভাষা জানে সে। কয়েকটি ভাষায় উচ্চ ডিগ্রীও লাভ করিয়াছে। বাংলা চমৎকার জানে। বাংলাসাহিত্যে তার জ্ঞানও প্রচুর। ডক্টর সোমের সহিত বিবাহ হইলে উভয়েই সম্ভবত খুব সুখী হইত। কিন্তু মায়ের কথা মনে করিয়া ডক্টর সোম বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তাহার ভালবাসা আজও অম্লান আছে। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, সংসারে তুচ্ছতার মধ্যে আবর্তিত হইলে, হয়তো এত অম্লান থাকিত না। লিসাকে চিঠি লিখিবার জন্য দামী নানা রঙের কাগজের যে প্যাড তিনি ছাপাইয়াছেন তাহার শীর্ষদেশে রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনটি ছাপা আছে—'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে'। ডক্টর সোমের নাম নয়নানন্দ। লিসার সহিত মিলনের জন্য এখনও তিনি নব-প্রণয়ীর মত উৎসুক। প্রেম যদি একপ্রকার মোহ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ডক্টর সোম এখনও সম্মোহিত হইয়া আছেন। তিনি বিশ্বের নানা স্থানে সারা বছর ঘোরেন, কিন্তু লিসার খুঁটিতেই তাঁহার মনটি এখনও বাঁধা আছে। তিনি মায়ের ছবিটি বাহির করিয়া দেখিলেন। বিশেষত্ব কিছুই নাই। থান-কাপড়-পরা মাথায় আধঘোমটা দেওয়া সাধারণ বাঙালী বিধবার ছবি। রূপ নাই, কিন্তু মুখভাবে সেই অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্যটি আছে যাহা তিনি কনকলতার মুখে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ডক্টর সোম অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার পর সেটি গরদের থলিতে পুরিয়া ভেলভেটের বাক্সের ভিতর আবার রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর যে অ্যালবামটায় লিসার ছবি আছে সেটা বাহির করিয়া লিসার যে ছবিটা কয়েকদিন পূর্বে আসিয়াছে সেইটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। লিসার মুখভাব সৌম, কিন্তু সেই সৌম্যতার সহিত একটু দুষ্টামিও তাহার চোখে এবং অধরপ্রান্তে যেন উঁকি দিতেছে। এই ছবিটির সহিত যে চিঠি সে লিখিয়াছে, তাহাতেও তাহার দুষ্টামির একটু পরিচয় আছে। লিখিয়াছে, নয়ন কয়েকদিন হইতে একটু বিব্রত আছি। কলেজের একজন নামজাদা প্রফেসার আমার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে একটা ভালো হোটেলে দুইদিন ডিনার খাওয়াইয়াছেন, চারদিন সিনেমায় লইয়া গিয়াছেন এবং প্রায়ই আমার ফ্ল্যাটে আসিয়া কাব্য আলোচনা করিতেছেন। লোকটি সুদর্শন, বড়লোক এবং বিদগ্ধ। কি করব পরামর্শ দাও।

নয়নানন্দ উত্তর দিয়াছেন, ভালো জিনিস পৃথিবীতে বিরল। লোকটিকে তোয়াজ কর।

ইহার উত্তরও লিসা দিয়াছে। শুধু লিখিয়াছে—হা, হা, হা, হা।

এ ধরণের দুষ্টামি লিসা প্রায়ই করে চিঠিতে। সে জানে, কাল্পনিক প্রণয়ীর কথা নয়ন

বিশ্বাস করিবে না। তবু দুষ্টামি করিয়া লেখে। আগেও আর একবার লিখিয়াছিল।

হঠাৎ আলো নিবিয়া গেল। পাখা বন্ধ হইল। নিশ্চয় সেদিন কোন গন্ডগোল হইয়াছে। টর্চ বাহির করিয়া ছবিগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন ডক্টর সোম। হঠাৎ হরিশ্চন্দ্রের মুখটা তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। আবার হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিল, পাখা চলিতে লাগিল। এবার তাঁহার মুখেও হাসি ফুটিল। আলোটা নিবাইয়া দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

॥৩॥

হরিশ্চন্দ্র কি শীত কি গ্রীষ্ম বাড়ির মধ্যে প্রকান্ড উঠানে মস্তবড় একটি চৌকির উপর আকাশের নীচে শোন। শীতকালে লেপ গায়ে দেন, গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে থাকেন। তাঁহার নিজের একটি ঘর আছে, কিন্তু সে-ঘরের ভিতর কখনও তিনি শোন না। বন্ধ ঘরে তিনি থাকিতে পারেন না। বর্ষাকালে শোন প্রকান্ড খোলা বারান্দায়, তাহার উপরটা ঢাকা আর চারিদিক খোলা। গুপী চাকরটি একটি দড়ির খাটিয়ায় তাহার নিকটেই শোয়। ভোর পাঁচটায় তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তিনি যথারীতি উঠবোস করিলেন, ডনও টানিলেন কয়েকটা। গুপীও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়াছিল। সে তখন এক বাটী সর্ষপ তৈল আনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে মর্দন করিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রও খানিকটা তেল লইয়া গুপীর পিঠে এবং মাথায় মাখাইয়া দিলেন। রোজই দেন। তাঁহার ধারণা, অপরের সাহায্য বিনা পিঠে ভালো করিয়া তেল মাখা যায় না।

তেল-মাখা পর্ব শেষ হইলে গুপী ইঁদারায় গিয়া জল তুলিতে আরম্ভ করে এবং তিনি ইঁদারার ধারে গিয়া বসেন। ইঁদারার ধারে চৌবাচ্চাতে রাত্রেই জল তুলিয়া রাখা হয়। সেই জলে হরিশ্চন্দ্র স্নান আরম্ভ করেন। প্রথমেই উপবীতটি সাবান দিয়া পরিষ্কার করেন। গায়ে সাবান ঘষেন না, গামছা ঘষেন। তাহার পর গুপী ইঁদারার টাটকা জল তুলিয়া তাঁহার মাথায় ঢালিতে থাকে। পাঁচ বালতি জল ঢালার পর হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া পড়েন এবং পূর্বাকাশের দিকে ফিরিয়া করজোড়ে সূর্যমন্ত্রটি পাঠ করেন। তাহার পর কাপড় ছাড়িয়া তিনি প্রবেশ করেন পূজার ঘরে। সেখানে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আহ্নিক করিতে বসেন। আহ্নিক শেষ করিয়া মায়ের মহলে যান। সেখানে গিয়া প্রথমে বসিয়াই প্রাতরাশ খাইতে হয়। কিছু ফল, কয়েকটি সন্দেশ এবং এক বাটী দুধ। তাহার পর তিনি মাঠে চলিয়া যান।

সেদিনও যথারীতি সব কাজ শেষ করিয়া তিনি মাঠের দিকে যাইতেছিলেন। সহসা মনে হইল, উপানন্দকে বাঈজী প্রসঙ্গে চিঠি লিখিতে আর একবার তাগাদা দিতে হইবে। না দিলে হয়তো সে ভুলিয়া যাইবে। কারণ কোনও ব্যাপারই তাহার বেশীক্ষণ মনে থাকে না। মনটা শিশুর মত।

উপানন্দের বাড়ি গিয়া হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, কেহ নাই। কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া ডক্টর সোম বাহিরে গিয়াছেন। উপানন্দ মাঠে বড় ক্যামেরা লইয়া ফোটো তুলিতেছেন। উপানন্দের বাড়ির সংলগ্ন একটা প্রকান্ড মাঠ আছে। উপানন্দ সেখানে বাগান করেন নাই। নানারকম আগাছায় ভর্তি মাঠটা। হরিশ্চন্দ্র সেখানে গিয়া দেখিলেন, উপানন্দ সেখানে একটা সিনেমা তুলিবার বড় ক্যামেরায় ফোটো তুলিতেছে।

'এখানে কার ফোটো তুলছো?'

'একঝাঁক প্রজাপতির। ওই দেখ, এখনও রয়েছে কতকগুলো। একটু আগে সমস্ত মাঠটা ছেয়ে গিয়েছিল। কি চমৎকারই যে দেখাচ্ছিল। ভাবলাম, ছবিটা তুলে রাখি। এ উৎসব আর হবে না। তুমি আজ মাঠে যাও নি?'

'মাঠেই যাচ্ছি! তোমাকে মনে করিয়ে দিতে এলাম বাঈজীকে চিঠিখানা আজই লিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিও। শতরঞ্জির আর বেশী দেরি নেই তো।'

'চল, এখুনি লিখে দিচ্ছি। তোমাকেও সই করতে হবে।'

উপানন্দকে সাহায্য করিবার জন্য একজন ফটোগ্রাফার ছিল, নাম রাতুলচরণ। তিনি ক্যামেরাটা ঠিক করিয়া ফোটো তুলিতে লাগিলেন। উপানন্দ হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর টেবিলে বসিয়া খুব দামী মোটা চিঠির কাগজে এই পত্রটি লিখিয়া ফেলিলেন ঃ

শ্রীযুক্তা শীর্ষা দেবী,

সুচরিতাসু,

আমার বন্ধু তবলচি আবিদ মিঞা এবং আপনার অভিভাবিকা ইমন বাঈজীর পত্র আমরা পাইয়াছি। আমাদের শতরঞ্জি উৎসবে আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আসেন, আমরা সত্যই বড় আনন্দিত হইব। ইমন বাঈজী যে সব শর্ত দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আপনাদের জন্য একটি আলাদা বাড়িরও ব্যবস্থা রাখিব। আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমাদের উৎসব আরম্ভ। অন্তত তাহার দুইদিন পূর্বে আপনি আসিলে ভালো হয়। বিশ্রাম করিতে পারিবেন। আপনার সম্মতিপত্র পাইলেই আমি আমাদের নায়েব মশাইকে পাঠাইয়া দিব, তাঁহার সংগেই আসিবেন। আপনার যাহাতে কোনও অসুবিধে না হয় সে ব্যবস্থা আমরা যথাসাধ্য করিব। পত্রের উত্তর একটু তাড়াতাড়ি দিবেন, কারণ অক্ষয় তৃতীয়ার বেশী দেরি নেই। আমাদের প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি, ভবদীয়—

'নাও, এইবার তুমি নাম সই কর। তারপর আমি করব।'

হরিশ্চন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন। তাহার পর বলিলেন, 'নামটি তো বড় বাহারের দেখছি। আমাদের চলতি বাংলায় শুরসো বলে একটা কথা আছে, যার সাহায্যে কপাটে শিকল তুলে দেওয়া যায়।'

উপানন্দ বলিলেন, হ্যাঁ, নামটি বাহারে বটে, তবে শুনে আমার 'শুরসো'র কথা মনে হয় নি। মনে পড়েছিল, রাইডস হ্যাগার্ডের (RidesHaggard) 'She' বলে বিখ্যাত বইটাব কথা। বইটার পুরো নাম 'She, who must be obeyed,'... বইটা পড়েছ?'

'না আমার ইংরেজি বিদ্যার দৌড় বেশীদূর নয়।'

তাহার পর চিঠিতে দুজনেই সহি করিয়া খামে পুরিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'খামে পুরো ঠিকানা লিখে Registered with acknowledgement due লিখে দাও, আমি টহলকে ঘোড়ায় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে বড় পোস্টাফিসে গিয়ে পোস্ট করে আসুক। আমি চললুম, আমার দেরি হয়ে গেছে।'

চিঠিখানি লইয়া হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'তোমার বন্ধুটি কোথা?'

'তিনি কবিরাজ মশায়ের সংগে বুনো গাছ দেখতে বেরিয়েছেন। কবিরাজ মশাই কতকগুলি গাছকে দুষ্প্রাপ্য বলছেন। তাঁর মতে ওগুলো তুলে এনে চাষ করা উচিত এবং সারা বছর ধরে ওগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ওদের ফল-ফুল হয় কিনা, হলে কখন হয়, কেমন তাদের চেহারা, এসব না জানলে গবেষণা করা যায় না। নয়ন খুব উৎসাহিত হয়ে

উঠেছে। সে আমাকে বলছিল, আমাকে কিছু জমি কিনে দাও। আমি ভাবছি, আমার বেগুনবাড়ির পঞ্চাশ বিঘে জমি ওকে দিয়ে দেব। তোমার আপত্তি আছে?'

'জমি তোমার, আমি আপত্তি করব কেন?'

'জমি আমার নয়, সবই তোমার। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

'তাহলে ভাবতে দাও।'

হরিশ্চন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে জমিটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে ঠিক করিলেন যে জমির মালিকানা ডক্টর সোমকে দিবেন না। তিনি ভবঘুরে লোক, পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ান, কখন হয়তো খেয়ালের মাথায় জমিটা অপরকে বিক্রয় করিয়া দিবেন, তখন আমরা বিপদে পড়িব। তবে ওই জমিটাতে তিনি যদি বন্য গাছগাছড়ার চাষ করিতে চান, করিতে পারেন। কবিরাজ মহাশয় যদি তাহার ভার লইতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে তিনি আপত্তি করিবেন না।

জমিতে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, কয়েকটি লোক তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রোজই করে। গ্রামের লোক তাহারা, বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়াছে। বিপদে পড়িলে বা কোন পরামর্শ করিবার জন্য প্রায়ই আসে। হরিশ্চন্দ্র সেদিন লাউ গাছের গোড়াগুলি খুঁড়িয়া দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, তাহাই করিতে করিতে গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

জাকলা গ্রামের ছবি মোড়লের দুই পুত্র সর্বদা কলহ করে, এখন তাহারা আলাদা-আলাদা থাকিতে চায়। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তোমার তো জমি অনেক, তাদের আলাদা জায়গায় বাড়ি করে দাও। তারা আলাদা থাকুক। দরকার হলে তোমার জমি থেকে তাদের খাবার জিনিষপত্র পাঠিও। কিন্তু বিষয় ভাগ করে দিও না।'

মোড়ল বলিল, 'আপনি যদি একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেন ওদের, আপনাকে ওরা খুব খাতির করে।'

'বুঝিয়ে-সুজিয়ে কোন লাভ হয় না শেষপর্যন্ত, তাছাড়া দুটো পরিবার একসঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে শান্তিতে থাকতেও পারে না। আলাদা আলাদা থাকাই ভাল। কি করে ওরা?'

'একজন তো আপনার কাছারিতেই গোমস্তাগিরি করে, আর একজন ভগু বাবাজীর আখরায় গিয়ে গান-বাজনা করে। তার ইচ্ছে, একটা যাত্রার দল করা।'

'বেশ তো, যা ইচ্ছে করুক না। দেখো, যেন বোকে না যায়।'

মোড়ল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'আপনি যা বললেন তাই করব। এখন আমি তবে—'

'এসো।'

সে চলিয়া গেল, আর একজন আগাইয়া আসিল। বলিল, 'আমার মায়ের পেটে অনেক দিন থেকে একটা ব্যাথা হচ্ছিল, কাল ডাক্তারবাবু বললেন, সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, পেটের ভিতরে নাকি ফোড়া হয়েছে। তাই আপনার পালকিটা চাইতে এসেছি।'

'বেশ, নিয়ে যেও, আমি বলে দেব।'

সে লোকটিও চলিয়া গেল।

তারপর আরও নানা ধরণের লোক একে-একে আগাইয়া আসিল। সকলেই প্রায় প্রার্থী। কেউ কিছু বীজ চাহিল, কেউ দু'খানা লাঙল ধার চাহিল কয়েক দিনের জন্যে। আর একজন স্থানীয় পাঠশালার পন্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, পন্ডিত নাকি তাহার

নাতির উপর অযথা অত্যাচার করে।

হরিশচন্দ্র বলিলেন, 'পণ্ডিত মশায়ের বিরুদ্ধে কোনও নালিশ তোমার মুখে শুনতে চাই না। আমি আগামী সোমবারে তোমাদের গ্রামে যাব। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তোমার ছেলের নাম কি?'

'ডাক নাম ভোম্বল, ভালো নাম ভোলানাথ দাস।'

'আচ্ছা, আমি গিয়ে খোঁজ করব।'

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন তিনি লাউ গাছের গোড়াগুলির তত্ত্বাবধানে মন দিলেন। অনেকখানি জমিতে নানা রকম শাকসব্জি লাগানো আছে। দূরে দূরে অন্যান্য চাকররাও কাজ করিতেছে। তিনি নিজের জন্য খানিকটা অংশ পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে তিনি নিজেই দেখাশোনা করেন। কাজ করিতে করিতে নানা রকম চিন্তাও কবেন। আজ তাঁহার মায়ের চিন্তাটা তাহাকে পাইয়া বসিল। আগেও এ চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের মাকে মনে নাই। কনকলতাকেই তিনি মা বলিয়া জানেন, কনকলতাই বাড়ির কর্ত্রী, কিন্তু ইহাও তিনি জানেন, কনকলতা তাঁহার নিজের মা নন। তাঁহার মায়ের দূর সম্পর্কের বোন। তিনি বাল-বিধবা অনাথা ছিলেন বলিয়া বাবা তাঁহাকে আনাইয়া শিশু হরিশচন্দ্রের ভার তাহার উপর দিয়াছিলেন। সে-ভার তিনি এতদিন যোগ্যতার সহিত বহন করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্রও তাঁহাকে গৃহস্থালীর সর্বেসর্বা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বালিকা বধূর মৃত্যুর পর কনকলতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, 'দেখ মা, মায়েরা বাঘিনীর মতো। দুই বাঘিনী এক সংসারে শান্তিতে থাকতে পারে না।'

'আমি বাঘিনী?'

'ওটা একটা উপমা দিয়ে বললাম। তবে তোমার ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপে।'

'তোর বউ যাতে না কাঁপে, তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো। আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও থাকতে পারবে না। আমার মরবার পর তুমি যা খুশি কোরো। আমি বিয়ে করব না।'

ইহার পর কনকলতা আর বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, কিন্তু ইহার পর হইতেই এই চিন্তাটি হরিশচন্দ্রের মনে মাঝে মাঝে উদিত হইয়াছে। তাঁহার মনে হইয়াছে, মৃত্যুর কথা কিছু বলা যায় না, মায়ের আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তখন মায়ের অবস্থা কি হইবে? তিনি যদি সত্যিই আমার মা হইতেন, তাহা হইলে আইনত এই জমিদারির উপর তাঁহার দখল থাকিত। বাবা উইল করিয়া তাঁহাকে কিছু দিয়া যান নাই। তিনি ভাবিতেছেন, কোনও একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা করিবেন? তাঁহার জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীই বা কে হইবে? হয়তো ইহা শেষে গভর্ণমেণ্টের কবলে গিয়া পড়িবে এবং গভর্ণমেন্ট তাঁহার আদর্শের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবে না। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার নানা আড়ম্বরে তাঁহার আত্মসম্মান-অলংকৃত স্বাধীন স্বদেশীয় আদর্শ অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। সহসা তাঁহার মনে হইল, আমি আমার পূর্বপুরুষদের কি আদর্শ ছিল তাহা জানি কি? বাবার মুখে শুনিয়াছি, আমার প্রপিতামহ একজন নীলকর সাহেবের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে একজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কৃপাদৃষ্টি নাকি তাঁহার উপর পড়ে। নীলকর সাহেব যখন দেশে চলিয়া যান, তখন নামমাত্র মূল্যে তাঁহার জমিদারিটি তিনি গঙ্গোদক চক্রবর্তীকে (হরিশচন্দ্রের প্রপিতামহ) বিক্রয় করিয়া যান। সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় আর-একটি জমিদারিও তিনি বন্ধু শিবানন্দের নিকট হইতে টাকা ধার

করিয়া কিনিয়াছিলেন। শিবানন্দ ছিলেন উপানন্দের প্রপিতামহ। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। দুইটি জমিদারি পাশাপাশি ছিল। গঙ্গোদক কিন্তু ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। জমিদারিটাই শিবানন্দকে দিয়া দিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল, আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষের পদাংক অনুসরণ করিয়াছি? সংগে সংগেই তাহার উত্তরটাও তাঁহার মনে আসিল। গঙ্গোদক চক্রবর্তী দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারি ছিলেন। সাহেবদের খুব খোশামোদ করিতেন বলিয়া সাহেবরাও তাঁহাকে প্রশ্রয় দিতেন। তিনি চারটি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র একটি পত্নীরই একটি মাত্র পুত্র হইয়াছিল। তাহারই বংশধর হরিশ্চন্দ্র। গঙ্গোদকের পাঁচটি ভাই ছিল। তাঁহাদের তিনি পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কে কোথায় আছেন তাহা তাঁহার জানা নাই। তাঁহার পিতামহ যুধিষ্ঠির জমিদারির সর্বত্র জলসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত লোককে একমুঠা ভিজা-ছোলা, একটু গুড় এবং জল দেওয়া হইত। কিন্তু চাকরেরা এত ছোলা এবং গুড় চুরি করিতে লাগিল যে হরিশ্চন্দ্রের বাবা বিরক্ত হইয়া সমস্ত জল-সত্র বন্ধ করিয়া দেন। পরিবর্তে তিনি নানা স্থানে কূপ ও কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র সেগুলিও বজায় রাখিতে পারেন নাই। যাহাদের জন্য পিতা কূপ এবং পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন তাহারাই নানাভাবে সেগুলিকে নষ্ট করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের জমিদারির প্রত্যেকটি গ্রাম এখন পঞ্চায়েতের অধীন। তাহারাই সেখানকার সব ব্যবস্থা করে, প্রয়োজন হইলে হরিশ্চন্দ্র তাহাদের অর্থ সাহায্য করেন। ওই ব্যবস্থাই এখনও চলিতেছে, কিন্তু পঞ্চায়েতের নামে নানা অভিযোগ প্রায়ই তাঁহার কানে আসিতেছে। আমাদের দেশের লোক ধর্মপ্রবণ, বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব সর্বত্র হয় কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকই প্রকৃত ধার্মিক নয়। অসাধু, লোভী, মিথ্যাবাদী, চোরের সংখ্যাই বেশী। হরিশ্চন্দ্রের ধারণা ইহার মূল কারণ দারিদ্র্য। সেইজন্য তিনি প্রজাদের দারিদ্র্য মোচন করিতে সদা উৎসাহী। জমিদারির মধ্যে তিনি ডেয়ারি, পোলট্রি, চরকা-চালানো, খদ্দর বুনিবার তাঁত, দেশী মুচিদের দিয়া সস্তায় দেশী জুতা বানানো, খাঁটি সরিষার তেলের জন্য অনেক ঘানি স্থাপন করিয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব প্রজাদের সহায়তায় কো-অপারেটিভ প্রথারও প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি পারতপক্ষে এমন কোনও বিলাতী-যন্ত্র ব্যবহার করিতে চান না, যাহা মানুষকে বেকার করিয়া ফেলে। তাঁহার মনে হয়, সেফটি রেজার, নেল-কাটার, ডাইং ক্লিনিং-এর দোকান, নানা ফ্যাশানের বিদেশী বাসনপত্র, মিলের কাপড়—এ সবই বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা মানুষদের বেকার করিয়া দিতেছে, তাহাদের হাতের কাজ কাড়িয়া লইতেছে। সেকালের নাপিত, তাঁতি, কর্মকার, কুম্ভকার, ধোপা, এমনকি কৃষকদের প্রতি যে আত্মীয়সুলভ মনোভাব ছিল, তাহা এখন আর নাই। তাহারা বেকার হইয়া ক্রমশঃ আমাদের শত্রু হইয়া উঠিতেছে। যাহাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজে অপরিহার্য অংগ ছিল, তাহারা আজ সমাজের কেহ নয়। যাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রস্তুত মসলিন বা টেরা-কোটা দেখিয়া জগৎ বিস্মিত হইত তাহাদের বংশধরেরা আজ আপিসের কেরাণী। তাহাদের শিল্পকে নষ্ট করিয়া আমরা যন্ত্রের দাসত্ব করিতেছি। এসব কথা হরিশ্চন্দ্র অনেকবার ভাবিয়াছেন, নিজের এবং উপানন্দের জমিদারিতে নিজের আদর্শকে মূর্ত করিবার প্রয়াসও পাইতেছেন। উপানন্দ যদিও তাঁহার সহিত একমত নহে—সে আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষপাতী কিন্তু সে কখনও হরিশ্চন্দ্রকে বাধা দেয় না। তাহার ভাবটা, হরিশ্চন্দ্র একটা experiment করিতেছে করুক না—যাহা অনিবার্য, তাহা তো শেষপর্যন্ত ঘটিবেই। সেই অনিবার্য ঘটনাটা

কেমন হইবে তাহাও আগে আন্দাজ করাও শক্ত।

উপানন্দ নিজের চারিদিকে একটা আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। বেহালাটা বিদেশী না দেশী, ছবি আঁকিবার বা ফটো তুলিবার ফিল্মগুলির অবস্থান কোথায়—ইহা লইয়া সে মাথা ঘামায় না। সে গোলাপগাছও বিলাত হইতে আনায় এবং কাচের ঘর বানাইয়া সে-ঘরে উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া অনেক রকম কান্ড সে করিয়াছে নানা রকম গোলাপ ফুলের রং উপভোগ করিবার জন্য। সে রূপ-সন্ধানী খেয়ালী লোক। তাহার খেয়াল লইয়াই সে মত্ত। জমিদারির ভার হরিশ্চন্দ্র বহন করে। বিষয়ের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। বস্তুতঃ, কোনও বস্তুর প্রতিই তাহার আসক্তি নাই। অনেক টাকা খরচ করিয়া নানা রকম শখের জিনিস কেনে, কিন্তু শখ মিটিয়া গেলেই সেগুলির সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যায়। মনটা শিশুর মনের মত। আর-একটা যে জিনিস হরিশ্চন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা তাহার ব্রহ্মচর্য। বহু দেশে ঘুরিয়াছে, বিদেশে অনেকদিন লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু কোনও স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া সে বিপথে যায় নাই। সে বলে, ভালোবাসিতে পারি এমন স্ত্রীলোক আমার চোখে পড়ে নাই! মাঝে মাঝে সৌরভ পাইয়াছি, কিন্তু সেজন্য ফুলটাকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি নাই, এ বিষয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি একমত।

> 'ফুলের যা দিলে নাহি কোন ক্ষতি
> অথচ আমার লাভ,
> আমি চাই সেই, সেই সৌরভটুকু
> অতনু অতল ভাব—'

কথাটা অনেকদিন পরে মনে পড়িল হরিশ্চন্দ্রের। তিনি একা একাই হাসিয়া উঠিলেন—খিত্‌খিত্‌ করিয়া শব্দ হইল। তাঁহার নিজের যৌন-প্রকৃতির মুখে তিনি রাশ টানিয়া রাখিয়াছেন মাকে কথা দিয়াছিলেন বলিয়া। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সেইদিন কনকলতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'তুমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে তো?'

'কেন পারব না। তুমি তো বাল-বিধবা, তুমি নিজেকে ঠিক রেখেছ কি করে? আমিও পারব।'

'কথাটা মনে থাকে যেন। যদি তোমার নামে কোনদিন কলঙ্ক শুনি, সেইদিন আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব কিন্তু।'

হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

'পারবে?'

'নিশ্চয় পারব!'

'পাপের বাড়িতে আমি থাকতে পারি না।'

'বেশ, দেখো।'

হরিশ্চন্দ্র এ পর্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্রের চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল। নিকটেই একটা গাছের উপর কয়েকটা শালিক পাখি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া গিয়া গাছটার নীচে দাঁড়াইলেন এবং খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দেখিতে পাইলেন, গাছটার উপরে একটা সাপ রহিয়াছে। আর-একটা ডালে শালিক পাখিদের বাসা।

ঠিক সেই সময় টহল সহিস আসিয়া প্রবেশ করিল। সে পোস্টাপিসে গিয়াছিল শীর্ষা দেবীর চিঠিটি রেজিস্ট্রি করিতে। সে সেই রসিদটি হরিশ্চন্দ্রকে দিল। হরিশ্চন্দ্র রসিদটি পকেটে রাখিয়া দিলেন।

'ঝুমনা কোথা?'

'সে পটল ক্ষেতে বেড়া দিচ্ছে।'

'তাকে ডাক, ধনুকটা নিয়ে আসতে বল। ওই গাছে একটা সাপ উঠেছে। শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে।'

টহল চলিয়া গেল। একটু পরেই তীরন্দাজ ঝুমনা তীর-ধনুক লইয়া হাজির। 'কোথা সাপ বাপু?'

'গাছের ওপর। ওই দেখ।'

ঝুমনা স্বল্পভাষী। সে কিছু না বলিয়া ধনুকে তীর লাগাইয়া কয়েক মুহূর্ত সাপটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার তীর নিক্ষেপ করিল। তীর-বিদ্ধ সাপটা সংগে সংগে মাটিতে পড়িয়া গেল। দেখা গেল, সাপটি গোখ্‌রো সাপ।

ঝুমনা বলিল, 'সাপটার বিষদাঁত দুটো ভেঙে বিষের থলিটা আমি বার করে নেব।'

'কি করবি ও নিয়ে?'

'নিরঞ্জন বাদ্যি সাপের বিষ কেনে। কলকাতায় বিক্রি করে। আমাকে দুটো টাকা দেবে।'

সাপটা লইয়া ঝুমনা চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্রের সাঁওতাল প্রজা অনেক আছে। তাহাদের মধ্যে একদল শিকারী আছে। হরিশ্চন্দ্র তাহাদের খুব উৎসাহ দেন। তাহাদের তীর-ধনুক, বল্লম, টাংগী, তলোয়ার, গুপ্তি কিনিয়া দেন তিনি। এছাড়া ছোট-বড় নানারকম লাঠিও ব্যবহার করে তাহারা। থাম্বা জংগলে প্রায়ই শিকার করিতে যায় তাহারা। বন্যবরাহ, বন্যখরগোশ, শজারু তাহাদের প্রিয় খাদ্য। একবার একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপকে ফাঁস লাগাইয়া ধরিয়াছিল। বাঘও মারিয়াছিল একবার লাঠি ও বল্লম দিয়া। বাঘটার সহিত সম্মুখ সমরে আহত হইয়াছিল ঝুমনার বাবা। হরিশ্চন্দ্র তাহার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রায় তিন মাস শয্যায় ছিল সে। সে যখন সারিয়া উঠিল তখন একদিন সভা করিয়া বাঘ-আঁকা একটি স্বর্ণপদক তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন এবং তাহাকে উপাধি দিয়াছিলেন 'ব্যাঘ্রজিৎ'— সেটা অবশ্য এখন সংক্ষেপে 'বাঘু' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সবাই তাহাকে 'বাঘু মোড়ল' বলিয়া ডাকে। বলিষ্ঠ বুকের উপর বাঘের থাবার চিহ্নটা তাহার গর্বের বস্তু। সে এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছে। সাঁওতাল শিকার বাহিনীর দলপতি সে। ঝুমনা তাহারই ছোট ছেলে। হরিশ্চন্দ্র যখন মাঠে কাজকর্ম করেন তখন তাঁহার ফাইফরমাস খাটে সে। পাশেই যে দশ বিঘা জমি, সেটি তাহার বাবার। সে-জমির এক প্রান্তে ছোট একটা ঘর আছে, সেইখানেই সমস্ত দিন থাকে ঝুমনা। সমস্ত দিন তীর-ধনুক লইয়াই লক্ষ্যভেদ করিয়া বেড়ায়। একটা উড়ন্ত পাখিকে একদিন সে ভূপাতিত করিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট বকুনি খাইয়াছিল।

'ওকে মারলি কেন? ওতো আমাদের অনিষ্ট করে নি। অনিষ্টকারী জীব-জন্তুকে মারবি? নিরীহ পাখিকে মেরে কি হবে?'

ঝুমনা সাপটা লইয়া চলিয়া যাইবার পর শালিকদের চীৎকার থামিয়া গেল। হরিশ্চন্দ্রও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ পরে সেই চিন্তাটা তাঁহার মনে জাগিল—যাহা আজকাল প্রায় জাগে—তাহার অবর্তমানে এতবড় জমিদারির কি পরিণাম হইবে? শুধু তাঁহার নয়, উপানন্দের বিষয়েরই বা কি পরিণাম হইবে? উপানন্দ বলে, তুই যা খুশী কর।

ওসব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারব না। যতদিন বাঁচব সুখে বাঁচতে চাই। উপানন্দের সুখে বাঁচা মানে নিজের খেয়ালখুশী মত বাঁচা।

অনেক জমিদারের খেয়ালখুশী মানেই মদ মেয়েমানুষ এবং গভর্ণমেণ্টের খোশামোদ করিয়া কোন খেতাব লাভ করা। উপানন্দ পবিত্র-চরিত্র, শিল্পীলোক। অনেকগুলি যন্ত্র বাজাইতে পারে, চমৎকার ছবি আঁকে, ফোটো তোলে। শিকার করিবার ঝোঁকও আছে। সম্প্রতি ঝোঁক ধরিয়াছে, থাম্বা জঙ্গলের ভিতর একটা চারতলা বাড়ি বানাইবে। প্রত্যেক তলায় কেবল একটিমাত্র বড় ঘর থাকিবে। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া একা থাকিবে। দূরবীক্ষণ· অণুবীক্ষণ যন্ত্র, নানারকম ক্যামেরা সব আছে তাহার। নানারকম বাদ্যযন্ত্র তো আছেই। সেদিন অনেক টাকা খরচ করিয়া একটা পিয়ানো কিনিয়াছে। বিলাতে যখন পড়িতে গিয়াছিল তখনই পিয়ানো বাজানো শিখিয়াছিল। উপানন্দ নিজেকে লইয়াই সারাদিন থাকে। সন্ধ্যার সময় আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে খায় এবং গান-বাজনা করে। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে কখনও যায় না। হরিশ্চন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সে। এই সুপুরুষ সচ্চরিত্র বিদগ্ধ গুণী বন্ধুটিকে ছাড়িয়া হরিশ্চন্দ্রও থাকিতে পারে না। উপানন্দকে সে শুধু ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে। সে অনুভব করে, উপানন্দের মধ্যে এমন একটা কি আছে যাহা অবর্ণনীয়, যাহা তাহার নাগালের বাহিরে এবং যাহা অনবদ্য। গাছের গোড়াগুলি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সে উপানন্দের কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় ঝুমনা আসিয়া খবর দিল, কবিরাজ মহাশয় এবং একজন সাহেব আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, কবিরাজ মহাশয় এবং ডক্টর সোম আসিতেছেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'ডক্টর সোম অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গাছ খুঁজে বার করেছেন। তার মধ্যে দু-তিনটি গাছ তিনি চিনতে পেরেছেন।

ডক্টর সোম বলিলেন, 'তোমরা আমাকে বিশ-পঁচিশ বিঘে জমি দাও। কবরেজ মশাই সেখানে গাছগুলো লাগিয়ে তাদের জীবনচরিত্র পর্যবেক্ষণ করুন। ওদের ফুল-ফল, বিভিন্ন ঋতুতে ওদের কি-কি পরিবর্তন হয় সেটাও লক্ষ্য করে লিখে রাখুন, ওদের বংশবৃদ্ধি কি উপায়ে হয় সেটাও লক্ষ্য করুন, ওদের বীজ সংগ্রহ করে রাখুন। এর জন্য ওঁকে মাসিক পারিশ্রমিকও আমি অবশ্য দেব, উনি যদি নিতে রাজি থাকেন, কিন্তু সর্বাগ্রে কিছু জমি চাই। শুনলাম, উপানন্দের অনেকখানি জমি এমনি পড়ে আছে, ও যদি সেটা আমাকে বিক্রি করে।...'

'ও বিক্রি করবে না।'

'আমি বলে দেখব যদি করে।'

'উপা তার জমিদারির ভার আমার ওপর দিয়ে দিয়েছে। আমি যা করব তাই হবে। আমি ওর জমিদারির ছটাক জমিও বিক্রি করব না। তবে তুমি যদি ওখানে কিছু গাছপালা লাগাতে চাও, আমি আপত্তি করব না, বরং খুশীই হব। কবিরাজ মশাই পণ্ডিত লোক. একটা মনোমত কাজ পাবেন। তুমি লাগাও না গাছ। তবে জমি বিক্রি আমি করব না।'

ডক্টর সোম হাসিয়া বলিলেন, 'লাগাতে যদি দাও তাহলেও আমি খুশী। কবিরাজ মশাই সব দেখাশোনা করবেন। জমি কিনবার লোভ আমার নেই। আমি কালই আমেরিকা চলে যাচ্ছি? কবে ফিরব-ফিরব কিনা জানি না। তোমাদের জমিদারিতে আমার এই সামান্য কয়েকটা গাছের স্মৃতি যদি কবিরাজ মশাই বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তাহলেই আমি খুশী হব। পণ্ডিত মশায়ের জন্য কিছু প্রণামী আমি রেখে যাব উপার কাছে। চল, এবার বাড়ি ফেরা যাক। উপা আমার জন্য না খেয়ে অপেক্ষা করছে।'

'তুমি যাও, আমার যেতে একটু দেরি আছে।'

হরিশ্চন্দ্র দূরে রাস্তার উপর মোটরটা দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আর-একবার মনে হইল, ইহারা এমন যন্ত্রের দাস হইয়া পড়িতেছে!

ইহার পর যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা বেশ নাটকীয়। বাঘু একটি বৃদ্ধাকে টানিতে টানিতে লইয়া হাজির হইল।

'দেখুন হুজুর, রুইলা আপনার পূবদিকের ক্ষেত থেকে তরকারি চুরি করে পালাচ্ছিল। আপনি ওদের পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছেন, যাতে ওদের অভাব না থাকে। তবু দেখুন, ওদের চুরি করা স্বভাবটা। ওরবেটা খেতুও একদিন আমার ক্ষেত থেকে কুমড়ো নিয়ে পালিয়েছিল।'

হরিশ্চন্দ্র কিছু বলিবার পূর্বেই খেতুর মা পেট-কাপড় হইতে তরকারিগুলি বাহির করিয়া মাটির উপর উজার করিয়া ঢালিয়া দিল এবং ছুটিয়া আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের পায়ের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'আপনি আমাকে জুতো মারুন বাবু, আপনি আমাকে জুতো মারুন।'

'কি হল কি ? তুই এসব কি করেছিস ? খেতু কি জমি চাষ করে না ? পাঁচ বিঘে জমিতে তোদের চলে যাওয়া উচিত।'

'খেতু কি চাষ করে ? সে জমিটা আধিতে দিয়ে দিয়েছে হকরুকে। হকরু যা খুশী তাই দেয়। আর সেটা বেচে খেতু তাড়ি খায়। আর হকরুর বিধবা বোন নাগিনের সঙ্গে ও জুটেছে। দিনরাত হকরুর বাড়িতেই পড়ে থাকে। ও আমার ছেলে নয় বাবা, শত্রু। কাল থেকে খেতে পাই নি, ঘরে চাল-ডাল কিছু নেই, হাতে পয়সাও নেই। তাই ভাবলুম, কিছু তরকারি নিয়ে যাই, সিদ্ধ করে খাব।'

খেতুর বাবা হরিশ্চন্দ্রের পুরাতন বিশ্বাসী চাকর ছিল। সর্পাঘাতে তাহার অকালমৃত্যু হয়। খেতুর বয়স তখন ষোল বছর। তাই তাহাকে তিনি পাঁচ বিঘা জমি দিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন, মা-বেটার গ্রাসাচ্ছাদন উহাতে চলিয়া যাইবে। এখন দেখিতেছেন, তাঁহার আশা সফল হয় নাই। কু-সঙ্গে মিশিয়া খেতু উচ্ছন্ন গিয়াছে। খেতুর মায়ের দুঃখ তিনি ঘুচাইতে পারেন নাই। আগেও যে কথা তাঁহার একাধিকবার মনে হইয়াছিল, সেই কথাই আবার মনে হইল, দেশের লোকের চরিত্র যতদিন না উন্নত হইতেছে, ততদিন দেশের উন্নতি হইবে না। আবার তাঁহার মনে হইল, এই যন্ত্রসভ্যতাই আমাদের ষড়রিপুকে উদ্দীপিত করিয়া আমাদের অমানুষ করিয়া ফেলিতেছে। এই খেতু ছেলেটা তাহাদের বাড়িতেই কাজ করিত। কিছুদিন আগে সে শহরে পলাইয়া গিয়া মিলে কাজ লইয়াছিল। সেখানেই তাড়ি খাইতে শিখিয়াছে। তিনি খেতুর মাকে বলিলেন, 'চুরি করে তুই অন্যায় করেছিস। তুই আমার বাড়িতে গিয়ে থাক, সেখানেই খাবি দুবেলা। আমি খেতুর কাছ থেকে জমি কেড়ে নেব। ম্যানেজারবাবুকে বলে দেব। তুই এখন এই তরকারিগুলো নিয়ে যা।'

খেতুর মা তরকারিগুলি তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র আবার গাছ খোঁড়ায় মন দিলেন। হঠাৎ তাঁহার পাদোদক চক্রবর্তীর কথা মনে পড়িল। পাদোদক তাঁহার প্রপিতামহ গঙ্গোদকের ভাই পুণ্যোদকের বংশধর। গঙ্গোদকের এক ভাই ছিল পুণ্যোদক। তাঁহারই পৌত্র পাদোদক। সে বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে শ্বশুরালয়ে ঘরজামাই হইয়া থাকে। তাহার শালা একজন উকিল। শালার পরামর্শে সে হরিশ্চন্দ্রের জমিদারির কিছু অংশ দাবী করিয়া মোকদ্দমা করিয়াছে। গঙ্গোদক যখন ভাইদের পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রত্যেক ভাইয়ের নিকট হইতে তাহাদের

জমিদারির অংশ নগদ টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন এবং সেসব দলিল এখনও মজুত আছে। সুতরাং মোকদ্দমা করিয়া পাদোদক কিছু করিতে পারিবে না, কিন্তু এই মোকদ্দমার হাঙ্গামা, এই মোকদ্দমার পিছনে যে ঈর্ষার মনোভাব, তাহা হরিশ্চন্দ্রের মনকে বড়ই চঞ্চল করিয়াছে। তিনি পাদোদককে কখনও দেখেন নাই। বস্তুতঃ গঙ্গোদকের ভাইদের কোনো খবরই তিনি রাখেন না। তাহারাও রাখে না। হরিশ্চন্দ্র শুনিয়াছেন, একজন বস্তারে আছেন, সেখানে একজন ধনী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। আর একজন আছেন পাঞ্জাবে। মিলিটারিতে কাজ করেন। কিছুদিন আগে মোকদ্দমা করিয়া পাদোদক তাহার নামে যে উকিলের চিঠি দিয়াছেন তাহার উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন আইনত পাদোদক কিছু পাইবে না। তবে সে যদি অর্থকষ্টে পড়িয়া থাকে হরিশ্চন্দ্র তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ চিঠির কোনও উত্তর আসে নাই। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের মনের ভিতর একটা বেদনা যেন মাঝে মাঝে টনটন করিয়া উঠিতেছে। আবার তাহার মনে হইতেছে, এতবড় বিষয়ের শেষ পরিণাম কি হইবে? এ বিষয়ের প্রতি আমার কেন এত মায়া? আবার মনে হইল, উপানন্দ আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী। সে নিরাসক্ত।

সেদিন তিনি সকাল সকাল মাঠ হইতে ফিরিয়া সোজা ম্যানেজারবাবুর বাড়িতে গেলেন। ম্যানেজার কুঞ্জলাল তাঁহার পিতৃবন্ধু রামনাথ ন্যায়রত্নের পুত্র। তিনি পড়াশোনায় ভালো ছেলে ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বরাবর স্কলারশিপ পাইয়া তিনি এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন তখন রামচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তুমি আর গ্রামের বাইরে যেও না। আমাদের জমিদারির দেখাশোনা কর। তোমাকে এক'শ' বিঘে জমি দিচ্ছি, তা ছাড়া আড়াই শ' টাকা করে মাইনেও দেব। মাইনে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কুড়ি টাকা করে বাড়বে, হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। তোমার বাড়িও আমরা তৈরি করে দেব। তোমার বাবার টোলে একজন ভাল পন্ডিত বহাল কর। আমাদের স্টেট থেকেই তাঁর ভরণ-পোষণ হবে।'

তখন হইতেই কুঞ্জলাল স্টেটের সর্বেসর্বা। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ব্যবহারের জন্য ঘোড়া, হাতী, পালকি, ঘোড়ার গাড়ি কিনিয়া দিয়াছেন। চাপরাসী আরদালি এবং দুইজন কিরিচ-বন্দুকধারী গুর্খা তাঁহার বাড়ি সর্বদা পাহারা দেয়। হরিশ্চন্দ্র নিজে যদিও আড়ম্বরপ্রিয় নন, কিন্তু তাঁহার স্টেটের ম্যানেজারের মর্যাদা ও আভিজাত্য যাহাতে জাঁকজমকপূর্ণ হয় এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের একটা শিশুসুলভ মনোভাব ছিল। ম্যানেজারের বাড়িটি রাজপ্রাসাদবৎ। হরিশ্চন্দ্র আসিয়াছেন খবর পাইয়া কুঞ্জলাল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন।

'আপনি এই অসময়ে হঠাৎ এলেন যে, আমাকে খবর পাঠালে আমিই যেতাম।'

'মাঠেই মনে হল কথাটা। তাই মাঠ থেকেই চলে এলাম।'

'কি কথা?'

'একটা উইল করতে চাই।'

কুঞ্জলাল একটু বিস্মিত হইলেন। কোনও কথা বলিলেন না।

হরিশ্চন্দ্র বলিতে লাগিলেন, 'মৃত্যু কখন আসবে কিছু বলা যায় না। হঠাৎ মনে হল, আমি যদি আগে মারা যাই মায়ের কি হবে? তিনি তো আমার নিজের মা নন। আমি তাই উইল করতে চাই যে আমার অবর্তমানে মা এ সংসারে যেমন সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তেমনি

থাকবেন, তাঁর নির্দেশেই সংসারে সব কাজকর্ম চলবে। তা ছাড়া প্রতি মাসে তিনি পাঁচশ টাকা করে হাতখরচ পাবেন। আর একটা কথা থাকবে সে উইলে। উপাই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এই উইলটা লিখে কালই তুমি আমার কাছে নিয়ে যাবে। এর সাক্ষী থাকবে তুমি আর স্কুলের হেডমাস্টার মশাই। আর কথাটা যেন গোপন থাকে।'

'তা তো থাকবেই। আমি কাল হেডমাস্টার মশাইকে নিয়ে যাব আপনার কাছে।'

'বেশ। আমি তবে এখন উঠি।'

'গাড়ি করে আপনাকে পৌঁছে দিক।'

'না, আমি হেঁটেই যাব।'

হরিশ্চন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন সান্ধ্যবৈঠকে উপানন্দ একাই আসিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে একা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

'তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

'সে কলকাতা চলে গেল। তার বান্ধবী লিসা কলকাতায় এসেছে। বিকেলে তার টেলিগ্রাফ এসে হাজির, অবিলম্বে চলে এস। সন্ধ্যের ট্রেনে সে চলে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময় পায় নি। তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে।'

হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ায় টান দিতে দিতে পত্রটি পড়িলেন।

ভাই হরিশ্চন্দ্র,

উপানন্দ আমার অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু তার বাড়িতে এই প্রথম এসেছিলাম। এসে তোমাকে পেলাম। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হয় নি। বিজ্ঞানের প্রগতিকে আমি বরণ করতে চাই, তুমি চাও না। চাইলে তোমাদের জমিদারির অনেক উন্নতি হত। মতের সঙ্গে মিল না হলেও তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। শ্রদ্ধা করবার মত লোক পৃথিবীতে বেশী পাই নি। যে অল্প দু'চারজনকে দেখেছি তার মধ্যে তুমি একটি। আমি বিজ্ঞানী লোক, নানারকম experiment করি। প্রণয় নিয়ে একটা experiment করছি। সেই experiment -এর পাত্রী কলকাতায় এসে আমাকে ডাক দিয়েছেন, তাই আমাকে এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তা না হলে আরও কিছুদিন থাকতুম। শুধু তোমাকে নয় তোমার মাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে। তাঁকে দেখে মনে পড়ছে আমার নিজের মাকে। তুমি আমার অকপট শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিও। ইতি—

নয়ন

হরিশ্চন্দ্র গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিয়া চিঠিখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চিঠিটি উপানন্দকে দিলেন। 'প্রেম নিয়ে experiment, বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

উপানন্দর স্বভাব, চট করিয়া কোনও কথার জবাব দেন না, হাসিমুখে নীরবে চাহিয়া থাকেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে ধরাইলেন সেটি। তাহার পর বলিলেন, 'ও আমেরিকায় একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি রূপসী, সেখানে এক কলেজে পড়ায়। অনেকগুলি ভাষা জানে। বাংলা ভাল জানে। বাংলা হাতের লেখা মুক্তোর মতো। মেয়েটি নয়নকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু নয়ন বিয়ে করে নি। বলেছে, তোমাকে ভালবাসি বলেই বিয়ে করব না। যে কোনও বাঁধনের ঘর্ষণে প্রেমের মৃত্যু হয়। তোমাকে আমি কোনও

রকম বাঁধনে বাঁধতে চাই না। তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে চাই। আমি কেবল তোমাকে ভালবাসব। তুমি নিজে যথেষ্ট রোজগার কর, আমারও টাকার অভাব নেই। সুতরাং অর্থাভাবে কাউকে কারও অধীনতা স্বীকার করতে হবে না। মেয়েটিও এতে রাজি হয়েছে। কাউকে বিয়ে করে নি।'

হরিশ্চন্দ্র খিত্ খিত্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'ও রকম পবিত্র প্রণয় তো এক পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর কারও সংগে হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সংযমী সাধুরা এই রকম প্রেমিক। তাঁরা নমস্য, কিন্তু নয়নবাবু কি সেই জাতের?'

'না মোটেই তা নয়। ও ভোগী। আমার মনে হয়, এটা ওর এক্স্পেরিমেণ্ট (ex-periment)। ও দেখতে চায় বন্ধনহীন ভালবাসা ধোপে টেকে কিনা। মেয়েটিকে কিন্তু ও সত্যিই খুব ভালবাসে। আর এও জানি, ওকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়েছে ও।'

'নিজে কি ও সংযমী আছে?'

'তা জানি না ভাই। বিলেতে ছাত্রজীবনে দেখতুম মেয়েদের সংগে ও খুব মিশত। এর বেশি আর কিছু জানি না। তবে ও একজন প্রতিভাবান লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতিভাবান লোকেদের মাথায় একটু আধটু ছিট থাকে।'

'তুইও কম প্রতিভাবান নোস। তোর মাথা তো নানারকম ছিটের দোকান। অথচ তুই কোনও মেয়েমানুষকে ভালবাসিস নি।'

'আমি শিল্পী। আমি ভালবেসেছি মা সরস্বতীকে। তিনি নানা রূপে আসেন আমার কাছে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুই বিয়ে করলি না, আমিও করব না। আমাদের এতবড় বিষয়ের পরিণাম কি হবে তা কখনও ভেবেছিস?'

'ওসব ভাবনা তুমি ভাবো। তোমার যা খুশী তাই কর। আমি বাধা দেব না। তবে একটা কথা জেনে রাখ, সব বিষয়েরই পরিণাম এক। তা একজনের কাছে বেশী দিন থাকে না। লক্ষ্মী চঞ্চলা। সেই সেকালের হাম্মুরাবি রাজা থেকে অনেক রাজার খবর ইতিহাসে লেখা আছে, তাদের অনেক বিষয় ছিল, প্রবল প্রতাপ ছিল, কিছু টেকে নি। সব ভেসে গেছে। কারো নাম ইতিহাসের পাতায় আছে, কারো নেই। না থাকাটাই পৃথিবীর নিয়ম। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ যদি আনন্দে বেঁচে থাকতে পারি তাহলেই যথেষ্ট। ওর বেশী কিছু চাই না, চাইলেও পাব না।'

'অনেকে মদ মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে থাকে, সেটাকেও কি তুই ভাল বলবি?'

'আমাদের ওসব ভাল লাগে না, কিন্তু কারো যদি লাগে তাকে মন্দ বলতে পারি না। আমার শংকরাচার্যকে ভাল লাগে, ওমর খৈয়ামকেও ভাল লাগে। ভালবাসা পাওয়া জীবনে একটা পরম প্রাপ্তি। তা সবাই পায় না, যারা পায় তাদের তুমি নিন্দে করতে পার না।'

'আমি কিন্তু মদ মেয়েমানুষের ভেতর না গিয়েও ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছি। যেমন আমি তোকে ভালবাসি।'

'আমার চেয়েও তুমি ভালবাসো তোমার ঐ অদ্ভুত খেয়ালটাকে।'

'কি খেয়াল?'

'তোমার যন্ত্র-বিরোধিতা। ওই নিয়েই মেতে আছ তুমি। তোমার যুক্তি আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু মানুষ একদিন বনে ছিল। যে পথে চলে সে আজ মহাকাশে গিয়ে পৌঁছেছে, সে পথের শেষ প্রান্তে হয়তো মহামুক্তি বা মহাবিনাশ অপেক্ষা করছে

আমাদের জন্যে। তবু কিন্তু সেই পথেই আমাদের চলতে হবে, ফেরবার উপায় নেই। কিন্তু তোমার এই পাগলামিটা আমার খুব ভাল লাগে। ওই জন্যেই তোমাকে আরও ভালবাসি। ওই জন্যেই তুমি অসাধারণ।'

'হয়েছে, হয়েছে। ভুল বলেছি, তোকে আমি একটুও ভালবাসি না। তুই বিলাসী, স্বার্থপর, ফোতোবাবু, নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু বুঝিস না।'

হরিশ্চন্দ্র চোখ বড় বড় করিয়া ভড়াক্ ভড়াক্ করিয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন। উপানন্দ নীরবে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার মুখের দিকে। পরক্ষণেই গুপী ও নকু প্রবেশ করিল। গুপীর হাতে উপানন্দের বেহালা, নকুর হাতে একটি ট্রেতে কফির সরঞ্জাম। নকু কফির ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং হরিশ্চন্দ্রের জন্য শ্বেতপাথরের গ্লাসে গুড়ের শরবৎ লইয়া আসিল। হরিশ্চন্দ্র কিন্তু তামাকই খাইতে লাগিলেন। উপানন্দ জানেন, এ সময় কথা কহিলে হরিশ্চন্দ্রের রাগ আরও বাড়িয়া যাইবে। তিনি নীরবে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগিলেন এবং নীরবেই কফির পেয়ালাটি শেষ করিয়া ফেলিলেন। নকু কফির খালি কাপ ভিতরে লইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্রও গড়গড়ার নলটি নামাইয়া রাখিয়া শরবতের গ্লাসটি তুলিয়া ঢক ঢক করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর উপানন্দের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, 'যে দেশে ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের নানা মূর্তি, সে দেশের শিক্ষিত ছেলে হয়ে তুই হাজার হাজার টাকা বিলাসে খরচ করিস, তোর লজ্জা করে না?'

'না। যার রং কালো তাকে ফরসা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সমস্ত জমিদারিটাই তো তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তুমিও চেষ্টার ত্রুটি করছ না, হচ্ছে কিছু? তোমার এই অম্বুরি তামাকের গন্ধ চারিদিকে প্রচার করছে যে তুমিও বিলাসী। তোমার ওই শ্বেত পাথরের গেলাসে কাগজি লেবুর রস দিয়ে গুড়ের শরবৎ খাওয়াও একরকম বিলাস। আমার বিলাস উড়ন্ত প্রজাপতির ছবি তোলা, তোমার মাঠে গিয়ে জমি খোঁড়া। আমরা দুজনেই বিলাসী, কিন্তু আমাদের রুচি ভিন্ন। এক জায়গায় কিন্তু আমাদের মিল আছে?

'না, কোথাও মিল নেই।'

'আছে, আর সে মিল অচ্ছেদ্য। আমি রসস্রষ্টা, তুমি রসিক। তুমি নীতিবাগীশ, কিন্তু আমার আঁকা ন্যাংটা ভিখারিটার ছবিটা দেখে তুমি বাহবা দিয়ে উঠেছিলে সেদিন। তোমাকে বাজনা না শোনালে আমার তৃপ্তি হয় না, আর আমার বাজনা শোনার জন্যে তুমি উৎসুক হয়ে থাকো।'

হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া উপানন্দের পিঠে গুম করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিলেন, তাহার পর তাহার গলা জড়াইয়া তাহার ললাটে চপাৎ করিয়া একটা চুম্বন বসাইয়া দিলেন।

'ছাড়ো ছাড়ো, কি যে কর।'

হরিশ্চন্দ্র পুনরায় গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'তোর ওই ছবিটা ন্যাংটা ভিখারিণীর ছবি বলে ওতরায় নি। উতরেছে তুই ওর সামনে একটা উদ্ধত সাহেবের ছবি এঁকেছিস বলে। ওটা একটা ঐতিহাসিক সত্যের ছবি হয়েছে। আর একদিন দেখে আসব ছবিটা।'

'সে ছবিটা নয়নকে দিয়ে দিয়েছি। তারও খুব পছন্দ হয়েছিল।'

'অমন ছবিটা দিয়ে দিলি?'

উপানন্দ কিছু না বলিয়া হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পর মুহূর্তেই গুপী,

নকু এবং জগ্গী আসিয়া ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিতে লাগিল।

'জানালা বন্ধ করছিস কেন?'

'খুব বৃষ্টি আসছে। পশ্চিমদিকের আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে।'

'এখন এক পশলা জলের দরকারও খুব।'

হরিশ্চন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রচণ্ড একটা বজ্র হানিয়া বৃষ্টি ঘোষণা করিল নিজের আগমনবার্তা এবং একটু পরেই ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল।

'আজ আর কেউ আসবে না। তুই একটা বাজা কিছু।'

উপানন্দ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের জন্য যেন নিজের মনের অতলে তলাইয়া গেলেন। তাহার পর বেহালাটা বাহির করিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজিয়া ফেলিলেন।

বাহিরে ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর ঘরের ভিতরে উপানন্দ তন্ময় হইয়া বাহা বাজাইতেছেন, তাহাতে ঘরের সমস্ত পরিবেশটা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের মনে হইতেছে, সব যেন অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু একটা আকুল কান্না – তাহা সুরের ভাষায় যেন অবিরাম বলিয়া চলিয়াছে, তুমি কোথা, তুমি কোথা, তুমি কোথা। বাহিরের প্রবল বর্ষণও যেন রোদনময় হইয়া গিয়াছে। তাহাও যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি কোথা, তুমি কোথা, তুমি কোথা।'

হরিশ্চন্দ্রের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল। খানিকক্ষণ পরে উপানন্দের বাজনা যখন থামিয়া গেল তখনও হরিশ্চন্দ্র চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর চোখ খুলিয়া বলিলেন, 'রাস্কেল, কি কাণ্ড করলি বল দেখি?'

' 'দেশ' আলাপ করলাম।'

'তুই তো বেহালায় কাঁদলি, আমাকেও কাঁদালি।'

এমন সময় বাহিরের কপাটে কে যেন ধাক্কা দিল। গুপী পাশের ঘরেই ছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া কপাট খুলিয়া দিল।

প্রবেশ করিল একটি আপাদমস্তক-সিক্ত বালক। আসিয়া উপানন্দ এবং হরিশ্চন্দ্রকে প্রণাম করিল।

'কে তুমি?'

'আমি হারান দাসের ছেলে। স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ি। একটা কবিতা মুখস্থ করেছি। আপনাকে শোনাতে এসেছি।'

'কোন, গাঁয়ে বাড়ি?'

'মজুতপুরে বাড়ি আমাদের।'

'কি করেন তোমার বাবা?'

'মজুরি খাটেন। সাতদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছেন।'

'এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তুমি এলে কেন, তুমিও অসুখে পড়ে যাবে যে।'

ছেলেটি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'তুমি আগে ভিজে জামা-কাপড় ছাড়, কিছু খাও, তারপর তোমার কবিতা শুনব। গুপী, একে ভেতরে নিয়ে যা।'

গুপীর সহিত ছেলেটি অন্দরমহলে চলিয়া গেল।

'হরিশচন্দ্র উপানন্দের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ও কেন এসেছে বল তো?'
'ও তো নিজেই বললে, কবিতা শোনাতে এসেছি।'
'এসেছে কবিতা শুনিয়ে চাল নিতে। ওর বাবার অসুখ, ঘরে বোধ হয় চাল বাড়ন্ত।' তাহার পর ম্লান হাসিয়া আবার বলিলেন, 'এই দেশ রাগিনী।'
উপানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'রাগিনী নয়, খবর। অত্যন্ত বেসুরো খবর। রাগিনী হলে সবার চোখ দিয়ে জল পড়ত, তোমার চোখ দিয়ে যেমন পড়ছে। তুমিও এদের দুঃখে কাঁদো না, কর্তব্যবোধে এদের দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা কর। রাগিনী কাঁদায়। আমায় পাগল করে দেয়। দুঃখ আর দুঃখের রাগিনী এক জিনিস নয়। রাগিনী হচ্ছে শিল্পীর সৃষ্টি, আর দুঃখ হচ্ছে সুখের ক্ষত।'
'হয়েছে, হয়েছে, থাম।'
উপানন্দ চুপ করিয়া গেলেন এবং সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার বন্ধুর মুখের দিকে। তাহার পর তাঁহার সুদৃশ্য সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন। উপানন্দের সিগারেট-লাইটারটিও চমৎকার। খুব ছোট একটি রঙীন পাখি, চোখে ঈষৎ চাপ দিলেই চোখ ফাঁক করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করে।
হরিশচন্দ্র হাঁক দিলেন, 'গুপী, তামাক দিয়ে যা। তোর আম্বুরি তামাক ভাল লাগে না? তোকে অমন সুন্দর একটা গড়গড়া কিনে দিলাম, তুই একবারও ছুঁলি না সেটা। ক্রমাগত বিলিতি সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছিস।'
'গড়গড়ায় আমার আপত্তি ওর ভড়াক শব্দটা। সিগারেট নিঃশব্দ এবং 'নীট'। গড়গড়া একটা জবড়জং ব্যাপার।'
গুপী একটি কলকে গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া দিয়া গেল।
হরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলেটা কোথা?'
'মা তাকে খাওয়াচ্ছেন।'
একটু পরেই ছেলেটি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পরিধানে শুকনো কাপড় এবং খুব ঢিলা একটি খদ্দরের ফতুয়া। দুইটিই চন্দ্রশেখরের।
'কি কবিতা শোনাবে তুমি?'
'রবীন্দ্রনাথের।'
ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিয়া দিল:

> 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
> আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
> দিন আগত ওই
> ভারত তবু কই –'

কবিতাটি বেশ বড়। আবেগভরে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিয়া হরিশচন্দ্র এবং উপানন্দ দুজনকেই সে মুগ্ধ করিয়া দিল।
উভয়েই বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ!'
'রবীন্দ্রনাথের আর কোনও কবিতা মুখস্থ আছে তোমার?'
'আছে।'
'বল তো।'

> 'আনন্দময়ীর আগমনে
> আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,

হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।'

এই কবিতাটিও নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করিল সে।

হরিশ্চন্দ্র গুপীকে বলিলেন, 'একে দশ সের চাল আর কিছু তরিতরকারি দিয়ে দে। আর গণোরিকে বল, 'একে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসুক। মজুতপুর এখান থেকে দেড় ক্রোশ পথ। ওহো, তোমার নামটাই জিগ্যেস করা হয় নি!'

'আমার নাম কমল।'

'তোমরা ক'টি ভাইবোন?'

'বোন নেই। আমরা তিন ভাই। আমার ছোট দু-ভায়ের নাম অমল আর বিমল।'

'তারা কি করে?'

'তারাও স্কুলে পড়ে।'

'তোমার বাবার চিকিৎসা কে করছেন?'

'হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। তিনি একটা দামী ওষুধ কিনে খাওয়াতে বলেছেন, কিন্তু সেটা আমরা এখনও কিনতে পারি নি।'

'আচ্ছা, সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। খবর পাঠাব, তিনি রোজ তোমার বাবাকে দেখে আসবেন, আর যা-যা ওষুধ দরকার দেবেন। খুব ভাল লেগেছে তোমার আবৃত্তি। আবার এসো।'

কমল উভয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে খোলের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'গোবিন্দ আসছে।'

কীর্তনিয়া গোবিন্দদাস তাহার দোহার্কি নিতাইকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

'বৃষ্টিতে আমরা আটকে পড়েছিলাম। রাত হয়ে গেছে, গান শুনবেন কি আজ?'

'এসেছ যখন শোনাও একটা। ছোটখাটো কিছু শোনাও।'

'বেশ।'

উপানন্দ বলিলেন, 'কানু কহে রাই' গানটা তোমার গলায় চমৎকার ওতরায়, সেটাও শোনাও।'

'বেশ।'

নাতিদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া গোবিন্দদাস বলিতে লাগিল, 'কানু শ্রীরাধিকার প্রেম-সাগরে তলিয়ে গেছেন, তবু তার তল খুঁজে পাচ্ছেন না, তবু বুঝতে পারছেন না এর সীমা আছে কিনা? রাই কুল, মান সব বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি জানেন, আরও অনেক গোপিকার প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, তবু তাঁর প্রেম কমে নি। আরও বেড়ে যাচ্ছে। তিনি সমাজ সংসার কিছু চান না, তিনি চান কেবল শ্রীকৃষ্ণকে। বিস্মিত হয়ে গেলেন কানাই। বুঝলেন, এই বিশাল সর্বত্যাগী সর্বগ্রাসী প্রেমের মর্ম তিনি জানেন না, বুঝতেও পারছেন না, তারপরই খোলে চাঁটি পড়ল। গান গাহিয়া উঠিলেন সনাতন :

'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই,
আমি তোমার প্রেমের কি-বা জানি...'

হরিশ্চন্দ্র চোখ বুঁজিয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার সহসা একটা অদ্ভুত জিনিস মনে

হইল। মনে হইল, তাঁহার জীবনে এমন প্রেম আসে নাই, যে প্রেমের জন্য তিনি কুল মান প্রতিষ্ঠা সব বর্জন করিতে পারিয়াছেন। যে প্রেমের জন্য কলঙ্কও ভূষণ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। তিনি উপাকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসা শ্রীরাধার প্রেম-মহাসাগরের তুলনায় গোষ্পদ মাত্র। প্রেমের জন্য বিরাট কিছু ত্যাগ করিবার সুযোগই পান নাই তিনি। কোনো নারীও তাঁর প্রেমে পড়িয়া সর্বত্যাগিনী হয় নাই। তাঁহার জীবনে অবশ্য অনেক নারী ছলা-কলার জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে যে পথে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহা প্রেমের পথ নয়, কামের পথ। তাহার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, লোভ ছিল। তাহারা সামান্য কুলটা মাত্র। তাহাদের কাহারও ফাঁদে তিনি যে পড়েন নাই এজন্য তিনি গর্বিত, কিন্তু তাঁহার জীবনে প্রকৃত প্রেমের স্পর্শ যে একবারও আসিল না এজন্য অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহার একটা গোপন ক্ষোভ জাগিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, উপা ঠিকই বলিয়াছে, তিনিও বিলাসী, তাঁহার বিলাসটা একটা স্বতন্ত্র ধরনের। উপা দামী সিগারেট খায়, তিনি দামী অম্বুরী তামাক খান। তাঁহার খদ্দর, তাঁহার স্বদেশীয়ানা, সবই বিলাস। তিনি নিজেকেই ভালবাসেন, আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন নাই। ভালবাসার জন্য সর্বত্যাগী হইতে হয়। তিনি সর্বত্যাগী নন, তিনি বিষয়ী জমিদার। তিনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য, অতিশয় বঞ্চিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

উপানন্দ তখন নিজের বেহালাটা তুলিয়া সনাতনের গানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজাইতেছিলেন, 'আমি তোমার প্রেমের কি-বা জানি'—কানুর এই স্বীকারোক্তিটা যেন শ্রীরাধার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—মর্তলোক যেন অমর্তলোকে পরিণত হইল।

একটু পরে সসঙ্কোচে আসিয়া প্রবেশ করিল গুপী। বলিল, 'খাবার দেওয়া হয়েছে। মা ডাকছেন।'

গান বন্ধ হইয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'গুপী, এদেরও খাবার এনে দে।'

উপানন্দ রোজ রাত্রে এখানেই খায়। হরিশ্চন্দ্রের সহিত উপানন্দও বাড়ির ভিতর গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর গোবিন্দদাস গুপীকে অনুরোধ করিল, 'ভাই গুপী, বাবুর অম্বুরী তামুক আমাকে এক কল্কে খাইও ভাই।'

'খাওয়াব।'

ভিতরে খাবার সাজাইয়া হাতে পাখা লইয়া কনকলতা অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শরীর ভাল আছে তো? মুখখানা থমথম করছে।'

উপানন্দ উত্তর দিলেন, 'গান শুনতে শুনতে ও কাঁদছিল। ছেলেবেলা থেকেই তো ও ছিঁচ্-কাঁদুনে।'

হরিশ্চন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না।

কনকলতা তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

'গান শুনতে বসে অত কান্নাকাটি কিসের?'

হরিশ্চন্দ্র মৃদু হাসিলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

'বোসো। ও নিমাইয়ের মা, এইবার বড়াগুলো ভাজো গাওয়া ঘিয়ে।'

তাহার পর উপানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোর তো নতুন তরকারি ভাল লাগে।

খেয়ে দেখ তো, এটা পছন্দ হয় কিনা?'

উভয়েই খাইতে বসিলেন। কাঁসার থালাকে বেষ্টন করিয়া নানা রকম বাটীর সারি। একটু পরেই নিমাইয়ের মা দুইটি রেকাবীতে করিয়া বড়া ভাজা লইয়া আসিল।

'একটু ঠান্ডা হোক, এখন খুব গরম আছে।'

বড়া খাইয়া উপানন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। 'এটা তো অতি চমৎকার হয়েছে। কিসের বড়া এ?'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'এর মধ্যে ছানার স্বাদ পাচ্ছি।'

কনকলতা বলিলেন, 'ছানার সঙ্গে টাটকা বুটের ছাতু পিষে ব্যাসনে ডুবিয়ে ভেজেছি। ভাল হয়েছে খেতে?'

'চমৎকার।'

বাহিরে উপানন্দের মোটরের হর্ন শোনা গেল।

উপানন্দ চলিয়া যাইবার পর কনকলতা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, 'তুই আজ ঘরের ভেতরে শো। বাইরে পূবে হাওয়া দিচ্ছে।'

'বদ্ধ ঘরে শুলে আমার ঘুমই হবে না। আমি ওই ঢাকা বারান্দায় শোব।'

কনকলতা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং একটি কাঁথা লইয়া আসিলেন, 'এইটা বিছানায় থাক। শীত করলে গায়ে দিস।'

কাঁথাটি সচিত্রিত। কনকলতাই কিছুদিন আগে হরিশ্চন্দ্রের জন্য স্বহস্তে সেলাই করিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র শুইবার পর কনকলতা তাঁহার মশারি গুঁজিয়া দিলেন। নন্দু একটা লণ্ঠন আনিয়া সেটা এককোণে রাখিয়া গেল। সেই লণ্ঠনের আলোয় হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল মায়ের মুখে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ছাপ রহিয়াছে। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

'মা, এদিকে সরে এসো তো। তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছে?'

'তুই শো। আমার কিছু হয় নি।'

হরিশ্চন্দ্র মশারি হইতে বাহির হইয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে। দেখি, দাঁড়াও ভাল করে। তোমার সেই বুকের ব্যথাটা আর হয় নি তো?'

'হয়েছিল আজ খাবার পর। ছাড় আমাকে। শুয়ে পড়।'

'কবিরাজ মশাই যে ওষুধটা দিয়েছেন সেটা খাচ্ছ তো?'

'তুই ছাড় আমাকে। ওষুধ-টসুধ আমি খাই না। মরণই এখন আমার ওষুধ। ছাড় তুই আমাকে।'

'এ কথা বলছ কেন মা?'

'তোকে মানুষ করবার জন্যে এ বাড়িতে এসেছিলাম। তুই মানুষের মত মানুষ হয়েছিস। আমার কাজ ফুরিয়েছে। এখন ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকবার দরকার নেই। তোর একটা বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আমার কর্তব্য সম্পূর্ণ হত। কিন্তু তুই তো বিয়ে করবি না।'

'তুমি থাকতে এ সংসারে দ্বিতীয় কোনও কর্ত্রী আসবে না। তোমাকে ওষুধ খেতেই হবে। তুমি না থাকলে এতবড় সংসার সামলাবে কে?'

'সামলাবার লোক ভগবান পাঠাবেন। তোর মা যখন চলে গেলেন, আমি এসেছিলাম।

আমি যখন থাকব না, আর কেউ আসবে।'

'তুমি যদি ওষুধ না খাও আমি খাওয়া বন্ধ করে দেব।'

'বেশ, কাল থেকে খাব। তুই শো।'

হরিশ্চন্দ্রকে শোয়াইয়া আবার মশারি গুঁজিয়া দিয়া কনকলতা চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্রের অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না। বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভোরের দিকে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, উপানন্দের আঁকা সেই উলঙ্গিনীর ছবিটা যেন জীবন্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, মেয়েটি শুধু উলঙ্গিনী নয়, জীর্ণা-শীর্ণা, যৌবনের কোন মহিমা তাহার অঙ্গে নাই। বুকের প্রতিটি হাড় গোনা যায়। আর তাহার আশে পাশে পিছনে দাঁড়াইয়া আছে বহু উলঙ্গ-উলঙ্গিনী নর-নারী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা—সকলেরই চোখে জল। হরিশ্চন্দ্র চিনিতে পারিলেন, ইহারা তাঁহার প্রজার দল। সকলেই অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। হরিশ্চন্দ্র সেই উলঙ্গিনী ভিখারিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে মা ?'

ভিখারিনী বলিল, 'আমি তোমাদের মা। ধর্ষিতা, মর্দিতা, লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা মা। দারিদ্র্যের বিষে আমরা জর্জরিত। আমাদের অনেক দোষ; আমরা অলস, আমরা ভীরু, আমরা চরিত্রহীন, আমরা পরশ্রীকাতর পশুর দল। কিন্তু এককালে আমরা মানুষ ছিলাম, বহুকালের পরাধীনতা আমাদের পশু করে দিয়েছে। যুগে-যুগে ডাকাতের দল এসে আমাদের সব কেড়ে নিয়ে গেছে, আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। সবাই আমাদের ঘৃণা করে, একমাত্র তুমিই ব্যতিক্রম। এখনি তুমি দুঃখ করছিলে, তুমি কাউকে ভালোবাসতে পার নি। তুমি আমাদের ভালবেসেছ। তুমিও রাধা, আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই তোমার শ্রীকৃষ্ণ। তার জন্য সর্বত্যাগী হতেও তুমি প্রস্তুত। সর্বত্যাগের আনন্দ হয়তো তুমি পাবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাবে না, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল মথুরায় চলে গিয়ে রাজা হয়। আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষ দেশের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের দুর্দশা ঘোচে নি। বহু যুগের পাপের কালিমা সহজে ঘোচে না। কিন্তু তোমার সর্বত্যাগী প্রেমের আনন্দ তুমি পাবে, তোমার শ্রীকৃষ্ণ হয়তো তোমাকে ধরা দেবে না, কিন্তু তারই নাগাল পাবার জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে চিরকাল ছুটবে তুমি, আর সেই অনন্ত দুঃখের মধ্যেই পরম সুখও পাবে, সে সুখের তুলনা নেই।'

হঠাৎ এক সঙ্গে ভোরের পাখীরা ডাকিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখনও তাঁহার স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা কাটে নাই। মনে হইল, চোখ খুলিলেই বুঝি সেই উলঙ্গিনী ভিখারিনীকে দেখিতে পাইবেন।

॥৪॥

ডক্টর সোম গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়া লিসার সাক্ষাৎ পাইলেন। লিসা পাশাপাশি তিনখানি ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

'লিসা, তুমি হঠাৎ চলে এলে কেন ? আমিই তো তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম ক'দিন পরে।'

'কেন এলাম বলছি। লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছি।'

'বাঃ! চল, তোমাকে আমার দেশের বাড়িতে নিয়ে যাই। বাংলাদেশের ঘোর পাড়াগাঁ।'

লিসা মৃদু হাসিল। তাহার পর বলিল, 'কাপড়-চোপড় ছেড়ে আগে খাও কিছু।'

টং করিয়া ঘণ্টা টিপিতেই বেয়ারা আসিল।

'আমাদের চা দাও।'

নয়ন সোম নিজের ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বাথরুমে গিয়া স্নান করিলেন। স্নান করিতে করিতে মনে হইল, লিসার কি যেন একটা হইয়াছে। অনেকদিন পরে তাহার সহিত দেখা হইল, কিন্তু সে তেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না তো! চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে সেই আলো জ্বলিয়া উঠিল না আগে যেমন উঠিত। এক বৎসর তাহার সহিত দেখা হয় নাই। নয়নবাবুর মনে হইল, লিসার মুখে যে পবিত্রতা, তা তাহার রূপের জন্য নহে, কিন্তু তাহার মুখে বুদ্ধির প্রতিভার এবং শুচিতার এমন একটা মহিমা আভাসিত হইত যাহা ডক্টর নয়ন সোমকে একদা মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, লিসাও তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, বিবাহও করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ডক্টর সোম তাহাকে বিবাহ করেন নাই। কেন করেন নাই সে কথা আগে বলিয়াছি। দেহ-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত প্রেম সম্ভব কিনা তাহা তিনি নিজের জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন। লিসাও তাঁহার এই উদ্ভট অস্বাভাবিক পরিকল্পনার নূতনত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রেমের স্বপ্নলোকে তাহার সঙ্গিনী হইয়াছিল। এইভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে।

চায়ের টেবিলে লিসা বলিল, 'তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি তা বলবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি। তুমিও আশা করি বদলাও নি?'

'না, নিশ্চয় না। কিন্তু হঠাৎ একথা জিগ্যেস করছ কেন?'

লিসা একটু চুপ করিয়া রহিল, 'পাঁচ বছর আগে তোমার মনে রোমান্সের যে রং সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা কি এখনও তেমনি উজ্জ্বল আছে?'

'সমুজ্জ্বল থাকবে বলেই তোমাকে বিয়ে করি নি। হ্যাঁ, তোমাকে এখনও ঠিক তেমনি ভালবাসি। আর-একটা কথাও তোমাকে আমি বলি নি—যদিও আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম যে যৌন-ক্ষুধা মেটাবার জন্য দরকার হলে আমি অন্য স্ত্রী-সঙ্গ করতে পারব, তুমিও অন্য পুরুষ-সঙ্গ করতে পারবে। কিন্তু আজ তোমাকে আমি বলছি, বিশ্বাস কর, তোমার সঙ্গে আমার এই মানসিক সম্পর্ক হওয়ার পর আমি আর কোনও স্ত্রী-সঙ্গ করি নি। তোমাকেও স্পর্শ করি নি। আমি হিন্দু, আমি ব্রহ্মচর্যের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি। আবার আমি বিজ্ঞানীও, তাই আমি জানি, এই যৌনক্ষুধার দাবী সকলে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাই তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, প্রয়োজন হলে যদি তুমি অন্য পুরুষ-সঙ্গ করো, আমি আপত্তি করব না। প্রয়োজন হলে তুমি অনেক হোটেলে খাও, অনেক বাথ-রুমে যাও, কিন্তু তাদের প্রেমে পড় না। আমি তোমার মনটাই চেয়েছি কেবল, দেহটা চাই নি।'

লিসা একটু হাসিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে ও স্বাধীনতাটুকু না দিলেই ভাল হত। আমি অনেকদিন আত্মসংযম করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নি। আমি কিন্তু বারবার তোমাকেই চেয়েছিলাম। অন্য পুরুষকে যখন আলিঙ্গন করেছি, তখন মনে কল্পনা করেছি, তুমিই আমার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছ। অন্য পুরুষের দেহে তুমিই আর্বিভূত হয়েছ বারবার। আমার এ কথা বিশ্বাস কর তুমি নয়ন। এখন কিন্তু আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, আমার পেটে সন্তান এসেছে।

তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বল, এখন কি করব?'

'সে কি! এই বার্থ কনট্রোলের যুগে—'

'আমি ওসব পছন্দ করি না। মনে হয়, আমি যেন ভ্রূণ-হত্যা করছি। তা ছাড়া আর-একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ নয়ন, মেয়েদের ক্ষুধা থাকে না, তার চেয়ে প্রবলতর একটা ক্ষুধা আছে, সেটা মাতৃত্বের ক্ষুধা।'

লিসার চোখ দুইটিতে যেন একটা অসীম আগ্রহ জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

'এ সন্তানের বাবা কে?'

'তা জানি না। একাধিক লোকের সঙ্গ করেছি আমি। কিন্তু আর-একটা কথা জানি, এ সন্তানের জন্মের সঙ্গে তুমিও জড়িত আছ, তোমাকেই প্রতি মুহূর্তে ধ্যান করেছি। তুমি ছাড়া কাউকে আমি ভালবাসি নি, তাই তোমার কাছেই এসেছি। তুমি বল, এখন আমি কি করব?'

ডক্টর সোম কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'কি আর করবে, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। তোমার সন্তানও থাকবে আমাদের কাছে। তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি লিসা, তোমার দেহেরই অংশ তোমার সন্তান। তাকেও আমি ভালবাসব, তাকে মানুষ করব দুজনে মিলে। তুমি কিছু ভেবো না। বহুকাল আগে এক গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই রকম প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমার স্বপ্ন আমি সফল করবই।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'না। মিথ্যাচার আমি করতে পারব না। আমি বিজ্ঞানী, আমি সত্য থেকে একচুল নড়ব না। বিয়ে নাই-বা হল। আমার তিনকুলে কেউ নেই। তোমার মা-ও তোমার বাবাকে ডিভোর্স করে অন্যত্র বাস করছেন। তোমার বাবা মারা গেছেন শুনেছি। তুমি আর দেশে ফিরে যেও না, এখানেই থাকো। দেশে পাড়াগাঁয়ে আমার একটা বাড়ি আছে। সেখানেই চল, দিনকতক থাকি।'

লিসা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া চাহিল ডক্টর সোমের দিকে। তাহার পর করুণ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, 'আমাকে বিয়ে করবে না তুমি?'

'বিয়ের জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বিয়ে আমি করব না!'

'এত নিষ্ঠুর হবে তুমি?'

নিষ্ঠুরতার প্রশ্নই নয় এটা। এটা সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন। যে সন্তানের আমি পিতা নই, আইনত তার পিতৃত্ব স্বীকার করতে বলছ কেন তুমি? আইনের ছাপ নিয়ে হবেই বা কি? পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত লোকের পিতৃপরিচয় নেই। দ্য ভিন্‌চি জারজ ছিলেন। ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দ্য ভিন্‌চির কীর্তিই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তোমার আমার টাকার অভাব নেই। তোমার সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে তুলব।'

'তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই নয়ন। আমায় সত্যি যদি তুমি ভালবাস, বিয়ে কর আমাকে। প্লেটোর স্বপ্ন পাগলের স্বপ্ন, ওই পাগলামিকে আঁকড়ে ধরে তুমি আমার জীবন অশুচি করে দিয়েছ। তুমি যদি ঠিক সময়ে আমাকে বিয়ে করতে, আমার জীবন মধুময় হয়ে উঠত। বল, কেন আমায় বিয়ে কর নি, প্লেটোর পাগলামি নিয়ে experiment করবে বলে?'

নয়ন সোম বলিলেন, 'শুধু প্লেটো নয়, আর একটা কারণও ছিল। আমার মা, তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু-বিধবা ছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি,

তাহলে তাঁর পরলোকগত আত্মা কষ্ট পাবে। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলাম।'

'তুমি আমার সঙ্গে কেন তবে এত ঘনিষ্ঠতা করেছিলে?'

'তোমাকে ভালবেসেছিলাম। এখনও বাসি। তাই দেখতে চেয়েছিলাম, প্লেটোর স্বপ্নটা আমার জীবনে সফল করতে পারি কি না।'

'পার নি। তুমি আমার জীবনকে নষ্ট করেছ।'

'যা করেছি তা তোমার সম্মতি নিয়েই করেছি লিসা। তুমি একটা ঘুমের ওষুধের পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। তুমি একটু ঘুমোও।'

ডক্টর সোম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার এক বন্ধু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার ঠিকানা জানা আছে তাঁহার। নীচে নামিয়াই একটি ট্যাক্সি পাইয়া গেলেন এবং ডক্টর সেনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ডক্টর সেনকে লইয়া প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরিলেন তিনি। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। লিসা নাই। হোটেলের সমস্ত খরচ মিটাইয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে মাত্র এই ক্ষুদ্র পত্রটি।

নয়ন,

আমি চললাম।

—লিসা।

॥৫॥

শতবর্ষিকী উৎসব আসন্ন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দুইদিন যাত্রা হইবে, দুইদিন কীর্তন। ছেলেছোকরারা একদিন 'মিশরকুমারী' থিয়েটার করিবে। স্ত্রীভূমিকায় পুরুষরাই গোঁফ কামাইয়া নামিবে। ফুটবল খেলার ম্যাচ, কুস্তিগীরদের প্রতিযোগিতা, গ্রাম্য প্রদর্শনী, ছেলেদের আবৃত্তি, সাঁওতালদের নাচ-গান, ছৌউ-নৃত্য, সবরকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র। মুগমটর গ্রামের খরচে খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন হইতেছে। গ্রাম্যশিল্পীরা চমৎকার একটি মঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন। শীর্ষাবাঈ সেই মঞ্চে নৃত্য এবং সংগীত পরিবেশন করিবেন। উপানন্দ নিজের বাড়ি হইতে তার টানিয়া মঞ্চটিকে বিদ্যুতালোকিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাহাতে রাজি হন নাই। তিনি পেট্রোম্যাক্স আলো এবং ঝাড়-লণ্ঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপানন্দ তবু নিজের বাড়ি হইতে তিনটি থাম পুঁতাইয়া স্টেজের মধ্যে দুই-তিনটি বালব ঝুলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি, হঠাৎ ঝড় উঠিয়া যদি আলো নিভিয়া যায় তখন এগুলি কাজে লাগিবে। হরিশ্চন্দ্র ইহাতে আপত্তি করেন নাই। উপানন্দ কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া বাইজীর জন্য উৎকৃষ্ট বেনারসী কাপড় এবং শাল আনাইয়াছেন। একটি সোনার হারও আনানো হইয়াছে, সেটি হরিশ্চন্দ্র নিজে তাঁহাকে উপহার দিবেন। পারিশ্রমিক ছাড়াই এসব তাঁহাকে দেওয়া হইবে। তাঁহার সঙ্গে অভিভাবিকারূপে যে প্রবীণা ইমন বাইজী আসিবেন, তাঁহার জন্যও অনেক উপহার আসিয়াছে। আসিয়াছে একটি ভাল তানপুরা এবং সেতার। শীর্ষা বাইজীকে আনিবার জন্য উপানন্দের প্রাইভেট সেক্রেটারী চিন্ময়বাবু চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের থাকিবার জন্য একটি সুন্দর বাগানবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র উত্তেজনার তুঙ্গে বসিয়া আছেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু নবনির্মিত মঞ্চটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন। চমৎকার সাজানো হইয়াছে। বিশেষত হরি কুমোরের তৈরি সরস্বতী প্রতিমাটি যেন জীবন্ত মনে হইতেছে।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'উপা, এর মধ্যে বালবগুলো টাঙিয়ে তুই ছন্দ-পতন করে দিয়েছিস।'

'ভুনিকে বলেছি গোলাপী কাগজের পদ্মফুল বানিয়ে ওগুলো ঢেকে দিতে। ওগুলো তো জ্বলবে না, ঝড়টড় যদি আসে—'

'ঝড় এলে তোমার বালবও টিকবে না, ইলেকট্রিক আলোও জ্বলবে না।'

'থিয়েটারের স্টেজটা কেমন হয়েছে? চল, দেখে আসি।'

'ওটা বেশ মজবুত করে বাঁশ আর কাঠের শিলপার দিয়ে তৈরি করেছে কুঞ্জ। মোটা-মোটা তিরপল দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। ভালই হয়েছে। চল, দেখে আসি।'

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া পড়িতেই একদল স্কুলের ছেলে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিল, 'আমরাও থিয়েটার করব, কিন্তু হাবুলদারা বলছে, করতে দেবে না।'

'কি বই করবে তোমরা?'

'রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট'।'

'আচ্ছা, হাবুলকে বলে দিচ্ছি। স্টেজে, রোজই বোধ হয় একটা না একটা কি হবে। তাই যদি হয় তো তোমরা সব শেষে কোরো।'

'বেশ, তাই করব।'

বালকের দল খুশী হইয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় স্টেজটি দেখিয়া উপানন্দ খুশী হইলেন। কিন্তু বলিলেন, 'মাঝে একটা থাম্বা গেড়ে এখানেও গোটা দুই বালব লাগিয়ে দিই?'

'আর কিছু করতে হবে না। ওটার জন্য কারবাইডের টাকা সে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে।'

'আমি ভাবছি ঝড়-টড় যদি ওঠে তাহলে?'

'তাহলে ইলেকট্রিকও টিকবে না। তোমার বাড়িতেও তো বারবার ইলেকট্রিক নিভে যায় শুনেছি।' কিন্তু এ আলোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না। পিওন আসিয়া উপানন্দকে একটি টেলিগ্রাম দিল। উপানন্দ টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িলেন।

'আজই তো শুক্রবার?'

'হ্যাঁ, কেন? কার টেলিগ্রাম?'

'চিন্ময়ের। সে বাইজীকে নিয়ে আজই এসে পৌছচ্ছে। স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে বলেছে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি তোমার কার'টা পাঠিয়ে দাও। আমার বগি-গাড়িটাও যাক। আর জিনিষপত্তর আনবার জন্যে মোষের গাড়িটাও যাক।'

'বেশ। চল তাহলে বাড়ি যাই। কলকাতার ট্রেন তো সাতটা নাগাদ এসে পৌছবে। তুমি তোমার গাড়ি দুটো এখুনি পাঠিয়ে দাও। আমার মোটর আধ ঘণ্টার ভেতর পৌছে যাবে। এখন চারটে বেজেছে।'

উপানন্দ তাঁহার হাতঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র হাতঘড়ি পরেন না, ঘড়ির কোন প্রয়োজনই তাঁহার নাই।

উপানন্দ প্রশ্ন করিলেন, 'আমি কি স্টেশনে যাব?'

'পাগল নাকি! আমাদের লোকই তো নিয়ে আসছে তাকে। একটা বাইজীর কাছে অত হেদিয়ে পড়বার দরকার কি?'

উপানন্দ মুচকি হাসিয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'চল বাড়ি যাই। মাকে খবরটা দিই। বাগানবাড়িতে গগন ঠাকুর রান্নাবান্না করবে। রহমৎকে বলেছি, সেও থাকবে। যদি মুসলমানি খানাটানা চায়, করে দিতে পারবে। চল–'

দুই বন্ধু গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে একজন গোমস্তার সহিত দেখা হইল। সে আভূমি প্রণত হইয়া নিবেদন করিল, সানাইওয়ালারা আসছে। ওরা কি আজ থেকেই বাজাবে?'

'নহবৎখানা তো তৈরি হয়ে গেছে। বাজাক না। আবিদ মিঞা এসেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চমৎকার বাজায়। হ্যাঁ, বাজাতে বল ওদের।'

সন্ধ্যার পর হরিশ্চন্দ্র বাহিরের ঘরে একা বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন। উপানন্দ তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। বাইজীর আগমন বার্তা পাওয়া যায় নাই এখনও। তাঁহার বগি গাড়ি স্টেশন হইতে ফেরে নাই এখনও। বৈঠকখানার দেওয়ালে তাঁহার বাবার একটা অয়েল-পেন্টিং ছবি টাঙানো রহিয়াছে। সেকালের কোন সাহেব শিল্পীকে দিয়া ছবিটি আঁকাইয়া ছিলেন তিনি। ছবিতে তিনিও নগ্নগাত্রে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। হরিশ্চন্দ্র বহুদিন ছবিটির দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। অনেকদিন পরে আজ ছবিটির দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল, ছবিটা তাঁহাকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে। মুখে ঈষৎ হাসি, তাঁহার দিকে প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া আছেন, কিন্তু তিনি যেন বলি-বলি করিয়াও কথা বলিতে পারিতেছেন না। বাইরে উপার মোটরের হর্ন শোনা গেল। একটু পরেই একটি সবুজ সিল্কের শাড়ি-পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে উপার পিছু পিছু প্রবেশ করিল।

'কই, কাকাবাবু কই।'

উপানন্দ বলিলেন, 'ওই যে–'

মেয়েটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল হরিশ্চন্দ্রকে।

হরিশ্চন্দ্র অবাক। তাঁহাকে কাকাবাবু বলার মানে?

'বসুন, বসুন আপনি।'

'আমাকে বসুন বলছেন কেন? আমি আপনার ভাইঝি।'

উপানন্দ সবিস্ময়ে নির্নিমেষে এই অপরূপ রূপসীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, একটি গানের সুর যেন মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের ভাইঝি?

রহমৎ প্রবেশ করিল। উপানন্দকে বলিল, 'ইমন বাইজী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'চল যাচ্ছি।'

উপানন্দ চলিয়া গেলেন।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিই সব বলছি। আপনার এক দাদা ছিলেন, তিনি ছেলেবেলায় কার সঙ্গে যেন কুম্ভমেলা দেখতে যান। সেই মেলায় হারিয়ে যান তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আপনার বাবা খুঁজে পান নি তাঁকে। কুম্ভমেলায় ভীড়ের চাপে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। হয়তো মারাই যেতেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিখ্যাত গায়ক গগনচাঁদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। গগনচাঁদ তাঁকে উদ্ধার করে নিজের বাড়ি পাঞ্জাবে নিয়ে যান। বাবা তখন খুব ছেলেমানুষ, তাঁর বাড়ির ঠিকানা তাঁকে বলতে পারেন নি। কেবল বলেছিলেন, তাঁর বাড়ি মুগ-মটর গ্রাম, বাবার নাম রামচন্দ্র চক্রবর্তী। গগনচাঁদ পাঞ্জাবে চাকরি করতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। অপুত্রক ছিলেন তিনি, বিপত্নীকও ছিলেন। তিনি চাকরি করতেন আর গান বাজনা নিয়ে থাকতেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। বাবাকে তিনি গান-বাজনা শেখাতে লাগলেন। এইভাবেই বাবার শৈশবটা কেটে গেল। গগনচাঁদ তাঁর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য। অনেক গানের সভায় তাকে নিয়ে যেতেন, অনেক মেডেল, অনেক পুরস্কার তখন পেয়েছিলেন তিনি।

গগনচাঁদের আর-একটি বাঙালী শিষ্য ছিলেন, চন্দন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। সেও গগনচাঁদের কাছে সেতার শিখতে আসত। গগনচাঁদ তার সংগে বাবার বিয়ে দিলেন। গগনচাঁদ বেশী দিন চাকরি করেন নি। গান-বাজনা করে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন। তারপর হঠাৎ এক গানের আসরেই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাবাকে দিয়ে গেছেন। আমার তখনও জন্ম হয় নি। গগনচাঁদের মৃত্যুর পর আমার দাদামশাই চন্দন চট্টোপাধ্যায় পাঞ্জাব থেকে চলে আসেন। আগ্রার কাছে তাঁর একটা ছোট বাড়ি ছিল, সেখানেই নিয়ে গেলেন বাবাকে আর মাকে। গগনচাঁদ বাবাকে যে টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে আগ্রায় তিনি ছোট একটি গানের স্কুল খুললেন এবং নিজে একজন নাচের শিক্ষকের কাছে নাচ শিখতে লাগলেন। গান-বাজনা তিনি ভাল করেই শিখেছিলেন, নাচেও নাম করে ফেললেন কিছুদিনের মধ্যেই। পুরণ ওস্তাদের খ্যাতি যখন ও অঞ্চলে সকলের মুখে মুখে, সেই সময় আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের ছয় মাস পরে আমার মা মারা যান। আমার দাদামশাই দিদিমা আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁদের একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাঁর সম্পত্তি আমি পেলাম। মা মারা যাওয়ার পর বাবার এক ছাত্রী ইমন বাইজী আমার অভিভাবিকা হলেন। তিনি আমার জন্যে একজন ওয়েট নার্স বহাল করলেন। আমি যখন বড় হলাম তখন বাবা বললেন, তোর আর বিয়ে দেব না। তুই গান-বাজনা শেখ। নাচও শেখাব তোকে। তাই শিখতে লাগলাম। বাবাই একদিন কথা প্রসংগে আমাকে বলেছিলেন যে মুগ-মটর গ্রামে তাঁর বাড়ি। খুব ছেলেবেলায় কুম্ভমেলায় এসে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। গগনচাঁদ তাঁকে মেলা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন! মুগ-মটর গ্রাম কোন্ প্রদেশের কোন্ জেলায় তা তাঁর মনে নেই। শুধু মনে আছে, তাঁর বাবার নাম রামচন্দ্র চক্রবর্তী। আর তাঁর এক বন্ধু ছিল, তার নাম ছিল বিহারীলাল। মায়ের মুখটা কেবল আবছাভাবে মনে পড়ে। আর কিছু মনে নেই। মুগ-মটর নামে কোন পোস্টাফিস বা স্টেশন নেই। তাই বাবা আর এ গ্রামের সন্ধান করতে পারেন নি। পরে গান-বাজনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে মুগ-মটরের খবর পেতাম না, যদি না আপনার বন্ধু উপানন্দবাবু আমাকে আপনাদের শতরঞ্জি উৎসবে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি আমার খ্যাতির কথা তাঁর এক বন্ধুর মুখ থেকে শুনেছিলেন। আমি দূরে গান গাইবার জন্য যাই না। কিন্তু মুগ-মটর নামটা শুনে আমি উৎসুক হলাম। উপানন্দবাবুর বন্ধুকে বললাম, আপনি একটু খোঁজ নিন তো মুগ-মটর গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবারেরা থাকেন কিনা। যদি থাকেন তাহলে আমি যাব।

উপানন্দবাবুই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর থেকেই আমি জেনেছিলাম, আমার এক কাকা আছেন এবং তিনি একজন মস্ত জমিদার। বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন।

আমার নাচ-গানের খ্যাতিও অনেক হয়েছে, কিন্তু আমার আর এসব ভাল লাগছে না। আমি আর ফিরে যাব না, আপনার কাছেই থাকব।'

হরিশ্চন্দ্র নির্বাক হইয়া সব শুনিতেছিলেন। তাঁহার বিস্ময় তো সীমা অতিক্রম করিয়াছিলই, মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতেছিল সবটাই বানানো গল্প নয় তো! তিনি একটা তুখোড় অভিনেত্রীর পাল্লায় পড়িয়া গেলেন নাকি? কিন্তু শীর্ষার চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখের শুচিতায় এমন একটা সরল আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে হরিশ্চন্দ্র সেটাকে অভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিছিলেন না। বাবার ছবিটার দিকে চাহিলেন। মনে হইল, মুখের মৃদু হাসিটা আর একটু সজীব হইয়াছে।

'যা শুনলাম, তা তো নভেলের গল্পের মত। তুমি কিছু খেয়েছ?'

'না। উপানন্দবাবু তাঁর বাড়িতে নামতে বলেছিলেন, আমি নামি নি, সোজা এখানে চলে এসেছি। আপনার সঙ্গে বাবার মুখের অনেক মিল আছে।'

'চল, ভেতরে মায়ের কাছে চল। আগে কিছু খাও।'

শীর্ষাকে লইয়া তিনি অন্দরের দিকে গেলেন। তাহাকে ভিতরে রাখিয়া একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হইল, যাহা শুনিলেন, তাহা এতই রহস্যময় যে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া না দিলে সে রহস্যের সমাধান করা যাইবে না। উপানন্দ বুদ্ধিমান লোক, যদি ভিতরে কোনও চালাকি বা ফাঁকি থাকে সে ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহার মুখের গদগদ ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, সে শীর্ষাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। মুগ্ধ হইলে অনেক সময় বিচারবুদ্ধি গুলাইয়া যায়। তাঁহারও মেয়েটিকে খুব ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে, সত্যই এ যদি আমার দাদা পূর্ণচন্দ্রের মেয়ে হয়, তাহা হইলে তাঁহাব জীবনে নূতন আনন্দলোকের দ্বার খুলিয়া যাইবে। অপত্যস্নেহের স্বাদ তিনি কখনও পান নাই, মাতৃস্নেহের স্বাদও পান নাই। ভগবান কিন্তু কনকলতাকে পাঠাইযা দিয়া তাঁহার সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। শীর্ষাকে কি তিনিই পাঠাইয়াছেন তাঁহার অপত্যস্নেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য?

'গুপী, তামাক দে।'

বৈঠকখানায় একটা চেয়ারে বসিয়া তিনি চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন। মনের গহনে একটি আবছা-মূর্তি ফুটিয়া উঠিল—কিশোরী বালিকা মূর্তি আধ ঘোমটা দেওয়া, নাকে নোলক দুলিতেছে।

খুট করিয়া শব্দ হইল। গোপী তামাক লইয়া প্রবেশ করিল। হরিশ্চন্দ্র নীরবে গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন। আবার তাঁহার চক্ষু দুইটি বুঁজিয়া আসিল। কিন্তু সেই বালিকা মূর্তিটি আর তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিল না। হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল, সে যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহা নীরবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের মনে হইল, আভাসে তিনি যেন তাহার মর্ম বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহা যেন নীরবে বলিয়া গেল, আমি তো তোমাকে কিছু দিবার সুযোগ পাই নাই। ভগবান যাহাকে পাঠাইয়াছেন তাহাকে ফিরাইয়া দিও না।

হরিশ্চন্দ্রের ইহাও মনে হইল, এসব হয়তো তাঁহার মনগড়া ব্যাপার—ইংরেজিতে যাহাকে বলে wishful thinking! মেয়েটিকে ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই এসব কথা মনে হইতেছে।

উপানন্দের মোটরের হর্ন শোনা গেল। উপানন্দ প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, 'গুপী কই?'

'কেন ?'

'ইমন বাইজীকে কিছু ভালো অম্বুরি তামাক দিয়ে আসুক।'

'তিনি তামাক খান নাকি ?'

'আমি গিয়ে দেখলাম, তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন।'

'বলিস কি !'

'তাঁর যে বাক্সে তামাক, টিকে ছিল সেটা ট্রেন থেকে নামানো হয় নি। গড়গড়াটা নেমেছে। বিরাট মোরাদাবাদী গড়গড়া। কিন্তু তামাকের ডিবেটা নামে নি। বাইরে সামান্য ছিল, সেটাই খাচ্ছেন।'

'বাঙালী ?'

'বাংলা কথা তো চমৎকার বললেন। পরে আছেন কিন্তু ঢিলে পা-জামা। দেখতে ঠিক ফজলি আমের মত।'

'মুসলমান নাকি ?'

'বোধ হয় নয়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। গুপীকে দিয়ে তোমার ভালো তামাক খানিকটা পাঠিয়ে দাও এখুনি। আমার গাড়িটা নিয়েই যাক।'

হরিশ্চন্দ্র গোপীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমাদের তামাক কতটা আছে ?'

'দু' টিন আছে।'

'এক টিন বাগানবাড়িতে দিয়ে আয়। উপার গাড়ি করে যা।'

গোপী চলিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র উপানন্দকে বলিলেন, 'বোস ; শীর্ষার সঙ্গে আলাপ করলুম। মহা সমস্যায় পড়েছি।'

'কি সমস্যা ? কোথা গেলেন তিনি ?'

'মায়ের কাছে। খাবার খাচ্ছে।'

'সমস্যাটা কি ?'

'ও বলছে, ও আমার সেই হারিয়ে যাওয়া দাদার মেয়ে। বলছে, আর আমি ফিরে যাব না। বাইজী যে ভাইঝি হয়ে যাবে এ তো স্বপ্নাতীত ব্যাপার। কি করা যায় বল তো ?'

উপানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'মেয়েটিকে দেখে কিন্তু মনে হয় না ও মিছে কথা বলছে। তা ছাড়া তোমার ভাইঝি সেজে ওর লাভ কি। ওর অর্থাভাব নেই। আমার বন্ধুর মুখে শুনেছি, ওর ইলেকট্রিক-ফিটেড তিনতলা বাড়ি। মোটর আছে। ব্যাঙ্কে টাকাও নাকি প্রচুর। ওখানে অনেক বড় লোকের ছেলে ওকে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক। ও কিন্তু কাউকেই আমল দেয় না। সুতরাং টাকার লোভে ও মুগ-মটর গ্রামে এসে তোমার ভাইঝি সেজে বসে থাকবে কেন ? ওখানে ওর প্রতিষ্ঠা এবং খাতিরও খুব। এখানে আসবার কি প্রলোভন থাকতে পারে ওর ?'

হরিশ্চন্দ্র ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া গড়গড়ায় টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, 'তোর যুক্তিটা অকাট্য। মেয়েটিকে দেখে আমারও ভাল লেগেছে খুব।'

'খুব ভাল।'

'কিন্তু ওই ইমনবাইজী তো একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

'উনি কিন্তু কথা-বার্তায় খুব ভদ্র।'

'মনে হচ্ছে মদ্দা-মদ্দা ভাব। গলার স্বর কি রকম ?'

'মনে হল, কোকিল-কণ্ঠী। এখনও রোজ রেওয়াজ করেন। সঙ্গে তানপুরা, সেতার

আর ডুগি তবলা এনেছেন।'

এমন সময় হঠাৎ শানাই বাজিয়া উঠিল।

'আমাদের শানাইওলা এসে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমিই তাদের বলেছি।'

'বাঃ! আবিদ ভালো বাজায়—জয়-জয়ন্তী ধরেছে।'

এমন সময় ভিতর হইতে শীর্ষা আসিয়া পড়িল।

'ঠাকুমা অনেক খাইয়ে দিলেন। কি চমৎকার পায়েস খেলাম! এমন পায়েস কখনও খাইনি।'

'তুমি বোসো। তোমাকে আরও দু-একটা কথা জিগ্যেস করব। তোমার বাবা তোমাকে মুগ-মটর গ্রামের কথা, তাঁর বাবার কথা, আত্মীয়স্বজনদের কথা কিছু বলেছিলেন কি, মনে আছে তোমার?'

'বিশেষ মনে নেই।'

শীর্ষা কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'বাবা বলেছিলেন, ঠাকুর্দার একটা পায়ে নাকি গোদ ছিল। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আর একটা গল্প তিনি করতেন। এখানে আপনাদের এক পুকুরের পাড়ে নাকি একটা বড় বটগাছ ছিল, তার ডালপালা নাকি পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই পুকুরটার নাম ছিল বটপুকুর। বাবা নাকি সেই বটগাছে উঠে তার ডালে-ডালে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন নাকি পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেক নাকানি-চোবানি খেয়ে শেষে নাকি উদ্ধার পান।'

হরিশ্চন্দ্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'দুটোই সত্যি কথা। বাবার ডান পায়ে গোদ ছিল। আর বটপুকুর এখনও আছে, আরও অনেক বড় হয়েছে, তার ডালপালা পুকুরটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে পুকুরটাকে পরিষ্কার করাই। বটগাছের পাতাগুলো আমার জমিব সার হয়—তোমাকে কাল সকালে নিয়ে যাব বটপুকুরে। এবার আমার বিশ্বাস হয়েছে, তুমি আমাকে যা বলেছ তা সত্যি। তুমি সত্যি আমার সেই দাদার মেয়ে যাকে আমি কখনও দেখি নি।'

হরিশ্চন্দ্র আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শীর্ষা বাইজীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। তাঁহার চোখে জল ভরিয়া উঠিল, তিনি পাশের চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শিশুর মত রোদন করিতে লাগিলেন।

উপানন্দ এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। তাঁহার মনে যে কবিতা মূর্ত হইতে চাহিতেছিল তাহা অবর্ণনীয়, কিন্তু ভাবটি এই...

'তোমারি আশায় ছিনু
পথ-পানে আঁখি দুটি মেলে
এতদিন পরে তুমি এলে...'

শীর্ষা হরিশ্চন্দ্রের এই ব্যবহারে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়িল। উপানন্দের নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় না। উপানন্দের দিকে একবারও চাহে নাই সে।

হঠাৎ শানাইটা বন্ধ হইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র চোখের জল মুছিয়া আবার শীর্ষার দিকে চাহিলেন এবং একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গেলেন। শীর্ষার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কেমন লাগল শানাই?'

'চমৎকার। এখানকারই শানাই?'

'হ্যাঁ, হোসেনপুরে থাকে। আমাদেরই প্রজা।'

'চমৎকার বাজায়!'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'যার জন্যে তোমাকে পেলাম সেও একজন উঁচুদরের শিল্পী। সব রকম বাজনা বাজাতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, ভাল ফোটো তুলতে পারে। কেমব্রিজের এম. এ.। অথচ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যায় নি।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'ওই তোমার সামনেই বসে আছে। উপানন্দ রায়...আমার একমাত্র বন্ধু। রোজ সন্ধ্যায় আমাকে বেহালা বাজিয়ে শোনায়। উপা, শোনা না একে তোর বেহালা। ওরে নকু, উপার বেহালাটা নিয়ে আয়।'

উপানন্দও অনিচ্ছুক ছিল না। তবু মুখে বলিল, 'উনি এখন ক্লান্ত, এখন কি ওঁর ভাল লাগবে?'

'গান-বাজনা আমার সব সময় ভাল লাগে। আমি ক্লান্ত নই, সমস্ত রাস্তা ঘুমুতে ঘুমুতে এসেছি। রাত্রে আর কিছু খাব না, ঠাকুমা যা খাইয়ে দিয়েছেন।'

নকু বেহালা দিয়ে গেল।

উপানন্দ বাজাইতে শুরু করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরের যে পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন তাহা শীর্ষাকে শুধু অভিভূত করিল না, অপ্রস্তুতও করিল। সে বুঝিতে পারিল না, কি সুর তিনি বাজাইতেছেন। এদেশের কোনও সুর নয়, অথচ কি চমৎকার! চারিদিকে নানা ভঙ্গীতে যেন আনন্দের লহরী বহিয়া যাইতেছে। বেহালা যেন সুরের ভাষায় বার বার বলিতেছে, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। বেহালা যখন থামিল, তখন হরিশ্চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ!'

শীর্ষা বলিল, 'সত্যিই অপূর্ব! কিন্তু কি সুর বাজালেন, ধরতে পারলাম না তো?'

'এটা একটা ইটালিয়ান সুর। ওদেশে যখন ছিলাম, তখন একজন ইটালিয়ান গুরুর কাছে বেহালা শিখেছিলাম। তিনিই শিখিয়েছিলেন এটা।'

'ও অনেক রকম যন্ত্র বাজাতে পারে। ওর হাতের পিয়ানো যদি শোন, তাক লেগে যাবে।'

শীর্ষা উঠিয়া পড়িল।

'আমি এবার একবার মাতাজীর কাছে যাই।'

হরিশ্চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'উনি কি বাঙালী?'

'না, উনি দিল্লীর মেয়ে। ওঁর বাবাও গগনচাঁদের শিষ্য ছিলেন। আমার বাবার গুরুভাই ছিলেন তিনি। এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ওঁর বাবা আর মা মারা যান। উনি ছিলেন বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তখন ওঁর বয়স দশ বছর। আমার বাবা তখন ওঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। নিজের মেয়ের মত মানুষ করেন। বাবার কাছেই গান-বাজনা শিখেছেন। কিছুদিন পরে আমার মায়ের যখন মৃত্যু হল, তখন উনিই আমার ভার নিলেন। আমি জন্ম থেকেই ওঁকে দেখছি। যদিও আমার ওয়েট-নার্স ছিল, আরও অনেক চাকর-চাকরাণী ছিল, কিন্তু ওঁকেই আমি মাতাজী বলে ডেকেছি, আর সত্যিই উনি মাতৃস্নেহে আমাকে পালন করেছেন। আমি এখন যাব ওঁর কাছে। উনি যে ক'দিন আছেন, ওই বাগানবাড়িতেই আমি থাকব। তারপর উনি চলে গেলে আমি আপনার কাছে থাকব। আমার আর-একটা অনুরোধ আছে কাকাবাবু।'

'কি?'

'আপনাদের যে ক'দিন উৎসব হবে, রোজ আমি গান গাইব, কিন্তু নাচব না। ওখানেও আমি নাচের মুজরো নিই না আজকাল, যদিও বাবা আমাকে খুব ভাল করেই নাচ শিখিয়েছিলেন। নাচলে তো অনেক টাকা রোজগার করা যায়। কিন্তু আমি নাকি...'

উপানন্দ প্রশ্ন করিলেন, 'কেন, নাচও তো একটা বড় শিল্প?'

'তা ঠিক। কিন্তু একজন যুবতী মেয়ে যখন নাচে, তখন তার নাচের শিল্প দেখতে পুরুষদের দল ভীড় করে না। খুব কম লোকই নাচের শিল্প বোঝে। তারা যায় মেয়েটির দেহ দেখবার জন্য। অনেকের চোখে পাপের কলুষ আমি লক্ষ্য করেছি, অনেক অভব্য চিঠিও পেয়েছি আমি। তাই ঠিক করেছি আমি নাচব না। আমি মাতাজীর কাছে মাঝে মাঝে নাচি ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে। এখানে আপনি মান্যগণ্য জমিদার, আপনার ভাইঝি সবার সামনে খোলা স্টেজের ওপর নাচবে সেটা কি ভাল দেখাবে? আমি নাচব না কাকাবাবু।'

শীর্ষার কণ্ঠস্বরে একটা আবদারের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহাতে হরিশ্চন্দ্র, উপানন্দ দুজনেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

'বেশ তাই হবে।' হরিশ্চন্দ্র সোৎসাহে সায় দিলেন। উপানন্দ উঠিয়া পড়িলেন।

'চলুন তাহলে, আপনাকে মাতাজীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'চলুন।'

উপানন্দের সঙ্গে শীর্ষা চলিয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার নীচের ঠোঁটটা বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। বেশী বিচলিত হইলে তিনি সাধারণতঃ যাহা করেন তাহাই করিলেন। পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া উঠ-বোস করিলেন কয়েকবার। তাহার পর বলিলেন, 'ওরে নকু, জংগীকে ডাক, চান করব।'

দীর্ঘকায় জংগী আসিয়া কুয়া হইতে জল তুলিয়া তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিল। স্নান করিয়া তিনি গোপীকে আর-এক কল্কে তামাক দিতে বলিলেন। উপানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন তিনি। সে আসিলে একসংগে খাইতে বসিবেন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে গ্রামের কোন শিল্পীরা আসে নাই। শতরঞ্জির কোন না কোন ব্যাপারে সকলেই ব্যস্ত। একটু পরেই উপানন্দ ফিরিয়া আসিলেন।

'মা ডাকছেন, চল এবার খাই গিয়ে। শীর্ষাকে কেমন লাগল?'

'অসাধারণ।'

খাইবার সময় কনকলতাও বলিলেন, 'মেয়েটি খুব ভাল। ও তোর দাদা পূর্ণেরই মেয়ে। কত আশ্চর্য জিনিসই যে ঘটে পৃথিবীতে। ও বলছে আর ফিরে যাবে না।'

'আমাকেও তাই বলছে। কেন বলছে? টাকার ওর অভাব নেই। ও আসত না, মৃগ-মটর নামটাই ওকে টেনে এনেছে। দাদার কাছে বটপুকুরের কথা শুনেছিল, সে কথাও বললে।'

কনকলতা বলিলেন, 'না, ও মিছে কথা বলছে না। ও আমাদেরই মেয়ে। থাকতে চায় থাকুক না। বাড়িতে জায়গার তো অভাব নেই। দোতলার ঘরগুলো তো সব খালিই রয়েছে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'তাহলে কিন্তু তোমার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আনতে হবে। ওঁর আগ্রার বাড়িতে শুনেছি ইলেকট্রিসিটি আছে।'

হরিশ্চন্দ্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ঝাঁকিয়া উত্তর দিলেন, 'না,

ওসব আমার বাড়িতে হবে না। আমার মা যখন এ বাড়িতে এসেছিলেন তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না, তার নাতনীও বিনা ইলেকট্রিসিটিতে থাকতে পারবে। এই যে মা রয়েছে, ইলেকট্রিসিটি নেই বলে কি অসুবিধে হয়েছে তাঁর?'

'তোরা ঝগড়া করিস না, খা।'

উপানন্দ স্মিত মুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, তিনি যখন পিয়ানো কিনিতে চাহিয়াছিলেন হরিশ্চন্দ্র বাধা দিয়াছিলেন, এখন কিন্তু সে পিয়ানোর মহাভক্ত।

॥৬॥

শতরঞ্জি উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সাতদিন ধরিয়া 'দীয়তাং ভুজ্যতাং,' আবাল বৃদ্ধ বনিতার জন্য নানা রকম আমোদ-প্রমোদ তো ছিলই—প্রতি বৎসরই থাকে, কিন্তু এবার শীর্ষাবাঈ এবং ইমনবাঈয়ের গান সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। শীর্ষাদেবীর সংগে তবলায় সংগত করিতেন ইমনবাঈ। গ্রামেরই দুইজন ছেলে গানের সংগে সেতার বাজাইয়াছিল। শীর্ষা নিজেই তানপুরায় আলাপ করিতে করিতে গান গাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল সকলকে। উপানন্দও প্রতিদিন একটা না একটা যন্ত্র আলাপ করিতেন একা। ইমনবাঈও একদিন একটা ভজন গাহিয়া অবাক করিয়া দিলেন সকলকে। শীর্ষাও অবাক হইয়া গিয়াছিল উপানন্দের বাজনা শুনিয়া। উপানন্দ দেখিতে সুন্দর, তাঁহার আচার-ব্যবহারও অনিন্দনীয়, কেমব্রিজের এম. এ.,—এ রকম লোক যে একটা পল্লীগ্রামে শিল্পসাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে তাহা শীর্ষা কল্পনা করিতে পারে নাই। ইনি কোনও বড় শহরে গেলে তো দেশ বিখ্যাত হইতে পারিতেন। কিন্তু খ্যাতির মোহ উঁহাকে শিল্পসাধনা হইতে বিচ্যুত করে নাই। এই মুগ-মটর গ্রামে শীর্ষা যে তাহাব কাকাবাবুকে আবিষ্কার করিয়া তাহার নিজের বড়িতে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে তাহা নয়, কাকাবাবুর প্রিয়তম বন্ধু গুণী উপানন্দকে আবিষ্কার করিয়া সে সেই রকম আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে রকম আনন্দ ও বিস্ময়ে বহুকাল পূর্বে অভিভূত হইয়াছিলেন কলম্বাস আমেরিকা দেখিয়া। যে বিপুল শ্রদ্ধা তাহার মনকে আবিষ্ট করিতেছিল তাহা যে প্রেমেরই পূর্বাভাস তাহা সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু নারীদের অন্তর অনেকটা ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মত। আলোকের সামান্যতম স্পর্শেও তাহাতে দাগ পড়ে। সে এখন পারিল, উপানন্দও তাহাকে ভাল বাসিয়াছে যদিও তিনি মুখে কিছু বলেন নাই।

আচার-ব্যবহারে কোনও অভব্যতার চিহ্নমাত্র সে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় যাহা বলিতেছিল তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। শীর্ষা অবশ্য প্রায়ই অন্দরমহলে ঠাকুমার কাছে থাকিত, কিন্তু উপানন্দ সন্ধ্যার সময় আসিলে হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই তাহাকে গান গাহিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইতেন। তখন মনে হইত, উপানন্দের দৃষ্টি যেন তাহাকে পূজা করিতেছে। বিব্রত হইয়া আনত মুখে সে বসিয়া থাকিত। হরিশ্চন্দ্র গান গাহিতে বলিলে গান গাহিত, না বলিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। উপানন্দ প্রত্যহ বেহালা বাজাইতেন। শীর্ষার মনে হইত, বেহালা যেন তাহার স্তুতি করিতেছে। দেশ, বেহাগ, বাগেশ্রী, ভৈরবীরা যাহা প্রকাশ করিতেছে তাহা শুধু সুরের কেরামতিই নয়, উপানন্দের প্রাণের আকুতি। সে আকুতির স্পর্শ শীর্ষাকেও আকুল করিতেছে। শীর্ষা রূপসী এবং প্রথম শ্রেণীর সংগীত শিল্পী। অনেকেই তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিয়াছে,

কিন্তু কেহই তাহাকে এত বিচলিত করে নাই। বাহিরে সে কিন্তু স্থির আছে। ইমনবাঈ শতরঞ্জি উৎসব হইবার কয়েকদিন পরেই চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় সাশ্রু নয়নে হরিশ্চন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছেন, 'ওর বাবার আদেশে ওকে আমি মানুষ করেছি, তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। এখন ওকে ওর কাকার হাতে দিয়ে চললাম। আপনারই ওর ওপর বেশী দাবী। আমার দাবী স্নেহের। আইনত তার কোন মূল্য নেই। তা ছাড়া ও এখানে থাকতে চাইছে। আমাকেও থাকতে বলছে। কিন্তু আমি আমার ভার আপনাদের ওপর চাপাতে চাই না। শীর্ষা বলেছে, আগ্রার বাড়িটা আর সেখানকার বিষয়সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দেবে। আমি নিতে চাই নি, যে ক'দিন বাঁচব ওর বাড়িতেই থাকব। ব্যাংকে ওর অনেক টাকা, মাসে প্রায় পাঁচ শ' টাকা করে সুদ পায়। সে টাকা ও আমাকেই খরচ করতে বলেছে। ওখানে ওর যে মুন্সী আছে তাকে ও চিঠি লিখে দিয়েছে। ও বড় ভাল মেয়ে। বলেছে, আমার কাছে মাঝে মাঝে যাবে। পাঠিয়ে দেবেন ওকে।'

হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন, 'আমিই ওকে নিয়ে যাব। দাদার নাকি একটা ছবি আছে সেখানে, সেটা আমি নিয়ে আসতে চাই।'

'সেটা আমি দেব না। আমার গুরুজীর ফোটোই তো এখন আমার জীবনে একমাত্র সম্বল। আমি কি নিয়ে থাকব বলুন ?'

'বেশ, ওর থেকে আর একটা ফোটো করিয়ে নেব আমি।'

'তা হতে পারে। শীর্ষাকে নিয়ে আসুন তাহলে আগ্রায়।'

ইমনবাঈ চলিয়া যাইবার পর শীর্ষা কয়েক দিন কান্নাকাটি করিয়াছিল, কিন্তু কনকলতার আদর যত্ন এবং হরিশ্চন্দ্রের অপত্যস্নেহ, বিশেষত উপানন্দের নিঃশব্দ প্রেম তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটা অপরূপ নূতন জগৎ সৃষ্টি করিল যে ইমনবাঈ-এর জন্য বিরহ বেশীদিন স্থায়ী হইল না।

খুব গরম পড়িয়াছিল। শীর্ষা সত্যই গরমে খুব কষ্ট পাইতেছিল। কনকলতা তাহাকে রাত্রে হাত-পাখা দিয়া হাওয়া করিবার জন্য একজন ঝি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শীর্ষা বলিল, 'পাশে বসে কেউ পাখা নাড়লে আমার ঘুম হবে না। আমি নিজেই পাখা নেড়ে ঘুমোব। ঝির দরকার নেই।'

কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল, তাহার কপালে কয়েকটি বিষফোঁড়া দেখা দিয়াছে। কনকলতা বলিলেন, 'ও গরমের জন্যেই হয়েছে।'

তিনি চন্দন ঘষিয়া কপালে লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন উপানন্দ। তিনি বলিলেন, 'ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। ইলেকট্রিক ফ্যানে শোয়া ওর অভ্যাস। আমি আমার বাড়ি থেকে একটা লাইন টেনে ওর ঘরে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিই।'

'আমাদের ঘরে তো ফ্যান নেই। হাত পাখাতেই আমাদের চলে যাচ্ছে।'

'তুমি সব সহ্য করতে পার। ও কিন্তু চিরকাল ফ্যানের হাওয়ায় অভ্যস্ত। ওকে এ রকমভাবে কষ্ট দেওয়া অন্যায়। আমি কালই এর ব্যবস্থা করব, তুমি বাধা দিও না।'

গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন হরিশ্চন্দ্র।

পরদিনই কয়েকটি বাঁশ পুঁতিয়া এবং বাঁশের ডগায় তার বাঁধিয়া উপানন্দ শীর্ষার ঘরে একটা টেবিল ফ্যান লাগাইয়া দিলেন। শীর্ষা কনকলতাকে বলিল, 'কাকাবাবুর যখন ইচ্ছে নয় তখন আমিও ফ্যান চালাব না। আপনি খবর পাঠিয়ে দিন, ও-ফ্যান নিয়ে যাক।'

কনকলতা হাসিয়া বলিলেন, 'ওরা দুজনেই একগুঁয়ে। ওদের ঝগড়া ওরাই মিটিয়ে

নেবে, আমি ওর মধ্যে যাব না। তোর তো সত্যিই কষ্ট হচ্ছে, চালা না পাখাটা।'

'না, কাকাবাবু না বললে আমি চালাব না।'

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধুতে লাগিয়া গেল।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তুই তো জানিস আমি ওসব বিলিতি যন্ত্রের বিরোধী। কেন বিরোধী, তাও বার বার তোকে বলেছি। আমি দেশের গরীব লোকদের ভালবাসি। যারা চাষী, যারা খেটে খায়, যারা শিল্পী, যাদের পূর্বপুরুষ এদেশে মসলিন বানাতো, প্রতিমা বানাতো, মন্দির বানাতো—যন্ত্রসভ্যতা এসে তাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখনও যে দু-চারজন অতি কষ্টে বেঁচে আছে, আমি তাদের পক্ষে। যন্ত্রসভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে তাদের বাঁচানো চাই। তাই আমি আমার বাড়িতে ওসব ঢুকতে দিতে চাই না।'

উপানন্দ স্মিত মুখে সব শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'শীর্ষা কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে, এটা ফ্যাক্ট্। তুমি মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুলে এনে জলের অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছ। মাছটা কিন্তু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।'

'দেখ, যারা নেশাখোর তারা নেশার জিনিস না পেলে প্রথম প্রথম ছটফট করে, তারপর ঠিক হয়ে যায়।'

'ওসব তর্ক তো অনেক করেছি। এখন তুমি দয়া করে অনুমতি দাও, শীর্ষা পাখাটা ব্যবহার করুক। তোমার ভয়ে ও পাখা চালাচ্ছে না।'

'আমি তো মানা করি নি।'

'মুখে মানা কর নি, কিন্তু ও বুঝেছে পাখা চালালে তুমি অসন্তুষ্ট হবে। আমি বুঝতে পারি না, তুমি এমন এক-বগ্গা একগুঁয়ে কেন?'

হরিশ্চন্দ্র কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'তোরা বিলাসী, স্বার্থপর, তোরা বুঝতে পারবি না আমার ব্যথা কোথায়।'

হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া তিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। উপানন্দ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তাহার পর অন্দরে প্রবেশ করিয়া কনকলতাকে প্রশ্ন করিলেন, 'সে গেল কোথা?'

'ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছে। বলেছে, রাত্রে খাব না।'

'আমিও খাব না তাহলে। আমি বাড়ি চললাম।'

'কি যে ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করিস তোরা? বুড়ো খোকা সব।'

উপানন্দ বাড়ি চলিয়া গেলেন। বাড়ি গিয়া দেখিলেন, ডাকবাক্সে একটা খামে মোড়া চিঠি রহিয়াছে। অচেনা হাতের লেখা। চিঠিখানি খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন। লিসার চিঠি। বাংলাতে লিখিয়াছে। চমৎকার হাতের লেখা। দীর্ঘ পত্র।

উপানন্দ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং পড়িতে শুরু করিলেন:

মান্যবরেষু,

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার বন্ধু নয়নের কাছে আমার নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। আমি তাঁহার বান্ধবী লিসা। আমাদের বন্ধুত্বটা যে সাধারণ পর্যায়ের নহে সে কথাও আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন। নয়ন আমার প্রণয়ী। আমিও তাহাকে খুব ভালবাসি। আমাদের এ ভালবাসা অনেক দিনের। কিন্তু তবু আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। কেন হইল তাহা সংক্ষেপে বলি। নয়ন খামখেয়ালী লোক। মস্ত বড় বিজ্ঞানী।

তাহার খেয়াল হইল, দেহ-সম্পর্ক-বর্জিত প্রেম—ইংরেজিতে যাহাকে 'প্লেটোনিক লাভ' বলে—তাহা বাস্তবে সম্ভব কিনা সে পরীক্ষা করিবে! আমাকে বিবাহ করিল না, পবিত্র প্রেম বিষয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিল। বলিল, সে আমাকেই ভালবাসে, চিরকাল বাসিবে, কিন্তু আমাকে বিবাহ করিবে না। নিজে সে ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। আমি তাহাকে বলিলাম, কিন্তু আমার দেহের তো একটা ক্ষুধা আছে। নয়ন বলিল, আত্মসংযম যদি করিতে না পার, অন্য পুরুষের সহিত সহবাস করিতে পার, সে স্বাধীনতা তোমাকে আমি দিলাম, কিন্তু চেষ্টা কর দেহের ক্ষুধা দমন করিতে। আমি দুই বৎসর চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নাই। আপনারা যাহাকে 'পদস্খলন' বলেন তাহাই আমার হইয়াছিল। নয়ন সারা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়, সে যদি কাছে থাকিত তাহা হইলে এমনটা হয়তো হইত না। কিন্তু সে কখনও ইংলন্ড, কখনও ফ্রান্স, কখনও জার্মানি, কখনও রাশিয়া, কখনও ভারতবর্ষ, কখনও চীন, কখনও জাপান, কখনও জাভায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু যেখানেই থাকিত প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখিত। কি সুন্দর চিঠি সে সব। প্রায় প্রতি চিঠিতেই লিখিত, তুমি চাকরি ছাড়িয়া দাও। যতদিন বাঁচি এসো, আমরা দুইজনে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই। পৃথিবী যে কত সুন্দর, কত মনোরম, মানুষ যে কি বিচিত্র জীব, কি অদ্ভুত তাহার প্রতিভা, কি অপূর্ব তাহার সৃষ্টি তাহা দেখি। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ আমার কাছে চলিয়া আসিত, আবার চলিয়া যাইত কয়েকদিন পরে। এই ভাবেই চলিতেছিল, কিন্তু বেশী দিন চলিল না। আমার পেটে একদিন সন্তানের সম্ভাবনা আমি অনুভব করিলাম। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে জন্ম-নিরোধ করা যায়, কিন্তু আমি ও ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, জন্ম-নিরোধ আমাদের অনেক সম্ভাবনাকে রোধ করে। জন্ম-নিরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিলে হয়তো বেদব্যাসের জন্ম হইত না, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পাইতাম না। ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া আমি যখন নিঃসংশয় হইলাম, তখন আমার নিজের প্রতি ঘৃণাও হইল। আমি আপনাদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কিছুকিছু পড়িয়াছি। আমি জানি, আপনাদের শাস্ত্রে যে পঞ্চকন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া, তাঁহারা প্রত্যেকেই অসতী। আপনাদের দেশে শকুন্তলা পতিতা বলিয়া ঘৃণিতা নহেন। আপনাদের দেশে রাক্ষস-বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহও সমাজে স্বীকৃত, কিন্তু আমি মনে মনে ভক্তি করিয়াছি সীতা সতী সাবিত্রী দয়মন্তীকে। আমি তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। নয়ন যদি আমাকে বিবাহ করিত হয়তো পারিতাম। কিন্তু নয়ন হৃদয়হীন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা সত্য-নির্ণয়ের জন্য অসংখ্য গিনিপিগ, বানর হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নয়ন একটা ক্ষুধিতা মাতৃত্বলোলুপ নারীর জীবন লইয়া যে পরীক্ষা করিয়াছে আমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই।

যখন আমি নিঃসংশয় হইলাম যে আমি গর্ভবতী তখন নয়ন আপনার কাছে ছিল। আমি কলিকাতায় চলিয়া গেলাম এবং নয়নকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলাম, অবিলম্বে আমার সহিত দেখা কর। সে আসিয়াছিল, অবিলম্বেই আসিয়াছিল, কিন্তু আসিয়া যাহা বলিল তাহা আমি প্রত্যাশা করি নাই। সে বলিল, বেশ তো, তোমার ছেলেকে আমি মানুষ করিব, কিন্তু তোমাকে বিবাহ করিব না। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি একজন বড় উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, তোমার জানা উচিত, গাছের জীবনের সার্থকতা ফুলে, যে ফুল ফলে পরিণত হয় তাহাই সার্থক। নয়ন বলিল, কিন্তু গাছেদের বিবাহ হয় না। তুমি বিবাহের জন্য ব্যস্ত কেন ? আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি, তোমার সন্তানকে আমি মানুষ করিব। সন্তানের পিতাটি কে ? আমি একাধিক পুরুষ-সঙ্গ করিয়াছিলাম, পিতার খবর দিতে পারিলাম না।

নয়ন বলিল, তাহার বাবার নাম জানিবার আমার প্রয়োজন নাই। সে তোমার সন্তান, ইহাই আমার কাছে তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তুমি অনর্থক বিচলিত হইয়াছ, একটা ঘুমের বড়ি খাইয়া ঘুমাইয়া পড়। আমি একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনি। সে চলিয়া যাইবার পরই আমি সেই হোটেলটি ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম আর একটা হোটেলে। সেই হইতেই নয়নের সহিত আমার ছাড়াছাড়ি। আমি জানি না নয়ন এখন কোথায়। আমি দীর্ঘ ছুটি লইয়া আসিয়াছিলাম। কলিকাতাতেই আত্মগোপন করিয়াছিলাম এতদিন। একটি নার্সিংহোমের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিছুদিন আগে সেখানে আমি একটি মৃত-সন্তান প্রসব করিয়াছি। আমার ছুটিও ফুরাইয়াছে, এবার দেশে ফিরিব। নয়নকে এখনও আমি ভালবাসি। আমি বাকী জীবনটা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিব। আপনার বন্ধু যদি আবার আপনার কাছে আসে, এই চিঠিটি তাহাকে দেখাইবেন। তাহার বর্তমান ঠিকানা জানি না বলিয়াই আপনাকে এই পত্র দিলাম। আপনি নয়নের বন্ধু। সে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে। তাহার বর্তমান ঠিকানা যদি জানা থাকে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন। পুনরায় আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

লিসা

পত্রটি পড়িয়া উপানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। লিসার জন্য তাঁহার দুঃখ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হইল। তিনিও তো শীর্ষার প্রেমে পড়িয়াছেন। এ প্রেমকে প্লেটোনিক প্রেম বলা যায়? সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। না, না, নিশ্চয় নয়। তিনি শীর্ষাকে সর্বতোভাবে চান। রবীন্দ্রনাথের লেখা একটা কবিতার লাইন মনে পড়িল, 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে'। তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন, কালই তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাছে প্রস্তাবটা করিবেন। ইহাতে তো দোষের কিছু নাই। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার পালটি-ঘর। বাবারও বন্ধু সে। উপানন্দ হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং পিয়ানোতে একটা উদ্দাম গৎ বাজাইতে লাগিলেন। মনে হইল যেন আনন্দের ঝড় বহিতেছে। বাহিরে বগি-গাড়ি আসিয়া থামিল। হরিশ্চন্দ্র গাড়ি হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই থামিয়া গেলেন। উপানন্দ তন্ময় হইয়া বাজাইয়া চলিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, সে যেন মর্ত্যলোকে নাই, অন্য কোনও লোকে চলিয়া গিয়াছে।

'উপা।'

পিয়ানো বন্ধ হইয়া গেল, উপানন্দ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন হরিশ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন।

'তুই না খেয়ে চলে এলি কেন? মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। খাবি চল, মা বসে আছেন?'

উপানন্দ বিহ্বল দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন হরিশ্চন্দ্রের দিকে। তাহার পর বলিলেন, 'বোস, যাচ্ছি।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে!'

'তুমি বোস না।'

হরিশ্চন্দ্র একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। উপানন্দ বলিলেন, 'তোমার কাছে আমি একটা ভিক্ষে চাইছি। দেবে বল?'

'তোকে তো আমার অদেয় কিছু নেই। সবই তো দিয়েছি তোকে। তোর সব রকম খেয়ালই তো মিটিয়েছি। আবার কি চাই?'

'আমি শীর্ষাকে বিয়ে করতে চাই। আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি।'

কথাটা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র নির্বাক হইয়া গেলেন। ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, উপানন্দ কখনও কোন নারীর মোহে পড়িবে না। তিনি নির্বাক হইয়াই রহিলেন।

উপানন্দ বলিলেন, 'চুপ করে আছো কেন?'

'অবাক হয়ে গেছি। তোর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করি নি। হঠাৎ তোর এ মতিচ্ছন্ন কেন?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো, আমি শিল্পী, আমি সুন্দরের উপাসক। মনের মত মেয়ে পেলে অনেক আগেই আমি বিয়ে করতাম, কিন্তু পাই নি। আজ সে নিজেই এসেছে আমার কাছে, আমার প্রাণে প্রথম একটি সুর সে নিজের অজ্ঞাতসারেই বাজিয়েছে, যা আর কেউ বাজাতে পারে নি, যা আমাকে পাগল করে দিয়েছে।'

হরিশ্চন্দ্র কেবল বলিলেন, 'তোর সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। ভাবতে পারি নি যে অসুর হঠাৎ হাড়গিলে পাখি হয়ে যাবে।'

'আমাকে যত খুশি গাল দাও, কিন্তু সত্যকে আমি অস্বীকার করতে পারব না। তোমার কাছে আমি গোপনও করতে পারব না। তুমি আমাকে বল, তুমি অনুমতি দেবে কিনা?'

'তোকে অদেয় আমার কিছু নেই সে তো আগেই বলেছি। কিন্তু প্রথমে মায়ের অনুমতি নিতে হবে, তারপর জানতে হবে শীর্ষার এতে মত আছে কিনা?'

'বেশ চল, মায়ের অনুমতি এখনি চেয়ে নিচ্ছি। শীর্ষা কি জেগে আছে?'

'না। মা তাকে খাইয়ে দিয়েছে। সে এখন বোধহয় ঘুমুচ্ছে।'

'বেশ, তার সম্মতিটা কাল তুমি জেনে নিও। সে যদি সম্মতি দেয় তাহলে তাকে কাল আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।'

'সে তোর বাড়িতে আসতে চাইবে না। আমার আর-একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানিস?'

'কি?'

'শীর্ষাকে বিয়ে করে তুই একটা সুড়ঙ্গ কাটতে চাইছিস। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে যন্ত্র-সভ্যতাকে ঢুকিয়ে দিবি আমাদের জমিদারির মধ্যে।'

'আরে না, না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি। অনেকদিন আগেই তোর মনে হয়েছে যে ইলেকট্রিসিটি তোদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। আমার কিন্তু তা মনে হয় নি। তুই সুযোগ পেলেই এ নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিস। শীর্ষা আসতে না আসতেই তোর মনে হয়েছে, ইলেকট্রিসিটির অভাবে ওই স্বর্গের মন্দার কুসুম শুকিয়ে যাবে, তাই তাড়াহুড়ো করে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছিস তার ঘরে। সে কিন্তু সত্যিই ভাল মেয়ে। ফ্যান চালায় নি।'

'কেন সব বাজে কথা বলছো। এ বিয়েতে তোমার মত আছে কিনা, এ বিয়েতে তুমি সুখী হবে কিনা, সেইটেই বল?'

'আমার অমত হবে কেন? তোর চেয়ে ভাল পাত্র কি পৃথিবীতে আছে? ওরা যদি আপত্তি না করে, এ বিয়ে হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, যে আদর্শকে আমি সারা জীবন আঁকড়ে ধরে আছি সেটা চুরমার হয়ে যাবে। যন্ত্র এবং যন্ত্র-চালকরা খেটে খাওয়া গরীবদের হাতের কাজ কেড়ে নেবে, স্বাধীনতা কেড়ে নেবে, তারা সবাই যন্ত্রের দাস হয়ে যাবে।'

'আবার তুমি বাজে বকবক শুরু করলে। এটা দেখছি তোমার ম্যানিয়া হয়ে

দাঁড়িয়েছে। বাড়ি চল, মা অপেক্ষা করে বসে আছেন।'

হরিশ্চন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না। উপানন্দ লক্ষ্য করিলেন, তাহার চক্ষু দুইটি আবার সজল হইয়া আসিয়াছে।

কনকলতা অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন।

তাঁহাদের দেখিয়া বলিলেন, 'দুই বন্ধুর ঝগড়া মিটল ? কত রাত করলি বলতো ? আর দেরি নয়, খেতে বসে যা।'

দুইজনে খাইতে বসিলেন। হরিশ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, শীর্ষা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?'

'পড়েছে বোধ হয়।'

উপানন্দ নীরবে খাইতেছিলেন। একটি কথাও বলেন নাই। হরিশ্চন্দ্রই কথাটা পাড়িলেন।

'উপা একটা অদ্ভুত আবদার করেছে। ভেবে দেখ, তুমি রাজি হবে কিনা ?'

'কি আবদার ?'

'ও শীর্ষাকে বিয়ে করতে চায়। তাকে নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে! এখন তোমার মত আছে এতে ?'

কনকলতাও ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'ভালই তো, ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে, উপার মত পাত্র কোথায় পাব আমরা ? তবে এ বিষয়ে শীর্ষার মতটাও নেওয়া উচিত। মেয়েটি খুব ভাল, আর হাব-ভাবে যতটা বুঝেছি উপাকে ও খুব ভক্তি করে। কাল বলছিল, আমি ওর মত গুণী দেখি নি। উনি যদি পাড়াগাঁয়ে না থেকে কোনও বড় শহরে থাকতেন, ভারত-জোড়া নাম হত ওঁর। আমি বললাম, ও গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবে না।'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'তবু তুমি ওকে জিগ্যেস কোরো একবার।'

'করব।'

'উপা বলছে, ওর যদি মত থাকে তাহলে ওর সঙ্গেও একা একটু কথা বলতে চায়। ও কি রাজি হবে, ও তো উপাকে এড়িয়ে বেড়াতে চায়। সন্ধ্যোবেলা আমাদের গানের আসরে একেবারে চুপ করে বসে থাকে। উপার বাজনা তন্ময় হয়ে শোনে। ও নিজেও কম বড় গুণী নয়, কিন্তু ওর কোনও আস্ফালন নেই।'

কনকলতা বলিলেন, 'ও তো উপার বাড়িতে যায় নি একদিনও। গিয়ে দেখে আসুক না একদিন। তাতে দোষটা কি আছে ?'

উপানন্দ বলিলেন, 'আমি শুধু জানতে চাই, ও সত্যি আমাকে বিয়ে করতে চায় কিনা। ও যেন না মনে করে, আমরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করছি।'

'বেশ, ওকে বলব। আমি না হয় ওর সঙ্গে যাব।'

'যেও।'

উপানন্দ খাওয়া শেষ করিয়া যখন বাড়ি চলিয়া গেল তখন হরিশ্চন্দ্র কনকলতাকে বলিলেন, 'মা, আমি তোমার ঘাড়ে আর-একটা বোঝা চাপিয়ে দিলাম।'

'কি বোঝা ?'

'শীর্ষাকে...'

'তুই যদি বিয়ে করতিস তোর ছেলেপুলে হত না ? শীর্ষা কি বোঝা ? ও তো অলঙ্কার। ও তোর দাদার মেয়ে। রূপে গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী, যেন এক দেহে এসেছে

আমাদের বাড়িতে। আর ও যদি অত ভাল না হত তাহলেই বা কি ? তোর দাদার মেয়ের ভারকে আমি বোঝা মনে করতুম ? তুই যখন ছোট ছিলি তখন এ সংসারের ভার আমি নিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব সে ভার আমাকে বইতে হবে। তুই শুগে যা, অনেক রাত হয়েছে। আমি এখনি গিয়ে মশারি গুঁজে দিচ্ছি।'

পরদিন সকালে এক কান্ড হইল। হই-চই পড়িয়া গেল চারিদিকে। আগ্রা হইতে ধবধবে শাদা প্রকান্ড একখানা 'বুইক' গাড়ি আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। চাপ দাড়িওলা পাঞ্জাবী ড্রাইভার সেলাম করিয়া হরিশ্চন্দ্রের হাতে ইমনবাইজীর একটি পত্র দিল। পত্রটি বড় বড় অক্ষরে বাংলায় লেখা :

হরিশ্চন্দ্রবাবু, আমার নমস্কার জানিবেন। নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। শীর্ষার গাড়িটি তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। আমার প্রয়োজন নাই। আমি আজকাল কোথাও যাই না। বাড়িতেই থাকি।

গাড়িটা শীর্ষাই পছন্দ করিয়া কিনিয়াছিল। তাহাকেই পাঠাইয়া দিলাম। আশা করি সে ভাল আছে। তাহাকে মাঝে মাঝে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। উপানন্দবাবুকেও আমার নমস্কার জানাইবেন। তিনি একজন মস্ত গুণী লোক। সেতারে অমন দরবারি কানাড়া আগে কোথাও শুনি নাই। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। শীর্ষা-মাকে আশীর্বাদ পাঠাইলাম। সে যেন আমাকে চিঠি লেখে। ইতি—

আপনাদের ইমন

হরিশ্চন্দ্র ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ড্রাইভার সাহেব, আপনি থাকবেন তো ?'

'হাঁ, জরুর। শীর্ষা-মাই যেত্না দিন রাখ্খে গি উনকি সেবা করুঙ্গা।'

হরিশ্চন্দ্র উপানন্দকে একটি ছোট পত্র লিখিলেন :

'উপা, ইমনবাইজী এই গাড়িটি পাঠিয়েছেন। গাড়িটি নাকি শীর্ষার—তোর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মোটর গাড়ি রাখবার গ্যারেজ নেই। ও বিষয়ে আমি কিছু বুঝিও না। তুই এটা রাখবার ব্যবস্থা কর। আমি মাঠে চললাম। মাঠ থেকে তোর ওখানে যাব। তুই বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করিস সন্ধ্যার সময়।'

শীর্ষা একটু বিব্রত হইল। কনকলতাকে বলিল, 'মায়ের কান্ড দেখুন। আমি তাকেই গাড়িখানা দিয়েছিলাম। তিনি আবার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তোমার সখের জিনিস, তাই পাঠিয়েছেন। থাক এখন। উপার সঙ্গে তোমার বিয়েতে যখন আপত্তি নেই, তখন চল, উপার বাড়ি একটু ঘুরে আসি। সে তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছিল। হয়তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'না, সে আমার ভারি লজ্জা করবে ঠাকুমা।'

'এতে লজ্জার কি আছে ? উপা হয়তো তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। চল যাই। টহলকে বলি, আমাদের গাড়িটা জুড়ে নিয়ে আসুক এখুনি।'

'আমার কিন্তু বড্ড লজ্জা করছে ঠাকুমা।'

'কিসের লজ্জা ? আমাদে দেশে মেয়েরা আগে থাকতে শবশুর বাড়ি দেখবার সুযোগ পায় না। তুমি ভাগ্যবতী। সে সুযোগ পেয়েছ, যাবে না কেন ? তা ছাড়া যে তোমার স্বামী হবে সে-ই যখন ডেকেছে তোমাকে, যাবে না কেন ? চল।'

শীর্ষাকে লইয়া কনকলতা যখন উপানন্দের বাড়িতে পৌঁছাইলেন তখন উপানন্দ একটি

প্যাস্টেল স্কেচ লইয়া মগ্ন ছিলেন। মুখ আঁকিতে ছিলেন একটা। শীর্ষারই মুখ। বগি-গাড়ি হইতে নামিয়া কনকলতাই প্রথমে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পিছনে সঙ্কুচিতা শীর্ষা।

'কই রে উপা, কোথায় তুই ?'

'এই যে মা।'

শীর্ষা উপানন্দকে প্রণাম করিল। কনকলতা ছবিখানার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উপানন্দ বলিলেন, 'তোমার নাতনীর ছবিই আঁকছিলাম, কেমন হয়েছে ?'

'চমৎকার হয়েছে। আমি তোর বাগানটা একটু ঘুরে দেখি। তুই যে ওকে কি জিজ্ঞেস করবি ?'

পাশের দ্বার দিয়া কনকলতা বাহির হইয়া বাগানে নামিয়া পড়িলেন। উপানন্দ হাসিয়া বলিলেন, 'বোস।'

শীর্ষা সামনের চেয়ারটায় বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সঙ্কোচে এবং লজ্জায় তাঁহার সর্বাঙ্গে আর-একটা যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহা শীর্ষা বাইজীর অঙ্গে আগে কখনও ফোটে নাই। উপানন্দ পাশের তাক হইতে খুব ছোট একটা ক্যামেরা পাড়িয়া খুচ করিয়া একটা ফোটো তুলিয়া লইলেন। শব্দ শুনিয়া শীর্ষা মুখ তুলিল।

'তোমার প্রথম আগমনের ছবিটা তুলে রাখলাম।'

শীর্ষা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আমায় আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন কি ?'

'হ্যাঁ। দুটি প্রশ্ন। সত্য উত্তর দিও। প্রথম প্রশ্ন—আমাকে তোমার সত্যিই ভাল লেগেছে কি ?'

শীর্ষা আনত মস্তকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিল, 'লেগেছে।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। তুমি বাইজী ছিলে। তোমাকে কেউ প্রণয় নিবেদন করেছিল কি ?'

'অনেকে করেছিল।'

'তুমি কি তাদের মধ্যে কাউকে ভালবেসেছিলে ?'

'না। আমি কারো চিঠির জবাব দিতাম না। কোন পুরুষকে আমার বাড়িতে ঢুকতে দিতাম না। আমার বাড়ির গেটে কিরিচধারী গুর্খা পাহারা দিত।'

উপানন্দ বলিলেন, 'তুমিও ইচ্ছে করলে আমাকে অতীত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার।'

শীর্ষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'না, প্রয়োজন নেই।'

'কেন ?'

শীর্ষা কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'আমার জানবার দরকার নেই। আমি অদৃষ্টকে মানি।'

কনকলতা প্রবেশ করিলেন।

'তোমাদের কথা হল ?'

'হয়েছে।'

'তবে চল, এবার বাড়ি যাই। ও বেলা তোদের জন্যে ছানার পোলাও করব। তার আয়োজন করতে হবে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'আজ হরিশ্চন্দ্র এখানেই আসবে। এখান থেকে আমরা যাব। হয়তো দেরি হবে একটু।'

শীর্ষাকে লইয়া কনকলতা চলিয়া গেলেন।

হরিশ্চন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, উপানন্দ বেহালা বাজাইতেছেন। হরিশ্চন্দ্র আসিতেই উপানন্দ তাহা থামাইয়া দিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, হরিশ্চন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল।

'তোমার মুখ আজ বেশ হাসিখুশী দেখছি যে?'

'হ্যাঁ, মাঠে কাজ করতে করতে একটু আগে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। আসবামাত্রই সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে গেছে।'

'কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত?'

'তোর বিয়ের বিষয়ে।'

'কি সিদ্ধান্ত?'

'তোদের বিয়েতে কোন খুঁত রাখবনা।'

'খুঁত মানে?'

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতায় আছে—'যা চেয়েছ তার বেশী কিছু দিব, বেণীর সঙ্গে মাথা।'

হরিশ্চন্দ্র খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'হেঁয়ালি ভেঙে বল, বুঝতে পারছি না। বেণীটা কি, আর মাথাটাই বা কি?'

'বেণী হচ্ছে আমার ভাইঝি শীর্ষা, আর মাথাটা হচ্ছে আমার প্রিন্সিপল্ (Principle) আমার আদর্শ, তোরা যাকে বলিস আমার পাগলামি, আমার গোঁয়ার্তুমি, আমার সেকেলে মনোভাব। আমি ঠিক করলাম, আমার বাড়ি ইলেকট্রিফায়েড করে সেই ইলেকট্রিসিটির আলোয় তোদের বিয়ে দেব। যে মণ্ডপে শীর্ষা গান গেয়েছিল, সেই মণ্ডপটা এখনও আছে। সেটা নানা রঙের 'বাল্‌ব' দিয়ে সাজিয়ে দেব। সেইখানেই তাকে তোর হাতে সম্প্রদান করব আমি। তোর বাড়িতে যে 'জেনারেটার' (Generator) আছে সেটার শক্তি কত? তা দিয়ে কি হবে?'

'সেটা খুবই শক্তিশালী। সমস্ত মুগ-মটর গ্রামকে ইলেকট্রিফাই করে দিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই কিনেছিলাম ওটা। কিন্তু তুমি বাধা দিলে।'

'না, আর বাধা দেব না। আমি মাঠে বসে ভেবে দেখলাম, তোমাদের সুখের অন্তরায় হয়ে আমি সুখী হতে পারব না। তাই ঠিক করলাম, ওরা যদি সুখী হয়, আসুক না আমার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা, আমাদের বাড়ি ইলেকট্রিফাই করতে ক'দিন সময় লাগবে?'

'তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত আমি তো কারেণ্ট নিয়ে গেছি, আমার মনে হয়, মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। শহর থেকে কিছু মালপত্র আনাতে হবে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিও আনাতে হবে ক'জন।'

'সব ব্যবস্থা করে ফেল। মাসখানেক পরেই বিয়ে হবে।'

উপানন্দ বলিলেন, 'এতো তাড়াহুড়ো করছো কেন?'

'ইলেকট্রিক আলোতে আমাদের বাড়ি যখন ঝলমল করবে, তখন সেই বাড়িতে বিয়ে হবে তোর। তাড়াহুড়ো করতে হবে বইকি। আমি এখন আর বসব না, বাড়ি চললুম। তুই এখনই মিস্ত্রির জন্যে লোক পাঠা।'

'কিছু খাবে না? গুড়ের শরবৎ করতে বলব?'

'না। আমি এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করব, তোকে সুসংবাদটা দিতে এসেছিলাম।'

হরিশ্চন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। উপানন্দ লক্ষ্য করিলেন, হরিশ্চন্দ্রের চোখে অশ্রু টলমল করিতেছে।

॥ ৭ ॥

টাকা খরচ করিলে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। শহর হইতে বড় বড় ট্রাকে চড়িয়া বহু মিস্ত্রি সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল এবং এক মাসের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রের প্রকাণ্ড বাড়িকে বিদ্যুৎতারিত করিয়া ফেলিল। গানের মণ্ডপটি নানা রঙের বিদ্যুতের আলোকে সাজিয়া সত্যই অপরূপ হইয়া উঠিল। সেইখানেই হরিশ্চন্দ্র শীর্ষাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুরকম বাজনা-বাদ্দ্যি, বহু লোক ভুরিভোজন করিলেন, বহু আতসবাজি পুড়িল, বহু দরিদ্র পেট ভরিয়া সুখাদ্য খাইল, নূতন কাপড়-জামা উপহার পাইল। আগ্রা হইতে ইমনবাঈও আসিলেন। কোথাও কিছু ত্রুটি রহিল না। উপানন্দের বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন সকালে কিন্তু হরিশ্চন্দ্রকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল তাঁহার ঘরে এই চিঠিটি:

উপানন্দ,

তোমার ভালবাসার পাত্রী, আমার দাদার মেয়ে শীর্ষাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হলাম। এবার আমি আমার ভালবাসার লোকেদের কাছে চললাম। তারা দরিদ্র, তারা অসহায়, তাদের নানারকম দোষ আছে। বর্তমান বিলাসিতার যুগে তারা বঞ্চিত, লুব্ধ, অনেকে চরিত্রহীন, অনেকে চোর। তবু তাদেরই আমি ভালবাসি, কারণ তারা বড় অসহায়, অথচ তারাই আমাদের দেশের লোক। আমি তাদের মঙ্গলের জন্যেই এতদিন চেষ্টা করেছি, পারি নি, কারণ আমি বিলাসের মধ্যে ছিলাম, তাই তাদের সম্মান পেয়েছি, ভালবাসা পাই নি। সর্বস্ব ত্যাগ করে তাই তাদের কাছেই চললাম। তাদের মধ্যে বাস করব, তাদের সঙ্গেই খেটে খাব। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না, আমি আর ফিরব না। তোমরা যন্ত্র-সভ্যতার বিলাসে সুখে থাকো। মাকে আমার শতকোটি প্রণাম দিও। তিনি জীবনে অনেক শোক সহ্য করেছেন, আমার শোকও সহ্য করতে পারবেন, কারণ তিনি সর্বস্নেহা মা। ইতি—

হরিশ্চন্দ্র

नौ

লী শব্দটির মানে, মিলন। মিলনের কথাই লিখব আজ। নতুন করে মিলন,—যে মিলনে দেহের স্থান নেই—সেই মিলন।

ফাটা বুক থেকে ফিনিক্ দিয়ে রক্ত পড়ে, ফাটা মেঘ থেকে ফিনিক্ দিয়ে আলো বেরোয়, ফাটা স্মৃতি থেকে যা বেরুচ্ছে তাই দিয়ে তাকে নূতন করে সৃষ্টি করবার প্রয়াস করছি। পারব কি?

মনের ভিতর থেকে নীরবে সে উত্তর দিল—'পারবে না। আমাকে যতদিন পার মনে রেখো।'

'মনে তো রাখবই। আপনি মনে থাকবে, তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না। কিন্তু যাকে মনে রেখেছি, সে তুমি তো আর নেই। তোমাকে নূতন করে সৃষ্টি করতে হবে। সে সৃষ্টিকে যম কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তা আমার সঙ্গে সহমরণে যাবে।'

তার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম। তবু এল না কোনও সাড়া।

চুপ করে বসেই রইলাম খোলা ছাতে আকাশের দিকে চেয়ে। একটা কাক ডাকছে। অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে। কাকে ডাকছে? ওরও সঙ্গিনী হারিয়ে গেছে নাকি? আমার চিন্তাধারা বাধা পেল সহসা। এল একটা হলদে প্রজাপতি। বসল না কোথাও, উড়তে উড়তে চলে গেল। মনের মধ্যে রেখে গেল কিন্তু তাঁর বাসন্তী রংটা। আর তার সঙ্গে একটা শাড়ি আর নরেন মুখুজ্যেকে, যাঁর পত্রিকায় লেখার জন্য দক্ষিণা পেয়েছিলাম বলেই শাড়িটা কেনা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ওরা কেউ এখন নেই।

না, নেই।

কেউ থাকবে না।

তবু থাকবে।

তাদের সৌরভ ঘুরে বেড়াবে আকাশে বাতাসে। চেনা লোকদের মনে স্মৃতির সৌরভ ছড়াবে। অচেনা লোকেরাও সে সৌরভে হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠবে। বুঝতে পারবে না কেন এ পুলক।

নরেনবাবুর একটা কথা মনে পড়ছে।

'তোমার এ বইটা যদি আগে লিখতে তাহলে আমার খুব সুবিধে হত। স্ত্রীকে চিঠি লেখার জন্য অত গলদঘর্ম হতে হত না। তোমার চিঠিগুলিই একটু অদলবদল করে টুকে দিতাম।'

যাকে ওই চিঠিগুলি লিখেছিলাম সে আজ নেই।

হঠাৎ বাঁ হাতটা সুড়সুড় করে উঠল। চেয়ে দেখি—এ কি কান্ড! এ কখন নীরবে এসে বসে আছে আমার হাতের উপর। সর্বাঙ্গে সবুজ মখমল। তার উপর দু'পাশে কালো বড়

বড় ফুটকি। ফুটকি নয়, যেন চোখ। সর্বাংগ দিয়ে দেখছে যেন আমাকে। কখন চুপি চুপি আমার গায়ে উঠে বসে আছে, জানতেও পারি নি। গুটিপোকা? গুটিপোকার গায়ে এত রূপ? এ যেন একটা অপূর্ব কবিতা। শুনেছি গুটিপোকারা গাছে থাকে, গাছের পাতা খায়। আমার কাছে এসেছে কিসের আশায়? মনে হল একটা মূক প্রত্যাশা যেন মূর্ত হয়ে প্রতীক্ষা করছে—সহসা মনে হল তাহলে কি—শিউরে উঠল সর্বাংগ। ইচ্ছে হল গুটিপোকাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরি। হাত তুলতেই পড়ে গেল নীচে, সংগে সংগে একটা কাক ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল তাকে। সামনের একটা গাছের ডালে বসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। অমন একটা সুন্দর কবিতাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল আমার চোখের সামনে। ও কতটুকু সময় আমার হাতের ওপর ছিল, তবু খুব কষ্ট হতে লাগল। তাকে মনে পড়ল। তাকে খাট থেকে নামিয়ে বার করে নিয়ে গিয়েছিল যখন, তখন যে রকম কষ্ট হয়েছিল অনেকটা সেই রকম কষ্টই ভোগ করছি এখন। মনে হচ্ছে আমার জীবনে আর একটা সবুজ স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল। ওর সংগে তার কোথায় যেন মিল ছিল একটা।

কাকটা উড়ে গেল।

চুপ করে বসে আছি আকাশের দিকে চেয়ে। একটা স্তূপ মেঘ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। ছিল পাহাড়ের মত, এখন হয়েছে বিরাট একটা মুখ। নাথানিয়াল হথর্নের The Great Mountain Face গল্পটা মনে পড়ছে! সে-ই গল্পটা পড়িয়েছিল আমাকে। যেখানে যা ভাল তার চোখে পড়ত আমাকে দেখাত সেটা। আমি বই কিনতাম অনেক। পেতামও। সব কিন্তু পড়া সম্ভব হত না আমার পক্ষে। সে কিন্তু সব পড়ত। ভাল লাগলে আমাকে পড়তে বলত। স্তূপ মেঘের ওই বিরাট মুখটা তার স্মৃতিকে সজীব করে তুলেছে আমার মনে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

পাশের ঘরে দেখি আলো জ্বলছে।

"তুমি এখনও পড়ছ?"

'এই যে হয়ে গেল, যাচ্ছি—'

খানিকক্ষণ পরে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

আজ কোথায় তোমার সেই হাত? চিতায় পুড়ে গেছে? বিশ্বাস হয় না। পক্ষাঘাত হয়েছিল তোমার? বিশ্বাস হয় না। তোমার মৃণাল বাহুর সে স্পর্শ এখনও যে আমায় বেষ্টন করে আছে।

...বিরাট মুখ আর নেই। বিরাট সমুদ্রে পরিণত হয়েছে, তরংগসমাকুল বিশাল সাগর।

আকাশের নীল মিশেছে মেঘের ফ্যানার সংগে। মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে বসে পুরীর সমুদ্র দেখছি। হ্যাঁ, পুরীর সমুদ্রই মূর্তি পরিগ্রহ করেছে চোখের সামনে। মূর্ত হয়ে উঠল আর একটা ছবি মানসপটে। অতীতের যবনিকা কে যেন সরিয়ে দিলে...পুরীর সমুদ্রের ধারে সরকারী যে ডাক-বাংলোটা আছে তারই বারান্দায় বসে আছি। তখন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী। তিনি আমাদের উড়িষ্যা ভ্রমণের জন্য একটা বাস দিয়েছিলেন। তাঁর স্টেনো সস্ত্রীক ছিলেন আমাদের সংগে।

সমুদ্রে জেলেরা মাছ ধরছিল। অনেক জেলে নৌকা ভিড়িয়ে মাছ বিক্রিও করছিল। চল, আমরাও গিয়ে মাছ দেখি—'

ভাল মাছ প্রলুব্ধ করেছে বরাবর।

'চল।'

সে-ও উৎসাহে উঠে পড়ল।

ঘুরে ঘুরে কয়েক রকম সামুদ্রিক মাছ কিনলাম।

মাছ নিয়ে ফিরলাম যখন, তখন স্টেনো বললেন, 'এত মাছ কিনলেন কেন ?'

'সবাই মিলে খাওয়া যাবে। সঙ্গে তো বেশ ভাল রাঁধুনী আছে—'

স্টেনো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আড়ালে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে এসে বললেন, 'পুরীতে এসে আগে জগন্নাথদেবের প্রসাদ খেতে হয়। আমি ফোনে আমাদের সকলের জন্য 'কণিকা' প্রসাদ বুক করেছি। এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আমাদের রাঁধুনী বুদ্ধ বলল, 'এখুনি রান্না করে খেলে এ মাছের যে স্বাদ পেতেন, ও বেলায় তা আর পাবেন না।'

আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হলাম। সে কিন্তু বলল, 'না, আগে ঠাকুরের ভোগ খাব। যেখানকার যা নিয়ম তা মানতে হবে—'

আবার আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম দুজনে মিলে। তার কোঁচড় আর আমার পকেট ভরে গেল। তার সে কি উৎসাহ!

বহু ঝিনুক নিয়ে আমরা যখন ফিরলাম তখন দেড়টা বাজে। স্টেনো কিন্তু তখনও ফেরেন নি। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। তিনি ফিরলেন আরও একঘণ্টা পরে। ভোগ নিয়ে নয়, বাজার করে। বললেন, একজন অচ্ছুত নাকি ভোগ দেখে ফেলেছিল, সে ভোগ আর জগন্নাথদেবকে দেওয়া যাবে না। আবার ভোগ চড়ানো হচ্ছে। তা নামতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তারপর তা জগন্নাথকে দেওয়া হবে।

সে বললে, 'আমি উপবাস করে থাকতে পারব। দ্বিতীয়বার ভোগ হোক, তখন খাব—

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আমি পারব না।'

স্টেনো বললেন, 'আমিও পারব না!' আবার তিনি আড়ালে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বললেন, 'উনি বলছেন, ভোগ যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন জগন্নাথদেবের ইচ্ছে নয় যে আমরা ও ভোগ খাই। মন্দির থেকে জগন্নাথদেবের প্রসাদী কোন মিষ্টান্ন এনে আমরা খাই। তারপর এখানে রান্না হোক।' তাই হল। বুদ্ধ মহা উৎসাহে রান্না করতে লেগে পড়ল। একটু পরেই আমরা মাছ-ভাজা আর মাছের ঝাল দিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে ভাত খেলাম। মনে মনে প্রণাম করলাম জগন্নাথদেবকে আমার মত লোভীর মনের কথা তিনি শুনেছেন বলে।

সে কিন্তু খেতে চায় নি। বলেছিল, 'দ্বিতীয়বার ভোগ রান্না হোক, তারপর খাব। কয়েক ঘণ্টা উপোষ করে থাকা কি এমন শক্ত।'

স্টেনো বললেন, 'ভোগ দিতে আজ অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। আমি জগন্নাথদেবের প্রসাদী পেঁড়া তো এনেছি—'

সে রাজী হল, কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগল মনে মনে। তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম সেটা। বলল—'আপত্তি করছ কেন ?'

'হয়তো অমঙ্গল হবে।'

'কি অমঙ্গল ?'

'তা তো জানা নেই। তাই অস্বস্তিটা বেশী।'

তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম এই অনির্দিষ্ট অস্বস্তিটা একটা আশংকাকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মনে। এই তার স্বভাব ছিল।একটা অজানা ভয়, অজানা দুশ্চিন্তা সর্বদা তার মনকে আকুল করে রাখত। সে শনিবার দিন কাউকে কোথাও যেতে দিত না, বৃহস্পতিবারের বারবেলাতেও না। তার মন সর্বক্ষণ সকলকে যেন আগলে আগলে বেড়াত।

হঠাৎ আমার মনটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আর সেই কুয়াশার ভিতর থেকে উঠতে লাগল একটা আর্ত জিজ্ঞাসা—তুমি এখন কোথায় আছ, তুমি এখন কোথায় আছ, তুমি এখন কোথায় আছ, তুমি এখন কোথায় আছ, কোথায় কোথায় কোথায় ?

কুয়াশায় ঢেকে গেল সব।

চুপ করে বসে রইলাম।

লোকের যেমন ফিট হয়, তার মৃত্যুর পর থেকে আমি মাঝে মাঝে এই রকম কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আর সেই কুয়াশার ভিতর থেকে একটা প্রশ্নই কে যেন বার বার করতে থাকে যে প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, যে প্রশ্ন অসহায় হৃদয়ের অতল থেকে উৎসের মত আকাশের দিকে যেতে চায়, কিন্তু যেতে পারে না, হারিয়ে যায় ওই কুয়াশায়। ওই কুয়াশা আমার অতি সীমিত বুদ্ধির কুয়াশা। কিন্তু প্রশ্নটা হারিয়ে যাবার আগে যেন মূর্তি ধরে ছটফট করে বাণ-বিদ্ধ পাখীর মত। আর সেটা যেন আমি দেখি! না, ঠিক আমি নই, আমার আর একটা সত্তা যেন।

আকাশে সাদা মেঘের স্তূপ আর নেই। বিরাট একটা চাদর কে যেন আকাশে বিছিয়ে দিয়েছে। সাদা চাদর নয়, সোনালি চাদর। তার থেকে সোনালি আভা বেরুচ্ছে। দূরে একটা ঘুঘু ডাকছে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে যেন। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবেশটা আতরের গন্ধে ভরে উঠল। চারিদিকে কে যেন খস্ আতর ছড়িয়ে দিলে।

বুঝলাম ইলোরা এসেছে। ইলোরা এলে খস্ আতরের গন্ধ ছাড়ে। এদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কাহিনীটা অদ্ভুত।

সে যখন চলে গেল তখন আমার মনের অবস্থা যা হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। মনে হচ্ছিল না আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল যে ভূমির উপর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তা যেন পায়ের তলা থেকে সরে গেছে, আমি যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। একদিন রাত্রে কিন্তু হঠাৎ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। আমি জেগে ছিলাম না তন্দ্রার ঘোরে ছিলাম তা জানি না। দেখলাম দুটি অপরূপ সুন্দরী আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

'আপনারা কে—'

'আমাদের নাম নেই। পূর্বজন্মে আপনার স্ত্রীর বন্ধু ছিলাম। এখন আমরা আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়াই। আপনাদের কিন্তু সব খবর রাখি আমরা—'

'আপনাদের তো আগে কখনও দেখি নি'

'আমাদের দেখা যায় না। আমরা অশরীরী। আপনাকে দেখা দেব বলেই শরীর ধারণ করেছি। শরীর ধারণ করে থাকতে কষ্ট হয়।'

'কি করেন আপনারা ?'

'যেখানে যা কিছু সুন্দর জিনিস পাই তা সংগ্রহ করি। যেখানে যত শিল্পী আছেন তাঁরা মনে মনে যা সৃষ্টি করেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না, তাঁদের সেই অপ্রকাশিত সৃষ্টিও সংগ্রহ করি আমরা। এ সংগ্রহ পৃথিবীর কোনও সংগ্রহশালায় নেই, আমাদের কাছে আছে। আপনি একটু আগে চমৎকার একটা সৃষ্টি করেছেন। মনে মনে করেছেন, বাইরে সে ছবি কোথাও নেই। দেখবেন ?' সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে গেল তারা। দেখলাম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা দুর্দান্ত বলিষ্ঠ কালো লোক জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে চীৎকার করছে—আমি যাব না, যাব না, যাব না, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এদের ছেড়ে যেতে পারব না—

আর দূর থেকে ভেসে আসছে শ্রীশ্রীদুর্গা, তারক-ব্রহ্ম-নারায়ণ, নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে—

আমি যাব না—যাব না, যাব না—যাব না।

কিন্তু লোকটা নিয়ে চলে গেল তাকে। ছবি লুপ্ত হয়ে গেল।

আবার এসে দাঁড়াল মেয়ে দুটি

'এ ছবি আপনি সৃষ্টি করেছেন—আমরা সংগ্রহ করে রেখেছি।'

'আপনারা কোথা থাকেন—'

'আমাদের 'তুমি' বলুন। আমরা আপনার স্ত্রীর পূর্বজন্মের বান্ধবী ছিলাম। আমরা ওদের বাগানে প্রজাপতি ধরতে যেতাম। মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, আমরা কিন্তু ওকে ভুলিনি। আমরা কোথা থাকি বলছেন ? আমরা সর্বত্র থাকি। আমরা ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই। শিল্পীর মনের আকাশেও থাকি। তাদের অপ্রকাশিত সৃষ্টিগুলি কুড়িয়ে রাখি—'

চেয়ে দেখলাম আবার মেয়ে দুটির দিকে। দু'জনের মুখ একরকম। দু'জনেই আশ্চর্য রূপসী। মনে হয় যেন রক্ত-মাংসের দেহ নয়, স্বচ্ছ রঙের অপূর্ব সমন্বয় যেন ওরা।

তোমরা দুজন কিন্তু একরকম দেখতে—'

'আমরা দুজন যমজ ছিলাম। একসঙ্গেই আমাদের মৃত্যু হয়—'

'আমার কাছে হঠাৎ এলে যে—'

'প্রায়ই আসি আমরা। শিল্পীর মনের ভিতর যেতে ভারি ভাল লাগে। আমাদের বান্ধবী যখন বেঁচেছিল তখনও আসতাম। আজই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলাম। কিন্তু দেহ ধারণ করে থাকতে বড় কষ্ট হয়। আমরা এবার যখন আসব, গন্ধ হয়ে আসব।'

'কিন্তু আমি বুঝব কি করে কে এসেছ ?'

'আপনি আমাদের নামকরণ করুন। আমরা বলে দিচ্ছি—আমরা কে কোন গন্ধ হয়ে আসব।'

'বেশ, তোমার নাম থাক অজন্তা আর এর নাম ইলোরা'

'বাঃ, চমৎকার নাম হয়েছে। ইলোরা হবে খস্ আর আমি গোলাপী আতর।'

তারা অন্তর্ধান করবার পর আমি বিছানায় উঠে বসলাম। মনে হল—এ স্বপ্ন মায়া, না মতিভ্রম ?

তারপর তারা আর আসে নি, আজ এই সোনালি আলো খসের গন্ধে মম করছে। ইলোরাই এসেছে কি ?

'ইলোরা ?'

আমার মনের মধ্যেই উত্তর পেলাম।

'হ্যাঁ আমি ইলোরা। ঠিক চিনেছেন। এটি অপূর্ব সৃষ্টি আপনি করেছেন। সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই করেছেন। আমি কিন্তু সেটি কুড়িয়ে রেখেছি। জগন্নাথদেবকে আপনারা যখন প্রণাম করছিলেন তখন তার মনটি দেখতে পেয়েছিলেন আপনি। কল্পনায় তার মনের কথাগুলিও শুনেছিলেন। এই দেখুন।'

চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল একটি ছবি।

সে প্রণাম করছে জগন্নাথদেবকে। আর মনে মনে বলছে, 'তোমার প্রসাদ আগে না খেয়ে আমি অন্যায় করেছি ঠাকুর। কিন্তু ওদের সবার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। আর মনে হল ওঁর যদি পাপ হয়ে থাকে, আমারও হোক। ওর যদি এ জন্য শাস্তি হয়, আমারও হোক—'

তার মনের এই কথাগুলো আলো-ছায়ায় আঁকা আলপনার মত ভাসছে তরল জ্যোৎস্নার উপর। মনে হচ্ছে যেন একটি অপরূপ রোদন মূর্তি ধরেছে।

'আর একটি ছবি দেখবেন ?'

'দেখব—'

দেখলাম একটা হালকা মেঘ বায়ু-তাড়িত হয়ে ছুটোছুটি করছে। তারপর দেখলাম একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে আর সে একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি প্যাসেঞ্জারকে ডেকে ডেকে বলছে, 'বাবা আমার ছেলেরা কলকাতায় যাচ্ছে। আপনারা একটু দেখবেন ওদের। বড্ড ছেলে মানুষ তো—'

প্যাসেঞ্জাররা মুচকি হেসে আশ্বাস দিচ্ছে, 'কুছ্ ডরিয়ে নেহি মাইজি। হাম লোগ দেখ্-ভাল করংগে। আপ নিশ্চিন্ত্ রহিয়ে—'

খস্ আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল। একা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম ছাতে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর অনুভব করলাম অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। শুক্রগ্রহ জ্বল জ্বল করছে আকাশে।

মনে পড়ল আমরা দুজনে আকাশ-চর্চা করতাম রাত জেগে জেগে। তখন বই পড়ে জেনেছিলাম শুক্র একটি রহস্যময় গ্রহ। অত উজ্জ্বল কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়েও ওর ভিতরের খবর পাওয়া যায় না। একটা উজ্জ্বল বাষ্পের আবরণে ও নিজেকে ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ল একবার একটা ধূমকেতু দেখবার জন্য রাত্রি দুটোর সময় ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে উঠেছিলাম। কোথায় গেল সে সব দিন ? কোথায় গেল। কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন গেল—আবার কুয়াশা ঘনিয়ে এল মনের মধ্যে। কুয়াশার মধ্যে চীৎকার করতে লাগল প্রশ্নগুলো।'

'ঘরে যাও, ঠান্ডা লাগবে—'

ঠিক তার গলা।

কিন্তু সে নেই।

কেউ নেই।

॥ দুই ॥

তোমাকে আবার সৃষ্টি করব এই আমার পণ। কিন্তু সৃষ্টি করতে বসে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে। উপকরণ কই ? কি দিয়ে সৃষ্টি করব তোমাকে। তোমার সংগে যার সম্পর্ক নেই, সাদৃশ্য নেই, এমন কিছু আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। তোমার স্মৃতি, তোমার সম্বন্ধে আমার মোহ—এই তো আমার সম্বল।

আমার বাগানের শেষ প্রান্তে পেয়ারা গাছের সারিতে জোনাকির ঝাঁক যে নীরব উৎসব করছে, সেইদিকে চেয়ে বসে আছি। তোমার সংগে ওর মিল আছে। মৃত্যুর অন্ধকার তোমাকে গ্রাস করতে পারে নি। সহস্র স্মৃতির উজ্জ্বল বিন্দু টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। অন্ধকার মিথ্যা হয়ে যায় নি, পটভূমিকা হয়েছে ওই উজ্জ্বল আলোক বিন্দুগুলির। কিন্তু আমি অন্ধকারকে দেখছি না, দেখছি ওই আলোক-বিন্দুগুলিকে। স্মৃতির আনন্দ-বিন্দু। অজস্র। আভাগুলো গাছকে ঢেকে ফেলেছে। আলোর ঐক্যতান হচ্ছে যেন।

'খা না। তোর জন্যে আলাদা করে মেটে-চচ্চড়ি করেছি।'

'না, তুমি আর খেও না। দুটো রসগোল্লা তো খেলে। সুগার একটু কমুক না।'

'আমি কি মানুষ নই, বেলা বারোটার সময় একগাদা মাছ কিনে নিয়ে এলে—'

বেলা দুটোর সময় খেয়েছিলাম বড় বড় পাবদা মাছের ঝাল দিয়ে গরম কাতারনি চালের ভাত। তার মুখে রাগ ও অনুরাগের অপূর্ব শোভা।

আব্দুল দর্জি এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

'কি আব্দুল—'

'মাইজি বোলায়ঁ হ্যাঁয়।'

সে বেরিয়ে এল সংগে সংগে।

'বাবুর জন্যে একটা গরম লং কোট করাব। মাপ নাও—'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'আমার লং কোট ? হঠাৎ ?'

'লেখার জন্যে যে পঞ্চাশ টাকা এসেছে তা দিয়ে তোমার গরম লং কোট করিয়ে দিই। ও টাকা সংসারে খরচ করব না।'

'আমার লং কোটের দরকার কি এখন—'

'তোমার না থাকে আমার আছে। মাপ দিয়ে দাও ওকে। আমি ডাল চড়িয়ে এসেছি—আব্দুল ভাল করে মাপ নাও—'

আব্দুল মাপ নিয়ে বলে গেল কাপড় সিংগল্ বহর হলে কত লাগবে, ডবল বহর হলে কত লাগবে।

তখনও ভাল বিলাতী গরম কাপড় পাওয়া যেত। চমৎকার কালো কোট হয়েছিল একটা। কোটটি এখনও আছে।

সে নেই।

একটা গাছের জোনাকিগুলো যেন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। একটা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হল সেখানে। তারপর জ্বলে উঠল গাছটা। সমস্ত গাছগুলোই জ্বলতে লাগল। যেখানে

জোনাকির উৎসব হচ্ছিল সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল।

এই তো হয়। এইটেই স্বাভাবিক। চিতা প্রত্যেকের জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—আমি তাকে সৃষ্টি করব। সৃষ্টি করবই।

তারপরই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল একটা। আগুনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রদীপ্ত ঋষি। মনে হল আগুনেরই খানিকটা যেন মনুষ্যমূর্তি ধরে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

'কে আপনি—'

'আমি গীতার লেখক।'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।

'বসুন, বসুন, দাঁড়ালেন কেন ?'

'আপনি বসুন আগে।'

'আমি এইখানে বসছি।'

একটা জ্বলন্ত গাছের নীচে বসে পড়লেন তিনি। আমি একটু দূরে মাটিতেই বসলাম। গীতা অনেকবার পড়েছি, তবু আমি আগুনের মধ্যে গিয়ে বসতে পারলাম না।

গীতার লেখক মৃদু হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসতেন না।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'ভালবাসলে এই আগুনের মধ্যেই এসে বসতেন। আপনারা তো আগুনের মধ্যেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু এ-ও জানি তিনি আগুনের মধ্যে এখন নেই।'

'বাঃ, ঠিক বলেছেন। পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেছেন।'

'আপনি যখন গীতা লিখেছিলেন তখন ভূত মাত্র পাঁচটি ছিল। এখন তারা লক্ষ লক্ষ। এখন তাদের নাম প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি। সবাই বিদ্যুৎকণা। কেউ পজিটিভ, কেউ নেগেটিভ, কেউ নিউট্রাল। আমার স্ত্রীর দেহ এই রকম বহু বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে এটা হয়তো বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু ওই সত্যকে ধ্যান করে সুখ নেই। তাই আমি আবার তাকে সৃষ্টি করতে চাই। হয়তো সে সৃষ্টির নাগাল কোনও দিন পাব না, কিন্তু সৃষ্টি করার যে আনন্দ তা পাব। তাকে দূর থেকে দেখেও আনন্দ পাব আমি। আমি স্মৃতির উপাদান দিয়েই সৃষ্টি করছি তাকে। এখন ধরবার ছোঁবার মত আর তো কিছু নেই। আপনি কেন এলেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি লেখক, আমিও লেখক। আপনি কষ্ট পাচ্ছেন তাই আপনার কাছে এলাম। আমি গীতা নামে যে বইটি লিখেছি তাতে আমি চেষ্টা করেছি মৃত্যু-কবলিত মানুষকে সান্ত্বনা দিতে। তাদের বলেছি যে.আমরা মরি না, আমরা অমর। দেহটা আমাদের সাময়িক বাসস্থান। সে গৃহ যখন জীর্ণ হয়ে যায় বা অন্য কোনও কারণে অকস্মাৎ ভেঙে যায় তখন অমর আত্মা সে ভগ্ন গৃহে থাকতে পারে না, সে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়—'

'আপনার গীতা আমি একাধিক বার পড়েছি। বইটি অতি চমৎকার। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। গীতা পড়ে কেউ সান্ত্বনা পায় নি। শোকাতুর লক্ষ লক্ষ মানুষ রোজ কাঁদছে। লক্ষ লক্ষ কপি গীতা বিক্রি হয়েছে, এখনও হচ্ছে, শোক কিন্তু বিদূরিত হয় নি। আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করি নি, আমরা অসহায়ের মত কাঁদছি। আচ্ছা, আপনি যখন এসেছেন তখন আপনাকে যদি দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন কি ?'

'না, রাগ করব কেন ? ভগবান রাগ করেন না। গীতায় আমি ভগবানের ভূমিকা গ্রহণ করেছি, সুতরাং রাগ আমি করব না। নির্বিকার থাকব। কি প্রশ্ন আপনার বলুন।'

'আপনি যে আত্মাকে অমর বলেছেন, সে আত্মা কি শরীরের একটা অংশ ? কোথায় সে থাকে ? মস্তিষ্কে ? হৃদয়ে ?'

'সে শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সে শরীরের অংশ নয়। সুর একটা যন্ত্রকে অবলম্বন করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু সে যন্ত্রের অংশ নয়। লক্ষ লক্ষ যন্ত্র রোজ ভেঙে যাচ্ছে, সুর কিন্তু অমর। এটা একটা উপমা দিলাম। উপমাটা অবশ্য খুব লাগসই হল না। কারণ সুর সীমিত, আত্মা অসীম। সেই অসীম আত্মা কখন যে কোন যন্ত্রকে অবলম্বন করে কি রূপে প্রকাশিত হবেন তা কেউ জানে না। নিখিল বিশ্বের দিকে চেয়ে দেখুন কত নিত্য-নতুন সৃষ্টি, দুটো এক রকম নয়। আবার নিত্য-নতুন মৃত্যু। তারাও এক নয়, প্রত্যেক মৃত্যু আলাদা ছন্দে।'

'এ সব কি আপনি কল্পনা করেছেন ? শুনতে ভারি ভাল লাগছে—'

'কল্পনাও করেছি, দেখেওছি। আপনি তো লেখেন, আপনি নিশ্চয় জানেন যা আমরা কল্পনা করি তাকে মনে মনে প্রত্যক্ষও করি। তাই তাকে অমন জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারি। আর কোনও প্রশ্ন আছে আপনার ?'

'আছে। আত্মা যে অমর একথা আপনি ভাবলেন কেন ? আমাদের দেহ মরে যায় এ তো আমরা দেখতে পাই—'

'একবার নয় বার বার মরে যায়। সে মৃত্যু আমাদের চোখের সামনেই ঘটে তবু আমরা দেখতে পাই না। ছেলেবেলার আপনি আর এখনকার আপনি দুই বিভিন্ন দেহী। আপনি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছেন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার জীবনশক্তির কৌশলে। কিন্তু সে কৌশলের একটা সীমা আছে। তাই দেহের মৃত্যু ঘটবেই। একদিন দেহের সব যন্ত্রই অকেজো হয়ে যাবে। থাকবে শুধু আপনার আমিত্ব বোধটা, যে বোধটা আপনার জন্ম থেকে আছে, মৃত্যুর পরও থাকবে, কারণ সেটা কোন ক্ষয়শীল বস্তু নয়—তা একটা বোধ—'

'তার মানে আপনি বলছেন অহঙ্কারই আত্মা—'

'ধন মান রূপ ঐশ্বর্য নিয়ে যে আস্ফালন তা আত্মা নয়। 'আমি আছি'—এই বোধই আত্মা'

'এ বোধ কি মস্তিষ্কে থাকে ?'

'থাকে অথচ এ মস্তিষ্কের অংশ নয়। সুর যেমন বীণার অংশ নয়, কিন্তু বীণাকে আশ্রয় করেই তা বাজে। সে বোধ দেহাতীত, তা অমর।'

'একি এখনও চা খাওনি ? চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল।'

আমার চাকর বান্দা এসে হাজির হল।

...সব ভেঙে গেল।

গীতার লেখক অন্তর্ধান করলেন। পেয়ারা গাছগুলো আবার মূর্ত হল। সেখানে একটি জোনাকি নেই।

'ঘরে চল, আবার চা করে দি। ঠান্ডা পড়েছে সোয়েটারও তো গায়ে দাও নি। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। চল ঘরে চল—'

বান্দার পিছু পিছু ঘরে ঢুকলাম। বান্দা আমার অতি পুরাতন ভৃত্য। বাবার আমলের। আমাকে নাম ধরে ডাকে।

'বৌমা সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী ছিলেন। মাথায় সিঁদুর নিয়ে রাজরাজেশ্বরীর মত চলে গেছেন তিনি–ভরা সংসার রেখে। তুমি ও নিয়ে দিনরাত মন গুমরে আছ কেন? সোয়েটারটা গায়ে দাও। আমি গরম চা নিয়ে আসি–'

বান্দা চলে গেল।

আমি সোফার উপর বসলাম। লীলারই কেনা সোফা। ঘরের পরদাগুলোও সেই কিনেছিল। যে জামাটা পরে আছি সেটাও তো সে-ই তৈরী করিয়ে দিয়েছিল। আমার সব জামা-কাপড়, এমন কি আমার কলম-কাগজ–সব সে-ই কিনত। ঘরের চারিদিকে যে ছবি টাঙানো–ওই নারায়ণের ছবি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা মা-র ছবি, শিল্পী অরবিন্দ দত্তের আঁকা উত্তরা-অভিমন্যুর ছবি, কলসী-কাঁখে রাধিকা যমুনার দিকে চলেছেন–এ সবই তার পছন্দ-করা ছবি–চারদিকে তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীদের ফটো–তার অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ছবি। তার প্রিয় কুকুর 'রকেট' মারা যায়, তারই স্মৃতি ওই ছবিটা–চারিদিকে তার স্মৃতি–শুধু সে নেই, সে নেই! আমি তাকে সৃষ্টি করব আবার। করব, নিশ্চয় করব।

বান্দা গরম চা নিয়ে এল।

'গরম গরম খেয়ে নাও এটা–'

আমি নীরবে খেতে লাগলাম।

বান্দা বললে, 'আগে তো কত পড়তে। আজকাল পড়া ছেড়ে দিয়েছ। কি ভাবছ এত? লেখাপড়ায় মন দাও।'

ছেলেরা বিদেশে, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি। বান্দা আর তার স্ত্রী বিন্দি আমার গার্জেন। বান্দা আমাকে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। তারপর ফিরল খানিকটা হালুয়া নিয়ে।

'এটাও খাও। বিন্দি বলছে আজ খেতে রাত হবে। গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। স্টোভে রাঁধছে–'

আমি নীরবে খেতে লাগলাম।

'তুমি চুপচাপ হয়ে গেছ কেন বল দিকিন?'

আমি চুপ করেই রইলাম। বান্দাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না যে আমি তাকে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি। বললে সে ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের খবর দেবে, ডাক্তার ডাকবে।

খাওয়া শেষ করে বললাম, 'হালুয়া চমৎকার হয়েছে।'

'একগাদা চিনি আর কিসমিস দিয়েছে, তোমার তো ভাল লাগবেই। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে চিনি কম খেতে বলেছে–'

আমার খুব ছেলেবেলায় বান্দা যখন সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে বহাল হয়েছিল তখন বান্দার নাম ছিল বন্ধন-গোপাল আর তার স্ত্রীর নাম বিন্দুবাসিনী। বাবা নাম বদলে সংক্ষেপ করে দিয়েছিলেন বান্দা আর বিন্দি। বিন্দি বাঁজা। আমিই ওর ছেলে। বান্দা খালি বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল। আমি আর কোন উত্তর দিলাম না।

বিন্দি কেন বেশী কিসমিস দিয়েছে তা আমি জানি। লীলা বেশী কিসমিস দিত। তার কাছ থেকে অনেক রান্না শিখেছে ও। ধনেপাতা দিয়ে কি একটা চমৎকার চাটনিও শিখেছিল তার কাছে। মাঝে মাঝে তৈরি করে সেটা। সব রান্নাই লীলার কাছে শিখেছে ও। লীলা ওকে–

সহসা সব ঢেকে গেল কুয়াশায়। আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত মন। কুয়াশার ভিতর থেকে

আর্তনাদ উঠতে লাগল—কোথায় চলে গেছ তুমি, কত দূরে চলে গেছ, কত দূরে, কত দূরে—

সোফায় ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম। চোখের সামনে ফুটে উঠল তার মূর্তিটা। সেই যৌবনকালের মূর্তিটা, যখন সে অপরূপ রূপসী ছিল। আমার আকুলতা যেন সে ছবিটাকে স্পর্শ করতে চাইল। কিন্তু পারল না। দূরে দূরে সরে যেতে লাগল ছবিটা। ছবি নয়, যেন আলেয়া। অসহায় হয়ে যখন ভাবছি কি করব তখন গোলাপী আতরের গন্ধে ভরে উঠল চারিদিকে। মন যেন অবলম্বন পেল একটা।

'অজন্তা নাকি ?'

অশরীরী অজন্তার উত্তর পেলাম মনের মধ্যে। সে উত্তর ভাষাহীন, কিন্তু সুবোধ্য।

'হ্যাঁ, আপনারই আঁকা আর একটি ছবি ওই দেখুন রয়েছে আপনার মনের নেপথ্যলোকে। আপনিই আপনার অজ্ঞাতসারে এঁকে রেখেছিলেন ওটি। আমি অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি ওটি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কেন ? ওই দেখুন—'

দেখলাম আকাশপটে প্রকান্ড একটি ফ্রেম। ফ্রেম অসংখ্য নক্ষত্র দিয়ে প্রস্তুত। ফ্রেমের মাঝখানে নীলাভ অন্ধকার। তার মাঝখানে আবছা একটি মুখ। আবছা হলেও তাকে চেনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার চোখ দুটি ছল ছল করছে।

'ও ছবিকে ধরতে পারবেন ? অথচ ও ছবি তো আপনার মনের মধ্যেই আছে। যে ছবিকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, তা বড় স্থূল। সূক্ষ্ম রূপের মাধুরী সে ছবিতে নেই। সে ছবি নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর। তারা মলিন হয়, পুড়ে যায়। যা অধরা, যা চিরদূরবাসিনী, তাই চিরন্তন। তাকে ধরতে যাবেন না, ধরতে পারবেন না। আপনি যাকে সৃষ্টি করতে চাইছেন সে আছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—'

আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। অজন্তা চলে গেল। তার কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে লাগল, 'সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে'।

সেই ছবিটি কিন্তু মনের আকাশে ফুটে রইল অনেকক্ষণ। নির্নিমেষ চেয়ে রইলাম তার দিকে। ওকে আমি সৃষ্টি করেছি। কখন ?

তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনের পর রাত্রি আসে।

জাগরণের পর ঘুম।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আসে মাঝে মাঝে। সেদিন স্বপ্নে সে এসেছিল।

জীবন-গ্রন্থের অনেক পাতাই ছিঁড়ে উড়ে গেছে কোথায়। তারা আর ফিরবে না। সেদিন স্বপ্নে একটা পাতা জীবন্ত হয়ে এসেছিল।

পূর্ণিমা রাত্রি। সে, আমি আর আমার ছোট ভাই রাত একটার সময় চুপি চুপি খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। যাব আমাদের আমবাগানে। সেখানে একটা ছোট ঘরও আছে। তার গানের গলা ছিল চমৎকার। কিন্তু বাড়িতে সবার সামনে গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল না তখন। নতুন বউদের মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘোরাফেরা করতে হত। আমরা রাত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম আমবাগানে। সেখানে ছোট ঘরটির বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসতাম। সে বিনা হার্মোনিয়মে গান গাইতে পারত, গান মুখস্থ থাকত তার। সামনেই বই বা খাতা খুলে গান গাইত না সে কখনও। আমাদের প্রকান্ড বাগান জ্যোৎস্নায় ভেসে

যাচ্ছে। আমগাছগুলো কালো কালো স্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছে। তারাও যেন শ্রোতা। বাড়ির বড় বউয়ের গান শুনবে বলে যেন প্রতীক্ষা করছে।

সে গাইল, 'দূর দেশী এক রাখাল ছেলে—।' তারপর গাইল 'শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলাম গান।' তারপর গাইল, 'জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি।'

ঘুম ভেঙে গেল।

কোথায় সেই রাখাল ছেলে, সে যে বাঁশীটা ফেলে গিয়েছিল কোথায় সেই বাঁশীটা ?

তোমার শেষ পারানির তরীতে তুমি কি গান কণ্ঠে ভরে নিয়ে গিয়েছিলে—তোমার তো বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। কোন নিবিড় অন্ধকারে কার হাত ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ ?

বিছানায় উঠে চুপ করে বসে রইলাম। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি সে আসে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। এল না।

একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম আবার।

আবার স্বপ্ন দেখলাম।

সে যেন বলছে, 'তুমিই তো সেই রাখাল ছেলে। আবার বাটে বটের ছায়ায় খেলা করেছিলে। যে বাঁশিটি ফেলে গিয়েছিলে সেইটিই তো আমি সারা জীবন বাজিয়েছি। তারপর শুভদৃষ্টির সময় বুঝতে পারলাম সেই রাখালই নূতন রূপে ফিরে এসেছে।'

মুচকি হেসে মিলিয়ে গেল সে। তারপর দেখলাম একটা বিশাল নদীর বাঁকে নৌকোর উপর বসে আছে। বলছে, 'শেষ পারানির নৌকোতে আমি গানই কণ্ঠে ভরে নিয়েছিলাম। সে গানে কথা ছিল না, শুধু কান্না ছিল। বিরামহীন কান্না। বুঝতে পেরেছিলাম তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে এবার। তাই নির্বাক হয়ে শুধু কেঁদেছিলাম। তুমি বুঝতে পার নি ?'

নৌকোটা নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সমস্ত ঢেকে গেল অন্ধকারে। একা দাঁড়িয়ে রইলাম সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সহসা অনুভব করলাম কে যেন আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরেছে। কী শীতল স্পর্শ!

কে তুমি ?

কোন উত্তর দিলে না।

কে তুমি ?

এবারও কোন উত্তর এল না। শুধু মৃদু কণ্ঠে কে যেন বলল, 'চল—'

সেই নিবিড় অন্ধকারে হাত-ধরাধরি করে চলতে লাগলাম দুজনে। আর সন্দেহ রইল না সে কে।

।। তিন ।।

মন তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে দিন-রাত। তাকে মানে, তার দেহকে। দেহহীন তার অস্তিত্ব কল্পনা করবার চেষ্টা করছি, পারছি না। রূপহীন কিছু কল্পনা করা শক্ত। তাই সর্বদেশেই অরূপ ভগবানেরও নানা-রূপ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষ রূপের জগতে বাস করে। তার অবচেতনা সবই রূপময়।

তার যে দেহটাকে আমি চিনতাম তাকে পুড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু সেই দেহের স্মৃতিটা

পোড়ে নি। মনের মণিকোঠায় শতরূপে তা ঝলমল করছে। কিন্তু তার ভিতরে যে মন ছিল, সেই মনের যে রূপ ছিল, তার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি? সে আমার বহুদিনের সঙ্গিনী, সে আমার সমস্ত সংসারের গৃহিণী, সে আমার পুত্রকন্যাদের জননী ছিল। কিন্তু এসব ছাড়াও সে আর-একটা-কি ছিল যার প্রতি মনোযোগ দিই নি আমি। দিই নি কারণ তা আমাব সাংসারিক প্রয়োজনের বাইরের জিনিস ছিল। তা সৌরভের মত, রঙের মত, জ্যোতির মত, সুরের মত, যা সংসারিক থোড়-বড়ি-খাড়ার বাইরে, যা মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরা যায় না। তার মনের এই রূপ আমি সবটা দেখি নি। যা দেখেছি তা আভাসে, কখনও বা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর ঝলকে। হঠাৎ মনে হয়েছে এ লোককে আমি চিনি না। এ কে?

সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে উধাও হয়ে চলে যাওয়ার সাহস ছিল তার। চলেও গিয়েছিল একবার। হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে।

বাড়ির কারো সামান্য অসুখ করলে সে অস্থির হয়ে পড়ত, বিদেশ থেকে ছেলেদের চিঠি না এলে যার ঘুম হত না রাত্রে, সংসারের সামান্যতম ত্রুটিও যে সহ্য করতে পারত না— হঠাৎ সে সব ফেলে চলে গিয়েছিল, চলে যেতে পেরেছিল। বেলা এগারোটার সময় আমি যখন দু-তিন রকম মাছ কিনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম, তখন সে হঠাৎ বলে উঠল, আমি আর পারছি না, আমি চললাম। একটা পাতলা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে চলে গেল। ভাবলাম পাড়ার কারো বাড়িতে গেছে বোধহয়। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, ফিরল না। তখন মোটর নিয়ে বেরুলাম খুঁজতে। চেনা-শোনা সকলের বাড়িতেই খুঁজলাম। কোথাও নেই। অবাক কাণ্ড! কোথায় গেল! আর কাউকে খবর দিলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। জানতাম সে ফিরে আসবেই। ফিরে এসেছিল আট-দশ দিন পরে। গিয়েছিল হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, বলেছিল আর সংসার ভাল লাগছে না, আপনাদের কাছেই থাকব। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে ছিলাম। বাকী জীবনটাও তাঁর কাছে থাকব। আশ্রমের স্বামীজী অনেক বুঝিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন। সেই স্বামীজির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি তাকে যত্ন করেছিলেন। আসবার সময় একটি ভাল গরম কম্বলও দিয়েছিলেন পথে গায়ে দেবার জন্য। তখন শীতকাল। আসবার ভাড়াও দিয়েছিলেন। সবই ফেরত পাঠিয়েছিলাম স্বামীজিকে, কিন্তু তাঁর স্নেহের ঋণ আজও শোধ করা হয় নি। তাঁর সঙ্গে দেখাই হয় নি আমার।

লীলা হঠাৎ চলে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার ফিরে এল। মনে মনে হয়তো একটু অপ্রস্তুত, বাইরে কিন্তু সপ্রতিভ। যেন কিছুই হয় নি, আবার লেগে পড়ল সংসারের কাজে।

আমি কিন্তু বুঝতে পারতাম সে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে, বাইরে যদিও সপ্রতিভ থাকবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার মনের অপ্রস্তুত ভাবটা বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝতে পারি নি কেন সে এমন করলে।

'আপনি আপনার অবচেতনলোকে এর দুটো চমৎকার ছবিও এঁকেছিলেন, দেখবেন?'

আতরের গন্ধে ভরে উঠল চারিদিক। খস্ না গোলাপ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'কে এলে? ইলোরা না অজন্তা?'

'আমরা দুজনেই এসেছি। আমাদের দু'জনের কাছেই ছবি আছে।'

ঘরের ছবি মুছে গেল। ফুটে উঠল আর একটা ছবি। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ একটা। তার উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে বন্য হরিণী একটা। ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল সেটা কিছু দূর। তারপর থমকে দাঁড়াল। এ ছবিটা মিলিয়ে গেল। তারপর ফুটে উঠল আর একটা ছবি। একেবারে অন্যরকম ছবি। একটা পাখী যেন সসঙ্কোচে এসে খাঁচায় ঢুকছে।

'এ দুটো ছবি আপনার অজ্ঞাতসারে এঁকেছিলেন আপনি। আমরা কুড়িয়ে রেখেছিলাম।'

'তার আর কি কি ছবি আছে তোমাদের কাছে? থাকে তো দেখাও না—'

'অনেক ছবি আছে। কিন্তু কোন ছবি কোথায় আছে তা আমাদের মনে থাকে না। আপনি যখন তার কথা ভাবেন তখন আপনার ভাববার ধাক্কায় আমাদের মনে পড়ে যায় কোন ছবি কোথায় আছে। কোন স্বপ্নের গহনে তাদের লুকিয়ে রেখেছি। এখন চলি, আবার আসব আমরা। আপনার ভাবনাই টেনে আনছে আমাদের।'

'আপনাদের পূর্বজন্মের বান্ধবীর সঙ্গে কি দেখা হয়েছে?'

'না, এখনও হয় নি। হয়ে যাবে একদিন। সে-ও তো আকাশলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনোময় দেহ ধারণ করে। তাকে যে রূপে চিনতাম সে রূপে তো সে নেই এখন। আচ্ছা, চললাম আমরা।'

আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ হয়ে তার ছবিটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। এখন ওই ছবির ভিতর দিয়েই তার নাগাল পাবার চেষ্টা করি।

হঠাৎ মনে হল ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যদিও তার চোখের পাতা নড়ছে না, তবু মনে হল ওটা যেন নির্জীব কাগজ মাত্র নয়। মুখের মুচকি হাসিটা যেন একটু বেশি প্রখর হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটেছে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা। মনে হল সে যেন নীরব ভষায় বলছে, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাকে নিয়ে এত সব লিখছ কেন? একটু অশোভন হচ্ছে না? আমি তো তোমারই। আমার এত প্রশংসা করা কি আত্মপ্রশংসা নয়? তুমি তো চিরকাল আত্মবিজ্ঞাপনের বিরোধী। এ তুমি করছ কি? তার চেয়ে গল্প লেখো।'

আমিও নীরবে উত্তর দিলাম।

'এখন তুমি আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছ। তোমার দেহ আমার চোখের সামনে নেই। তাই তোমাকে সৃষ্টি করতে চাই আবার। করতে চাই, কিন্তু কি করে করব জানি না। করবার চেষ্টা করছি। যদি পারি তাহলে তা তোমার ফটোগ্রাফ হবে না। তোমার পিঠে শিড়দাঁড়ার দুপাশে যে দুটি তিল ছিল, তোমার ছোট ছোট পা দুটির যে অপরূপ গড়ন ছিল, তোমার মুখ-টেপা হাসির যে মাধুর্য ছিল, তোমাকে ঘিরে স্নেহ-ভালবাসার যে অপূর্ব উদ্যান ছিল—সে সব থাকবে না আমার সৃষ্টিতে। তা অন্যরকম হবে, অথচ তুমি তাতে থাকবে—'

'আমার বড্ড লজ্জা করছে কিন্তু। আমি বাঙালী ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে, তার বেশি কিছু নই।'

'তুমি আমার চোখে যে কি ছিলে তা তুমি জান না।'

এই নীরব আলাপ কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না। ঝন ঝন করে কি যেন পড়ে গেল কোথায়। শিউরে উঠল চারিদিক। মনে হল একটা কাঁসার বাসন পড়ে গিয়ে ঝনৎকার তুলে

সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি পড়ে গেল ?'

বান্দা এসে বলল, 'কই কিছু পড়ে নি তো? তুমি বসে বসে স্বপ্ন দেখছ নাকি ?'

বান্দা চলে গেল।

তাহলে কি শব্দটা আমার মনের ভেতর থেকে উঠল ?

তার ছবি ঠিক তেমনি হাসছে। হাসির সঙ্গে মিশেছে একটু কৌতুক। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে আমি খেতে খেতে রাগারাগি করে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কি একটা রান্না আমার মনোমত হয়নি বলে। সেই শব্দটা এখনও বেঁচে আছে। সে যেন আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল—এখন যাকে নিয়ে এত কবিত্ব করছ, একদিন তাকে কত কষ্ট দিয়েছিলে। সে সেদিন কিছু খায় নি, মনে আছে ? সব মনে আছে, এ-ও মনে আছে ইলিশমাছের সব পেটিগুলি সে আমাকেই দিয়েছিল, নিজে নিয়েছিল মুড়োটা। ঝালটা তেমন ওতরায় নি। কাঁচালঙ্কা কম দিয়েছিল ডাক্তারের বারণ অনুসারে। একজন হিতৈষী ডাক্তার তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ঝাল বেশি খেলে লিভার খারাপ হবে। তাকে বললাম—রান্না ভাল হয় নি। সব পেটিগুলো আমি খাব না, তুমি নাও। বার বার বলা সত্ত্বেও যখন নিল না—হঠাৎ ক্রোধান্ধ হয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম থালাটা।

ছবির দিকে চেয়ে দেখলাম তেমনি মুচকি মুচকি হাসছে। অপরাধীর মত বসে আছি ছবিটার সামনে। সত্যিই তো কষ্ট দিয়েছি তাকে। আনন্দ দিতে পারি নি ? একবারও না ?...ঘরের ভিতর একটা ভোমরা ঢুকে গুন গুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গুন গুন গুন গুন। মনে হল যেন বলছে, মনে নেই ? মনে নেই ? মনে নেই ?

হঠাৎ মনে পড়ল।

আমার প্রথম চাকরি। মাইনে মাসে আশী টাকা। ছোট একটি ঘর ভাড়া করেছি। কিনেছি সাধারণ একটি চৌকি। দুটি টিনের চেয়ার, ছোট একটি কাঠের টেবিল। ও প্রথম আসছে তার নিজের সংসারে। ওর জন্যে কিনে রেখেছি একটি হাত-আয়না, একটা চিরুনী, একশিশি সুগন্ধি মাথার তেল, আর কয়েক গজ কালো ফিতে, চুল বাঁধবার জন্য। তাছাড়া পাউডার আর ক্রীম। এসব বিষয়ে আমার নিজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, দোকানদার যা ভালো বলে দিয়েছে তাই নিয়েছি। আশঙ্কা ছিল ওর পছন্দ হবে কিনা।

...ছোট আয়নাটি তুলে নিয়ে ওর মুখে যে হাসিটি ফুটেছিল তাতে ছিল অকৃত্রিম আনন্দ, লজ্জা আর গর্ব। আমার সমস্ত সংসার ওর হাতে তুলে দিয়ে যে অলিখিত দলিলটি ওকে দিয়েছিলাম তাতে ও পড়েছিল সেই আনন্দের উজ্জ্বল আভা। তা আজও আমার সংসারে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে নেই, কিন্তু তার সেই হাসির আভায় আমার সংসার ঝলমল করছে আজও।

ঝগড়াঝাটি হয়েছে, কিন্তু আনন্দের ফল্গু বয়েছে চিরকাল। তা কখনও লোক-দেখানো বন্যা-রূপ ধারণ করে নি। তা চিরকালই অন্তঃসলিলা। এখনও তাই। আশা আছে সেই অন্তঃসলিলা ফল্গু বেয়েই আমি তার কাছে পৌঁছব একদিন।...

হঠাৎ সব যেন হারিয়ে গেল আবার! কুয়াশায় ঢেকে গেল সব। কুয়াশার ভিতর থেকে উঠতে লাগল সেই আর্তরব—কোথা আছে সে? যদি দেখা হয় চিনতে পারব কি তাকে ? তার যে রূপ আমার বুকে আঁকা আছে সে রূপ আছে কি তার ? আমারও এ রূপ কি

থাকবে ? হয়তো দু'জন পাশাপাশি বসে থাকব কেউ কাউকে চিনতে পারব না। হয়তো চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। কোথায়–কোথায়–?

'আমি তোমার পাশেই আছি।'

চমকে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। কেউ নেই। তাহলে দরজার বাইরে থেকে কি কেউ বললে ? উঠে গিয়ে কপাট খুলে দেখলাম। কেউ নেই। সামনে দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। নিষ্পলক নেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে আছেন। চোখের কোণে মৃদু কৌতুকের হাসি চিকমিক করছে। শ্রীরাকৃষ্ণকে বড় ভক্তি করত সে। শ্রীমাকেও। নিবেদিতা স্কুলে যখন পড়ত তখন মা বেঁচেছিলেন। ও খুব ছোট ছিল বলে মা ওকে নিজের ঘরে নিয়ে শুতেন। ও সকালে উঠে খাবে বলে ওর জন্য লুচি-সন্দেশ রেখে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর সারদা মা-র ছবি এখনও শোবার ঘরে টাঙানো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হ'তে লাগল উনি আমায় কিছু বলবেন বুঝি। ছবিরা অনেক সময় নীরবে কথা কয়। সে সুযোগ কিন্তু হল না। বাধা পড়ল। নীচে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল এবং একটু পরে আমার পূর্বপরিচিত হিতৈষী নরেনবাবু প্রবেশ করলেন।

প্রথমেই বললেন, 'আপনি আজকাল কোথাও বেরুচ্ছেন না। লিখছেনও না। তাই মনে হল আপনার খবরটা নিয়ে আসি। কেমন আছেন ?'

'ভালই আছি। কিছু করতে আর ভালো লাগে না। সে চলে গেছে। মনে হচ্ছে আমিও ফুরিয়ে গেছি।'

'আরে না, না, এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। জীবনে শোক-দুঃখ আসবেই, কিন্তু সেটাকে বরাবর আঁকড়ে সারাজীবন পড়ে থাকাটা সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। ওটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ও একরকম মরবিডিটি। ঘা লেগেছে, ঘা সেরে যাবে, বড়জোর একটা দাগ থাকবে।'

আমি বললাম, 'আপনি যা বলছেন আমি তা জানি। যিনি শোক দেন তিনিই শোক ভুলিয়ে দেন, এসব কথাও শুনেছি। তার দেহটা যে এখন লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রনে পরিণত হয়েছে, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সে কথাও আমার অবিদিত নেই। কিন্তু আমার মনে যে কি হচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। সেটা ঠিক শোক নয়। সেটা কেমন যেন একটা শূন্যতা, শূন্যতা ছাড়াও আরও কিছু ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি শোকে হু হু করে কাঁদছি না। আমি সেই শূন্যতাটাকে পূর্ণ করতে চাইছি। কি করে করব জানি না–'

নরেনবাবু একটু সবিস্ময়ে চাইলেন আমার দিকে।

'আবার বিয়ে করবেন ভাবছেন ? বেশি বয়সে অবশ্য অনেকেই বিয়ে করে। এই দেখুন না হরিশবাবু সত্তর বছর বয়সে–'

আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে উঠলাম–'হরিশবাবু বড়লোক, তিনি একটা কেন তিনটে 'রাখনি' রাখতে পারে। ওসব কি বিয়ে ? বিয়ে একবারই হয়। সব দেশেই বড়লোকেরা কামের তাড়নায় ওসব করেন। পশুদের সঙ্গে ওদের বেশি তফাৎ নেই। ওরা সারাজীবন জামা কাপড় মোজা গেঞ্জির মত বউও বদলায়। বিবাহ একটা পবিত্র জিনিস, যা অনেকের জীবনে একবারও হয় না। তা ভগবানের মতই একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমি হয়তো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন তার স্থান আর একটি

নারী দিয়ে পূর্ণ হবে না।'

নরেনবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু, বললেন, 'মাফ করবেন, আমি সাধারণ লোক, আপনাকেও সাধারণের পর্যায়ে ফেলেছিলাম। আপনি যা বললেন তা তো খুব উঁচুদরের কথা। ঠিকই বলছেন, প্রকৃত বিবাহ একবারই হয়। আপনি মুষড়ে পড়েছেন, কোথাও বেরুচ্ছেন না, তাই আপনার খোঁজখবর করতে এসেছিলাম। আচ্ছা, নমস্কার, চলি এখন।'

চলে গেলেন ভদ্রলোক।

তারপরই এল সীতারাম জেলে। সে এসেই আমার পায়ের উপর মাথা রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল। আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না। কোন কথা বলল না, খালি কাঁদতে লাগল।

দুজনে চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেলাম। চোখ বুজে বসে রইলাম। সীতারামের শোক-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একটু পরে চোখ খুলে দেখলাম—একা বসে আছে। সীতারাম নেই।

।। চার ।।

এতক্ষণ যা লিখলাম, তা গল্পের পটভূমিকা। যে গল্পটা বলব এবার, সেটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য গল্প মনে হবে না হয়তো এ যুগের বাস্তববাদী পাঠক-পাঠিকার কাছে। এটাকে গল্প না বলে ভ্রমণকাহিনী বললেও তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারতাম না ঠিক। কারণ রেলে মোটরে প্লেনে চড়ি নি। কোনও যানেই চড়ি নি আমি। হেঁটেও যাই নি কোথাও। তবু ভ্রমণ করেছি কোটি কোটি মাইল। স্বপ্নে কি! তাও তো জানি না। অজন্তা ইলোরা ছিল আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে। আতরের গন্ধে সেটা বুঝতে পারছিলাম। আর ছিল শীতল স্পর্শ। কে যেন আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন হাত ছিল না, ছিল শুধু শীতল স্পর্শ। তার স্পর্শ।...

সবই হয়তো আমার কল্পনা। কিন্তু যা অনুভব করছি তাই লিখছি। সে চিরকাল আমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে, আমার নানা উদ্ভট খেয়ালকে রূপ দেবার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছে সে। 'তাকে আমি সৃষ্টি করব আবার'—আমার এই অসম্ভব বাসনা পূর্ণ করবার বুদ্ধি সে-ই দিয়েছিল আমাকে।

অনেক রাত হয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। হঠাৎ ছাতের উপর চোখ পড়ল। নেটের মশারির ভিতর দিয়ে ছাত স্পষ্ট দেখা যায়। দেখলাম ছাতের উপর একটি মুখ যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমিও সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মুখটা। তবু আমি চেয়ে রইলাম।

একটু পরে আবার ফুটে উঠল মুখটা। অবিকল তার মুখ। আবার মিলিয়ে গেল। একটু পরেই আবার ফুটে উঠল। আবার মিলিয়ে গেল। মনে হল ছবিটা যেন বার বার নিজেকে ফুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

শেষে মিলিয়ে গেল, আর ফুটল না। অনেকক্ষণ চেয়ে শুয়ে রইলাম, কিন্তু সে ছবি আর এল না। আলোটা জ্বেলে রাখলাম।

বিস্ময়, আগ্রহ, কৌতূহল, আকুলতায় কতক্ষণ যে বিনিদ্র ছিলাম জানি না। হঠাৎ কিন্তু

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে-ই কি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল ? জানি না। শুধু জানি, স্বপ্নে সে সশরীরে দেখা দিয়েছিল। তার যেন সব অসুখ সেরে গেছে, মুখে সেই আগেকার মত হাসি।

বলল, 'তুমি অত ছটফট করছ কেন ? পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক রোজ মরছে, আমিও মরেছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমারও হচ্ছে, কিন্তু এ অমোঘ নিয়ম সহ্য করতে হবে। একে তো ওলটানো যাবে না।'

'তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ ?'

'কোথায় আছি জানি না। কিন্তু ভাল আছি। দেহের কষ্ট আর নেই। কারণ দেহ তো নেই–যা দেখছ তা তোমার স্মৃতির ছবি। অনেক চেষ্টা করলে দেহের একটা আবছা রূপ ধরতে পারি। কিন্তু সেটা রাখতে পারি না। একটু পরেই সেটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আমি তোমার কাছে কাছেই আছি! অত কাতর হয়ো না।'

'তোমার আশে পাশে আর কেউ নেই ?'

'অনেক বড় বড় লোক আছেন। দেহ কারো নেই। একজন বড় বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি বাঙালী। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ছাত্র। বললেন, আমাদের দেহটা ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি বিদ্যুৎকণার বিবিধ সমন্বয়। মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের একত্র করে একটা নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব। আমরা নানারকম নূতন ধাতু সৃষ্টি করেছি। সেই নূতন সৃষ্টির তপস্যাই করছি আমি। তুমি তো অহরহ চিন্তা করছ আমাকে নূতন করে সৃষ্টি করবে। তাঁকে বলেছিলাম তোমার কথা। তিনি বললেন–তা সম্ভব।

'সম্ভব ? মহাশূন্যে কি ল্যাবরেটরি আছে নাকি! ল্যাবরেটরি না থাকলে তো বিজ্ঞানীরা কিছু করতে পারেন না। মনোলোকে বস্তু থাকবে কি করে ?'

'আমি জানি না। তাঁকে জিগ্যেস করব।'

সে মিলিয়ে গেল।

তারপরই হাজির হল অজন্তা আর ইলোরা।

ইলোরা বললে, 'আপনি সেই গ্রীক উপকথাটা জানেন না ? এক গ্রীক ভাস্কর তার নিজের তৈরি পাথরের মূর্তিকে ভালবেসে ফেলেছিল। আর সেই ভালবাসার জোরে দেবতা এসে সেই প্রস্তর-প্রতিমাকে মানবী করে দিয়েছিল। এর জন্যে কোনও ল্যাবরেটরির দরকার হয় নি।'

অজন্তা বলল, 'দস্যু রত্নাকরকে কবি বাল্মিকী করেছিল কোন ল্যাবরেটরি ?'

বললাম, 'ওসব তো কবি-কল্পনা।'

'কল্পনাই তো বাস্তবে রূপ নেয়। বিজ্ঞানীরা প্রথমে কল্পনাই করেন, তারপর সেটাকে বাস্তবে রূপ দেন। মানুষ আগে কল্পনায় আকাশে উড়েছিল। তারপর বাস্তবে আকাশে উড়েছে। যাঁরা মর্ত্যের বিজ্ঞানী তাঁরা বস্তু নিয়ে কারবার করেন, মর্ত্যের বিজ্ঞানীরা–যাঁরা মনোলোকে বাস করেন–তাঁদের বস্তুর দরকার না-ও হতে পারে। ভালবাসা, ভক্তি, আগ্রহ, ধ্যান এদের ক্ষমতা কি কম ? দেখুনই না, তিনি কি করতে পারেন। আমরা কিন্তু এখন আপনার কাছে এসেছি দুটো ছবি নিয়ে। আপনাদেরই ছবি, কিন্তু আপনার মনে নেই। এই দেখুন–'

দেখলাম সে আর আমি মাঠে বেড়াচ্ছি। মাঠ নির্জন। হু হু করে হাওয়া বইছে। তার মাথার কাপড় গায়ের শাড়ি বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছে বার বার। হঠাৎ সে চোখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হল ?'

'বাঁ চোখে কি একটা পড়ল।'

'মুখটা তোল। দেখি–'

তার ডান চোখটার চেয়ে বাঁ চোখটা একটু ছোট ছিল। ওই চোখটাকেই বেশি ভালবাসতাম আমি। সে মুখ উঁচু করে দাঁড়াল। আমি তার চোখের নীচের পাতাটা উপরের পাতার নীচে ঢুকিয়ে আবার বার করে নিলাম। বালিটা বেরিয়ে গেল।

'আর কর কর করছে ?'

'না।'

তখন আমি তাকে জড়িয়ে তার বাঁ চোখে চুমু দিলাম একটা। সে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে দিলে। কিন্তু তার মুখে যে লজ্জার অরুণিমা ফুটে উঠল তার তুলনা নেই। আধ-ফুটন্ত লা ফ্রাঁন্স গোলাপটার কথা মনে হয়েছিল। আর মনে হয়েছিল শিল্পী অরবিন্দ দত্তের আঁকা উত্তরা-অভিমন্যু ছবিটা।

ইলোরা বললে, 'ওই ছবিটা আপনার মনের বিস্মৃতি-লোকে পড়েছিল, আমি কুড়িয়ে রেখেছি।'

অজন্তা বলল, 'আমিও রেখেছি একটা। এই দেখুন–'

দেখলাম।

লছমনঝোলার ঘাটে উদাস হয়ে বসে আছে সে, আকাশের দিকে চেয়ে। যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অজন্তা বলল, 'আপনার মনে হয়েছিল–কে এ ? এ উন্মনাকে তো চিনি না–'

সত্যিই তাই মনে হয়েছিল। লছমনঝোলার ধ্রুবঘাটে একটা উঁচু পাথরের উপর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। মনে হচ্ছিল তার অন্তর বুঝি ভূমাকে স্পর্শ করতে চাইছে। অনেক অনেক দূরে চলে গেছে তার মন।

অজন্তা আবার বলল, 'আপনি এক মুক্তপক্ষ আকাশচারী পাখিকে দেখছিলেন। সে কথা আজ আপনার মনে নেই। আমি এ ছবিটি কুড়িয়ে রেখেছি–'

ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বেশ বেলা হয়ে গেছে। পাশ ফিরতেই তার ফটোটা চোখে পড়ল। মুচকি মুচকি হাসছে। উঠে বাইরে গেলাম। দেখলাম ছাতে টবে তার প্রিয় গোলাপ 'কন্‌ফিডেন্স' ফুটেছে। তার মুখেও মুচকি হাসি।

তারপর সমস্ত বিশ্ব যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদল কাক ডাকতে লাগল। হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল একটা মোটর। জিন্দাবাদ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল একটা মিছিল।

বান্দা এসে খবর দিলে বাইরের ঘরে কয়েকজন লোক এসে অপেক্ষা করছে দেখা করবে বলে। বিন্দি নীচে খাবার ঘরে আমার জন্যে খাবার ঠিক করছে, আমি যেন খেয়ে তবে বাইরের ঘরে যাই।

বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। একজন সহকারী সম্পাদক এসেছেন লেখা নিতে। ইন্টারভিউ নেবার জন্যে এসেছেন এক সাংবাদপত্রের রিপোর্টার। তিনটি যুবক এসেছে তাদের পাড়ার সংস্কৃতি-সভায় প্রধান অতিথি হতে হবে। গেটের বাইরে দুটো কুকুর ঝগড়া করছে আর একজন ভিখারী গান গাইছে

হার্মোনিয়াম বাজিয়ে। তারপর ভীষণ গর্জন করে দাঁড়াল একটা ট্রাক। তাতে ইঁট বোঝাই। কাছেই বাড়ি করছেন এক ভদ্রলোক।

সে হারিয়ে গেল।

যে সমাজকে আমি সারাজীবন দেখেছি অথচ চিনি না, সেই সমাজের মুখোমুখি বসলাম আবার।

একটু পরেই দেখলাম সে হারিয়ে যায় নি। আমারই আশ-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাকে, আমি কিন্তু অনুভব করছি সে আমার পাশে বা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করছি তার অস্তিত্ব। হঠাৎ মনে হল যে হয়তো সে কখনও আমাকে ছেড়ে দূরে চলে যায় নি। সর্বদাই আমার আশে-পাশে আছে। আমি কখনও বুঝতে পারি, কখনও পারি না। আমার অনুভূতি যখন স্থূল বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকে তখন সে হারিয়ে যায়। সে এখন স্থূল দেহ নয় সূক্ষ্ম স্বপ্ন। তবু সর্বদা আমার কাছে কাছে আছে সে। সে আছে—সে আছে—সে আছে—সর্বদাই আছে—এটা মনে হওয়া মাত্র সমস্ত চেতনাটা যেন উথলে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম মনে মনে। কিন্তু সে এল না। আমার বাহুবন্ধনে ধরা পড়ল না!

একা ঘরে তার ছবিটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। এটা তার যৌবনের ছবি। ও ছবিতে যে মূর্তি আঁকা আছে তা তো আমার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে মরে গেছে। পাশেই আর একটা যে ছবি আছে সেটা যে ওই তন্বী যুবতীরই ছবি তা না বলে দিলে কি বিশ্বাস হয়? এ ছবিটাও সুন্দর। তন্বী যুবতী নয়, ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী মাতৃমূর্তি। দুই-ই এক, অথচ এক নয়। তার এর পরের যে ছবিটা আছে, তা বৃদ্ধার ছবি। চোখের আশে-পাশে বলিরেখা পড়েছে। চোখের দৃষ্টিতে সে উজ্জ্বলতা, সে কমনীয়তা নেই। কিন্তু তার শেষ ছবিটার ফটো নেই। গাল তুবড়ে গেছে, মুখের চারপাশে বলিরেখা। সমস্ত দেহটা যেন শুকিয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না, কেবল কাঁদছে, নীরবে কেঁদে যাচ্ছে কেবল। সে বুঝতে পেরেছিল এই তার শেষ ব্যাধি। এ রোগ আর সারবে না। এবার সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে। বুক ভেঙে যাচ্ছিল তার। তারপর যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন তার মুখের কি প্রসন্ন ভাব। হঠাৎ যেন কমে গেল তার বয়সটা। তার যৌবনের সেই মুখশ্রী আবার যেন ফিরে এল। শুভদৃষ্টির সময় তার যে মুখ দেখছিলাম—এ যেন সেই মুখ। আর কি পবিত্র ভাব সে মুখে! সে কি তার সারদা মা-কে দেখতে পেয়েছিল? তার চেহারার কথাই ভাবছি। তার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ছিলাম। আশ্চর্য হচ্ছি তার সব চেহারা আমার মনে নেই। আমার প্রথম সন্তান যখন হয়েছিল তখন কেমন চেহারা ছিল তার? মনে নেই। তখন ফটো তোলানো হয় নি। তাই সে চেহারাটা হারিয়ে গেছে। এর অনেক বছর পরে আমার ছোটছেলের বয়স তেরো-চৌদ্দ বছর তখন আমার এক বন্ধু তার একটা ফটো তুলেছিল। সে ছবিতে তার চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। উদাসীন দৃষ্টি মেলে কোন সুদূরের দিকে যেন চেয়ে আছে। এই দৃষ্টিই বহুদিন পূর্বে দেখেছিলাম ধ্রুবঘাটে।

...তার চেহারার কথাই ভাবছি অনবরত, যে চেহারা সতত পরিবর্তনশীল, যে চেহারা ভঙ্গুর, অথচ যে চেহারা ছাড়া আমার মনের অবলম্বন আর কিছু নেই। তার মনের চেহারার পূর্ণ পরিচয় জানি না হঠাৎ পেয়ে গেলাম সেটা। হঠাৎ আমার ঘরের সামনের দেওয়ালে ফুটে উঠল—ঝুনু, জিল্টু, জুলু, ভুটান, জাম্বু, বাচ্চা, রকেট—আমার কুকুরগুলোর

ছবি। আমার দিকে চেয়ে সবাই লেজ নাড়তে লাগল ধীরে ধীরে—যেন আমাকে বলতে লাগল, তুমি দেখনি তার মনের চেহারা? আমরা দেখছি।...তাদের ছবি মিলিয়ে গেল। ফুটে উঠল সুরভি, পিংগলা, মংগলা, কাজলী, লালীর ছবি। আমার গাইগুলো। সমস্বরে হাম্বা-রব করে ওরা জানিয়ে দিল আমাকে—'মাকে আমরা তো চিনতাম, তুমি চিনতে না? আশ্চর্য!'

তারপর কলরব করে উড়ে এল একপাল মুর্গী, হাঁস আর দুটো গিনি-ফাউল। তাদের পিছনে পিছনে ভেড়াটা, তার পিছনে পিছনে কয়েকটা খরগোস আর গিনিপিগ। গিনি-ফাউলটা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে সকলের মুখপাত্র হয়ে জানিয়ে দিলে—'আমাদের মাকে আমরা চিনতাম। মা-ও চিনত আমাদের। তুমি তো নিজেকে নিয়েই থাকতে, মাকে চেনবার চেষ্টা করেছিলে কখনও?'

মিলিয়ে গেল ওরা। তারপর এল দাইয়ের নানা বয়সের নাতি-নাতনীরা, আর পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা। তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারা যেন আমার পাশে মাঈজিকে না দেখে অবাক হয়ে গেছে।

সে ওদের সকলের মা ছিল, অনেক আবদার শুনত, অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতো ওদের জন্য। ওরা ওর মনের চেহারা চিনত। ওদের ছবিও মিলিয়ে গেল। তারপর এলেন ওয়াই, চৌধুরী। আমার একজন পাঞ্জাবী বন্ধু। হাতে এক বালতি দুধ। এসে প্রশ্ন করলেন, 'মাতাজি ভালো আছেন তো?'

'তোমার হাতে এক বালতি দুধ কেন?'

'মাতাজির জন্যে এনেছি। তিনি একবার চমৎকার পায়েস খাইয়েছিলেন আমাকে। আবার তাঁর হাতের পায়েস খাব।'

'তোমার মাতাজি আর নেই চৌধুরী। তিনি চলে গেছেন।'

বিস্ফারিত চক্ষে সে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ওয়াই, চৌধুরীর সংগে অনেকদিন দেখা হয় নি। অনেকদিন তার কোনও খবর পাই নি। ও বেঁচে আছে কি না, তা-ও জানি না। ও এখন এল কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ওই বিরাটদেহ পাঞ্জাবী পুত্র তার। তার মাতাজিকে সত্যিই মায়ের মত ভক্তি করত সে। ধীরে ধীরে সে-ও মিলিয়ে গেল। আমার কুকুর, গরু, মুরগী ও হাঁসের দল, ভেড়া, খরগোস, গিনিপিগ কেউ আর বেঁচে নেই। দাইয়ের নাতি-নাতনীরাও অনেকে বেঁচে নেই। কিছুদিন আগেই রুক্মিনিয়ার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। তাহলে কি ওয়াই, চৌধুরীও বেঁচে নেই? যাদের দেখলাম তারা কি প্রেতাত্মা? তারা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে এসেছিল তার মনের চেহারাটা কি রকম ছিল? এরা সবাই এল, সে কেন এল না? সে কোথায়?

আবার আমার সমস্ত মন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার ভিতর থেকে কে যেন আর্তনাদ করতে লাগল—আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে মথিত করে কার আকুল রোদনে যেন ছেয়ে গেল চারিদিক—কোথায় আছ, কোথায় আছ, কোথায় আছ তুমি—!

চোখ বুজে বসে রইলাম। বসে বসে শুনতে লাগলাম সেই নিদারুণ ক্রন্দন। সেই হাহাকারের আবর্তে যখন আমি তলিয়ে গেছি তখন হঠাৎ থেমে গেল সব। আমার মনের চারদিকে কে যেন একটা ঢাকনা পরিয়ে দিলে। স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত আর্তনাদ। মনে হল আমার মনকে কে যেন জড়িয়ে ধরেছে। ক্রন্দনরত শিশুকে মা যেমন জড়িয়ে ধরে, তেমনি করে, আমার মনে হল—কেন মনে হল জানি না—কিন্তু মনে হল, সে এসেছে। সে, যে

এখন দেহ-হীন, কিন্তু মনোময়।

॥ পাঁচ ॥

সেদিন রাত্রে স্বপ্নে আবার দেখলাম তাকে। দেখলাম তার প্রথম যৌবনের চেহারায়, যখন তার সংগে আমার বিয়ে হয়েছিল, যখন সে বিজন দস্তিদারের কাছে গান শিখত। তার যে ছবিটা আমার কাছে টাঙানো আছে, তাতে সে পরে আছে একখানা ঢাকাই শাড়ি। স্বপ্নে দেখলাম সে পরেছে অপরূপ একখানা নীলাম্বরী শাড়ি। চমৎকার রূপোলি পাড় আর সর্বাংগে ছোট ছোট রূপোলি বুটি। মনে হল যেন এক-টুকরো নক্ষত্র-খচিত আকাশ গায়ে দিয়ে এসেছে সে। মৃদু হেসে নীরবে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, 'আমি যে আর বাঁচব না, এ তুমি অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলে। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমার পাশে শুয়ে যে গানগুলি মুখে মুখে তৈরি করে গাইতে আমি তার থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমার আশা ছেড়ে দিয়েছ, আমিও বুঝেছিলাম আমি আর বাঁচব না। তোমার গানগুলি কিন্তু আমার বড় ভাল লাগত। সেগুলো আমি ভুলি নি।'

'তাই নাকি?'

'গেয়ে শুনিয়ে দেব?'

অনবদ্য সুরে সে গুন গুন করে গাইতে লাগল।

ভালো হবে, হবে ভালো
রাত পোহাবে আঁধার যাবে
আসবে আলো আসবে আলো।
অন্ধকারেও যাহার ভুবন আলোয় ভরা
জ্বলছে কোটি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সেই ভুবনে কেমন করে
  চিরটা কাল থাকবে কালো
আসবে আলো, আসবে আলো।
বীণা তোমার উঠবে বেজে
আসবে সে যে আসবে সে যে
তাহার লাগি আসন পাতো.
তাহার লাগি মালা গাঁথো
তাহার লাগি প্রদীপ জ্বালো
আসবে আলো, আসবে আলো।

একটা সুরলোক মূর্ত হয়ে উঠল আমার চারপাশে। গানটা যখন শেষ হয়ে গেল তখনও আমি অভিভূত হয়ে বসে রইলাম।

সে বলল, 'সত্যিই রাত পুইয়েছে, আলো এসেছে। তা সূর্যের আলো নয়, তা অদ্ভুত রকম স্নিগ্ধ আলো। আমি খুব ভাল আছি। তবু তোমাদের জন্য মন কেমন করে।

তোমাদের কথা ভুলতে পারি না। তোমার গানগুলো সত্যিই বড় ভাল লেগেছিল আমার। একটাও ভুলি নি। মাঝে মাঝে স্বপ্নে এসে শুনিয়ে যাব তোমাকে। আজ কিন্তু তোমায় একটা দরকারী কথা বলতে এসেছি। সেই বিজ্ঞানীর সংগে আবার দেখা হয়েছিল আমার। যিনি বলেছিলেন ইলেকট্রন্ প্রোটন নিউট্রন—এইসব দিয়ে আবার নতুন সৃষ্টি করা সম্ভব। তুমি অহরহ ভাবছ আমাকে নূতন করে সৃষ্টি করবে। তোমার এই পাগলামির কথা বলেছিলাম তাঁকে। তিনি বললেন, সৃষ্টি করা সম্ভব। আপনার স্বামী যদি আমার কাছে এসে আপনার বর্ণনা করতে পারেন তাহলে আমিই সৃষ্টি করে ফেলতে পারি আপনাকে। আপনার দেহ তো আমি দেখি নি, দেখছি মনোময় রূপ। আপনার দেহের বর্ণনা আপনার চরিত্রের বর্ণনা, এগুলো চাই। আমি আজকাল ধ্রুবলোকে বসে ব্রহ্মার তপস্যা করি। তিনিই সৃষ্টি-কর্তা। তিনিই সৃষ্টির প্রেরণা দেন। আশা করি আপনার স্বামীর বাসনা আমি চরিতার্থ করতে পারব। কিন্তু তাঁকে আসতে হবে আমার কাছে। তাঁকে মানে, তাঁর মনকে—'

বিস্মিত হয়ে গেলাম।

বললাম, 'আমার মনকে তুমি নিয়ে যাবে কেমন করে?'

'তোমার মন তো সর্বদাই আমার কাছে রয়েছে। আমিও তোমার কাছে সর্বদাই আছি। আমার দেহ নেই বলে আমাকে দেখতে পাও না। আমিও দেখতে পাই না তোমাকে, কারণ চোখ তো নেই। কিন্তু আর একটা নূতন ধরনের চোখ পেয়েছি, সেটা অনুভূতির চোখ, সেটা দিয়ে অনুভব করি। দেহটাই প্রধান বাধা—তাই তুমি আমার সান্নিধ্য অনুভবও করতে পার না। ওই স্থূল দেহটা থেকে তুমি যদি বেরিয়ে আসতে পার তাহলে আমি নিয়ে যেতে পারব তোমাকে সেই বিজ্ঞানীর কাছে। তুমি সত্যি যদি আমার সংগে যেতে চাও, তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে দেহ থেকে। চেষ্টা করলেই দেহ থেকে বেরিয়ে আসা যায়।'

'যায়? কি করে চেষ্টা করব?'

'প্রবল ভাবে ইচ্ছা করতে হবে। মানুষের প্রবল ইচ্ছায় সবই সম্ভব। তুমি চেষ্টা কর, নিশ্চয় পারবে?'

'যদি পারি, বুঝব কি করে যে পারলাম—'

'আমি তখনই তোমায় স্পর্শ করব। তুমি বুঝতে পারবে, আমি তোমার হাত ধরেছি—'

'কিন্তু তোমার তো দেহ নেই।'

'মনোময় দেহ একটা আছে! সে দেহ দিয়ে আর একটা মনোময় দেহকে স্পর্শ করা যাবে।'

'যাবে?'

'হ্যাঁ। তুমি চেষ্টা কর। বইয়ে পড় নি মুনি-ঋষিরা দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কত জায়গা ঘুরে আসতেন? জ্যাক লন্ডনের 'জ্যাকেট' বইটার কথা মনে নেই? তাতেও একজন বন্দী জেল থেকে রোজ ওইভাবে বেরিয়ে যেতেন। পড়ে থাকত তাঁর অচেতন দেহটা। তুমিও পারবে, চেষ্টা কর।'

ফোনটা বেজে উঠল।

ঘুম ভেঙে গেল!

'হ্যালো—কে—'

'আমি অবনী। অনেকদিন আগে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। চিনতে পারছেন?'

'না, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমি লণ্ডনে ছিলাম অনেকদিন। কিন্তু তার আগে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম আপনার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে। সে আলোচনার কথা মনে নেই। কিন্তু একটি জিনিস আমি ভুলি নি। ভুলি নি বৌদিকে, ভুলি নি তাঁর আন্তরিক সেবা-যত্ন, ভুলি নি তাঁর হাতের রান্না। কেমন আছেন তিনি?'

'তিনি নেই। কয়েক মাস আগে মারা গেছেন।'

'সে কি! ভেবেছিলাম আজ একবার গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসব।'

'আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?'

'পাটনা থেকে। দেখি যদি ছুটি পাই যাব একবার আপনার কাছে। তাঁর ছবিকে প্রণাম করে আসব। নমস্কার।...'

ফোনটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন তিনি। কে এই অবনী ঘোষ? মনে করতে পারলাম না। আমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে আজকাল। সে যদি থাকত মনে করিয়ে দিত। সব মনে থাকত তার। অবনী ঘোষও হারিয়ে গেছে।

ইচ্ছে হল আবার শুয়ে পড়ি। আবার স্বপ্নে যদি সে আসে। শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে রইলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু আর ঘুম এল না। মনে নামল আবার সেই কুয়াশা। আর কুয়াশার ভিতর থেকে উঠতে লাগল সেই আকুল প্রশ্ন—কোথা আছ তুমি, কোথা আছ তুমি, কত দূরে—কত দূরে—

সত্যি যেতে পারব কি তোমার কাছে? সত্যি পারব? না, স্তোক দিয়ে গেলে শুধু—

বান্দা এসে বলল, 'বাইরে দুজন লোক বসে আছে। আমি বললাম, এখন ঘুমুচ্ছেন দেখা হবে না। ওরা বলল, আমরা অপেক্ষা করব—'

বান্দা চলে গেল।

বাইরে গেলাম। দেখলাম একজন তরুণ লেখক একটি মোটা খাতা নিয়ে বসে আছেন। আমাকে তাঁর লেখা কবিতা শোনাতে চান। আর একজন এসেছেন এক সংস্কৃতি-সভার নিমন্ত্রণ জানাতে। তারপর আমার লেখার প্রুফ নিয়ে এল একজন। মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স কালেক্টার এলেন। পিওন এল, বিন্দি এসে বলল, বাজারে সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না, গর্জন করতে করতে ট্রাক চলে গেল একটা। যে পৃথিবীতে সে নেই, সেই পৃথিবী আবার ঘিরে ধরল আমাকে।

॥ ছয়॥

সারাদিন অনুভব করতাম সে আমার আশেপাশে ঘুরছে। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যেও অনুভব করতাম সে আমার কাছেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এটা আমার কল্পনা। ভীড়ের মধ্যে তার নীরব ভাষা আমার মনে পৌঁছত না। পৌঁছত যখন একা থাকতাম।

সেদিন ছাতে একা আমার লেখার টেবিলের সামনে চুপ করে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি মরে যাওয়ার পর তুমি নাকি অনেক কবিতা লিখেছ? শোনাও না আমাকে—

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে কবিতার খাতা বের করে পড়তে লাগলাম।

তুমি চলে গেছ।
অনেকের মৃত্যু নিয়ে
অনেক কবিতা লিখেছি
তোমার মৃত্যু নিয়ে পারব কি?
দীর্ঘ জীবনের সঙ্গিনী আমার,
তোমার মধ্যে এতদিন ডুবে ছিলাম,
তোমাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে
সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে
উপভোগ করেছি,
তোমাকে চিনতে পারি নি।
তুমি আমার সব ছিলে
সর্বস্ব ছিলে
তবু পারি নি।
তুমি-ময় হয়েছিলাম
তাই পারি নি বোধ হয়।
চিনতে হলে
যে দূরত্ব থাকা দরকার
তা ছিল না।

এখন তুমি নেই,
এখন মনে হচ্ছে
অপূর্ব একটি মালা ছিলে তুমি,
রত্নের মালা।
প্রত্যেকটি রত্ন আলাদা জাতের।
ভালবাসা, কলহ,
মান-অভিমান,
আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা,
ধর্ম, ভগবান
পুত্র-কন্যা নাতি-নাতনী
আত্মীয় পরিজন
প্রসাধন, রন্ধন, শিশু-বোধ
আত্ম-মর্যাদা

বিরাট-মালার
প্রতিটি রত্ন বিভিন্ন।
কেউ হীরে, কেউ পান্না, কেউ চুনী,
কেউ মুক্তো, কেউ বৈদূর্য,
কেউ নীলকান্ত,
আরও কত যে—নাম জানি না।
যে সুতো দিয়ে
এ মালা গাঁথা ছিল
তার স্বরূপ জানতাম না।
সবাই যখন তোমায়
চিতায় তুলে দিলে
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রত্নগুলো
দেখতে পেলাম সুতোটা।
সামান্য সুতো নয়
তা আলোর রেখা
জ্যোতির্ময় প্রাণ-তন্ত্রী তোমার
মিলিয়ে গেল সেটা চিতার শিখায়
চলে গেল আকাশে
সূর্য-তারার দেশে।
নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায় বসে এই সব লিখছি।
গান থেমে গেছে।
গানের রেশ কানে বাজছে এখনও
মনে হচ্ছে আর পাব না তোমাকে
গানের রেশও থেমে যাবে একটু পরে।
এমন সময় কানের কাছে কে যেন বলে উঠল—
'বুঝলে—'
ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলি
বুঝেছি—বুঝেছি—সব বুঝেছি—
কিন্তু বলতে পারলাম না কিছু।
মহাকালের সামনে নির্বাক হয়ে রইলাম।

কবিতাটি পড়ে চুপ করে বসে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। একটু পরেই শোনা গেল তার ভাষাহীন সমালোচনা।

'কবিতা ভালই হয়েছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটু বাড়াবাড়ি করেছ। তাছাড়া তোমার নিজের দুঃখের কথাই লিখেছ, আমি যে ওই করাল রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি সে কথা তো কিছু লেখো নি। নিজের চোখেই তো দেখেছ সব। আরও কবিতা লিখেছ নাকি—

'অনেক লিখেছি।'

'আরও শোনাও দু-একটা।'

খাতার পাতা ওলটাতে লাগলাম দেখলাম প্রতিদিনই একটা লিখেছি।

'আমার মৃত্যুর ক'দিন পরে লিখেছিলে কবিতাটা ?'

'তিনদিন পরে। তারপর প্রতিদিনই প্রায় লিখেছি—'

'একমাস পরে যে কবিতাটা লিখেছিলে সেটা পড় তো।'

'সেটা শুনতে চাইছ কেন ?'

'দেখি একমাস পরে তোমার মনটা শান্ত হয়েছে কি না—'

পড়লাম।

বিসর্জনের বাজনা আজ
বাজছে বাতাসে
আজকে তুমি চলে গেছ
আজকে সাতাশে
জাদুকরি, কত কিছু
আমায় দেখালে
জীবনটা যে মধুর কত
আমায় শেখালে।
অবশেষে চিতার পরে
বাজি পোড়ালে
নীল আকাশের রাঙা মেঘে
ওড়না ওড়ালে।

'জাদুকরী আমি নই, জাদুকর তুমি। আমার মত সামান্য একটা মেয়েকে নিয়ে কি কাণ্ডই যে করছ! শোক মানুষের আর কতদিন থাকে—'

'আমার শোক শেষ হবে না। শেষ হতে দেব না। প্রতিমূহূর্তে মনে করব তুমি নেই, তুমি নেই। শোক না থাকলে আমি তোমায় ভুলে যাব। এ নিয়েও কবিতা লিখেছি একটা—

'পড় তো—'

আসছে চিঠি গাদা গাদা—
আসছে নানা লোক
বলছে সবাই নানা সুরে
শোক শান্ত হোক।
শোক করার মাঝে কিন্তু
আছে আনন্দ
চিত্ত ভরি সঞ্চারিছে—
সেই সুগন্ধ।
যে গন্ধ কোথাও নেই
এই বিশ্বে আর
শোকের অন্ধকারে যার
গোপন অভিসার।

যত দিন শোক আছে
করছি তাকে স্মরণ
শোক ফুরালেই সব শেষ
সত্যি তখন মরণ।
সত্যি তখন হবে সেই
দারুণ পরিণাম
যেদিন তুমি হয়ে যাবে
একটি শুধু নাম।
নামও শেষে ভুলে যাবে
ভাবী বংশধর
স্তরের উপর স্তর পড়বে
বিস্মৃতির স্তর।
ওগো, বন্ধু লোক
বল বল শোক তব
চিরস্থায়ী হোক্।

হঠাৎ অনুভব করলাম অতি শীতল কি যেন আমায় জড়িয়ে ধরল। আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম।

'ভয় পাচ্ছ নাকি? আমার দেহ নেই, তবু আমার মন নিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হল। তুমি কিছু বুঝতে পারলে?'

'মনে হল খুব ঠাণ্ডা কি একটা যেন জড়িয়ে ধরল আমাকে—'

'আমার মন বরফের মত হয়ে গেছে।'

'কেন—'

'আমার মনে হয়—শোকে। আমার দেহ নেই, চোখে জল ফেলতে পারি না, বুক চাপড়াতে পারি না, তোমার মত কবিতা লিখতে পারি না। দারুণ শোকে আমি ঠাণ্ডা হয়ে গেছি! তোমাদের আর কখনও কাছে পাব না, তোমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না, এই চিন্তা আমার মনের উত্তাপ হরণ করেছে। তুমি যদি তোমার মনকে দেহ থেকে বার করতে পার, তাহলে আবার আকাশলোকে মিলন হবে আমাদের। আমি বড় আশা করে আছি। তুমি চেষ্টা করছ?'

'করছি। কিন্তু কিছু হচ্ছে না।'

'হবে। চেষ্টা করতে করতেই হবে।'

আকাশে মেঘ করেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তা নি ভিতর চলে গেলাম।

সে এল কি?

'তুমি এসেছ? তোমার ওই বিছানায় বস না—'

কোনও সাড়া পেলাম না।

খুব জোরে বৃষ্টি এল বাইরে। মনে হল ওকি ছাতে দাঁড়িয়ে ভিজছে? সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ভুলটা। ওর তো দেহ নেই। মন তো বৃষ্টিতে ভেজে না। মন তো চিতার আগুনে

পোড়ে নি। তবু কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলাম ছাতের দিকে। তারপরই চোখে পড়ল ওর ছবিটা। মুচকি মুচকি হাসছে। চোখে সেই স্নেহভরা দৃষ্টি। জীবন্ত নয়, স্থির। চোখের পলক পড়ছে না। নিষ্প্রাণ ছবি শুধু। তবু ওই নিষ্প্রাণ ছবিতে কি যে জাদু আছে জানি না, চোখের দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না সেদিক থেকে। মনে হল ওটা শুধু ক্যামেরার কৃতিত্ব নয়, ওতে যেন আরও কি একটা আছে। সে নেই? কোথাও নেই? এতক্ষণ যা করলাম তা কি শুধু কল্পনা-বিলাস? সে এসে আমার কবিতা শুনে গেল, আমাকে গান শুনিয়ে গেল এ কি মিথ্যা? এ কি অসম্ভব? আমার যুক্তিবাদী মন বলে উঠল—হ্যাঁ অসম্ভব। ইংরেজিতে যাকে বলে wishful thinking, এ তাই। আমার অন্তরাত্মা কিন্তু যুক্তিকে আঁকড়ে তৃপ্তি পেল না, বলল, তোমার বুদ্ধির দৌড় বেশীদূর নয়—সে কোথাও নেই এ আমি মানব না।

সমস্ত মনটা হায় হায় করতে লাগল, দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারটায় বসে পড়লাম। বাইরে অঝোরে ঝরে বৃষ্টি পড়ছে। প্রকৃতিও যেন কাঁদছে আমার সঙ্গে।

খানিকক্ষণ পরে প্রচন্ড বজ্রাঘাত হল একটা। হাওয়ায় ঘরের একটা জানলা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। উঠে জানলার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। সমস্ত মেঝে জলে ভিজে গেছে। সোফাটাও ভিজে গেছে। এমন সময় বিন্দি এসে ঘরে ঢুকল।

'ইস্ চারিদিকে জলে জলময় হয়ে গেছে দেখছি—'

আবার বেরিয়ে গেল। একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ঘর মুছতে লাগল।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আবার ছবিটার দিকে চেয়ে দেখলাম। মুচকি মুচকি হাসছে। এবার হাসিটা জীবন্ত মনে হল। যেন আমাকে আশ্বাস দিলে, বললে, তুমিও এস না।

ঘুমিয়েছি না জেগে আছি বুঝতে পারছি না। চারিদিকে গোলাপী আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা নীল আলো। অজন্তা কথা বলছে।

'কোনটা কল্পনা, কোনটা সত্য তা নির্ণয় করা সত্যিই শক্ত। তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। যা দেখছেন, যা শুনছেন, যা অনুভব করছেন তা উপভোগ করুন। তা নিয়ে তর্ক করবেন না, চিন্তাও করবেন না। ওইটেই আপনাদের মুদ্রা দোষ। ওই জন্যই আপনারা সুখী নন। সত্যকে পান না, স্বপ্নকে মিথ্যা বলে অবজ্ঞা করেন। আমি যা বলছি তা বিশ্বাস করুন। এই যে রঙিন মলাটের খাতাটি আমি এনেছি, এটা আপনিই একদিন লিখেছিলেন রাত জেগে। এই মোটা সবুজ কাগজটা একটা বিলাতী বিজ্ঞাপনের বই থেকে কেটে এর মলাট করেছিলেন। সেই মলাটের উপর লাল রঙের কালী দিয়ে নাম লিখেছিলেন—'প্রথম ফাগুন'। এই লতা-পাতাগুলোও আপনার আঁকা। কবিতাটা আপনার কবিতার বইয়ে ছাপা আছে। প্রথমটা পড়ছি—

> এই তো এলো প্রথম ফাগুন
> তোমায় পাওয়ার পরে
> এবার কি গো পিকের গানে
> নূতন কিছু ফুটবে মানে
> নূতন ভাষা উঠবে জেগে
> দক্ষিণ হাওয়ার স্বরে?

কিন্তু সেই সুন্দর খাতাটা কোথায় ? আপনারা দুজনেই বড় অগে... ছিলেন। তাই আপনাদের কত চিঠি হারিয়ে গেছে। আমি এই খাতাটি কুড়িয়ে পেয়েছি। চিনতে পারছেন ?'

একটা ময়লা সবুজ খাতা সে তুলে দেখাল আমাকে। খাতার উপর যে 'প্রথম ফাগুন' লেখা ছিল সেটা ভাল করে পড়া যাচ্ছে না।

'কোথা পেলেন এটা ?'

'পৃথিবীর সব হারানো জিনিস যে মহাশ্মশানে থাকে সেখান থেকে। সেখানে যাওয়া যায় না। সেখান থেকে মাঝে মাঝে এক-একটা জিনিস উড়ে আসে। হঠাৎ পাওয়া যায়। আমি আজ পেলাম এটা। ভাবলাম আপনাকে দেখিয়ে আসি—'

'ইলোরা কোথায় ?'

'এখন কোথা আছে জানি না। আমরা তো ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। আপনার বা আপনার স্ত্রীর কোনও ছবি পেলেই সে আসবে আপনার কাছে।'

'আপনারা বলেছিলেন আমার স্ত্রী নাকি পূর্বজন্মে আপনাদের বান্ধবী ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হয় আপনাদের ?'

'মাঝে মাঝে হয়। পূর্বজন্মের স্মৃতি তার আর নেই। আমাদের চিনতে পারে না। আপনি তার শোকে খুব কাতর হয়েছেন বলে এসেছিলাম আপনার কাছে। আবার আসব।'

আমি চুপ করে রইলাম। যে কথাটা জিগ্যেস করব কিনা ভাবছিলাম অজন্তাই নিজে সেটা বলল।

'আপনি ভাবছেন আমরাও বোধহয় আপনার কল্পনা। আমাদের আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। আছে কি নেই তা নিয়ে আমি তর্ক করব না। আমি তর্ক করি না। আমি যদি আপনার কল্পনাই হই তাতে ক্ষতি কি। আমাকে নিয়ে খানিকটা সময় তো কাটল। আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া সবুজ খাতাটার খবরটা তো পেলেন। এবার যাই আমি।'

গোলাপী আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল। চলে গেল অজন্তা। সঙ্গে সঙ্গে একটা সত্য জ্বলে উঠল আমার মনে। আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম আমি একটা বিশেষ শক্তি লাভ করেছি। সেই শক্তিবলেই এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এ সংস্পর্শ দেহের সংস্পর্শ নয়, এরা যে ভাষায় কথা বলছে তা শব্দময় ভাষা নয়। এদের কথা নীরবে আমার মনে সঞ্চারিত হয়। ইলোরা অজন্তা যখন আসে, চারিদিক আতরের গন্ধে ভরে যায়। আমি সে গন্ধ টের পাই। সে যখন আসে আমার সারা বুকটা ভরে ওঠে, মনে হয় একটা অবর্ণনীয় আনন্দে আমার সমস্ত সত্তা যেন বিকশিত হয়ে উঠল। তার ভাষা শব্দময় নয়, নীরব, নিঃশব্দ। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি। কেমন করে পারি ? নিশ্চয়ই অভিনব কোন শক্তি লাভ করেছি আমি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্—

ডেকে উঠল একটা টিকটিকি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তার ছবির পিছন থেকে একটা টিকটিকি মুখ বার করে চেয়ে আছে আমার দিকে। নীরবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর আবার মুখটা টেনে নিলে ছবির পিছনে। ওর নিঃশব্দ চাহনি যেন আমাকে বলে গেল— তুমি পারবে। চেষ্টা কর।

আমার সমস্ত অন্তর যেন গান গেয়ে উঠল—পারব, পারব, পারব, পারতেই হবে

॥ সাত ॥

কোনও কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধনা করতে হয়। কিন্তু মনকে দেহ থেকে বার করবার সাধনা কি করে করতে হয় তা তো জানি না। এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন এমন গুরু কোথায় আছেন তা-ও তো অজ্ঞাত। তাঁর ঠিকানা পেলেও তাঁর কাছে যেতাম না আমি। মনের এ গোপন বাসনা গোপনই রাখব আমি। আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত এ তপস্যা আমাকে একাই করতে হবে। আমার এই অতি-গোপন অতি-নিগূঢ় ব্যাপারের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করলেই তার পবিত্রতা, তার মাধুর্য যেন নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে একাই সব করতে হবে।

একাই চেষ্টা করতাম গভীর রাত্রে। খুবএকাগ্রভাবে ইচ্ছা করতাম মনটা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাক। আমার মনের অবস্থাঅনেক সময় তন্ময় করে দিত আমাকে। কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়তাম, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম আমি যেন বেরিয়ে গেছি, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত। দেখতাম কিছুই হয় নি। গভীর রাত্রি থম-থম করছে চারিদিকে আমার মন দেহের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে। রোজই হতাশায় ভরে যেত বুকটা। গভীর রাত্রে ট্রেনের যে হুইশলটা শোনা যায়, রোজই শুনতে পেতাম সেটা। বুঝতাম মন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। যে পাহারাদাররা রোজ হুইশল বাজিয়ে আমাদের পাড়ায় পাহারা দেয় তাদের হুইশল্ রোজই শুনতে পেতাম। বুঝতাম আমার মন আমার দেহের মধ্যেই আছে। তারপর হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়তাম, সকালে খান্দার ডাকে ঘুম ভেঙে যেত। বুঝতাম দেহ ছেড়ে মন কোথাও যায় নি।

একদিন মনে হল বেরিয়ে কোথায় যাব তা তো ঠিক করিনি। লক্ষ্য স্থির না হলে যাব কোথায়?

একদিন হঠাৎ লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল।

ছাতে ইজিচেয়ারে শুয়েছিলাম সন্ধ্যার পর। চোখে পড়ল পুনর্বসু নক্ষত্রটা উঠেছে। আমরা দুজনেই এক আকাশ-চর্চা করেছিলাম। মিথুন রাশিতে জন্ম হয়েছিল তার। পুনর্বসু নক্ষত্রও ছিল। তাই তার প্রিয় ছিল পুনর্বসু নক্ষত্র। ঠিক করলাম ওই পুনর্বসু নক্ষত্রেই মনকে নিবদ্ধ করব। ওইটাই হবে আমার মনের লক্ষ্য। বইয়ে লেখা আছে পুনর্বসু নক্ষত্র আকৃতি। কয়েকটি তারা দিয়ে গঠিত নক্ষত্রটি। তীরটা কিন্তু সোজা নয়। ঈষৎ বক্র। এই যিনি আমাকে প্রথমে আকাশ-বিদ্যায় হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন পুনর্বসু ধনুকের মত দেখতে। মনকে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা করে যদি পাঠাই পুনর্বসুর দিকে, তা কি পৌঁছবে না সেখানে? আমার মন কি মুক্তি পাবে না? অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম। সূক্ষ্ম সূচের মত পথে মনকে পাঠাবার চেষ্টা করলাম আকাশে কিন্তু কিছু হল না। রাস্তার গোলমাল, মোটরের হর্ন—সব শোনা যাচ্ছে। মন দেহে বন্দী আছে।

...হঠাৎ মনে হল সে তো আর আসে নি...কেন আসে নি...কেন আসে নি...কোথা গেল...আর কি আসবে না?

হতাশার কুয়াশায় ঢেকে গেল মনটা। কোথা গেল, কোথা গেল আর কি আসবে না...একটা নিঃশব্দ রোদনে অবলুপ্ত হয়ে গেল সব।

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। তাকে নয়। পুনর্বসু নক্ষত্রের তিনটি উজ্জ্বল তারাকে। জ্যোতির্ময় মনুষ্য-মূর্তি ধরে এসেছে। তাঁরা নিজেরাই আত্ম-পরিচয় দিলেন।

একজন বললেন, 'আমরা পুনর্বসু নক্ষত্রের তিনটি প্রধান তারা।'

আমার মনে হল তাহলে এঁরাই কি Procyon, Pollux আর Castor বলে জানতাম?

তাঁরা আরও বললেন, 'আমরা আসতাম না, কিন্তু আপনি আমাদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে রেখেছেন, সেইটে সংশোধন করে দিতে এলাম। আপনি আমাদের ধনুকাকৃতি ভেবেছেন, সেটা ভুল। তীরের সঙ্গেই আমাদের বেশি সাদৃশ্য। কাল ভাল করে চেয়ে দেখবেন। কাল আপনি আমাদের কাছে আসবার যে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন মনে মনে তা আমাদের কাছে পৌঁচেছে—খুব আনন্দিত হয়েছি আমরা। চেষ্টা করুন, ঠিক পারবেন। মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে আপনার এ অদ্ভুত শখ কেন?'

বললাম, 'এক বিজ্ঞানী সাধক ধ্রুবলোকে আছেন। তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছা—'

'বেশ তো আসুন। আমাদের কাছেও কয়েকজন বসু এবং দেবতারা আছেন। তাঁদের কৃপা হলে নিশ্চয় ধ্রুবলোকে যেতে পারবেন—'

আমি বললাম, 'যৌবনে আকাশ-চর্চা করেছিলাম তখন আপনাদের নাম ইংরেজিতে পড়েছিলাম—'

'আমাদের সকলেরই এক নাম—অগ্নি। আমরা সবাই জ্বলছি। আমাদের যে আত্মীয়টি আপনাদের সবচেয়ে কাছে আছেন তার আপনারা নাম দিয়েছেন সূর্য। আকাশের সব তারাই সূর্য—সবাই আমরা অগ্নিরই নানারূপ দাউ দাউ করে জ্বলছি। অনেক দূরে আছি বলে আমাদের আপনারা ছোট ছোট বিন্দুরূপে দেখেন। ধ্রুবলোক বহু দূরে। সেখানে সত্যিই অনেক তপস্বী, অনেক স্রষ্টা, অনেক বিজ্ঞানী আছেন। কেন যাচ্ছেন আপনি সেখানে?'

'আমিও সৃষ্টি করতে চাই।'

'কাকে?'

'যে আমার জীবন-সঙ্গিনী ছিল। আমার সমস্ত ভালবাসা যাকে কেন্দ্র করে শতরূপে বিকশিত হয়েছিল, যে আমার জীবন অন্ধকার করে দিয়ে মরণের তমসায় হারিয়ে গেছে, তাকেই আবার আমি সৃষ্টি করব। ধ্রুবলোকবাসী এক বিজ্ঞানী আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি আমাকে সাহায্য করবেন—'

'সাধু, সাধু। কিন্তু স্থূল দেহ নিয়ে যাবেন কি করে সেখানে?'

'আমার দেহ যাবে না, আমার মন যাবে। আপনাদের লক্ষ্য করে আমি আমার মনকে দেহ থেকে বার করবার চেষ্টা করছি। আপনাদের তীরের ফলার ডগায় আমার মনকে নিয়ে যাব এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

'তারপর কি করবেন ?'

'আপনাদের লক্ষ্য করেই মন আমার দেহ ছেড়ে যাবে। মন দেহ ছেড়ে গেলেই তার স্পর্শ আমি পাব। তারপর কি হবে আমি জানি না।'

'আমাদের লক্ষ্য করার উদ্দেশ্য কি ?'

'মনে হল মনকে দেহ থেকে বার করে নিয়ে কোথায় যাব ? একটা লক্ষ্য চাই তো। কাল সন্ধ্যেবেলা আপনাদের দেখতে পেলাম আকাশে। ঠিক করলাম আপনাদের উদ্দেশ্যেই মনকে চালিত করব।'

শুনে খুব খুশি হলেন তাঁরা।

'বেশ আমরাও চেষ্টা করব আপনার মনকে আমাদের দিকে আকর্ষণ করতে।'

এই বলেই অন্তর্হিত হলেন তাঁরা। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনে হল অন্ধকার সমুদ্রে ছপ ছপ করে একটা নৌকো যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। এর পরই ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আলো জ্বললাম। চোখে পড়ল একটা বিচিত্র-বর্ণ 'মথ' নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে দেওয়ালে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। আশা করতে লাগলাম যদি ঘুমিয়ে পড়ি আবার স্বপ্ন আসবে। বাস্তব জগৎ থেকে মন পালাতে চাইছিল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলাম, ঘুম এল না। মনে করলাম আলোটা জ্বেলে একটু পড়ি। আমার মাথার শিয়রে কিছু বই রাখা থাকে এই জন্য। আলোটা জ্বালব জ্বালব করছি—চোখের পাতা তখনও পুরো খুলি নি—এমন সময় দেখি একটা আলোকিত রঙের ঝলক ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। আলোকিত সবুজ আর সোনালি রঙের স্বচ্ছ কি একটা যেন কাঁপছে চোখের সামনে। মনে হল এটা কি অবগুণ্ঠন। তারপরই দেখতে পেলাম তার চোখ দুটি, নাকের খানিকটা আর মুখের খানিকটা। মুচকি হাসিটাও। কি অদ্ভুত সুন্দরই যে লাগল! কথা কইতে যাব এমন সময় মিলিয়ে গেল সেটা। সংগে সংগে আলো জ্বেলে ফেললাম। কেউ নেই।

মনের ভিতর শুনতে পেলাম, 'একজন দেবীর সহায়তায় কিছুক্ষণের জন্য মূর্তি ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। বড় কষ্ট হয়। তবে তোমার মনকে দেহ থেকে বার করে নিয়ে এ। তুমি চেষ্টা করছ জানি, সেটা বুঝতে পারি। আমি সর্বদাই তোমার কাছে কাছে আছি চেষ্টা করে যাও, ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি আমার মনকে পুনর্বসু নক্ষত্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।'

'কেন ?'

'কোনও একটা লক্ষ্য না থাকলে জোর পাই না। একটু আগে স্বপ্নে ওই নক্ষত্রের তিনটি উজ্জ্বল তারা আমায় দেখা দিয়েছিলেন। তুমি তো তাঁদের চেনো। আমাদের একটা ভুল ধারণা ছিল। আমি ভাবতাম পুনর্বসু নক্ষত্র বুঝি ধনুকের মত। ওঁরা বললেন, না আমরা তীরের মত—'

'আমার কাছে এখন সবই সমান। আমি দেখতে পাই না। অনুভূতির জগতে বাস করি আমি। তোমার কাছাকাছি সর্বদা আছি। তোমার মন দেহ থেকে বেরিয়ে এলেই আমার স্পর্শ পাবে। আমিও অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছি তোমার জন্য।'

এর পরই নীরব আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। সে কোথাও চলে গেল হয়তো। আমার সমস্ত বুক ভরে ছিল এতক্ষণ। খালি হয়ে গেল। ...হঠাৎ মনে হল আমি পাগল হয়ে যাই নি তো? যা ভাবছি, যা দেখছি, তা সত্য না নিছক কল্পনা ? সমস্ত মনটা আবার আগের

মত কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। অসহায় মন কেবল চীৎকার করতে লাগল—তুমি কোথা? তুমি কোথা? তুমি কোথা? কত দূরে আছ তুমি?

গভীর রাত্রে একা মশারির ভিতর নিস্তব্ধ হয়ে বসে নিজেরই মনের আর্তনাদ শুনতে লাগলাম।

॥ আট ॥

এমনি ভাবেই চলতে লাগল কয়েকদিন। তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়লাম দেহ থেকে। এখন গভীর রাত্রি। দেখলাম আমি মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে আমার অচেতন দেহটাকে দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার বাঁ হাতের কবজিটা কে যেন চেপে ধরেছে।

'তুমি?'

'হ্যাঁ। চল।'

নীরব ভাষায় কথা হল।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না তার [illegible]নাময় দেহ কি করে আমার মনোময় দেহের হাত চেপে ধরেছে। আমাদের কারোরই তো হাত নেই।

প্রশ্ন করলাম তাকে মনে মনে, 'তোমারও হাত নেই, আমারও হাত নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আমার হাত চেপে ধরেছ। ধরেছ না?'

'ধরেছি। ওটা আমার হাতের স্পর্শ নয়, আমার ইচ্ছার স্পর্শ। তুমিও মনে মনে কামনা করছ আমার স্পর্শকে। তোমার কামনা এবং আমার ইচ্ছা মিলে এটা হয়েছে। ইচ্ছার জোরে সব হয়। আমি মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছি।'

'কোন মায়ের?'

'সারদা মায়ের—'

অবাক হয়ে গেলাম।

'চল—'

পরমুহূর্তেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম [illegible] পৃথিবীর এলাকা ছাড়িয়ে গেলাম নিমেষে।

শূন্য থেকে দেখলাম সূর্য তখন আমেরিকাকে আলো [illegible] আমাদের দিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দেখতে পেলাম শুক্র বৃষরাশিতে [illegible] শনি মকররাশিতে রয়েছে। শুক্রকে বেশ বড় আর উজ্জ্বল মনে হচ্ছে, যেন একটা [illegible] সাদা ফুটবল।

'চিনতে পারছেন শুক্রকে? ওকে প্রথম দেখেছিলেন আপ[illegible] কদম গাছের মাথায় ভোরবেলায়।'

চারিদিক আতরের গন্ধে ভরে উঠল।

'ইলোরা অজন্তা নাকি?'

'হ্যাঁ, আমরাও চলেছি আপনাদের সঙ্গে। আমরাও মাঝে মাঝে আকা[illegible] তবে আকাশ এত বিরাট এত বিপুল যে বেশি দূর যেতে পারি না। একবার [illegible] মন্ডলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনারা পৃথিবী থেকে কৃত্তিকাতে [illegible] সাতটি

তারা দেখতে পান। কিন্তু সেখানে তারার মেলা। ধূমন্তী বলেছিল চারশোর বেশী তারা আছে নাকি কৃত্তিকা-মণ্ডলে—'

'ধূমন্তী কে?'

'ধূমন্তী নাম আমরা দিয়েছি। ও একটা ধূমকেতু থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে সারা আকাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সমস্ত আকাশের খবর রাখে, পথও চেনে। সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে কৃত্তিকা-মণ্ডল থেকে পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেয়। তার দেখা যদি পেয়ে যাই আমাদের খুব সুবিধা হবে। আপনারা ধ্রুব-মণ্ডলে যাবেন তো—'

'তুমি কি করে জানলে? আমরা প্রথম কবে শুক্রকে কোথায় দেখেছি, তা-ও দেখছি তোমাদের অজানা নয়—'

'আমরা যে সব দেখতে পাচ্ছি। আপনারা এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছেন। আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অতীত বর্তমানের সব চিন্তাভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এখন ধূমন্তীর দেখা পেলে নিশ্চিন্ত হই—'

'তাকে খুঁজে পাবেন কি করে?'

'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? মনোময় দেহের নূতন দৃষ্টিশক্তি হয়—'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখছি—'

'তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করুন। ধূমন্তী একটা বড় জোনাকীর মত। কেবল রঙ বদলায়। এখনি লাল আছে, পরমুহূর্তেই সবুজ হবে, তারপর নীল, তারপর হলুদ, তারপর বেগুনী। মেজাজও খামখেয়ালী।'

সে এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এইবার বলল, 'আমি তাকে দেখেছি। দেখলেই চিনতে পারব। তার নাম কি ধূমন্তী?'

'এ নাম আমরাই দিয়েছি। এখানে কারো নাম নেই। আমরাই ওদের নামকরণ করি। এখানে খালি ছোট বড় তারা, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকা, কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত জ্যোর্তিবাষ্প, বহু যুগল-নক্ষত্র'

'যুগল-নক্ষত্র কি?'

'দুটি নক্ষত্র খুব কাছাকাছি পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে। দূর থেকে মনে হয় একটি নক্ষত্র। দূরবীণ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, খুব কাছে গেলেও বোঝা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশে অরুন্ধতীকে দেখা যায়, কিন্তু বশিষ্ঠকে ঘিরে আর একটি নক্ষত্র ঘুরছে। লুব্ধক নক্ষত্রকেও ঘিরে একটি নক্ষত্র ঘুরছে। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। আমরা যাকে ছায়াপথ বা আকাশ-গঙ্গা বলি তার মধ্যে অসংখ্য-যুগল-নক্ষত্র।'

'আমরা যখন আকাশ-চর্চা করেছিলাম তখন আমরাও পড়েছিলাম। এসব আপনারা জানলেন কি করে'

'আমরা যে প্রায়ই আকাশে ঘুরে বেড়াই। ধূমন্তীর কাছেও অনেক খবর জেনেছি।'

'ধূমন্তী আমাদের কথা বুঝতে পারবে?'

'মনের কথা বুঝবে। মনের তো আলাদা আলাদা ভাষা নেই। মনের কথাই আকাশের ভাষা। সেই ভাষায় উত্তর দেবে সে। সে উত্তর আপনারা বুঝতে পারবেন।'

'পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবেন। আমরা তো কোন ভাষাতেই কথা কইছি না; অথচ আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারছি। ধূমন্তীকেও পারবেন। এখন চলুন তাকে খুঁজে বার করি।'

আমরা মহাকাশে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারিদিকে তারার মেলা। অথচ ভীড় বলে মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে ফাঁকও অনেক। কিছুক্ষণ পরে টকটকে লাল একটি গোলক দেখা গেল।

ইলোরা বললে—'ওটা বৃশ্চিকরাশির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। চলুন আমরা দ্রুতবেগে ধনুরাশির দিকে চলে যাই। সেখানে আকাশ-গঙ্গা খুব গভীর ও স্পষ্ট। ধূমন্তীর ওটি খুব প্রিয় স্থান। ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে—'

সে একটি কথাও বলে নি। আমার হাতও ছাড়ে নি এক মুহূর্তের জন্য।

ধনুরাশির নীচেই যে প্রদীপ্ত আকাশ-গঙ্গা আছে—তার দ্যুতি আমরা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছিলাম।

'চল যাই—চল—'

নিমেষের মধ্যে আমরা ধনুরাশির নক্ষত্র-মন্ডলে গিয়ে হাজির হলাম। মনে হল বিরাট একটা জ্যোতির সমুদ্রে এসে হাজির হয়েছি। পৃথিবী থেকে যাকে মেঘের মত মনে হত—দেখলাম তা একটা বিরাট মহাসাগর, আলোর মহাসাগর। অসংখ্য ছোট-বড় নক্ষত্র যেন সাঁতার কাটছে তার মধ্যে। অধিকাংশই যুগল-নক্ষত্র।

সে বলে উঠল—'ওই ধূমন্তী—'

দেখলাম দূরে একটা বেশ বড় লাল জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে সেটা সবুজ হয়ে গেল, তারপর হলদে, তারপর গোলাপী, তারপর বেগুনী।

'হ্যাঁ, ওই তো ধূমন্তী—'

এগিয়ে গেলাম আমরা তার দিকে। ইলোরা বা অনন্তা কেউ বোধহয় মনে মনে ডাক দিলে তাকে। সে আমাদের দিকে ঘুরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। যখন কাছে এল, আমি বললাম, 'আমরা ধ্রুবলোক যাব বলে আকাশে এসেছি। এসে কিন্তু পথ হারিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি যদি দয়া করে পথ দেখিয়ে দেন আমাদের, খুবই উপকৃত হব আমরা। কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে—'

ধূমন্তী কোনও উত্তর দিলেন না। আমাদের প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন কেবল। প্রকান্ড একটা আলোক-শিখা ক্ষণে ক্ষণে নানাবর্ণে রূপান্তরিত হয়ে নৃত্য করতে লাগল আমাদের ঘিরে। তারপর হঠাৎ আমার মনের ভিতর দপ করে জ্বলে উঠল তার উত্তরটা।

'সামনেই পথ। এস আমার সঙ্গে।'

উড়তে লাগল ধূমন্তী। আমরা তার অনুসরণ করতে লাগলাম।

অনন্ত আকাশ যে অন্তহীন তা এতদিন আন্দাজে অনুভব করেছি। এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। আত্মহারা হয়ে গেলাম, অভিভূত হয়ে পড়লাম। আগে যখন পৃথিবী থেকে আকাশ দেখেছি মনে হয়েছে নক্ষত্রের ভীড়ে চারিদিক যেন গিজ গিজ করছে। এখন মনে হল এত ফাঁকা জায়গা আগে আর কোথাও দেখি নি। যে নক্ষত্রগুলোকে ঘেঁষাঘেঁষি দেখেছি—তারা মোটেই পাশাপাশি নেই। দুটি নক্ষত্রের মধ্যে বিরাট দূরত্ব।

ধ্রুব নক্ষত্র উত্তর দিকে আছে। আমরা ধনুরাশি থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিলাম অনেক উঁচু দিয়ে। দেখতে পাচ্ছিলাম বৃশ্চিকরাশিকে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র একটা বিরাট অঙ্গারপিন্ডের মত জ্বলছিল। তুলারাশিকে এবং অনেক দূরে কন্যারাশির চিত্রা এবং স্বাতীকেও দেখতে পেলাম।

তারপরই ধূমন্তী বলে উঠলেন, 'ডান দিকে সরে যাও, ধূমকেতু আসছে একটা–'

ধূমন্তী ডান দিকে সরে যেতেই আমরাও তার অনুসরণ করলাম। একটু পরেই দেখলাম প্রকান্ড একটা জ্যোতির্ময় অরণ্য। যেন ভীমবেগে ছুটে আসছে আমার দিকে। অরণ্যের শেষ দিকটা যেন স্বচ্ছ। সামনের দিকটা ঘনীভূত জ্যোৎস্নালোকের মত। একটু পরেই বেঁকে অন্যদিকে চলে গেল সেটা।

ধূমন্তী বললেন–'ও বোধহয় স্বাতী নক্ষত্রের দিকে গেল।'

সেই বিরাটকায় ধূমকেতু দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। খুব ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু দেখেছিলাম। মনে পড়ল তার কথা।

'বাঁ দিকে ফের এবার–'

আবার ধূমন্তীর অনুসরণ করতে লাগলাম আমরা। মনে হল পায়ের নীচে 'হারকিউলিস্' আর 'বুটেশ' নক্ষত্র-মন্ডল রয়েছে। আগে পৃথিবী থেকে ওদের দেখেছিলাম, এখন আকাশের উপর থেকে দেখছি। অদ্ভুত লাগছে। তারপর হঠাৎ একটা আলোকিত প্রদেশে এসে পড়লাম। মনে হল সেখানে যেন একাধিক মহাসূর্য উদিত হয়েছেন। সে আলোয় আমার মনোময় দেহের চেতনাকে যেন উদ্ভাসিত করে দিল। মনে হল যেন সে দিব্য জ্যোতিতে ডুবে গেলাম।

সে বলল, 'আমরা এবার সপ্তর্ষিলোকের কাছে এসে পড়েছি। যে বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন একদিন। আমাদের সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় সাতটি সূর্য এখানে জ্বলছে। তাই এখানে এত আলো। ওই দূরে দেখতে পাচ্ছি ধ্রুব মাতৃমন্ডলকে যাকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ড্র্যাগন বা ড্রেকো। ওরা মায়ের মত ধ্রুবমণ্ডলকে বেষ্টন করে আছে। বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলেন ওই মাতৃমণ্ডল প্রণাম করে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবেশ করবার অনুমতি নিতে হবে।

ধূমন্তী বললেন, 'তোমরা তাহলে তাই কর। আমি ওই ধূমকেতুটার পিছু পিছু যাব।

ধূমন্তী নানারঙের আলো বিকিরণ করতে করতে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অজন্তা বলল, 'ওই ড্রেকো নক্ষত্রমন্ডলকে আপনারা যেদিন প্রথম দেখেছিলেন ভাগলপুরের রেস-কোর্স মাঠে দাঁড়িয়ে, সেদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল। তা আপনাদের মনে নেই। ওঁর দুলে ছোট ছোট মুক্তোর ঝালর ছিল, সেই ঝালর থেকে ছোট্ট একটি মুক্তো খসে পড়েছিল সেই মাঠে। উনি জানতেও পারেন নি। আমি সেটি কুড়িয়ে রেখেছি। আপনি যখন বাড়িতে ফিরে যাবেন আপনাকে দিয়ে আসব একদিন।'

ইলোরা বলল, 'সে সব পরে হবে। এখন এস আমরা প্রার্থনা করি।'

আমরা চারজনেই প্রার্থনা করতে লাগলাম। ওরা কি প্রার্থনা করেছিল জানি না। আমি একই কথা বার বার বলছিলাম–

'হে ধ্রুব মাতৃমন্ডলীর অধিষ্ঠাত্রী জননী, আমি ধ্রুবমণ্ডলে এক তপস্বী বিজ্ঞানীর সন্ধানে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবেশের অনুমতি দিন। আমি বহু দূর থেকে বহু কষ্ট করে, বহু তপস্যার ফলে, আপনাদের সমীপবর্তী হয়েছি। দয়া করে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবেশের অনুমতি দিন–'

কতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম মনে নেই। মনে হচ্ছিল যুগ যুগান্তর পার হয়ে যাচ্ছে। সহসা একটি জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূত হলেন আমার সামনে। প্রশ্ন করলেন, 'সেই

তপস্বী বিজ্ঞানীর সংগে দেখা করবেন কেন?'

'আমার স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। যে বিজ্ঞান আমরা পড়েছি, সেই বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে কোনও জিনিস এ পৃথিবীতে নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার স্ত্রীর দেহের অণুপরমাণুগুলি মহাকাশে ছড়িয়ে আছে। আমার স্ত্রীর মনোময় দেহের সংগে দেখা হয়েছিল সেই বিজ্ঞানীর। তিনি বলেছেন যে সেই অণুপরমাণুগুলি থেকে আমার স্ত্রীকে আবার সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি আমার স্ত্রীকে আরও বলেছেন, আপনার স্বামী আমার কাছে এসে আপনার যথাযথ বর্ণনা যদি আমাকে দেন, মনে হয় আমি আপনাকে আবার সৃষ্টি করতে পারব। আমার স্ত্রী মর্ত্যে গিয়ে এই খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তুমি তোমার মনকে যদি দেহ থেকে বাইরে নিয়ে আসতে পার, তাহলে আমি তোমাকে সেই বিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাব। আমি অনেক চেষ্টার পর আমার মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এখানে এসেছি। আমাকে কৃপা করুন, অনুমতি দিন আমরা দুজনে ধ্রুবলোকে গিয়ে সেই বিজ্ঞানীর সন্ধান করি। আপনি কৃপা না করলে আমার এত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'আপনার পাশেই যে দীপ্তিময়ী প্রভা দাঁড়িয়ে আছেন, উনিই কি আপনার স্ত্রী।'

'উনি দীপ্তিময়ী কিনা জানি না। কিন্তু উনি আমার হাত ধরে আছেন সেটা অনুভব করছি—'

'নিজের পুণ্যবলে দীপ্তিময়ী উনি। ধ্রুবলোকে প্রবেশ করবার অধিকার উনি বহু পূর্বেই অর্জন করেছেন। ওঁর জন্য আমাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আপনাকেও ওঁর সংগে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। যে বিজ্ঞানীকে আপনি খুঁজছেন, তিনি ধ্রুবতারার খুব নিকটেই আছেন। তাঁর তপস্যার জ্যোতির মধ্যে ডুবে আছেন তিনি। আসুন আমার সংগে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব কোথায় তিনি আছেন। এঁরা কে?'

'এঁরা আমাদের বান্ধবী। এঁরাও আকাশচারিণী। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'ওঁরা এখান থেকেই ফিরে যান। ধ্রুবলোকে বেশী কে আমরা প্রবেশ করতে দিই না। আপনাদের পথ দেখাবার আর প্রয়োজন নেই।'

॥ নয়॥

যদিও আমার দেহ ছিল না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনও ইন্দ্রিয়ই ছিল না কেবল অনুভূতির ভিতর দিয়েই সব বুঝতে পারছিলাম এতক্ষণ। ভাষাহীন কথাও বলতে পারছিলাম, ধ্রুবলোকে প্রবেশ করেই কিন্তু বুঝতে পারলাম আমার মনোময় সূক্ষ্ম দেহে একটা পরিবর্তন এসেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখ দিয়ে যেমন দেখতে পেতাম, ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি। ধ্রুব মাতৃমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাকে দীপ্তিময়ী প্রভা বলেছিলেন সে প্রভা আমি আগে দেখতে পাই নি। এখন পেলাম। আমার যেন একটা দৃষ্টি খুলে গেল। দেখলাম ধ্রুবমণ্ডল রৌদ্রময়, কিন্তু সে রৌদ্র স্নিগ্ধ রৌদ্র, তাতে উত্তাপ নেই। তা জ্যোৎস্নার মতও নয়, তা জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল, আর তার চেয়ে অনেক বেশী ঠান্ডা। দেখলাম শতসূর্যের চেয়ে বেশী প্রদীপ্ত একটি বালক ব

নিস্তব্ধ হয়ে একটি নক্ষত্রের নীচে। তার বাহ্যজ্ঞান নেই, মনে হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে যে আলো বেরুচ্ছে তাতেই সমস্ত ধ্রুবলোক সমুজ্জ্বল। সেই আলোয় দেখলাম আরও অনেক জ্যোতির্ময় পুরুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন চতুর্দিকে। সেই বিরাট জ্যোতি-সমুদ্রে অভিভূত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সমুদ্র বলছি বটে, কিন্তু তা ঠিক সমুদ্র নয়, সেখানে কোনও তরঙ্গ নেই। সমস্তই ধীর, স্থির, নিবাত, নিষ্কম্প, নীরব, নিঃশব্দ। তা অবর্ণনীয়, অপরূপ।

সে বলল, 'চল এবার বিজ্ঞানীর কাছে। দেবী যে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন চল সেখানে যাই।'

'সেখানে তো সাদা একটা মেঘের মত দেখা যাচ্ছে—'

'ওটা একটা নীহারিকা। ওরই মধ্যে বিজ্ঞানী আছেন। চল—'

সে আমায় মুহূর্তের জন্য ছাড়ে নি। আমাকে নিয়ে চলল সেই নীহারিকার দিকে। ধ্রুবলোকে কোন নীহারিকার কথা পড়েছি বলে মনে পড়ল না। কাছে গিয়ে দেখলাম সেটা জ্যোতির্বাষ্পে নির্মিত বিরাট প্রাসাদ একটা। এটা আকাশ-বিজ্ঞানীদের দূরবীণে এখনও ধরা পড়ে নি। ধরা পড়ে নি অনেক কিছুই আকাশময় কোটি কোটি নীহারিকা ছড়ানো আছে যাদের খবর আমরা জানি না।

সে বিরাট প্রাসাদে কোনও দরজা নেই। আমরা সোজা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখতে পেলাম একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ বসে আছেন। সে বলল, 'আমি আমার স্বামীকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

তিনি তন্ময় হয়ে কি একটা ভাবছিলেন। তার কথা শুনে চাইলেন আমাদের দিকে।

'ও, আপনি এসেছেন? ইনিই আপনার স্বামী। বাঃ, খুব খুশী হলাম। আপনি আপনার স্ত্রীকে আবার সৃষ্টি করতে চান? তা করা সম্ভব। অসংখ্য ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। সেগুলো সংগ্রহ করে নূতন সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। এই যে প্রাসাদ দেখছেন—ও আমি তৈরি করেছি। এটা আমার ল্যাবরেটরি। এখানে বসে আমি নানারকম জিনিস তৈরি করি। সেদিন একটা পরী সৃষ্টি করেছি—আলোর পরী—ওই দেখুন উড়ে বেড়াচ্ছে।'

সত্যিই দেখলাম একটি চমৎকার পরী উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। তার সর্বাঙ্গ নানা রঙের, ডানা দুটি চমৎকার রামধনু রঙের।

মনে মনে প্রশ্ন করলাম (আমাদের সমস্ত আলাপই মনে মনে হচ্ছিল)—'এই রঙীন পরীটির পরিণাম কি হবে?'

'তা ভগবানই জানেন, তিনিই মহাস্রষ্টা। আমি যা কিছু সৃষ্টি করি তাঁর প্রেরণাতেই করি। সৃষ্টি হয়ে গেলে তাঁরই কাছে সমর্পণ করি সেটা। ওর পরিণাম কি হবে তা তিনিই জানেন। সৃষ্টি করে আমি যে আনন্দ পাই, সেই আনন্দই ভগবান, মনে তাঁর স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে যাই।'

রঙীন আলোর পরী দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল—শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

'আপনার পরী তো মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।'

'যাক না, ওর সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই। ও এখন আমার নয়, মহাস্রষ্টার।'

'এখন কি আপনি আর কোনও সৃষ্টির কথা ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, এখনই ভাবছিলাম। নূতন ধরনের একটা বজ্র-সৃষ্টির কথা!'

'বজ্র? কি রকম বজ্র?'

'পৃথিবীর অনেক মানুষ ক্রমশ দানব হয়ে যাচ্ছে। তাদের অত্যাচারে হাহাকার করছে কোটি কোটি দুর্বল লোক। সেই হাহাকারের স্পন্দন ভেসে আসছে এখানেও। আমার মন বিচলিত হচ্ছে মাঝে মাঝে। তাই ভাবছিলাম এমন একটা বজ্র তৈরি করা সম্ভব কি না যে পাপীরা পাপ করবামাত্র সংগে সংগেই মারা যাবে সেই বজ্রাঘাতে। তাদের পাপ থেকেই তৈরি হবে সেই বৈদ্যুতিক মারণাস্ত্র সংগে সংগে এবং তাদের মৃত্যু ঘটাবে।'

'এ রকম হওয়া কি সম্ভব?'

'ভগবান ইচ্ছে করলে সবই সম্ভব। তিনিই দধীচির অস্থি থেকে বজ্র করেছিলেন, স্তম্ভ বিদীর্ণ করে তিনিই আবির্ভূত হয়েছিলেন নৃসিংহ রূপে—'

'এই বিরাট মহাকাশে কোটি কোটি সূর্য মহাশূন্যকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে—এটা যদি সম্ভব হয়ে থাকে—তাহলে সবই সম্ভব। তবে সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন মহাস্রষ্টা ভগবানই। অসত্য অশিব অসুন্দর আচরণ করবামাত্রই মৃত্যু হবে—ভগবান ইচ্ছা করলে তাও হতে পারে। আমার মনে সে বজ্র-সৃষ্টির প্রেরণা এখনও আসে নি। তার উপায় উদ্ভাবন করতে পারি নি এখনও। হয়তো ভগবানের সে ইচ্ছা হয় নি এখনও। হলে কোন না কোন বিজ্ঞানীর মনে সে বজ্র তৈরি করবার প্রতিভা তিনি দেবেন। আমি কিছু পাইনি এখনও। আসুন, তাহলে আপনার স্ত্রীকেই আবার নূতন করে সৃষ্টি করা যাক। আপনি আপনার স্ত্রীর কথা আমাকে বলুন। আমি মন দিয়ে—'

'প্রথমে কি বলব—'

'তাঁর চেহারাটা কি রকম ছিল বলুন আগে। আমি তাঁর মনোময় রূপ দেখেছি। দেখেছি সে রূপ আভাময়। তার থেকে বুঝেছি তিনি পুণ্যবতী। আপনি তাঁর সম্বন্ধে আরও বিশদ করে বলুন। প্রথমে তাঁর চেহারাটা বর্ণনা করুন।'

মুশকিলে পড়ে গেলাম। যে আমার সংগে প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিল, যার চেহারার খুঁটিনাটি সবই আমার জানা আছে, সহসা এখন অনুভব করলাম, বর্ণনা করে বিজ্ঞানীকে বোঝাতে পারব না সে দেখতে কেমন ছিল। চেহারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। প্রত্যেক মানুষের চেহারা আলাদা। আমরা চোখ দিয়ে সেটা মনে এঁকে রাখি, ক্যামেরা দিয়ে তার ক্ষণিকের ছবি তুলে রাখি, কিন্তু বর্ণনা করে তা অপরকে বোঝানো অসম্ভব।

বললাম, 'শুধু আমার চোখেই নয়, অনেকের চোখেই সুন্দরী ছিল সে। আমার মনে যে চিত্র আঁকা আছে তা অপরূপ। কিন্তু আপনার মনে সে চিত্র কথা দিয়ে কি করে আঁকব বুঝতে পারছি না। তবু বর্ণনায় যতটুকু বলা যায় বলছি। সে নাতিস্থূলা, নাতিদীর্ঘ, গোধূমবর্ণা ছিল। প্রায় সর্বদাই একটা মৃদু হাসি ফুটে থাকত তার মুখে, চোখের ভাষা ছিল অনুপম, তার মুখে প্রসন্নতার সংগে এমন একটা আনন্দের শ্রী ফুটে থাকত—'

'থাক, আর চেহারার বর্ণনা করবেন না। যতটুকু বললেন তার থেকেই কিছু একটা সৃষ্টি করতে পারব। এইবার তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

এবারেও মুশকিলে পড়লাম। বর্ণনা করে কি কারও চরিত্র বোঝানো যায়? ...। চরিত্র কেবল কতকগুলি গুণাবলী এবং দোষাবলীর তালিকামাত্র নয়। তার মধ্যে যে

প্রাণবন্ততা থাকে সেইটেই তার রূপ। কিন্তু সেটা তো অবর্ণনীয়। তবু বলতে লাগলাম।

'ওর সঙ্গে যদিও আমার অনেক সময় মতের মিল হয়নি, ছোট-বড় নানা বিষয় নিয়ে আমরা ঝগড়া করেছি, কিন্তু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনুভব করছি, ও যদি আমার জীবনে না আসত তাহলে আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না। সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও-ই সামলেছে, আমাকে অবসর দিয়েছে সাহিত্য-সাধনা করবার।'

সে হঠাৎ বলে উঠল, 'ও বাড়িয়ে বলছে—'

বিজ্ঞানী বললেন, 'ওঁকে বলতে দিন, বাধা দেবেন না।'

সে চুপ করে গেল।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম।

'কিছু বাড়িয়ে বলি নি। সংসার ওর ছিল, আমি সে সংসারে সম্মানিত অতিথির মত কাটিয়েছি। যা উপার্জন করতাম তা ওর হাতে তুলে দিতাম।' আর কিছু করি নি। অসময়ে নিজের খেয়ালখুশী মত বাজার করে এনে মাঝে মাঝে ওকে বিব্রত করেছি কেবল। আমাদের বড় পরিবারে ও-ই ছিল বড় বউ। বড় বউয়ের বৃহত্ত্ব ও বজায় রেখেছে বরাবর। ওর শ্বশুর, শাশুড়ী, জা, দেওর সবাই ভালবাসত ওকে। আত্মীয় পরিজন অতিথিদের ভীড়ও ছিল প্রচুর। শুধু মানুষ নয়, জানোয়ারও ছিল নানারকম—গরু, কুকুর, ভেড়া, খরগোশ, মুর্গী, হাঁস, গিনি ফাউল—এদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও-ই পোয়াত। চারটে গরুর দুধ নিজে দুইতো। এর মধ্যে ছেলেমেয়েদের পড়াত, আমার সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়ত এবং যেখানটা ভাল লাগত না আমাকে দিয়ে আবার লেখাত। ও যখন আই-এ ক্লাসের ছাত্রী তখন ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার। তারপর বাড়িতে পড়ে ও বি-এ পাশ করেছিল। বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যের বহু বই পড়েছিল। উঠত ভোর পাঁচটায়, রাত্রি বারোটার আগে শুতে আসত না। শিল্পের দিকে ঝোঁক ছিল খুব। ভাল গান গাইতে পারত, ভাল গানের রেকর্ড কিনত। ভাল ছবি, ভাল সাহিত্য, ভাল অভিনয়, ভাল সিনেমা খুব প্রিয় ছিল ওর। অসুখে পড়েও সিনেমা, থিয়েটার দেখে এসেছে—'

আবার বাধা দিল সে।

'এসব কথা বলার কোন মানে হয়—'

বিজ্ঞানী বললেন, 'আবার আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন? আমি ওর মধ্যে থেকে আমার সৃষ্টির উপাদান নেব। ওঁকে বলতে দিন।'

আমি আবার বলতে শুরু করলাম।

ওর আর একটা বৈশিষ্ট্য ও ঠাকুর-দেবতা মহাপুরুষদের ভক্তি করত খুব। ওর ছেলেবেলা নিবেদিতা স্কুলে শ্রীশ্রীসারদা মায়ের কাছে কেটেছে। সে প্রভাব ধন্য করেছে ওর জীবনকে। ওর শোওয়ার ঘরে বিছানার শিয়রের দিকে টাঙানো আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। ওর ঠাকুরঘরে অনেক ঠাকুরের পট, লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি, তাদের জন্য খাট-মশারি, তাদের ভোগ দেবার জন্য ছোট ছোট বাসন। পূজো করে অনেকক্ষণ বসে থাকত রোজ। কুসংস্কারও ছিল নানারকম। বৃহস্পতিবারের বারবেলা মানত, শনিবারে বাড়ি থেকে যেতে দিত না কাউকে। কাককে রোজ খেতে দিত। কারও অসুখ হলে সিন্নি মানত নানা দেবতার কাছে। মণিহারীর পীরবাবার উপর বিশ্বাস ছিল খুব। প্রায়ই সিন্নি মানত পীরবাবাকে। কুষ্ঠি মানত। প্রায়ই জানতে চাইত সে সধবা মরবে কি না। বুদ্ধিমতী ছিল খুব, দূরদর্শিনীও ছিল, কিন্তু মনের জোর একেবারে ছিল না।

বাড়িতে কোন বিপদ-আপদ হলে একেবারে ভেঙে পড়ত। কারো অসুখ হলে বা কারো অসুখের খবর পেলে রাত্রে ঘুম হত না। ছেলেরা যখন বিদেশে পড়াশোনা করত তখন চিঠি পেতে দেরী হলে ব্যাকুল হয়ে উঠত। চিঠি এসেছে কি না জানবার জন্য নিজে পোস্টাফিসে পর্যন্ত চলে যেত। বিদেশে ছেলেদের অসুখের খবর পেলে নিজে সেখানে চলে গেছে অনেকবার। শুধু নিজের ছেলেদের নয়, অপরের ছেলেদের অসুখও অস্থির করে তুলত তাকে। ঝি-চাকরের ছেলেমেয়েদের অসুখ হলেও সেই একই ব্যাপার। যতক্ষণ না তারা সুস্থ হচ্ছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হত আমাকে। প্রতি বছর পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়ের টিকে দেবার ব্যবস্থা করত সে। টিকেদারকে খবর পাঠিয়ে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে টিকে দেওয়াত সবাইকে। কারো কষ্টের খবর পেলে—তা সে আত্মীয় অনাত্মীয় যে-ই হোক—সেটা মোচন করবার চেষ্টা করত। অনেক গরীবকে সাহায্য করত সে, তাতে কেউ বাধা দিলে চটে যেত খুব। কোনরকম নীচতা সহ্য করতে পারত না। তার এই উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্য, তার রস বোধ, শিল্প-প্রীতি, ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তি—এসব তো ছিলই—অনেকেরই থাকে। কিন্তু এ ছাড়াও ওর চরিত্রে আরও দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি—যা অসাধারণ। মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। দেখতাম জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। মনে হত সে যেন পৃথিবীতে নেই, আর কোথাও চলে গেছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও সে বুঝতে পারত না আমি এসেছি। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত মহাশূন্যের দিকে। যদি প্রশ্ন করতাম, এখানে বসে কি দেখছ? সে চমকে উঠত। তারপর একটু হেসে বলত, আমরা সবাই একদিন ছবি হয়ে যাব, সেই কথাই ভাবছিলাম।

'এই বৈরাগ্যের সুর ছাড়া আর একটা সুরও লক্ষ্য করেছি তার চরিত্রে। উপমা দিয়ে বলতে হলে বলতে হয়—সেটা অগ্নির সুর, যে অগ্নি পাবক যে অগ্নি উজ্জ্বল। সেই অগ্নির সুর। কোনও হীনতা, কোনও নীচতা, কোনও পাপ, কোনও মিথ্যা, কোনও অনাচার, কোনও অভব্যতার সঙ্গে কখনও সে আপস করে নি। তার চারিত্রিক এই অগ্নি পুড়িয়ে ফেলত সমস্ত অপবিত্র জঞ্জালকে। কারও মধ্যে কোনও মালিন্য সহ্য করতে পারত না সে। তাই অনেকে তাকে ভয়ও করত, ভালও বাসত। আমাদের ... বাকর, মেছো গোয়ালা সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করেছিল ও। আমার সাহিত্যিক ... -বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, মুসলমান, ইয়োরোপীয়, এমন কি জাপানী—যাঁরা ... বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন—তাঁরা সকলেই প্রিয়জন ছিল ওর। সে কারও ... ও ভাবী, কারও মাতাজি ছিল। আর আমার জন্যে সে না করেছে কি। আমার অসু... ব্যস্তই যে হত! ভাল না হওয়া পর্যন্ত শান্তি থাকত না ও মনে। আমার ডায়াবিটিশ ... তাই আমার খাওয়া-দাওয়ার উপর কড়া নজর রাখত। বেশি মিষ্টি যেন না খেয়ে ... অথচ আমার জন্যে সে কত রকম রান্নাই শিখেছিল। যখন ওর সঙ্গে বিয়ে ... বেথুন কলেজে পড়ত, বরাবর বোর্ডিংয়ে মানুষ, কোন রকম রান্নাই জানত না। ... পর যখন ও আবিষ্কার করল আমি খাদ্যরসিক, ভোজনবিলাসী, তখন রান্না শিখ... ন, কত রকম রান্নাই যে শিখেছিল। কখনও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আমি ... নে যত সাহিত্য-সভায় গেছি, ও আমার সঙ্গে গেছে, কিন্তু সভায় কখনও আমার পাশে ... না। উত্তরপ্রদেশে, বিহার, উড়িষ্যায়, এমন কি রেঙ্গুনেও গিয়েছিল আমার ... রো দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেছি ওঁকে নিয়ে। রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা, ধনুষ্কোটি সর্বত্র ও

সহচরী ছিল। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আমার যখন গল্-ব্লাডার (Gall-bladder) অপারেশন হল ও আমাকে একা নার্সিং হোমে যেতে দিল না। শেষে আমার কেবিনে ওর জন্যেও একটা খাটের ব্যবস্থা করতে হল। তিন সপ্তাহ নার্সিং হোমে ছিলাম। আমার জন্যে 'ডে নার্স' 'নাইট নার্স' ছিল। ও কিন্তু দিবারাত্রি জেগে বসে থাকত অতন্দ্র প্রহরীর মত। অপারেশনের পর আমার অবস্থা একদিন খুব খারাপ হয়েছিল—ও কিন্তু বিচলিত হয় নি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি ভাল হয়ে উঠবই। যম তার কাছে থেকে আমাকে কিছুতেই কেড়ে নিতে পারবে না। সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে। ও আমাকে বার বার বলত—আমি তোমার আগে যাব। তুমি থাকবে না, আমি থাকব—এ হতেই পারে না। ভগবান এ শাস্তি আমায় কেন দেবেন, আমি তো কোনও পাপ করি নি। ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। আমি কিন্তু বড় একা হয়ে গেছি—'

আমি চুপ করলাম।

বিজ্ঞানী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি আপনার যে বর্ণনা দিলেন সেটা ঠিক হয়েছে তো?'

'বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছেন।'

বিজ্ঞানী বললেন, 'আমার সৃষ্টির উপকরণ আমি পেয়ে গেছি—এবার আমি সৃষ্টি করব। আপনাদের কিন্তু এখান থেকে সরে যেতে হবে। কেউ কাছে থাকলে আমি সৃষ্টি করতে পারি না।'

'কি সৃষ্টি করবেন আপনি? মূর্তি?'

'না, ছবি। জীবন্ত ছবি—'

'কোথায় ছবি আঁকবেন?'

'মহাকাশে। আপনারা কাছে থাকলে কিন্তু পারব না।'

'আমরা কোথায় যাব?'

বিজ্ঞানী চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু?'

'আগে পাচ্ছিলাম, এখন পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা স্নিগ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল আলোর মধ্যে রয়েছি।'

'ধ্রুবলোকে এলেনে হয় দেহ সহস্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অর্জন করে। আপনার স্ত্রী তা অর্জন করেছেন, কারণ কিছুদিন আগে তিনি ধ্রুবলোকে এসেছিলেন। আপনারা সামনের দিকে চেয়ে দেখুন তো একটা কালো মত কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?'

'হাঁ একটা বিরাট কালো মেঘের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে—'

ওটা মেঘ নয়। ওটা কালো দেখাচ্ছে, কারণ ওখানে কোনও নক্ষত্র নেই। নক্ষত্রের আলোও ওখানে পৌঁছয় না। কয়েক কোটি মাইল বিস্তৃত স্থান ওটা। ইচ্ছে করলেই ওর মধ্যে যাওয়া যায়। আমি একবার গিয়েছিলাম। কয়েক কোটি মাইল অন্ধকার পার হয়ে দেখতে পেয়েছিলাম এক আশ্চর্য নক্ষত্রপুঞ্জ। বহু বর্ণের বহু নক্ষত্র পুঞ্জীভূত হয়ে স্থির হয়ে আছে ওখানে। জিগেস করেছিলাম, 'কে আপনারা?' উত্তর পেয়েছিলাম, 'আমাদের নাম পুরু, আমাদের ভুলে গেছ তোমরা। আমরা ক্রমশ অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছি।' অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে। আপনারা সেইখানে চলে যান, গল্প করে অনেকক্ষণ সময় কেটে যাবে। আপনারা মনোময় দেহ ধারণ করে আছেন, আপনারা ইচ্ছে করলেই ওর

মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবেন। ওই পুরাণপুঞ্জের কাছে পৌঁছতেও বেশি সময় লাগবে না। কেউ ওদের কাছে গেলে ওঁরা খুব খুশী হন!'

সে বলল, 'চল--'

সে বরাবর আমার হাত ধরেই ছিল। এক মুহূর্তের জন্য ছাড়েনি।

তার মনোময় দেহের নিবিড় স্পর্শের ভিতর দিয়ে অনুভব করছিলাম তার আকুলতা। সে যেন সর্বদা সোৎসুকে প্রতীক্ষা করছিল--এর পর কি হয়। আমার বাঁ হাতের কব্জিটা দৃঢ়ভাবে ধরেছিল সে। আমার মনোময় সূক্ষ্ম দেহ থেকে কি করে হাত বের হল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। সে যা বলেছিল তাই মেনে নিয়েছিলাম। প্রবল ইচ্ছায় সবই হওয়া সম্ভব।

'চল, আর দেরী করছ কেন।'

আমি তখন বিজ্ঞানীকে জিগ্যেস করলাম, 'কি করে বুঝব যে আপনার সৃষ্টি শেষ হয়েছে?'

'আমি খবর পাঠাব। একটা আলোর রেখা গিয়ে আপনাদের চোখের সামনে দাঁড়াবে। পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জকেও আমি খবর পাঠাচ্ছি। তাঁরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

আমরা আর কালবিলম্ব না করে যাত্রা করলাম সেই কালো স্থানটার উদ্দেশে। মহাশূন্যে ধ্রুবলোকে পার হয়ে সে যাত্রা যে কি অপরূপ, কি বিস্ময়কর, তা বর্ণনা করা যাবে না। ডাইনে, বাঁয়ে, মাথার উপর, পায়ের নীচে অগণিত নক্ষত্র। দূরে দূরে দ্বীপের মত অসংখ্য নীহারিকা। ধ্রুবনক্ষত্রের কাছে থুবান (Thuban) নক্ষত্রটিকে দেখতে পেলাম। পৃথিবী থেকে খুব ছোট দেখাত, এখন দেখলাম খুব প্রকাণ্ড নক্ষত্র সেটি। মনে হল আমরা যেন, জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের অরণ্য পার হচ্ছি। চারিদিকে যেন অগ্নির মহোৎসব চলছে। কিছুক্ষণ পরে সেই অন্ধকার স্থানটায় এসে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে যেটাকে ছোট কালো মেঘ বলে মনে হচ্ছিল, কাছে এসে দেখলাম অতি বিশাল গুহার মুখ একটা। সে মুখের পরিধি তা আন্দাজ করাও শক্ত। হয়তো কয়েক কোটি মাইল। আদি অন্তহীন নিবিড় অন্ধকার-লোকের সামনে স্তম্ভিত হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর মনে হল সেই অন্ধকার-লোক থেকে নীরব একটা বাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের মনের ভিতর। অদ্ভুত সে বাণী। আমাদের ভাষায় তা অনুবাদ করি যদি, অর্থহীন মনে হবে। মনে হল সেই অন্ধকার যেন ক্রমাগত জপ করে যাচ্ছে--'কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই ‥ আছে, কিছু নেই সব আছে--'

আমরা ভি৩‥ ঢুকে পড়লাম।

॥ দশ ॥

চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে অবিরাম সেই বাণী--কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই সব আছে। মাঝে মাঝে, চাপা কান্না, চাপা হাসিও শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাদের মনোময় দেহ খুব দ্রুতবেগেই যাচ্ছিল তবু মনে হচ্ছিল যেন যুগযুগান্তর পার হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একটি জ্যোতির্ময়ী মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। তিনি ফিরছিলেন। আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াতে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল ইনি মানবী নন,

দেবী। মনে মনে প্রণাম করে প্রশ্ন করলাম—'আপনি কে ? আমরা পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে যেতে চাই, আর কতদূর যেতে হবে বলতে পারেন ? আগে বলুন আপনি কে ? মনে হচ্ছে স্বর্গের দেবী আপনি।'

'না আমি স্বর্গের কেউ নই। আমি মর্ত্যের। আমার নাম সাবিত্রী। বহুকাল আগে আর্যাবর্তে আমার বাড়ি ছিল—'

'ও, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি সতীকুলশিরোমণি। ছেলেবেলায় আপনার গল্প পুরাণে পড়েছি। আপনি যমের কবল থেকে আপনার স্বামী সত্যবানকে উদ্ধার করেছিলেন—'

'ওটা ভুল গল্প। যম আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেন নি। যম মানে নিয়ম। যম ইচ্ছা করলেও নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। তবে তিনি আমার আকুলতা দেখে খুব বিচলিত হয়েছিলেন। আমাকে হঠাৎ তিনি বর দিয়ে ফেললেন, 'তুমি ফিরে যাও, তুমি শত-পুত্রের জননী হবে।' আমি তখন বললাম, 'আমার স্বামীকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, শত-পুত্রের জননী হব কি করে ?' যম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'তোমার স্বামীর আয়ু নিঃশেষ হয়েছে। তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তোমার স্বামীর দেহ এখনও পড়ে আছে, আমি বর দিচ্ছি তোমার স্বামীকে তুমি আবার সৃষ্টি করতে পারবে। তোমার প্রবল আকুলতাই তোমার স্বামীর মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে।' আমি তাই করেছিলাম। কিন্তু আমরা যে নীহারিকায় বাস করি, কাল সেখানে একজন সতী রমণী এসেছেন আর্যাবর্ত থেকে। তাঁর মুখে শুনলাম তিনিও নাকি পুরাণে পড়েছেন যে যম নাকি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আজ আমি ওই অন্ধকার-লোকে এসেছিলাম পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে। অতীতের প্রাচীন পুরাণকাররা নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে আছেন এখানে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম তাঁদের পুরাণে এ ভুল কেন এবং তা এখন সংশোধন করা যাবে কিনা। তাঁরা বললেন, আমরা ঠিকই লিখেছিলাম, কিন্তু মানুষরা কালক্রমে গল্পটাকে নিজেদের খুশীমত বদলে নিয়েছে। আমরা লিখেছিলাম হাতে, এখন ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হচ্ছে সব। ভূর্জপত্র থেকে নকল করবার সময় ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে। অনেকে নিজেদের খুশী মত অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছি ওর মধ্যে। আর সে সব কাহিনী বহু লোকের মনে গাঁথা হয়ে গেছে বহুদিন ধরে। ও আর সংশোধন করা যাবে না। এই উত্তর নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করা তাহলে সম্ভব ?'

'প্রবল আকুলতা, অদম্য ইচ্ছা, আর নির্মল নিষ্ঠা থাকলে সবই সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি তখন উদ্বুদ্ধ হন। তিনিই সৃষ্টি করেন। আপনারা পুরাণ নক্ষত্র-পুঞ্জের কাছে যাচ্ছেন কেন ?'

'কিছু সময় কাটবার জন্য। একজন বিজ্ঞানী ধ্রুবলোকে আছে। আমার স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আমার পাশেই মনোময় দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—'

'দেখতে পেয়েছি। ওঁর শরীরের আভা থেকে বুঝতে পারছি উনি পুণ্যবতী। আপনি কি করে এখানে এলেন ?'

'বহু চেষ্টার পর আমি আমার মনকে আমার দেহ থেকে বার করে আনতে পেরেছি। সেই বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে আমার স্ত্রী বিবরণ দিয়েছি তাঁকে। তিনি বললেন, যে উপকরণ তিনি পেয়েছেন তার থেকে কিছু একটা সৃষ্টি করতে পারবেন। তিনি এখন সেই সৃষ্টিকার্যে

ব্যাপৃত আছেন। তাই আমরা তাঁর আদেশে তাঁর কাছ থেকে সরে এসেছি। তিনিই বললেন, আপনারা পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে যান, নানারকম গল্প শোনাবেন তাঁরা, আপনাদের সময় বেশ ভালভাবেই কেটে যাবে।'

সাবিত্রী বললেন, 'তা যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানীর কি প্রয়োজন ছিল? আপনিই তো সৃষ্টি করতে পারতেন আপনার স্ত্রীকে! কিন্তু তাকে আর মর্ত্যে ফিরে পাবেন না, কারণ তার দেহ দাহ করা হয়ে গেছে। আমার স্বামীর দেহ ছিল তাই তাকে আমি দেহসুদ্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তাকে মনোলোকে সৃষ্টি করতে পারবেন। দেখুন বিজ্ঞানী কি করেন। আমি চললাম–'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমি থাকি ছোট্ট একটা নীহারিকার মধ্যে। মর্ত্যের বিজ্ঞানীরা দূরবীণ দিয়েও এর নাগাল পায় নি এখনও।'

'একা থাকেন সেখানে?'

'না। আমার সঙ্গে আছেন সীতা, সতী, দময়ন্তী। আজ আর একজন এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে খুব। কিন্তু এই অন্ধকার সহ্য করতে পারছি না। চলে যাচ্ছি তাই।'

'আপনারা যেখানে থাকেন সেখানে আমরা যেতে পারি কি?'

'তা তো জানি না আমি। কে কোথায় থাকবে তা ঠিক করেন কে তা তো জানি না। মৃত্যুর পর সারা আকাশে ঘুরে বেড়াতে হয়–আপনার স্ত্রী যেমন বেড়াচ্ছেন, তারপর পুনর্জন্ম যদি না হয়, তিনি ক্রমশ একটি বিশেষ নীহারিকা-লোকের অধিবাসী হয়ে যাবেন। কি করে যাবেন তা জানি না। এখানে কিছু স্পষ্ট, কিছু রহস্যময়। আচ্ছা, এবার যাই আমি–'

অপরূপ দ্যুতি বিকিরণ করতে করতে চলে গেলেন সাবিত্রী। একটা চলমান জ্যোতি যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'চল–'

'চল। তুমি একেবারে চুপ করে আছ যে?'

সে কোনও উত্তর দিল না। আমার হাতটা আরও জোরে চেপে ধরল শুধু।

অবশেষে পৌঁছলাম পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে। মনে হল একটা বিশাল মৌচাক যেন শূন্য থেকে নেমে এসেছে সেই তিমির-লোকে। সেই মৌচাকে নানাবর্ণের অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। মৌচাকের উপর যেমন অসংখ্য মৌমাছিরা বসে থাকে, এখানে তেমনি আছে নানাবর্ণের জ্যোতিষ্ক। তারা এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে মনে হয় তারা যেন জমে গেছে, পরস্পর পরস্পরের অঙ্গীভূত হয়ে একটা পরমাশ্চর্য দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। আমরা নিকটবর্তী হতে সেই নক্ষত্রপুঞ্জই সম্বোধন করলেন আমাদের।

'বিজ্ঞানী তপস্বী বুঝি আপনাদের পাঠিয়েছেন? আসুন, আসুন, স্বাগত–'

ওই বহুবর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কে যে আমাদের স্বাগত জানালেন বুঝতে পারলাম না। সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জটাই যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। মনে হল আমাদের আগমনে আনন্দিত হয়েছেন ওঁরা। ব্যক্তও করলেন সেটা।

'অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছি আমরা। বদলেও গেছি। আগে ছিলাম ইতিহাস, এখন হয়েছি রূপকথা। সে রূপকথাও শুনতে আসে না কেউ। শ্মশানে শৈব্যোর হাহাকার

আমরাই শুনি, আমরাই কেবল দেখি রাজা শিবি নিজের দেহের মাংস শ্যেনপক্ষীকে দান করেছেন, মহারাজা কর্ণ ছদ্মবেশী ভগবানকে আতিথেয়তায় তুষ্ট করছেন নিজের পুত্র বৃষকেতুকে বলিদান দিয়ে। আমরাই শুধু দেখতে পাচ্ছি মহর্ষি দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করেছেন। আমরাই শুধু দেখছি এসব। আর কেউ দেখে না, দেখতে চায় না। যে সভ্যতার হর্ম্য আজ তারা নির্মাণ করছে, তার ভিত্তি যে কোথায় তা জানবার আগ্রহ তাদের নেই। বসুন, আপনারা এসেছেন, এতে ভারি খুশী হয়েছি আমরা।'

বললাম, 'আমরা তো শূন্যে রয়েছি, কোথায় বসব?'

'আসন আছে। অন্ধকার জমে গিয়ে শক্ত হয়ে গেছে আমাদের চারিদিকে। সেখানেই বসুন আপনারা। মনোময় দেহেরও ক্লান্তি আসে। আপনারা বসুন। না বসলে গল্প জমবে না। বসুন।'

যদিও আমাদের দেহ ছিল না, তবু উপবেশন করবার প্রয়াস করলাম। একটু আরামও পেলাম যেন। মনে হল একটা পাথরের চাঙড়ের উপর বসেছি।

এখানেও মনে হল সেই, 'সব আছে, কিছু নেই', শব্দটা ফিস ফিস করে কে যেন বলছে।

প্রশ্ন করলাম নক্ষত্রপুঞ্জকে।

'এখানে যে কেন ফিস ফিস করে সর্বদা বলছে, সব আছে, কিছু নেই, সব আছে, কিছু নেই। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি। সর্বদা পাচ্ছি। বহু প্রাচীনকালের কোনও দার্শনিক কবির জীবনের উপলব্ধি ওই বাণী-রূপ ধরে এই অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর সরল অর্থ—জগতে সবই পরিবর্তনশীল! আজ যে জগৎ আপনারা দেখছেন তা কিছুকাল পরে আর থাকবে না, কিন্তু লুপ্তও হবে না। অন্যরূপে থাকবে। যাকে আমরা মৃত্যু বলে মনে করি, তা বিলুপ্তি নয়, তা পরিবর্তন। পরিবর্তন না হলে সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য থাকত না। সব একঘেয়ে একরঙা হয়ে যেত। ওই মহাকবির বাণী তাই বলছে—সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল তত্ত্ব ওটা। আপনি ভাবছেন আপনার স্ত্রী মারা গেছেন, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছেন তার আভাময় আর একটি মনোময় রূপ। ওই বিজ্ঞানী হয়তো অণু-পরমাণু দিয়ে ওঁর আর একটা রূপ তৈরি করবেন, কিন্তু আপনি তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলেন সে ভাবে পাবেন না আর। ঠিক একরকম সৃষ্টি দুবার হয় না। এক গাছের দুটি পাতা ঠিক একরকম নয়—'

তার হাতের স্পর্শ দৃঢ়তর হল এ কথা শুনে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জ বলতে লাগলেন, 'ওই বিজ্ঞানী কিন্তু একজন মেধাবী তপস্বী। সম্প্রতি উনি একটা আলোর পরী তৈরী করেছেন। পরীটা ফাজিল, মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে ভয় দেখায়। বলে, আপনাদের তপোভঙ্গ করব। আমরা বলি, কর না। করলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু আমাদের তপ আর নেই। আমরা এখন শুধু। আমরা স্থাণু, আমরা জীবন্মৃত, আমাদের অস্তিত্ব জমে গেছে। মহাকালের হাতুড়ি ছাড়া, আর কিছু দিয়ে তা ভাঙা যাবে না। পরীটা হাসতে হাসতে পালিয়ে যায়। বিজ্ঞানীর এ সৃষ্টিটি অপরূপ হয়েছে। এই বিরাট মহাকাশে একটি উজ্জ্বল কণিকার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। যখন আমাদের কাছে আসে খুব ভাল লাগে—'

থেমে গেলেন নক্ষত্রপুঞ্জ। ওদের মধ্যে কে যে কথা কইছেন তা বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল ওই বিরাট মৌচাকটাই যেন উত্তর দিচ্ছে আমার প্রশ্নের।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'এই যে বিরাট মহাসৃষ্টি এ কি করে হল সে সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আছে কিছু–'

'সৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না।' আমাদের যে ধারণা আছে তার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী মহর্ষিদের উক্তি। সে উক্তির সত্যতা যাচাই করবার উপায় নেই। আমরা তাঁদের উক্তি বিশ্বাস করেছি। কারণ তাঁরা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। তাঁরা যা বলেছেন তাই শুনুন। এ সৃষ্টি যখন শুরু হয় তার বহু কোটি বৎসর পরে জন্ম হয় প্রাণীদের। এ সৃষ্টির আদিলীলা কেউ দেখে নি। নানারকম ঋষি নানারকম অনুমান করেছেন। তবে সবাই এটা স্বীকার করেছেন যে সৃষ্টি যখন হয়েছে তখন স্রষ্টাও আছেন। তবে সে স্রষ্টা আমাদের মত মানুষ নন। তিনি নিরাকার মহাশক্তি। তিনি স্বয়ম্ভু। আমাদের পূর্ববর্তী তপস্বীরা তার নাম দিয়েছিলেন ব্রহ্ম। তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, নিরাকার, নির্বিকার। এই নিরাকার নির্বিকার মহাশক্তির ইচ্ছা হল–আমি বহু হব। সেই ইচ্ছাই নাকি রূপ ধারণ করেছে মহাবিশ্বে। কি করে এ মহাবিশ্ব হল তা কেউ জানে না। একজন কবি এ বিষয়ে অদ্ভুত একটা কল্পনা করেছিলেন। সেটা আমাদের বলেছিলেন তিনি। সেটা শুনুন। তাঁর মতে ব্রহ্মের এই ইচ্ছা প্রথম রূপ ধারণ করেছিল তেজরূপে। সেই তেজ ক্রমশঃ অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর মতে সমস্ত আকাশ জুড়ে সেই অগ্নির শিখা কোটি কোটি বছর ধরে দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। তারপর সেটা কোটি কোটি বছর ধরে ঠান্ডা হল এবং অবশেষে কঠিন হয়ে গেল। সমস্ত আকাশটা তখন বিরাট দিগদিগন্তব্যাপী উত্তপ্ত মাঠের মত রইল কিছুদিন।

কিছুদিন মানে–কোটি কোটি বৎসর। তারপর বিপুল একটা বিস্ফোরণে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কত দিকে তার ঠিক নেই। মাত্র সেই ফাটা টুকরোগুলোই নক্ষত্র নীহারিকার আদি রূপ। তারা পরস্পরের আকর্ষণে বহুকাল ঘুরেছে। তারপর তাদের বর্তমান রূপ হয়েছে। অধিকাংশ নক্ষত্র জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড। তবে আসল কথাটা তো আগেই বলেছি–সত্য কি তা কেউ জানে না। এক একজন ঋষি নিজেদের ধ্যানে বা নিজেদের মেধাবলে যা উপলব্ধি করেছেন তাই বলেছেন। সকলের মত একরকম নয়। নানা মুনির নানা মত। আপনার যেটা খুশী মানতে পারেন। ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। তবে এটা মানতে হবে, যে মহাবিশ্ব আমরা দেখছি সেটা বিস্ময়কর এবং আরও বিস্ময়কর যে সেটা একটা বাঁধা নিয়মে চলছে। আমি তো এই বিরাট বিশ্বকেই ভগবান বলে মানি। যাক, আপনাদের দেখে খুব খুশী হলাম। বিজ্ঞানীর কাছে আপনাদের গভীর প্রেমের কাহিনীও শুনলাম। খুব ভাল লাগল। আপনার বাহাদুরি আছে, দেহ থেকে মনটাকে বার করে এত দূরে চলে এসেছেন–'

বললাম, 'ওর জোরেই এসেছি। বড় একগুঁয়ে। যেটা ধরে সেটা করে তবে ছাড়ে–'

সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার কথা বলল।

'একগুঁয়ে আমি, না তুমি ? ক্রমাগত আমাকে ডাকছিল কে ? মরবার পরও শান্তি দাও নি। সর্বদা তোমার পাশে থাকতে হয়েছে–ক্রমাগত বলছ তোমাকে আমি আবার সৃষ্টি করব। শেষে বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা হল একদিন–'

পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জ বললেন, 'জানি জানি জানি, সব জানি। সব খবর পেয়েছি বিজ্ঞানীর কাছে থেকে। আমরা আরও খুশী হয়েছি আপনারা আর্যাবর্তের লোক বলে। আর্যাবর্তের কাব্যে প্রেমের মহিমা যেভাবে চিত্রিত, অন্য দেশের কাব্যে তেমন ভাবে নেই। আছে, কিন্তু

অত উজ্জ্বল নয়। গ্রীক কাব্যে তো খালি কাম, প্রতিহিংসা আর হত্যার তান্ডব। আকাশের নক্ষত্রেও প্রেমের কাহিনী ছড়ানো আছে। আর ওই একই নক্ষত্রমন্ডলের নাম আর তাদের ঘিরে যে-সব গল্প আছে তার থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তফাতও বোঝা যায়। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ওই যে প্রকান্ড নক্ষত্রমন্ডলটা ঘুরছে আমরা তার নাম দিয়েছি সপ্তর্ষিমন্ডল, আর পাশ্চাত্ত্য দেশে ওর নাম বড় ভালুক। পাশ্চাত্ত্য দেশে ও নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত সেটাও খুব উঁচুদরের কাহিনী নয়। গ্রীক দেবতাদের রাজার নাম জিউস আর তাঁর পত্নীর নাম জুনো। জুনোর এক সহচরী ছিল যার নাম কালিস্টো। জুনোর চেয়ে ঢের বেশী রূপবতী ছিল সে। হিংসুকে জুনো এটা সহ্য করতে পারছিল না। জিউসেরও দুর্বলতা ছিল মেয়েটির প্রতি। জুনো তাই কালিস্টোকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিল। জিউস তখন কালিস্টোকে বাঁচাবার জন্য তাকে প্রকান্ড এক ভালুকে রূপান্তরিত করে আকাশে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের সপ্তর্ষিমন্ডলের গল্পেও প্রেমের ছোঁয়াচ আছে একটু। সপ্তর্ষির সাতটি ঋষির নাম—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচি। এঁদের সাত পত্নী ছিলেন পরম রূপবতী। স্বয়ং অগ্নি এঁদের প্রেমে পড়ে গেলেন। অগ্নির আর একটি প্রণয়িনী ছিলেন। তাঁর নাম স্বাহা। তিনি তাঁর দয়িতের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। তিনি যখন দেখলেন অগ্নি ওই ঋষি-পত্নীদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁদের পাচ্ছেন না, তখন স্বাহা এক অদ্ভুত কান্ড করে বসলেন। প্রত্যহ একটি ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন তিনি। কিন্তু বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী এত বেশি সতী ছিলেন যে স্বাহা কিছুতেই তাঁর রূপ ধারণ করতে পারলেন না। বাকী ছ'জন ঋষি-পত্নীর নামে নানারকম কুৎসা ওঠাতে ছ'জন ঋষি তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্তন করে দিলেন। তারা কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে আকাশে আলাদা হয়ে আছেন। অরুন্ধতী কিন্তু এখনও আছেন বশিষ্ঠের পাশে। সপ্তর্ষিমন্ডলকে নিয়ে দু' দেশের দু' রকম গল্প। এই দুটো গল্প থেকে দু' দেশের চরিত্র বোঝা যায়।

পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা শিকার-প্রিয় তাই তাদের নক্ষত্রের নামও বড় বড় শিকারী বা বীরের নাম। আমরা যাকে কালপুরুষ বলি, ওদের চোখে সে একজন শিকারী মাত্র। আমাদের কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলে আছে—ব্রহ্ম তারা, দুর্গা তারা, রুদ্র তারা, অগ্নি তারা, বৃহস্পতি তারা, অদিতি তারা, কার্তিক তারা, ধর্ম তারা, গণেশ তারা, যমুনা তারা, অনন্ত তারা। ওদের শিকারী 'ওরায়ন' মন্ডলে শিকারীর কোমরবন্ধ, সেখান থেকে তলোয়ার ঝুলছে, হাতে ধনুক, পিছনে কুকুর, সামনে ষাঁড়। আমাদের নক্ষত্রমন্ডলের নামকরণে আমরা স্থান দিয়েছি দেবতাদের আর ঋষিদের। ওদের খালি শিকারী আর জানোয়ার নিয়ে কারবার। আমাদের পুরাণেও বড় বড় বীরের নাম আছে—অর্জুন, ভীম—কিন্তু আমাদের নক্ষত্রমন্ডলে ভীম মন্ডল বা অর্জুন মন্ডল নেই। ওদের আছে—পারসিউস, হারকিউলিস। ওদের জন্তু-জানোয়ার অনেক বেশি। আমাদের রাশিচক্রেও অবশ্য জন্তু-জানোয়ার আছে। ওটা বোধহয় আমরা নিয়েছি বিদেশ থেকে। রাশিচক্রে মিথুন, কন্যা, ধনু, তুলা আর কুম্ভ ছাড়া সবই জন্তু-জানোয়ারদের নাম। রাশিচক্রের নক্ষত্রগুলিতে আমরা ওদের নকল করেছি। জ্যোতিষ্ক-চর্চার সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষ-চর্চা মিশে গেছে। আমরা ছায়াপথকে বলি আকাশগঙ্গা, ওরা বলে দুধের পথ। এসব থেকে মনে হয় আর্যাবর্তের লোকেরা বেশি ধর্মপ্রবণ—'

আমি বললাম, 'আর্যাবর্ত বলে কোনও দেশ আর নেই। সে দেশের লোকেদের মতি-

গতিও বদলে গেছে। অধিকাংশ লোকই অধার্মিক—'

'আর্যাবর্ত বলে কোন দেশ নেই আর?'

'না। ভারত, হিন্দুস্থান আর ইণ্ডিয়া এই তিনটি নামেই পরিচিত এখন আমাদের দেশ।'

'তা হোক। সুবর্ণের নাম কনক, স্বর্ণ, সোনা। কিন্তু বস্তুটির রূপ গুণ বদলায় নি। অন্তরের অন্তস্থলে খোঁজ করে দেখুন, দেখবেন সনাতন আর্যাবর্ত বেঁচে আছে, যার জীবনের মূল লক্ষ্য ধর্ম, প্রধান আনন্দ ধর্মে। অধার্মিক লোক সব যুগেই ছিল। রাবণ কংসেরা সব যুগেই জন্মায় আর সব যুগেই মারা যায়। তাদের মারেন যম, যার অপর নাম ধর্ম। আপনাদের মন ধর্ম-মুখী, তা প্রেমের সুরে বাঁধা। আপনি যে কান্ডটা করেছেন তার মূলে আছে ধর্ম-বিশ্বাস, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় আস্থা। আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনার ধর্মপত্নী আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনী। আপনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পর তিনি অবলুপ্ত হন নি, মনোময় দেহ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহাকাশে। এ বিশ্বাস আছে বলেই আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন এত দূরে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আপনি তাঁকে সৃষ্টি করতে চাইছেন কেন?'

আমি বললাম, 'আমার কল্পনা কৌতূহল আর বিরহ আমাকে এ কাজে প্রবৃত্ত করেছে। আমার মধ্যে যে স্রষ্টা ঈশ্বর আছেন তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন—'

'ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি রকম? তিনি আপনার ফরমাস মত আপনার স্ত্রীকে সৃষ্টি করে দেবেন?'

'স্বয়ং ঈশ্বরকেই তো আমরা সৃষ্টি করেছি। নানা লোকের কাছে তাঁর নানা রূপ। তাই আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা! সকলকেই আমরা সৃষ্টি করেছি আমাদের কল্পনায় আর বিশ্বাসে। কারো কাছে ঈশ্বর মা, কারো কাছে পিতা, কারো কাছে নিরাকার ব্রহ্ম, কারো কাছে সুবিরাট শক্তিপুঞ্জ। এ সৃষ্টি করে আমরা তৃপ্তি পেয়েছি। আমার কাছে তিনি সর্বশক্তিমান খেয়ালী শিল্পী। নিয়ত ভাঙছেন আর গড়ছেন। আর আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে তিনি আছেন। সকলের মধ্যেই আছেন। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, কোনও বস্তুই অবলুপ্ত হয় না। তার শেষ পরিণতি অতি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকণায়। সেই বিদ্যুৎকণারাই আবার নূতন বস্তু সৃষ্টি করে। ওই বিজ্ঞানী বলেছেন তিনি আমার স্ত্রীকে সৃষ্টি করে দেবেন। আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছি—'

'খুব আনন্দ হচ্ছে আপনার কথা শুনে। আপনি যা বললেন তার সঙ্গে আমাদের মতের মিল আছে। বিদ্যুৎকণা থেকেই স্রষ্টা আবার সৃষ্টি করবেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর মনের মধ্যে যে স্রষ্টা আছেন তাঁর সৃষ্টি আপনার মনের মত না-ও হতে পারে। যদি না হয় তখন আপনি কি করবেন?'

'তখন আমি নিজেই চেষ্টা করব। নিজেই তপস্যা করব।'

'বাঃ বাঃ! খুব খুশী হলাম আপনার কথা শুনে। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করতে হলে ধ্রুবলোকে আপনাকে তপস্যা করতে হবে। ধ্রুববিশ্বাস না থাকলে তপস্যা সফল হয় না। ধ্রুবলোকে তপস্যা করলে সে বিশ্বাসও আপনি পাবেন। ধ্রুবলোকে অনেক বসু আছেন। বসুরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তেজ ও জ্যোতি। তাঁদের কাছ থেকে আপনি সৃষ্টির প্রেরণা পাবেন। ওই বিজ্ঞানী বহুকাল তপস্যা করেছেন ধ্রুবলোকে।'

সে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। এইবার বলে উঠল, 'আমিও কিন্তু যাব তোমার সঙ্গে।'

পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জ বললেন, 'নিশ্চয় যাবেন।'

আমি বললাম, 'স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে কি তপস্যা হয়?'

'কেন হবে না।'

ঠিক এই সময় একটি জ্যোতির্ময় আলোকরেখা আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

বুঝলাম বিজ্ঞানী আমাদের ডাকছেন।

।। এগার ।।

আমরা চলমান রেখাটির অনুসরণ করে সেই বিরাট অন্ধকার-লোক পার হয়ে বিজ্ঞানীর কাছে এসে পৌঁছলাম।

'ওই দেখুন—'

মনোময় দেহের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যা দেখলাম তা সত্যিই একটি বিরাট সৃষ্টি। মানুষ নয়, একটা দেশ। আকাশপটে রাঙানো রয়েছে অপূর্ব একটা দেশের ছবি। আ-দিগন্ত সবুজ চারিদিকে। বহুদূরে যেন সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের উপর উড়ছে সিন্ধু-শকুনরা, মাঝে মাঝে ফেন-মুকুটিত উত্তাল তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে দু'একটা। আর একদিকে নীল রঙের একটি পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে ঝরনা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবুজ মাঠের মধ্যে। সৃষ্টি করেছে ছোট একটি নদী। সে নদী বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। নদীর দুই তীরে ফুল ফুটে রয়েছে অসংখ্য। নানারঙের ফুল। মনে হচ্ছে নদীর দুই তীরে যেন পাড় বুনে দিয়েছে কোনও নিপুণ শিল্পী আর চারিদিকে একটা মৃদু সুর গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে সমস্ত দেশটাই যেন করুণ সুর আলাপ করছে একটা। ফিকে কমলা রং আবৃত করে আছে চতুর্দিকে। তা রোদের মত তীব্র নয়, জ্যোৎস্নার মত নিবিড় নয়, তা স্বচ্ছ, সুন্দর ও মৃদু। তা অপরূপ। আকাশ আলোর ঝালর দিয়ে ঢাকা। সে আলোও তীব্র নয়, মৃদু। এই স্বপ্নময় পুরীর একধারে সবুজ মাঠের মধ্যে একটি মর্মর মন্দির রয়েছে। মন্দিরের চারিপাশে বিস্তৃত বারান্দা। মন্দিরের সামনে একটি উৎস এবং উৎসকে ঘিরে জলাশয় একটি। উৎসর ঊর্ধ্বমুখী জলধারা নীলাভ, জলাশয়ের জল নীল। সেই জলাশয়ের উপর কয়েকটি শ্বেত রাজহংস ভাসছে। মন্দিরের আর এক পাশে একসারি গাছ, প্রত্যেক গাছে ফুল, নানারকম ফুল। শুধু গন্ধ নয়, বর্ণ-বৈচিত্র্যেও অভিনব। প্রতি গাছে পাখীও অনেক রকম, তাদের গানে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। সবুজ মাঠের ভিতর দিয়ে দুটি হরিণ ছুটতে ছুটতে এল। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আবার ছুটে চলে গেল। মন্দিরের কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন একটি অপরূপ রূপসী। তার পিছু পিছু দেবশিশুর মত কয়েকটি ছেলেমেয়ে। আর এলো কয়েকটি সাদা খরগোস। মেয়েটি রূপসী, খুবই রূপসী, মুখের ভাব অনেকটা ম্যাডোনার মত। পরিধানে গাউন। পরক্ষণেই একটি দাসী প্রকান্ড একটি ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ করল এবং ঝুড়িটি রেখে চলে গেল আবার ভিতরে। মহিলাটি আপেল বার করে দিলেন ছেলেমেয়েদের। আর কপিপাতা বের করে দিলেন খরগোসদের। তারপর মুঠো মুঠো শস্য ছড়াতে লাগলেন বারান্দার চারিপাশে। উড়ে এল ময়ূরের দল, উড়ে এল অনেক পায়রা, উড়ে এল আরও নানারকম পাখী।

বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মনোমত হয়েছে তো?'

বললাম, 'সৃষ্টিটি আপনার অতি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আমি যা চাইছি তা হয় নি। ওই রূপসী মহিলার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই।'

'নেই?'

'না। আপনি যাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি স্বর্গের দেবী। আমার স্ত্রী নন।'

'না হওয়াই সম্ভব। কারণ তাঁকে আমি দেখি নি। তাঁর মনোময় রূপটাই দেখেছি। মনে হয়েছে তিনি দেবীই। একজন দেবীর উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছি। আপনার পছন্দ হল না? এজন্য আমি খুব দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—'

'আপনার কাছে আমি যে এজন্য কত কৃতজ্ঞ তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এ ছবিটা তাহলে কি হবে?'

'এটা আমি মুছে ফেলছি এখনি।'

'মুছে ফেলবেন? কি করে?'

'যে শক্তিবলেই অসংখ্য বিদ্যুৎকণাকে একত্রিত করে এটা সৃষ্টি করেছিলাম সেই শক্তিবলেই এদের আবার বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেব মহাকাশে। দেখুন না—'.

বিজ্ঞানীর মনোময় দেহ থেকে একটা অদ্ভুত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সবিস্ময়ে দেখলাম মুছে যাচ্ছে ছবিটা। আকাশের পটভূমিকায় আবার ফুটে উঠছে নক্ষত্ররা।

বিজ্ঞানী বললেন, 'আপনার মনোমত সৃষ্টি আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমি পারব কি?'

'কেন পারবেন না। কিন্তু আপনাকে তপস্যা করতে হবে ধ্রুবলোকে। কোনও বসুর যদি কৃপা লাভ করতে পারেন তাহলে আপনার ধ্যানের প্রতিমাকে বিদ্যুৎকণা দিয়ে মূর্তিমতী করতে পারবেন আপনি। তপস্যা মানেই আগ্রহময় আকুলতা। তার অসীম শক্তি। গ্রীক পুরাণে শিল্পী পিগম্যালিয়ন তাঁর স্বহস্ত-নির্মিত প্রস্তর-প্রতিমাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন এবং তপস্যার জোরে জীবন্তও করেছিলেন তাঁকে—'

'এসব অসম্ভব গল্প কি সত্য?'

'আপনি গণিতের প্রমাণ দিয়ে যদি মাপেন তাহলে এটাকে সত্য বলা শক্ত। কিন্তু গণিতের প্রমাণ দিয়ে সব জিনিস মাপা যায় না। অনুভূতির মাপকাঠিতে তা মাপতে হয়। আপনি আপনার স্ত্রীকে যে ভালবাসেন এটা কি অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যাবে? তা অনুভব করতে হবে। মানুষ আজ লোহাকে সোনা করতে পারে, পাথরই বা মানুষে রূপান্তরিত হবে না কেন? আপনাদের পুরাণে পাষাণী অহল্যা রামের পদস্পর্শে আবার মানুষ হয়েছিল। আপনার প্রবল আগ্রহই বা জীবন্ত করবে না কেন আপনার মানস-প্রতিমাকে? আপনার কল্পনাকে আপনিই রূপ দিতে পারবেন। তপস্যা করুন—নিশ্চয় পারবেন। ধ্রুব নক্ষত্রের যতই কাছাকাছি যেতে পারবেন ততই ভাল। ধ্রুব নক্ষত্র থেকে বেরিয়েছে আর একটি ছোট সপ্তর্ষিমণ্ডল, এই মণ্ডলে বসুরা থাকেন। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই আপনি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা লাভ করবেন।' বিজ্ঞানী চুপ করলেন। মনে হল আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন তিনি।

'আমি কিন্তু তোমাকে একা যেতে দেব না।'

সে আমার বাঁ হাত এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়ে নি।

'বেশ, চল।'

এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে। আমরা ধ্রুবমণ্ডলেই ছিলাম কিন্তু চারিদিকে ছোট-বড় এত নক্ষত্র, যে কোনটি ধ্রুব তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একটি জ্যোতির্ময় শিশুমূর্তি দেখেছিলাম—সে-ই কি ধ্রুব? কে বলে দেবে আমাদের? চারিদিক আলোয়-আলোময়, কিন্তু কোনও উত্তাপ নেই। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন দেখছিলাম। শব্দের সাহায্য না নিয়েও কথাবার্তাও বলছিলাম মনে মনে। কিন্তু কাকে প্রশ্ন করব? কাছে-পিঠে কেউ নেই—শুধু আলো আর আলো। আর সে আলোর মধ্যে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধ আলোর সমুদ্রে ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। ধ্রুবকে জানবার ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। সেই প্রবল ইচ্ছাই বোধহয় আলোক-সমুদ্রে একটি স্রোতের সৃষ্টি করল। সেই স্রোতে ভেসে যেতে লাগলাম আমরা। ভেসেই চলেছিলাম, এমন সময় সামনের আকাশে অত্যুজ্জ্বল কি একটা দেখা গেল। দেখলাম সেটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম সেটা গোল নয় দীর্ঘাকার, অনেকটা ছোট একটা এরোপ্লেনের মত—কিন্তু ঠিক এরোপ্লেনও নয়। তার উপরে একজন দিব্যকান্তি যুবক বসে আছেন।

আমাদের কাছে এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি মর্ত্যবাসী?'

বললাম, 'হ্যাঁ আমি এখনও মর্ত্যেই আছি। আমার মনটাকে বার করে এনেছি এই আকাশলোকে—'

'আপনার পাশে যে জ্যোতির্ময় দেবীকে দেখছি, উনি কে—'

'উনি আমার মৃতা সহধর্মিনী।'

তারপর তাঁকে আমার সব বিবরণ বললাম। শুনে খুব খুশী হলেন।

বললেন, 'মানুষই তো স্রষ্টা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তেত্রিশ কোটি দেবতা, এমন কি আমাকেও সৃষ্টি করেছে মানুষ।'

'আপনি কে?'

'আমি নারদ। ব্রহ্মার মানসপুত্র। কিন্তু তাঁর হুকুম পালন করতে রাজী হইনি বলে তিনি আমাকে গন্ধর্ব আর মানুষের খিচুড়ি করে দিয়েছেন। অবশ্য আমার কোনও খেদ নেই তাতে। এই বাহনটি নিয়ে আমি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই। ত্রেতা যুগে মর্ত্যেও যেতাম। আড্ডা দিয়ে বেড়াই, ঘোঁট করি, আর হরিনাম করি। এই আমার কাজ। আপনাদের মধ্যে আজকাল কিন্তু রসিকের সংখ্যা কমে গেছে। সেদিন অশরীরী রূপ ধারণ করে বাংলাদেশে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। খবর পেয়েছিলাম যাত্রায় নাকি আমার চরিত্র আছে। দেখে আমি দমে গেলাম। লম্বা পাকা দাড়ি-ওলা যে লোকটা বাঁহাতে কমণ্ডলু আর ডান হাতে চিমটে চেপে দাঁড়িয়ে আছে সে-ই নাকি নারদ। আমার নাম নাকি ঢেঁকিবাহন। এই চমৎকার জ্যোতির্ময় বাহনটা কি ঢেঁকির মত দেখতে? এর কোনও চালক নেই। আমি যেখানে বলি সেইখানেই নিয়ে যায় আমাকে। শব্দ করে না, বক বক করে না। খুব খুশী হলাম আপনাদের দেখে। তপস্যা করুন, ঠিক সৃষ্টি করতে পারবেন। মানুষের অসাধ্য কাজ নেই—'

'আমরা ধ্রুব নক্ষত্রকে খুঁজে পাচ্ছি না। একবার অপরূপ দেবশিশুর মত একটি বালককে যেন দেখেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না সে-ই ধ্রুব কি না। নক্ষত্রের ভীড়ে

হারিয়ে ফেলেছি তাকে।'

'সে-ই ধ্রুব। ওই যে প্রকান্ড নক্ষত্রটা দেখা যাচ্ছে ওরই আড়ালে তন্ময় হয়ে বসে আছে সে—'

'আপনি ধ্রুবকে চেনেন?'

'সে আমার শিষ্য। বহুকাল আগে একা একা যখন বনে ঘুরছিল তখন আমিই ওকে দীক্ষা দিয়েছিলাম। ধ্রুবর কাহিনী আপনারা জানেন নিশ্চয়?'

'ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। এখন ভালো মনে নেই সবটা।'

যে বৃহৎ নক্ষত্রটা নারদ আমাদের দেখালেন সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ সে বলে উঠল—'আমি দেখতে পেয়েছি। কি সুন্দর—'

দেখলাম আলোর সমুদ্রের মধ্যে আলোর শিশু বসে আছে একটি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে মহাকাশের দিকে।

নারদ বললেন, 'ওই ধ্রুব। ওকে আমি রোজ একবার করে দেখতে আসি। ওর শিশুরূপও ঘুচল না, ওর তন্ময়তাও ঘুচল না। ও তন্ময় হয়ে সত্যকেই দেখছে যুগ-যুগান্ত ধরে। দেখে যেন ওর আশ মিটছে না।'

আমরা সবিস্ময়ে চেয়েছিলাম। নারদ বললেন, 'ও রাজার ছেলে। কিন্তু সৎমার তাড়নায় বনে পালাতে হয়েছিল ওকে। ওর আপন মা ওকে বলেছিল, তুমি সর্বদা হরিকে ডেকো। তিনিই তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। বনে একা বসে ও হরিকে ডাকছিল, এমন সময় আমি গিয়ে পড়ি। সেই সময়ই ওকে দীক্ষা দি আমি। সেই বনে বসে হরির তপস্যা করে হরির কৃপা লাভ করল। কৃপাধন্য ধ্রুবর প্রতি তার সৎমাও শেষে সন্তুষ্ট হল। তার বিয়ে দিয়ে তাকে সিংহাসনে বসাল। ধ্রুবর ছেলেও হয়েছিল। ধ্রুব কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও হরিকে ভোলে নি। মৃত্যুর পর ভগবান যখন তাঁকে ধ্রুবলোকে স্থাপন করলেন তখন দেখা গেল ধ্রুব সেই শিশুই আছে যে শিশু তপস্যা করে হরির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সে হরিকে দেখার সাধ এখনও মেটে নি—এখনও ও হরির দিকেই চেয়ে আছে নির্নিমেষে—এখনও জানে না যে ওকে ঘিরে প্রকান্ড এক ধ্রুবলোক গড়ে উঠেছে। ও এক হরি ছাড়া আর কোন বিষয়ে সচেতন নয়। হরিই সত্য। সত্যের অনন্ত রূপ দেখছে ও।'

'হরি আর সত্য কি এক?'

'আমি তাই জানি। তবে নামে কিছু এসে যায় না। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে অন্য নাম দিতে পারেন। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? কোন নাম দিয়েই তাকে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা যায় না। আমি তাই বীণার সুরে তাঁকে ছোঁবার চেষ্টা করি। তবু পাই না। আমার কাছে ছোট্ট একটি বীণা আছে, এইটি বাজিয়ে হরিকে ছোঁবার চেষ্টা করি—'

তিনি তাঁর সেই জ্যোতির্ময় যানের ভিতর থেকে ছোট একটি অপরূপ বীণা বার করে দেখালেন আমাদের। তারপর হেসে বললেন, 'আপনি তপস্যা আরম্ভ করুন। আমি বন্ধুদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তাঁরা আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার এ তপস্যা নূতন ধরনের তপস্যা। এ ধরনের তপস্যা আগে কেউ করেছেন কি না জানি না। শুরু করে দিন আপনি। আমি চললাম—'

নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক পূর্ণ হয়ে গেল এক অপূর্ব সুরে। তারপর থেমে গেল সব।

আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে অন্তরের দিকে চাইলাম। চেষ্টা করলাম মনকে সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করতে। মনে হল একটা অশ্রুর সাগর আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। সে তোলপাড়ের আলোড়ন কতক্ষণ ছিল জানি না। ক্রমশ আমি যেন তলিয়ে গেলাম। তারপর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম আস্তে আস্তে। সে যে আমার পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এ বোধও আমার রইল না। আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।

॥ বারো ॥

মনে হচ্ছিল কত অজাত ভ্রূণ আমার কাছে মিনতি করছে—আমাকে রূপ দাও, রূপ দাও, সৃষ্টি কর...

মনে হচ্ছিল কত অগীত সংগীত যেন প্রার্থনা করছে, আমাকে সুর দাও, আমাকে সুর দাও। হে কবি বাজাও আমাকে...

ভেসে আসছিল কত অসৃষ্টের সৃষ্টি কামনা, কত অপ্রকাশিতের প্রকাশ আগ্রহ...

মনে হচ্ছিল কোটি কোটি অপ্রস্ফুটিত কুসুমের স্বপ্ন যেন বার বার বলছিল—ফোটাও আমাকে ফোটাও। সৃষ্টি কর আমাদের নূতন রূপ, নূতন গন্ধ।...

মনে হচ্ছিল দূরে দেবরাজ ইন্দ্র সুবর্ণরথে আসছেন। তিনিও কাছে এসে বললেন, 'হে কবি, আমাকেও সৃষ্টি কর তুমি। আমি এখনও কল্পনায় আছি, আমাকে রূপ দাও তুমি। আর রূপ দাও আমার এই সহচরদের। এরাও এখনও কল্পনা-বিহারী। হে স্রষ্টা আমাদের সাহায্যে নূতন জগৎ সৃষ্টি কর তুমি। মানুষের কল্পনাই সৃষ্টি করেছিল আমাদের, মানুষের কল্পনাই আমাদের নিয়ে কত রূপকথা রচনা করেছে, কিন্তু আমরা এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হই নি। আমাদের সম্পূর্ণ কর তুমি।...

দেখলাম তাঁর পিছু পিছু অনেক দেবতা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলের মুখে ওই এক কথা—'আমাদের সম্পূর্ণ কর।'

সহসা আমার চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। লুপ্ত হয়ে গেল সব। নিঃশব্দ হয়ে গেল সব। শুধু সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে আর তাকে ঘিরে একটা জ্যোতির্ময় পরিমন্ডল। সমস্ত মন-প্রাণ সেদিকে নিবদ্ধ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম? তা জানি না। মনে হচ্ছিল অনন্তকাল বসে আছি। তার ছবিটাও মিলিয়ে গেল শেষে। তারপর অচেতন হয়ে পড়লাম। বিরাট ধ্রুবমন্ডলের ছবি মুছে গেল মন থেকে। কোন গভীরে যে আমি ডুবে গেলাম, কতক্ষণ যে সেখানে ছিলাম—কিছুই জানি না।

হঠাৎ সে বলে উঠল, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার, দেখ দেখ—'

মনে হল সে আমার হাতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

সংবিৎ ফিরে পেলাম।

সামনের আকাশে দেখলাম ফুটে উঠেছে একটি ছবি।

বিরাট সমুদ্র টলমল করছে। সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠেছে প্রকান্ড একটি শতদল। শতদলকে ভেদ করে উঠেছে মরকতের একটি দীপাধার। তার উপর জ্বলছে সুপ্রশস্ত একটি সুবর্ণ-প্রদীপ। প্রদীপের শিখা যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। আর সেই শিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম।

আবার ভাল করে দেখলাম—হ্যাঁ সে-ই তো। কিন্তু সে তো তার মনোময় দেহ নিয়ে আমার পাশে আমার হাত ধরে বসে আছে। আকাশের ওই ছবির সঙ্গে তাহলে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। যাকে আমি হারিয়েছি, যে আমার সংসারের কর্ত্রী ছিল, আমার ছেলেমেয়ের মা ছিল, আমার সঙ্গিনী ছিল, যে আমার অসুখে সেবা করত, যে আমার প্রতি লেখাটি পড়ত সে কি ওই? আবার ভাল করে চেয়ে দেখলাম—হ্যাঁ দেখতে ঠিক সেই রকমই—কিন্তু—

সে বলল, 'চল, এবার তোমায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি—'

নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

'চল। তোমার ছবিটি চমৎকার হয়েছে—'

'ওটা তুমি নও?'

'আমি তো তোমার পাশে বসে আছি। ওটা তোমার সৃষ্টি। নূতন সৃষ্টি। চমৎকার হয়েছে—কিন্তু ওটা আমি নই। ওটা তোমার কল্পনা। ভগবানের ইচ্ছা হলে আমি তোমার কাছে একদিন যাবই যাব। এখন বাড়ি চল—অপেক্ষা কর।

আকাশপথে দ্রুতবেগে আসছিলাম। সমস্ত মন হতাশায় পরিপূর্ণ। পারলাম না, পারলাম না, আমার লীলাকে সৃষ্টি করতে পারলাম না। ভগবানের সৃষ্টিকে মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে না। তার নকল করতে পারে আর কিছু পারে না।

সে আর একটি কথা বলে নি। মনে হল সে যেন কাঁদছে—সেও যেন মনে মনে আশা করেছিল আমি সত্যিই তাকে সৃষ্টি করে সঙ্গে নিয়ে যাব।

হল না, কিছুই হল না।

বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম আমার অচেতন দেহ বিছানায় পড়ে আছে। বাড়ির কেউ কিছু জানতে পারে নি। সবে ভোর হচ্ছে। আমি আমার দেহে প্রবেশ করলাম। বান্দা একটু পরে চা দিয়ে গেল। উঠে বসতেই তার ছবিখানি চোখে পড়ল, দেখলাম আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

দিনলিপি

মর্জিমহল

জানুয়ারী ১৯৭১

|| ১ ||

আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে যে ফাঁকা মাঠটা আছে, তার একধারে জমে আছে খানিকটা জল। সেই জলকে ঘিরে আজ কাকের দল জমায়েত হয়েছিল। প্রথমে বুঝতে পারিনি কেন ওরা জমায়েত হয়েছে। পরে দেখলাম ওরা স্নান করছে। কয়েকটা কাক জলে নেমে পাখাগুলো ভিজিয়ে নিচ্ছে, তারপর শুকনো জায়গায় উঠে ডানা ঝেড়ে, ঠোঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে বুক, পিঠ, ডানা। কয়েকটা কাক দেখলাম রাস্তার ধারের ইলেকট্রিক তারের উপর উড়ে বসল গা শুকুতে। আমরা যখন কোন পুণ্য লগ্নে সবাই মিলে ভীড় করে নদীতে গিয়ে স্নান করি, এ-ও যেন অনেকটা তেমনি। মনে হল কাকদের পঞ্জিকায় আজ বোধহয় স্নানের কোন শুভ যোগ আছে। একটু দূরে ইলেকট্রিক তারের উপর একটা ফিঙে, আর তার চেয়ে আর একটু দূরে একটি কাজল পাখী (Shrike) বসে আছে। তাদের কিন্তু স্নানের তেমন উৎসাহ নেই। ফিঙেটা ঘাড় বেঁকিয়ে কাকদের কান্ড দেখছে। কাজল পাখীটা টপ করে নেমে একটা পোকা ধরল। মাঠের আর একপাশে গোশালিকরা চরে বেড়াচ্ছে। তারাও দেখলাম কাকদের এই যৌথ স্নানের ব্যাপারে উদাসীন। এটা কাকদেরই বিশেষ কোন পর্ব বোধ হয়।

|| ২ ||

একদল ছেলে সরস্বতী পূজোর চাঁদা চাইতে এসেছে। এর আগে আরও অনেক দল এসে গেছে। কত লোককে চাঁদা দেওয়া যায়? কিন্তু ওরা না-ছোড়। দুঃখ হল। ওরা উৎসব করতে চায়। কিন্তু সংগতি নেই। তাই চাঁদার ছুতোয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। সবাই এক সংগে মিলে ভালোভাবে একটা পূজো করবে সে মনোভাবও এদের নেই। প্রত্যেকেই ছোট ছোট দল বেঁধে নিজেদের বাহাদুরি দেখাতে চায়। আমাদের রাজনীতি, সাহিত্যে, সব জায়গাতেই এই দলাদলি। আমরা স্বাধীন হয়েছি? কিন্তু এ ধরনের স্বাধীনতার পরিণাম ভেবে ভয় হচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে দেশে মানুষ নেই। যারা আজ কিশোর-কিশোরী, তারাও মানুষ হচ্ছে না। আমাদের ভবিষ্যৎ কী তা হলে? এই চিন্তা বেশিক্ষণ কিন্তু আমাকে বিচলিত করল না। চাকর যেই ডাক দিল–বাবু খাবার দেওয়া হয়েছে,–অমনি সুট সুট করে উঠে গিয়ে খেলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

|| ৩ ||

একটা ছবি মনে জাগল হঠাৎ। একটা বলিষ্ঠ ঘোড়ার চার পা যেন শক্ত করে বেঁধে রেখেছে চারটে খুঁটিতে। ঘোড়ার মুখটাও বাঁধা। তার চারিদিকে আড়গড়া। আড়গড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে তুমুল চীৎকার করছে একদল লোক। বাজনাও বাজাচ্ছে নানারকম–ঢোল, ঢাক, বাঁশী, রামশিঙে, কাঁসি, সানাই।

ঘোড়ার কানদুটো খাড়া হয়ে উঠছে। চোখ দুটো ঠিকরে বাইরে আসতে চাইছে। লাফাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। দড়িগুলো সব শক্ত।

এর মানে কী?
ঘোড়াটা কে?
আমি, না, দেশ?

॥ ৪ ॥

তীর্থে অনেক পাপীদের ভীড়, তীর্থ তবুও তীর্থ–
সাগরে অনেক ময়লা তো ভাসে, সাগর তবুও সাগর।
দু-একটা দোষ থাকলে পরেও পূজ্য মহান চিত্ত–
মন্দ আছেই তবু ও বন্ধু, বিশ্বভুবন ডাগর।

॥ ৫ ॥

হারাচ্ছি, পথ খুঁজছি তবু, পাচ্ছি নূতন রাস্তা
তাই হয়েছে আস্থা,
তোমায় শেষে পাব, তোমার কাছে যাবই যাব।

॥ ৬ ॥

পুরোনো কবিতার খাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ চোখে পড়ল শ্রীমতি শুভাকে একটা কবিতায় চিঠি লিখেছিলাম। শুভা সম্পর্কে আমার দূর সম্পর্কের নাতনী। কবিতাটা হয়ত হারিয়ে যাবে। তাই এখানে টুকে রাখলাম। পাঁচ বছর আগে লেখা।

ঠক-ঠক-ঠক শব্দ কিসের, বাহির হয়ে যাই ঠকিয়া,–
কাঁঠাল গাছে কাঠ-ঠোকরা চঞ্চু ঠোকে ঠক ঠকিয়া,–
পিঠটি তাহার সোনার বরণ, মাথার ঝুঁটি টকটকিয়া।
ঠক-ঠক-ঠক শব্দ কিসের, পিওন এল কান্দু মিত্রা–
অনেক চিঠি অনেক কাগজ অনেক রকম বার্তা নিয়া।
তাহার সাথে কার্মতি থেকে নাতনি এল বকর্কিয়া–
চোখদুটিতে ফুটছে হাসি, দুল দুলছে চকমকিয়া–
হঠাৎ যেন বাদল কেটে রোদ উঠল ঝকমকিয়া।

॥ ১০ ॥

'সারথি' পত্রিকার উদ্বোধন করতে আজ গিয়েছিলাম। ভারি ভালো লাগল ছেলেদের। ওরা ভালো হবার জন্য উৎসুক, উন্মুখ, একাগ্র। কিন্তু ওদের সুপথে চালিত করবার লোক নেই। ওরা ভাবছে নেতারা ওদের সব করে দেবে। বললাম, কেউ কারো জন্য কিছু করে দেয় না। নিজেকেই সব করতে হবে, নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে, কেউ তোমার ভার বহন করবে না। এমন কি, তোমার বাপমায়েরাও তোমাকে ভার মনে করবে কিছুদিন পরে। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব এই শপথ নাও তোমরা, আর সে শপথ পালন করবার চেষ্টা কর। তাহলেই বাঁচবে।

॥ ১২ ॥

একটা গল্পের প্লট মাথায় এসেছিল। তারপর গোলমাল করে ঘরে ঢুকল কয়েকটি যুবক। সাহিত্য আলোচনা হল, রাজনীতির কথা হল, তারা যে মাসিকপত্রটি বার করেছে তার জন্যে আমার একটি লেখা চাইল। চা এল, খাবার এল, চাঁদার খাতা এল, আরও একজন ভদ্রলোক এলেন, তারপর আর একজন। সবাই যখন চলে গেল তখন দেখলাম গল্পের প্লটটিও চলে গেছে তাদের সঙ্গে। এখনও ফিরে আসে নি।

॥ ১৪ ॥

রোজই খুনের খবর। বায়োলজিতে জন্মমৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে। হাজার হাজার জন্মায়, হাজার হাজার মরেও। প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মায়, যাদের জীবনীশক্তি বেশি তারা বেঁচে থাকে দুর্বলেরা মারা যায়। এরই গালভরা নাম 'স্ট্রাগ্‌ল ফর এগজিজস্টেন্‌স'। মানুষ অস্বাভাবিক উপায়ে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মৃত্যুর হার কমিয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। বুড়োরাও সহজে আর মরে না। তাই কি প্রকৃতি মানুষদের বুদ্ধিতেই এমন একটা প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছেন যে তারা মারামারি করে মরছে?

॥ ১৫ ॥

কহিলাম, হে অনন্ত নাহিক তোমার দন্ত
মাংসের স্বাদ তুমি পাবে না।
একাই খাইব তাই রাগ করিও না ভাই
প্রাণে যে বাজিল দুঃখ, সহজে তা যাবে না।
অনন্ত হাসিয়া কয়, হে উদার মহাশয়
কেন দুঃখ পান অকারণ—
রসগোল্লা বা সন্দেশ বাগাতে পারিব বেশ
সের দুই অনায়াসে উদরেতে করিব ধারণ।
চক্ষু হল ছানাবড়া কহিলাম সুরে চড়া
ওরে ও রাক্‌কোশ,
সন্দেশ ঘরেতে নাই রসগোল্লা কোথা পাই
হাড়গুলো চোষ।

এই ভাব যখন পরিশীলিত হয়, তখনই কি তার নাম হয় রাজনীতি?

॥ ১৬ ॥

একটা বাঁদর হঠাৎ একদিন এসে হাজির। তার হাতে একটা পেয়ালা। বললে—চা ভরে দিন এতে।

জিজ্ঞাসা করলাম—পেয়ালা কোথা পেলে?

—চুরি করে এনেছি। চা-ও চুরি করব যদি না দেন।

দিলাম চা। দিতে হল।

॥ ১৮ ॥

বিবাহ বাড়ির সেকেলে ব্যবস্থা। মাটিতে বসিয়ে পংক্তি ভোজন। আমার পাশেই দেখলাম একটি চোঙা প্যান্ট পরা ছোকরা বেঁকে খণ্ড-ত-এর মতো বসেছে। তাকে জিগ্যেস করলাম,— এ পোষাক পরে এলে কেন বিয়ে বাড়ি?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে সে,—ট্রাম-বাসে চড়ে আসতে হয়।

বললাম—কিন্তু খেতে বসে কত অসুবিধা হচ্ছে তোমার?

ছোকরা বললে,—কিছু না, ঠিক চালিয়ে যাব। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম কেটারিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। চেয়ার-টেবিলে খাব। কিন্তু মুখুজ্যেমশাই দেখছি একেবারে সেকেলে লোক। কিন্তু এতেও ম্যানেজ করে নেব।

দেখলাম সত্যিই ম্যানেজ করল। প্রচুর পোলাও মাংস খাবার পরও দই আর রসগোল্লা যা খেল, তা তারিফ করবার মতো। কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা মনের পড়ল: 'বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।'

।। ২৪ ।।

আকাশে রোজ প্লেন ওড়ে। তাদের গতিপথ বাঁধা, লক্ষ্যও নির্দিষ্ট।

মনের আকাশেও প্লেন ওড়ে। কিন্তু তাদের গতিপথ বাঁধা নয়, লক্ষ্যও অনির্দিষ্ট।

হঠাৎ একদিন মনের প্লেনটা থামল গিয়ে তার কাছে। মনে পড়ে গেল সব। সে কিন্তু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করল—কে আপনি? কী চান?

বললাম,—যে ফুলের মালাটা অনেকদিন আগে দিয়েছিলাম, সেইটে ফেরত নিতে এসেছি।

সবিস্ময়ে বললে সে—দিয়েছিলেন না কি! কই মনে নেই তো!

।। ২৫ ।।

আজ যাদের আসবার কথা ছিল, তারা এল না। তাদের অপেক্ষায় বসে আমার সময় নষ্ট হল। মনে হচ্ছে লিখি—

কথা যদি রাখবিনা ওরে মুখপোড়ারা—
দিস কেন কথা তবে হতভাগা ছোঁড়ারা।

দিনটা মেঘলা-মেঘলা। বাড়ির সামনে দিয়ে ইলেকট্রিক তার চলে গেছে। তার উপর দেখলাম বসে আছেন আমার পুরানো বন্ধু—ফিঙেটি। নিবিষ্ট মনে চেয়ে আছেন নিচের দিকে, যদি পোকার সন্ধান পাওয়া যায়।

—শুনছেন সার। আজ আর একটা খুন হয়েছে—

বললেন আমাদের প্রতিবেশী। তাঁর হাতে খবরের কাগজ, মুখে স্মিত হাসি। খুন হয়েছে বলে তিনি যে মর্মাহত তা মনে হল না। ঘোট করতে চান।

।। ২৬ ।।

রীতিমত বৃষ্টি আজ। সূর্যদেবের দেখা নেই। আজ রিপাব্লিক ডে। কিন্তু কারো মনে সুখ নেই। মনে হচ্ছে স্বাধীনতার নামে যে চুরি-ডাকাতির ঢালোয়া কারবার এদেশে চলেছে, তার আসান হবে কবে? কীভাবে হবে? আনন্দবাজারে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লেখা 'সর্বনাশের ইতিহাস' পড়লাম। খুব ভালো লাগল। প্রবোধ বাবুর 'প্রমত্ত যৌবন' প্রবন্ধটিও ভালো, কিন্তু সব জায়গায় মতে মিলল না। এই দেশেই একবার গণতন্ত্র হয়েছিল। গোপাল-দেবকে সিংহাসনে বসিয়েছিল বাঙালী। ইংলণ্ডে চার্লস দি ফার্স্টকে হটিয়ে দিয়ে ক্রমওয়েল গণতন্ত্র করেছিলেন একদিন। তারপরে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের নৃশংস তাণ্ডব। কোথায় সেসব এখন? 'মাইট্ ইজ রাইট' এই নীতি অনুসারে সর্বদেশে বলবানরাই রাজত্ব করছে, তাদের মুখোশটা বদলাচ্ছে খালি। রাশিয়া কি এখন লেলিন স্ট্যালিনের রাশিয়া আছে? সব বদলে গিয়া।

।। ২৭ ।।

এক জোড়া ঘুঘু প্রায়ই ছাতের কার্ণিশে এসে বসছে। তাদের বাসনা ছাতে যে আমার বোগোনভিলার ঝাড়টা উঠেছে, তাতেই বাসা করবে। লীলা [স্ত্রী] কিন্তু ঘুঘু দুটোকে তাড়াতে চায়। তার ধারণা ভিটেয় ঘুঘু আসা অমঙ্গল। ঘুঘু দুটোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে বারবার। ঘুঘুরাও নাছোড়। একটু ফাঁক পেলেই এসে বসছে আবার। দেখা যাক কে জেতে শেষ পর্যন্ত।

আজও বেশ বৃষ্টি। রীতিমত সাইক্লোন গোছের। এর প্রতিষেধক হচ্ছে খিচুড়ি আর মাছ ভাজা। কিন্তু হায়, কোনটাই হবে না। ঘি খেলেই রক্তের চাপ বেড়ে যায়, আর মাছ আনবার লোকও নেই। চাকররা কেউ আসেনি।

এসব সত্ত্বেও আমার গাছে একটি চমৎকার গোলাপ ফুটেছে—Ena Horkness. দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবার জন্য তাকে কেটে এনে ফুলদানীতে রেখে দিলাম।

ফুলের মাধুরী মনের বীণায় বাজায় সুর
আসবে কবে গো বাকী আছে আর কতটা দূর?

।।২৮।।

আজও বেশ মেঘলা। ভি-আই-পি রোডে বাস পুড়িয়েছে নাকি দু-খানা। সুতরাং বাসওয়ালারা স্ট্রাইক করেছে। বাস চলে নি, সুতরাং আমার ড্রাইভারও আসেনি; আমার যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হল না; দিনটা লিখেপড়েই কাটাতে চেষ্টা করলাম। জানলার পাশে একটা কাক এসে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কক্-কক্-কক্ মনে হল বলছে,—কী হে সভ্য মানুষ, দেখ আমরা কারও বাসও পোড়াইনি, স্ট্রাইকও করি নি। নিজের ধান্দায় বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। কক্-কক্-কক্!

উড়ে চলে গেল। আমারও ইচ্ছে হ'ল উড়ে যাই।
কিন্তু উড়তে হলে প্লেন চাই—
দূর ছাই—
আমার তা যে নাই!
সুতরাং একটিপ নস্যি নিয়ে আবার
বইয়ের পাতা ওলটাই।

।। ২৯ ।।

আজও শীত খুব। বিকালে বাজারে মাছ আনতে গিয়েছিলাম। বাজারে মাছও তেমন নেই। ন-টাকা সের দিয়ে ইলিশ মাছ কিনলাম একটা। দেখলাম ফুটপাথে অনেক ছোট ছোট সরস্বতী প্রতিমা বিক্রী হচ্ছে। কিন্তু সর্বশুক্লা মূর্তি একটিও নেই। সবই রঙীন। হলদে রঙের এবং নীলচে রঙের মূর্তিও দেখলাম কয়েকটি। সেকালের সরস্বতীদের সঙ্গে একটিমাত্র মিল দেখলাম, সব কটিই নারী মূর্তি।

।। ৩০ ।।

আজও বেশ শীত। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি--সব কটা সুরই যেন ভেসে এল রাস্তা থেকে। উঠে দেখি, একপাল ছোট ছেলে কলরব করতে করতে একটা বাঁশ নিয়ে চলেছে। সরস্বতীর প্যাণ্ডেল তৈরি করবে বোধ হয়। হঠাৎ মনে পড়ল আমরা ছেলেবেলায় যবের শীষ্ যোগাড় করবার জন্যে মাঠে যেতুম। সেই বহুকালকার হারিয়ে যাওয়া শ্যামল মাঠের ছবিটা হঠাৎ এসে মিলিয়ে গেল আবার। এই শহরে ছেলেরা কি সেই মাঠ দেখেছে?

করবীদের [কন্যা] বাড়িতে সরস্বতী পূজো হচ্ছে। সেখানে গিয়েছিলাম আজ সকালে। যদিও চা-জলখাবার খেয়েই গিয়েছিলাম, তবু অঞ্জলি দিলাম।

জানি না এতে মা সরস্বতী রাগ করলেন কিনা। আমার বিশ্বাস, করেন নি; কারণ, তিনি আনন্দের দেবতা। যিনি ক্ষুধিত থেকে আনন্দ পান, তাঁর অঞ্জলিতেও তাঁর আনন্দিত হওয়া উচিত। আনন্দটাই আসল, খাওয়া-না-খাওয়াটা অবান্তর। অবশ্য এটা আমার থিয়োরী। ওই কুন্দেন্দুশুভ্রা কুচভারনমিতার মনের কথাটা কী, জানি না। দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। আমার কিন্তু অঞ্জলি দিয়ে খুব ভালো লাগল।

ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

১

একটা ঘুঘু আজ আমার শোবার ঘরে ঢুকেছিল। আমি বাইরে এসে দেখি ঘুঘুটা মশারির

ফ্রেমের ওপর বসে আছে। আমাকে দেখে উড়ে গেল। বেশি দূর গেল না, ছাতের কার্ণিশে পায়চারি করতে লাগল। কেমন যেন রাগরাগ ভাব। ঘরটা যেন ওরই, আমি জবর দখল করেছি। ওর মনোভাবও যদি কবিতায় ব্যক্ত করতে পারত, তাহলে হয়তো বলতো,–

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই–
সেই নেপোরা সাম্য নিয়ে করছে হই-চই!

৪

বিড়াল কহিল ইঁদুরে ডাকিয়া–এটা জেনো ভাইfact
আমরা দুজন মিতালি করিলে ধ্বংস হইবে মানব,
ওরাই এ যুগে দানব,
এসো করি তাই pact.

* * * *

এক ঝাঁক টিয়া হঠাৎ এসে বসেছিল সামনের সোনাঝুরি গাছটাতে। হঠাৎ আবার উড়ে গেল। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল। গোশালিকের মধ্যে কী যেন একটা হয়েছে। প্রত্যেকের হাব-ভাব-ভঙ্গীতে কেমন যেন ষড়যন্ত্রের একটা আভাস পাচ্ছি। আকাশেও মেঘ বাতাস যেন চোরের মতো চলছে-ফিরছে। চড়ুই পাখীগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চরে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু কিচিরমিচির করছে না অন্যদিনের মতো। কী জানি বাবা, কী যে হবে!

সন্ধ্যের সময় দেখলাম, নেপথ্যে যা ছিল তা নেপথ্যেই বিলীন হয়েছে। কিছু হয়নি। চানাচুরওয়ালা হাঁকছে,–চাই-চানাচু-র!

৬

আজ সকাল থেকেই মন কেমন করছে। কিন্তু কার জন্য তা ঠিক জানি না। কেবলি মনে হচ্ছে কে যেন নাই, কিন্তু কে সে? মন উত্তর দিতে পারছে না। আকাশের নীল বই মেঘের মলাটে মোড়া–বাতাসের স্বচ্ছ প্রবাহে পাঁচের গন্ধ--এরোপ্লেন সশব্দে উড়ে গেল–চাপা পড়ে গেল বুলবুলির 'কৃষ্টপ্রিয়'–কাকগুলোও যেন আনমনা। আমার মন কেমন করছে–কিন্তু কার জন্য জানি না।

৭

হঠাৎ মনে হল বাংলাদেশটা বোধহয় প্রাচ্যদেশের ডাস্টবিন। বহু নোংরা জিনিস বহুকাল থেকে সঞ্চিত হয়ে আছে এখানে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য নোংরামিও জুটেছে। দু-চারটে ভাল লোক জন্মেছে অবশ্য। কিন্তু ডাস্টবিনেও দু-একটা ভালো জিনিস পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। ডাস্টবিনকে ঘিরে কুকুরের দল মারামারি করছে, তাদের চোখে অবশ্য দামী জিনিসের কদর হয় না বড় একটা। পথচারী পথিকেরা মাঝে মাঝে ডাস্টবিন থেকে দামী হীরা বা মুক্তা উদ্ধার করছেন, এ খবর মাঝে মাঝে ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাতে কি ডাস্টবিনের গৌরব বাড়ে? বাড়ে না।

৮

হে বিধাতা করলে কেন এমনতর
সবাই বাজে, সবাই যেন কেমনতর,
কোথায় আছ স্পর্শমণি–স্পর্শ কর, স্পর্শ কর।
মেয়েরা কই? হিজড়ে যে সব
জীবন্ত কই? গলিত শব
চতুর্দিকে দেখছি খালি–

রাস্তা ঢেকে উপচে পড়ে সর্বদাই ত পচা নালী–
সব্বাইকো দিচ্ছে গালি।
হে বিধাতা বিধান তব কেমনতর–
কোথায় আছ স্পর্শমণি, স্পর্শ কর, স্পর্শ কর।

১৩

ভোট নিয়ে কাগজে উত্তেজনা। বাড়িতে উত্তেজনা দুধ আসেনি বলে। কোথায় কটা খুন হল এটা যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। দুধ বন্ধ হওয়াটা এখনও গা-সওয়া হয়নি। হয়তো তাও হয়ে যাবে। আমাদের চামড়া যে কী জাতীয় গণ্ডারের চামড়া, তা' গবেষণার বিষয় হল ভবিষ্যতে।

২০

শরীরের কথা আর না-ই লিখলুম। একটা না একটা লেগেই আছে। তার চেয়ে কবিতা লেখা যাক একটা।

দুই দুগুনে চার আর তিন দুগুনে ছয়–
না হয় যদি তাতেই কেন করব হাহাকার।
আমরাই ত গাড়ি ভাঙি নানারকম নিয়ম–
আমরাই তো 'হা' কে 'না' করছি বারম্বার।
ভোটে যদি সবাই বলে দুই দুগুনে তিন–
আমরা সবাই মানব সেটা, তা-ধিন্-ধিন্-ধিন্।

২২

তুমি যদি তর্ক কর আমি হেরে যাব। কিন্তু এটা আমি জানি তুমি চোর, তোমার স্ত্রী বারফটকা। সুতরাং তোমার ছেলেমেয়েরা ভালো হবে না। কখ্খনো ভালো হবে না। হতে পারে না। তর্ক করতে চাও কর। কিন্তু ওরা ভালো হবে না। আমড়া গাছে আম ফলবে না।

২৩

বেহালার শ্যামবাবু
চেতলার শ্রীহাবুল
কাঁদছেন হু-হু ক'রে,
ভিয়েত্‌নামের শোকে
হবিষ্যি করছেন,
চারজনই খুব নাকি

হাওড়ার হরি বোস–
বৈঁচির কানু ঘোষ–
কাঁদছেন দিনরাত,
খাচ্ছেন ফ্যান-ভাত ;
যদি হয় কিছু ফল–
হয়েছেন দুর্বল।

২৫

আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা রেডিওতে নানা বিষয়ে ফতোয়া দেন দেখছি–হ্যান কেরো না, ত্যান করো না, এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাজনৈতিক নেতারা তো প্রায়ই এ কাজ করেন।

আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা কাগজে তাঁদেরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন নাকি? কাঁধে জয়ঢাক নিয়ে আত্মপ্রচারে নেমেছেন তির্যক পথে। তাঁদের এসব ফতোয়ার কোন ফল হয় কি? কেন তাঁরা এসব করেন তবে? আমাদের গাঁয়ের পেটমোটা গণেশবাবুর কথা মনে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ছোট খুঁটি পুঁতে নোটীশ লট্‌কে দিতেন– এখানে থুথু ফেলিও না, মলমূত্র ত্যাগ করিও না। নিচে খুব বড় বড় করে নাম লেখা–শ্রীগণেশচন্দ্র হালদার। গণেশচন্দ্রের নামটা নিয়ে দিন কতক সবাই হাসাহাসি করত, আর কোন ফল হ'ত

না। গণেশবাবুকে জিগ্যেস করেছিলাম,–এসব করেন কেন মশাই ? তিনি দন্ত বিকশিত করে বলেন,–আমার একটা দোকান আছে তো ? সেই কথাটা মনে করিয়ে দি আর কি। এ যুগে পাবলিসিটি দরকার। সবাই পাবলিসিটি করছে, আমি বা করব না কেন ?

২৬

মই দিয়ে গাছে উঠে ফল পেড়ে খাও, সুখ পাবে।
দই দিয়ে চিঁড়ে মেখে করহ ফলার,–সুখ পাবে।
কিন্তু যদি দই দিয়ে উঠতে চাও গাছে' হবে মা সফল,
মই দিয়ে চিঁড়ে মাখা যাবে না-ও জেনো, হবে না ফলার।
মইদই স্বক্ষেত্রেই করে বাজিমাৎ–
রাখিও স্মরণে বন্ধু খানদানি বাত্।

মার্চ ১৯৭১

৫

সিনেমার ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকা এবং বক্স-অফিসই প্রধান। সাহিত্য, সাহিত্যিক বা শিল্প সেখানে গৌণ। ব্যবসাটাই আসল। কিন্তু সাহিত্যিকদের তবু ওরা ছাড়েন না। কিছু টাকা দিয়ে তাদের গল্পটা কিনে সেটা দুমড়ে-মুচড়ে এমন কান্ড করেন যে অনেক সময় শিউরে উঠবে হয়। সাহিত্যিকরা গরীব, তাই তাঁরা সব জেনেও কিছু টাকার লোভে গল্প বিক্রি করেন। তা ছাড়া তাঁদের আর একটা কথাও বোধ হয় মনে হয়,–'আমরা তো মাঠের মতো। আমাদের উপর অনেক গরুই তো চরছে, এরাও চরুক।'

৬

এ ক'দিন লেখা হচ্ছে না। প্রথমত লিখতে ইচ্ছে করছে না। দ্বিতীয়ও যেই লেখার টেবিলে এসে বসছি, অমনি কেউ এসে হাজির হচ্ছে। তাড়িয়ে দিতে পারি না, কারণ প্রথমত আমি সামাজিক জীব, দ্বিতীয়ত আমি লেখক। সমাজের দাবী উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং তাদের বসতে বলি, আড্ডাও জমে যায়। খুব যে খারাপ লাগে তা-ও নয়। কিন্তু লেখা আর এগোয় না।

৭

আরও খুনের খবর আসছে। কোন একটা জবরদস্ত পার্টি নাকি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে, আমাদের ভোট না দিলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো। কিন্তু আমার মনে হয় না, বাঙালী হুমকিতে ভয় পাবে। তার স্বরূপ আমরা শীঘ্রই দেখতে পাবো।

৮

সময় বলছে–আমি দাঁড়িয়ে আছি! আমরা বলছি, সময় নেই,–
এদিকে–এদিকে–জল্দি–এই-এই।'
হুড়োহুড়ি করছি কেবল সবাই
শত্রুকে বলছি ভাই, ভাইকে বলছি হারামজাদা।
ছুঁড়ছি ইঁট, ছুঁড়ছি কাদা,
সেটা যে নিজের দিকেই, তা' খেয়াল নেই।
হাতীকে বলছি পিঁপড়ে, গন্ডারকে বলছি মাছি–
সময় বলছে,–আমি দাঁড়িয়ে আছি।
হিসেব নিচ্ছি, কে জিতবে কে হারবে–
যথা সময়ে জানতে পারবে।

থামছে না আমাদের হই-হই,
ওগো তুমি কোথা গেলে—কই, কই ?
দেখা গেল তাঁর 'তুমি'—
বাজাচ্ছেন নাকি কান্নার ঝুমঝুমি।
আর ঠিক আর কাছাকাছি
সময় বলে চলছে নীরব ভাষায়,—আমি দাঁড়িয়ে আছি।

মার্চ ১৯৭১

১২

হাত বাড়িয়ে চতুর্দিকে চাই
আপন জন একটিও তো নাই—
সামনে যাকে পাই
জড়িয়ে গলা তাকেই বলি ভাই।
রকবাজদের রকে কম্প এবং রুক্মী
ছাড়ছে বসে নানারকম বুকনি,
তুলছে যাবা হেঁচকি, তারা ভাবছে হাসছি ;
কামুকেরা কামের গুঁতোয় ভাবছে ভালবাসছি,
—চাইছে কায়াটাই।
আপন জন একটিও ত নাই।
ও দরদী বঁধু—
মুখেই তোমার মিষ্টি কথা,
ভাঁড়েতে নেই মধু।

১৩

ঘুঘু-দম্পতি শেষকালে আমার বুগেনভিলার ঝাড়টাতেই বাসা বেঁধেছে মনে হচ্ছে। যাতায়াত করছে বারবার। ছাদের আলসেতে পায়চারি করছে। সামনের টেলিগ্রাফের তারে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে পিঠ চুলকাচ্ছে। বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। আমার গৃহিণী খবরটা জানে কিনা জানি না। আমি কিছু বলিনি।

১৭

দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আমরা পশ্চিম বাংলার যুবসমাজের দিকেই প্রত্যাশা-ভরে চেয়ে আছি। যে প্রশ্ন আজ দেশের সম্মুখে, তার জবাব তাঁদেরই দিতে হবে। তাঁদের জবাব দিতে হবে—

(১) একতাবদ্ধ হয়ে তাঁরা দেশের মঙ্গল-সাধনে বদ্ধপরিকর হতে পারবেন কিনা

(২) সর্বকালে সর্বদেশে যে চারিত্রিক ভিত্তির উপর সবল নেতৃত্ব নির্মিত হয়েছে, সে ভিত্তি নির্মাণে তাঁরা সক্ষম কি না।

(৩) যে ক্ষুদ্রতম স্বার্থবুদ্ধি হীনতম কাজ করতেও পশ্চাৎপদ হচ্ছে না' তার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা মহত্তর আদর্শ দেশে স্থাপন করতে পারবেন কি না।

(৪) বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর দাবীই যে অনিবার্য অগ্রাধিকার পাবে, এ নীতি সমর্থন করবার জন্য তাঁরা প্রাণপণ করতে প্রস্তুত কী ?

(৫) মুজিবর রহমানের দৃষ্টান্ত তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে কী ?

১৮

আজ কোন কাজ নাই, কাজ নাই—কাজ নাই,

খেলাঘরে নাই কোন খেলনা ;
আজ কোন সাজ নাই, সাজ নাই—সাজ নাই,
পরতে হবে না কোন ঝকঝকে পাঞ্জাবী পোষাকী,
চাকিটা সংগীহীন, নাই তার একটাও ব্যালনা;
কল্পনা কোথা আজ, গরবিনী গোসা কী ?
মেঘলা আকাশ আর ফুরফুরে বাতাসে—
বাজছে একটি খালি বাজনাই—
কাজ নাই—কাজ নাই—কাজ নাই—
সাজঘরে ঝকমকে সাজ নাই ;
খাঁ খাঁ করে মনটা—
কোথায় বাজছে যেন টিফিনের ঘণ্টা।

২০

যন্ত্রসভ্যতা যত বাড়ছে, ততই যেন মানুষের সুখশান্তি দূরে চলে যাচ্ছে। যে মনুষ্যত্বের উপর মানবসভ্যতা একদা দাঁড়িয়েছিল, সে মনুষ্যত্বের ভিত্তি যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। এখন আমাদের স্বাধীনতা শুধু কাগজে কলমে। আসলে আমরা পরাধীন—যে সব যন্ত্র আমাদের তথাকথিত আরাম বজায় রেখেছে, সেই সব যন্ত্রেরই পরাধীন। ফলে একদিন জল না এলে, ইলেকট্রিক কারেন্ট অফ হয়ে গেলে, ট্রেন-ট্রাম-বাস অচল হলে আমাদের জীবনযাত্রাই অচল হয়ে যায়। কৃষি সভ্যতার আমলে আমরা ঢের বেশি স্বাবলম্বী ছিলাম। এখন আমরা অলস, পঙ্গু এবং পরিবর্তনশীল। বাড়িতে একদিন চাকর বা ঝি না এলে হায় হায় করতে থাকি। আগে এত পরাধীন আমরা ছিলাম না।

২৩

সমস্ত দিনের পর মোটর এলো গ্যারাজ থেকে। ষাট টাকা বিল হয়েছে। তা-ও নাকি পুরো সারানো হয়নি। আমাদের শৌখীন পূর্বপুরুষেরা শুনেছি একটি ক'রে রক্ষিতা রাখতেন। এ যুগে মোটরই মর্ডান রক্ষিতা।

২৪

কাল সন্ধ্যায় তারাশঙ্করের (বন্দ্যোপাধ্যায়)বাড়ি গিয়েছিলাম। বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটল। কবি উমা রায়ও গিয়েছিল সেখানে। সম্ভবত নিজের কোন কাজের জন্য। কাজ শেষ হতেই চলে গেল। বৌদির সংগে (তারাশঙ্করের বউ)অনেক গল্প হল। বাড়িসুদ্ধ সকলের পান বসন্ত হয়েছে। ছোট ছেলে কড়ু টালিগঞ্জে চাকরি করে ফোন করে জানালো, ফিরতে দেরি হবে। তাকে টালা থেকে টালিগঞ্জ ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করতে হয় এই খুনোখুনির বাজারে। বউদির একটুও স্বস্তি নেই।

তারাশঙ্কর ভালো আছে দেখলাম। চোখটাই তাকে কষ্ট দিচ্ছে কেবল। চোখের ডাক্তার বলছে—পাওয়ার বাড়ছে নাকি। কিন্তু মোটের উপর ভালো। তারাশঙ্করের বড় ছেলে সনৎকে বরাবর ভালো ছেলে বলেই জানতুম। সে ধারণা কাল আরও বদ্ধমূল হল।

শৈলজার (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) সংগে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। কাছেই তার বাড়ি। কিন্তু তার বাড়ির সামনে পাইপ বসাচ্ছে, খানাখন্দ চতুর্দিকে। যেতে পারলাম না। আর একদিন চেষ্টা করব।

আমার তিনটে গোলাপ গাছ মরে গেল। টবে গোলাপ গাছ করেছি। দেখলাম তিনটে টবের নিচের ছ্যাঁদা বুজে গেছে। টবের মাটি ঢেলে টব পরিষ্কার করিয়ে নূতন মাটি দিলাম

আবার। ছ্যাঁদা যাতে বন্ধ না হয়। তার জন্য দিলাম লোহার চাক্তি। ভালো দোআঁশ মাটি পাচ্ছিলাম না। ক্ষৌণীশবাবু জোগাড় করে দিলেন। এ পাড়ার সবাই আমাকে সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত। সবাই ভদ্রলোক। শেষ জীবনে যে এই পরিবেশে থাকতে পাব, তা ভাবিনি।

২৬

সমস্ত দিন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। সন্ধ্যাবেলা এম. সি. সরকারের দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সাহিত্যিকদের আড্ডা বসে একটা। অনেকেই ছিলেন। অচিন্ত্য কুমার (সেনগুপ্ত) আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন। প্রবোধ সান্যালও ছিল, তার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো।

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে তুষারকান্তি (ঘোষ) প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে দু-খানা কাগজ—অমৃতবাজার পত্রিকা আর যুগান্তর। যে সংবাদ আনলেন তা রোমহর্ষক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইয়াহিয়া খাঁ আর ভুট্টো চম্পট দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য এসে পৌঁছেছে। মিলিটারি ধর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের লোকেরা খুব লড়ছে। মুজিবর রহমান কোথায় কেউ জানে না। মিলিটারী পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাগজে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুদের 'তীব্র প্রতিবাদ' পড়লুম বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক হামলার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ যত তীব্রই হোক তা কাগুজে প্রতিবাদ। ওর একটিমাত্র সার্থকতা, নিজেদের নাম জাহির করা। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কোনও উপকারই হবে না কথার ফুলঝুরি কেটে বা রঙীন বচনের আতশবাজী উড়িয়ে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের পাশে যদি দাঁড়াতে পারি, তাহলেই সেটা কাজের মতো কাজ হবে। কিন্তু তা আমরা পারব না। আমরা বাক্য-বীরমাত্র, তার বেশি আর কিছু নই। এসব জেনেও যে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করতে ছুটে যাই, তার একমাত্র কারণ, আমাদের অন্তঃসারশূন্য অহংকার! আমরা নানাভাবে নিজেদের জাহির করতে চাই, আর বেগতিক দেখলে পালাই।

চুপি চুপি এসেছিল, চলে গেল চুপি চুপি
স্বপনের বহুরূপী।
কভু লাল, কভু নীল, কখনও সবুজ সে যে,
নানা রঙে আসে সেজে।
কখনও কাপড়-পরা, কখনও মাথায় টুপি
স্বপনের বহুরূপী।
স্বপনের বহুরূপী স্বপনেই আসে যায়
সুগোপন লঘু পায়—
লঘু পায় যায় আসে
কেবল মুচকি হাসে;
চেয়ে চেয়ে তার পানে
মন ভরে ওঠে গানে।
চলে গিয়ে তবু থাকে, জলে তার স্মৃতি-ধূপই—
স্বপনের বহুরূপী।

এপ্রিল ১৯৭১

১

ছাদে দশটা বড় গামলায় দশটা গোলাপ গাছ পুঁতেছিলাম বছর খানেক আগে। বেশ ফুলও হচ্ছিল। কিন্তু তিনটে গাছ ক্রমশ শুকিয়ে মরে গেল। আমাদের পাড়ার নির্মল বিশ্বাস মশাইকে অনুরোধ করেছি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে আমাকে যেন তিনটি ভালো গোলাপের চারা এনে দেন। তিনি দেবেন বলেছেন, কিন্তু এখনও পাইনি। শূন্য টবগুলোর দিকে চেয়ে কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হলো, আমার বুকের ভিতরও একটা শূন্য টব খালি প'ড়ে আছে। সেখানে কোন গাছ পুঁতব, কে এনে দেবে সেটা ? জানি না।

৩

পূর্ব বাংলায় যা হচ্ছে, তা' অতি শোচনীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। মুজিবর রহমান্ এবং তাঁর অনুগামীরা বীরপুরুষ। মুজিবরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি একটি কবিতায়। কবিতার নাম, 'সহস্র সেলাম'। বেরিয়েছে 'অমৃত' পত্রিকায় ২৬শে মার্চ তারিখে।

একটি কথা কিন্তু ভুলতে পারছি না। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এই কিছুদিন আগেই 'ইসলাম'-এর দোহাই দিয়ে হাজার হাজার হিন্দু বাঙালীকে খুন করেছিল, গৃহহারা করেছিল, তাদের নারীদের ধর্ষণ করেছিল, শিশু-হত্যাও করেছিল। নোয়াখালি, ক্যালকাটা কিলিং, এসবও দেখেছি আমরা।

গ্রীক পুরাণে প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী–Nemesis। তাঁরই পুনরাবির্ভাব ঘটল না কি! হিন্দুদের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করেছিল, তখন সেটাও একটা Nemesis। কারণ তার আগে হিন্দুরাও মুসলমানদের উপর কম অত্যাচার করে নি। এই অত্যাচার আর পাল্টা-অত্যাচারই আমাদের ইতিহাস।Nemesis-এর লীলাই কি ইতিহাস তাহলে ? আমরা যে ভগবানকে ডাকি তাঁর স্থান কি কোথাও নেই ? না, ভুল বললাম। স্থান আছে, ধর্মগ্রন্থে।

৫

সন্ধ্যার দিকে বড়ঝাপ্টা বজ্রবিদ্যুৎ হয়ে গেল একচোট। বৃষ্টিও হয়ে গেল এক পশলা। হঠাৎ ঠান্ড পড়ে গেল খুব। হু হু ক'রে হাওয়া বইতে লাগল। মোটা গেঞ্জিটা গায়ে দিতে হল। আর এক দুর্ভাবনা জুটল এসে। রন্তু [পুত্র] আপিস গেছে। এখনও ফেরেনি। শুনলাম, শ্যামবাজার অঞ্চলের ট্রাম-বাস সব বন্ধ। বাঙালী বীররা 'বাস' পুড়িয়েছে কয়েকটা। আটটা বাজল, তবুও রন্তুর দেখা নেই। লীলা [স্ত্রী] তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। আমি একটা বইয়ে রবীন্দ্রনাথ খাওয়া বিষয়ে কেমন খামখেয়ালী ছিলেন, কি কি খেতে ভালবাসতেন এই সব পড়ছিলাম। ভালো লাগল না। বই বন্ধ ক'রে রেডিও খুললাম। দেখলাম কে একজন বুদ্ধিজীবী পূর্ব বাংলার দুর্দশা নিয়ে গলাবাজি করছেন। বন্ধ ক'রে দিলাম। এ' এক উৎপাত হয়েছে নতুন রকম। রাস্তায় দল বেঁধে কতকগুলো ছোঁড়া জোর ক'রে চাঁদাও আদায় করছে শুনলাম। ব্লাড প্রেসার সুতরাং বাড়ছে। হঠাৎ রন্তু এল। বলল, বৃষ্টির জন্য আটকে পড়েছিলাম। ক্যালকাটা ক্লাবে আড্ডা দিচ্ছিলাম ব'সে।

৬

আজ বিকেলে আলিপুরে রয়াল এগ্রি-হর্টিকালচারাল-এর বাগানে গিয়েছিলাম গোলাপফুলের চারা আনতে। হর্টিকালচারালিস্ট ডঃ তরুণ বসুর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। অত বড় বিদ্বান লোক অথচ কি অনাড়ম্বর। চারটে গোলাপ চারা, দুটো লিলির bulb, বেলফুলের গাছ আর দুটো কি বিলিতি গাছ দিলেন।

ফেরার সময় মানিকতলা বাজারে থেমেছিলাম ফল কেনবার জন্যে। আমার সম্প্রতি-আবিষ্কৃত বিহারিণী বেটির সঙ্গে দেখা হল। সে-ই ফল টল কিনে দিলে, আমাকে আর নামতে হল না গাড়ি থেকে।

সাধারণত খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধ আমি পড়ি না। আজ একটা দৈনিক কাগজে মনোজের (মনোজ বসুর) লেখা একটা প্রবন্ধ দেখে সেটা পড়ে ফেললাম। মুজিবুরের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের হামলা নিয়ে যথারীতি তম্বি করেছে দেখলাম। যা বলেছে তা সবই সত্য, সবই জানা, একথা অনেক লোক একাধিকবার বলেছেন। যেটা জানতাম না, সেটা হচ্ছে এই যে, মনোজ বসু যখন চীনে গিয়েছিল, তখন মুজিবুর রহমান তার পাশের ঘরে থাকত আর তাকে দাদা বলে ডাকত। আরও অনেক দেশে ঘুরেছে সে, সে খবরও এ-প্রবন্ধে আছে। প'ড়ে ভারি মজা লাগল।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ির করবী গাছে অজস্র করবী ফুটেছে। কিছু শুকিয়ে গেছে, কিছু আধ ফুটন্ত। তার পাশে পেয়ারা গাছেও অজস্র ফুল, অজস্র 'পাউডার পাফ' প্রতি ডালে ডালে। ছোট ছোট ফলও ধরেছে অজস্র।

এই সবে মগ্ন হব হব, এমন সময় কা কা ক'রে উঠল কয়েকটা কাক, তারপর চীৎকার করতে লাগল শালিকগুলো। উঠে দেখি আল্‌সের উপর একটা বেড়াল। সর্বাঙ্গে তার কাদা। নর্দমায় প'ড়ে গিয়েছিল মনে হল। কাক আর শালিকগুলো ওকে দেখে হাসছে, না ভয় পেয়েছে ঠিক বুঝলাম না।

খবরের কাগজটা ফট্‌ ক'রে বাতাসে উড়ে গেল। জোর পশ্চিমেহাওয়া বইছে।

৮

গতকাল নীরেন চক্রবর্তী এসেছিল আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে। প্রফুল্ল সরকারের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাকে একটা নিবন্ধ লিখে দেবার অনুরোধ নিয়ে। সেই নিবন্ধটিই লিখলাম আজ।

প্রফুল্ল সরকারের সম্বন্ধে আমার মনে ধারণা স্থায়ী হয়ে আছে সেই কথাই লিখলাম। তিনি ভদ্রলোক ছিলেন। সেকালে–অর্থাৎ ১৯৪৭-এর আগে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া যেত। আজকাল ক্কচিৎ পাওয়া যায়।

৯

ভাগলপুরে খুব ভোরে গাছে গাছে ফিঙে পাখীরা গান গাইত মিষ্টি সুরে--মেকি-কি মেকি-কি মেকি-কি। এখানে রাস্তার ধারে দিনদুপুরে বিজলীর তারের উপর বসেও সেই গান গাইছে ফিঙে। মেকি-কি মেকি-কি মেকি-কি–কি মিষ্টি সুর! বলতে ইচ্ছা করছে–হ্যাঁ ভাই, সব মেকি–সব নকল–সব ফসকা গেরো–। কিন্তু ওর মতো মিষ্টি সুরে বলতে পারব না। তাই চুপ করে রইলাম।

১০

আজ বিকেলে কেয়া এবং করবীর [কন্যাদ্বয়] বাড়ি গিয়েছিলাম। কারও দেখা পেলাম না।

ফেরার পথে মানিকতলার সার্কুলার রোডের মোড়ে পুলিশ হঠাৎ সব গাড়ি থামিয়ে দিলে। দেখলাম একটা গাড়ি সাঁৎ ক'রে বেরিয়ে গেল রং সাইড দিয়ে। বিশ্বনাথ (আমার ড্রাইভার) বললে একজন মিনিস্টার গেলেন। মিনিস্টারের গাড়ি বলেই তাকে বে-আইনীভাবে পাশ করানোটা কি অন্যায় নয়! আমার ব্লাড প্রেসার আরও বেড়ে গেল। কিন্তু মুখে বললাম--আগেকার রাজা-রাজড়াদের সাত খুন মাপ ছিল। একালে এরাই রাজা,

এরা এখন এটুকুও সুবিধাও পাবে না—এ তোমার কেমন আবদার!

১২

কাল বিকালে ভি. আই. পি রাস্তা ধ'রে এরোড্রোমের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মোটরে। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, রাস্তার দুধারে জাপানী ধান অনেক হয়েছে। মাঠের শ্যামলশ্রী দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল। দূরে শুনলাম 'চোখ গেল' পাখী ডাকছে অনবরত। একটা খালের ধারে নেমে দাঁড়ালাম খানিকক্ষণ। ওপাশের খালে কচুরীপানার অজস্র ফুল ফুটেছে। এপারের খালটা থেকে হঠাৎ একটা বড় মাছ লাফিয়ে উঠল। মনে হল বোয়াল মাছ। চমৎকার লাগল।

১৩

গৃহিণীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুঘু-দম্পতি আমার বুগেনভিলিয়ার ঝোপে বাসা করেছিল। আজ দেখলাম দুটি চমৎকার বাচ্চা হয়েছে। বেশ বড় হয়েছে বাচ্ছা দুটো। গায়ে পালক গজিয়েছে। চোখ দুটি যেন কাল মুক্তো। কিন্তু এখনও ওরা পুরো বয়স্ক হয়নি। বয়স্ক ঘুঘুর গলায় যে ফুটফুটগুলো থাকে, সেগুলো হয়নি এখনও। আমার দিকে মিটমিট ক'রে চাইতে লাগল। দৃষ্টিতে ভয়ের ঈষৎ আভাস। পাছে বেশী ভয় পায়, তাই সরে এলাম। মানুষকে সবাই ভয় করে।

দস্যু মানুষ
উড়িয়েছে সভ্যতার যে ফানুস
তা' উড়ে পুড়ে যাচ্ছে বারবার
লজ্জা নেই তবু তার।
থামছে না তার হুঙ্কার আর গর্জন
কিন্তু বাছাধন,
সার কথা এই—
এভাবে চললে শেষ পর্যন্ত হার মানবেই,
মানতে হবে
জয়ের নূতন পন্থা জানতে হবে।
কামান বন্দুকে বেশী দিন চলবে না
সত্যের ভবী ভুলবে না
কিছুতে সে টলবে না।

১৪

ঠিক মূল্য নির্ণয় করতে রসিকেরা করেন না কো ভুল -
কোদালকে ঠিক কোদাল বলেন, ফুলকে বলেন ফুল।
তোমরা যদি আপত্তি করতে চাও—কর
রসিকদের তাতে এসে যায় না বড়।

* * *

আজ আনন্দবাজার পত্রিকার আপিসে প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। সভায় গিয়েছিলাম। অনেক বক্তৃতা হল শুনলাম। আমিও সামান্য কিছু বললাম। সভাশেষে জলযোগ হল।

১৫

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আজ সংবর্ধনা দেওয়া হলো সাহিত্যতীর্থে। অনেক

সাহিত্যিকের সমাবেশ হয়েছিল সেখানে। রমেন (রমেন মল্লিক) আমাকেই সভাপতি ক'রে দিলে সভার। বিপদে পড়ে গেলাম। এর সঙ্গে আবার 'বাংলাদেশ' সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। অনেক বক্তৃতা, অনেক কবিতা পাঠ। বিভূতিভূষণ সত্যিই কৃতী সাহিত্যিক। অনেকে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বিভূতিবাবু রসিক লোক। তিনি সভার শেষে বললেন,–আপনারা যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এত প্রশংসা করলেন আমি তাঁকে চিনি না। আমি যাঁকে চিনি তিনি ভালোয় মন্দ-য় মেশানো সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশের চিত্রও আমি ভালো ক'রে ফোটাতে পারিনি, কারণ আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বিহারে।

১৬

আজ সমস্ত দিন বসেই কাটল। কোন কিছু করতে ইচ্ছা করল না। ইজিচেয়ারে শুয়ে চেয়ে রইলাম রাস্তাটার দিকে। কত মোটর যাচ্ছে আসছে, হেঁটেও যাচ্ছে অনেক নর-নারী, রিক্সাও দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে।

শালিক, গো-শালিক, চড়াই, কাক, বক, ফিঙে, কাজল পাখীরা নিজের নিজের ধান্দায় ব্যস্ত।

সামনে বাড়ি হচ্ছে কার যেন। সবুজ শাড়ি পরা একটি মজুরনী ইঁট বইছে, রাজমিস্ত্রি ইঁট গাঁথছে। হঠাৎ মেয়েটি খুব জোরে হেসে উঠল। রাজমিস্ত্রিটা কোনও রসিকতা করল বোধহয়।

ঠুন ঠুন রিক্সা এলো একটা। রিক্সায় বসে এক প্রবীণ ভদ্রলোক একটা বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম–জানি না।

কিছুই জানি না। এই না জানার প্রবাহে অলস হয়ে বসে থাকতে বেশ লাগছে কিন্তু।

১৮

অখিলদা এসেছিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। রোজই মনে করতাম তাঁর খোঁজ করবো। কিন্তু করা হয় নি। হঠাৎ তিনি নিজেই এসে হাজির। আমাদের চেয়ে বছর চারেকের সিনিয়র ছিলেন মেডিকেল কলেজে। আমার কবিতার খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁকে আমার নূতন কবিতা সংকলন 'সুরসপ্তক' দিলাম এক কপি। খুব খুশি হলেন। এখনও প্র্যাকটিস করেন মুন্সিগঞ্জে গিয়ে–এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে। মার্টিনের হাওড়া-আমতা লাইন এখন উঠে গেছে। তবু যান হপ্তায় একদিন। বাকি-দিনগুলো তাঁর ছেলে চালায়। বেশ শক্ত আছেন। কথায় কথায় তাঁর হেমমামার কথা উঠে পড়ল। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার মনে পড়ল একটি খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় সুরসিক ব্যক্তিকে–যাঁর কথায় বার্তায় হিউমার উপছে পড়ছে–ব্যবহারে নিখুঁত ভদ্রতা। এসব লোক আর দেখা যায় না বড়।

২০

পাইকারি হত্যাকান্ড চলেছে পূর্ববঙ্গে। পৃথিবীর সবাই নির্বাক হয়ে দেখছে। প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করছে না কেউ। যেটুকু করছে সেটুকু না করলেও চলত। হায় রে, মানব-সভ্যতা! শুক্রগ্রহের আভ্যন্তরীণ তাপ কত তাই নিয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের প্রতি মানুষের পাশবিক অত্যাচারে তাদের টনক নড়ছে না। ভ্রূক্ষেপই করছে না কেউ।

ওরে মুখোশ,
পশুটাকে আর কেনরে বৃথাই লুকোস!

যাচ্ছে দেখা দন্ত, নখ, লালায়িত জিউভা–
সাক্ষী দিচ্ছে ভিয়েতনাম ও কিউবা।
ওরে মুখোশ-addict
তোরা যে সব sadist.

২১

সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পূর্ববঙ্গে নাকি খুব বৃষ্টি হচ্ছে। হানাদার পাক-সৈন্যরা খুব বিব্রত না কি। ভগবান দয়া কর। বলছি তো, কিন্তু তুমি সত্যি দয়া কর কি? সে ক্ষমতা কি আছে তোমার? কিম্বা তোমার আইনই হয়তো অন্যরকম। আমাদের দয়ার দাবী হয়তো তোমার বিচারে অন্যায়। হয়তো–

না, 'হয়তো'র তালিকা বাড়িয়ে লাভ নাই। আবোল-তাবোল যা তা লিখলাম খানিকটা। মাপ করবার ক্ষমতা যদি থাকে মাপ করো। কিন্তু তাও পারবে কি? সর্বশক্তিমান হয়েও তুমি অক্ষম।

২৩

আজ নরেনদার (কবি নরেন্দ্র দেব) শোকসভা সাহিত্য-তীর্থে। যাব ব'লে একাই বেরুলাম। বেরিয়েই গাড়ির ব্রেক (brake) ফেল করল। গাড়িটিকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে রেখে একজন মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে, ট্যাক্সি ডেকে সভায় গেলাম। অনেকে এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করলেন। আমি সেই কবিতাটি (যেটি গতকাল 'অমৃত' কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি) পড়লাম। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমাকেই ওঁরা সাহিত্য-তীর্থের তীর্থপতি নির্বাচন করলেন। নরেনদাই তীর্থপতি ছিলেন। খুব বৃষ্টি এল। ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

সবই খাপছাড়া ছন্দে বাজল। শেষ পর্যন্ত তালটা কিন্তু সমেই পড়ল ঠিক।

২৪

সবার সঙ্গে মেলবার ইচ্ছা প্রবল,
কিন্তু মিলতে পারি না।
সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি মনে মনে
বাস্তবে দেখি মিল হয় না
জলের উপর তেল ভেসে ওঠে।
কেউ আমাকে চেনে না,
আমিও কাউকে চিনি না।
যে তীর্থে পৌছলে
সব অচেনা চেনা হয়ে যাবে
সে তীর্থ কোথায়?
মাঝে মাঝে ভাবি সে তীর্থ হয়তো নাই–
যদি কোথাও থাকে,
আছে আমার কল্পনায়।

২৭

ছিলে তুমি, আছ তুমি থাকিবেও চিরকাল
তুমি চির সুপ্রকাশ তুমি চির-অন্তরাল।
তুমি মহামৌনদেব, তুমিই মুখর গান

তব চিররহস্যের তুমিই তো সমাধান।

বাঁ হাঁটুতে বাত হ'য়ে প্রায় চলৎশক্তিরহিত ক'রে ফেলেছে। তাই বোধহয় এই আধ্যাত্মিক কবিতাটা মনে জাগল!

২৮

হাঁটুর ব্যথা মাঝে মাঝে কমছে। আবার বাড়ছে। ৩০ তারিখে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা তাদের বার্ষিক উৎসবে যাওয়ার জন্য বলে গেছেন। হাঁটু অন্তরায় না হলে যাব। ক্ষৌণীশবাবু কাল রাত্রে বলে গেলেন—কাল কোথাও বেরুবেন না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দাঙ্গা হবার সম্ভাবনা।

কয়েকদিন আগে তো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কর্মচারীরা দেখলাম ইঁট-পাটকেল সোডার বোতল দুধের-বোতল নিয়ে তৈরি ছিলেন। ছাত্র পরিষদের মিছিলের সঙ্গে তাঁদের খুব সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল না কি। ওপারে জয় বাংলা, এপারে জয় দাঙ্গা।

২৯

অনেক ছোটোখাটো ঘটনা ঘটেছে আজ। অনেকে এসেছে, গেছে। কিন্তু যে ঘটনাটি ঘটেনি, সেইটেই লিখব আজ।

তুমি আসনি।

৩০

আমার বাড়ির সামনে টেলিফোনের তারবাহী থামের উপর বাসা বেঁধেছিল একটা গো-শালিক—খড়কুটো দিয়ে। আজ দেখছি ঝড়ে সেটা উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। খবরের কাগজে এ-সংবাদ বেরুবে না। উথান্ট এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। বস্তুত, কাছাকাছি যারা আছে, তারাও এ সম্বন্ধে উদাসীন। ওখানে যে গো-শালিকেরা বাসা করছিল এ খবরটাও জানত না কেউ। আমিই জেনেছিলাম, আমিই তাই কষ্ট পাচ্ছি। To know is to suffer.

মে ১৯৭১

১

বহু পূর্বে এদেশে যারা আদিবাসী ছিল, তাদের নাম বিজয়ী আর্যরা দিয়েছিলেন অনার্য। অনার্যদের নানা উৎসব ছিল। আর্যরা এদেশে এসে যে সব পূজা-পদ্ধতি-উৎসব-সমারোহের প্রবর্তন করেছিলেন, তা' এখনও আছে। যজ্ঞও নাকি এখনও হয় কোথাও কোথাও। অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞের কথা অবশ্য ইদানীং শুনিনি। এখন মহাসমারোহে দুর্গাপূজা, হোলি প্রভৃতি হয়। একটা জিনিস—"সেই অনার্যদের উৎসবের ছোঁয়াচ,"—আর্যরা এড়াতে পারেননি। আর্যরা যখন বৌদ্ধদের কাছে হেরে গেলেন, তখন তাঁদের নানা পূজা প্রবর্তিত হল এদেশে। ধর্মপূজা এখনও অনেক জায়গায় হয়। বৌদ্ধদের হারিয়ে এলেন মুসলমান। তাঁদের মোহররম্ প্রভৃতি আমাদের উৎসব হয়ে গেছে। ইংরেজরা যখন মুসলমানদের হারিয়ে এদেশে এলেন, তখন তাঁরাও নূতন নূতন খ্রীষ্টানী পরব আনলেন এদেশে। বড়দিন, ইষ্টার আমাদের ছুটির দিন। আজ পয়লা মে। আজ 'মে ডে' হচ্ছে। এর প্রবর্তক রাশিয়া। শ্রমিকদের উৎসব! এটাও চলবে। এদেশে অচল হয়ে আছে শুধু মানুষ। পশুত্বের সীমানা তারা কিছুতেই পার হতে পাচ্ছে না।

২

সকাল থেকে এলোমেলো হাওয়া বইছে। দামাল বাছুরের মতো সে যেন দাবড়ে

বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে রোজ খবরের কাগজ পড়ি। পড়া গেল না আজ। কাগজ এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। তখন-দোসরা মে-কে সম্বোধন করে বললাম—

ওগো দোসরা মে, তুমি আজকের রাজা—
থামিয়ে দাও না হাওয়ার বেহায়াপনা,
দাও না সাজা, কর জরিমানা।

বলা বাহুল্য, কিচ্ছু হলো না। দোসরা মে-ও যেন আমাদের মন্ত্রীদের মতো। কিচ্ছু করে না। মন্ত্রীদের সম্বন্ধে আমরা যা করি, দোসরা মে-র সম্বন্ধেও তাই করলাম। বললাম—

ওরে দোসরা মে,
রাত বারোটা পর্যন্ত তোর রাজত্ব—
তারপর আসবে তেসরা মে
শুনেছি লোক ভাল সে।

৩

চীনে আর মার্কিনে ভাব হয়ে গেল নাকি
পিংপং টেবিলের আসরে রূপসী স্বার্থ-সাকী
পেগে পেগে মদ ভরে দিয়েছিল, জান তা কি ?—জান না ?
ঢোকেনি এখনও সেটা মগজে ?
ওহো, ছাপা যে হয়নি সেটা কাগজে।

৪

আজ ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর বাৎসরিক উৎসবে গিয়েছিলাম প্রধান অতিথিরূপে। রবীন্দ্র সদনে উৎসব হচ্ছিল। বেলা সাড়ে পাঁচটায়। গিয়ে শুনলাম ওঁদের একজন কর্মী নাকি আজই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সমস্ত পরিবেশটা বিষণ্ণ। 'অগ্নিমিত্র' লিখিত নাটক 'নিকটে ফাঁদ' অভিনীত হচ্ছিল। জমল না। সাড়ে আটটা নাগাদ উঠে চলে এলাম।

* * *

আজ আর একটা খবর। একটা শালিক পাখীর তাড়ায় একটা ষণ্ডা কাককে বিব্রত হতে দেখলাম। পালাতে হ'ল শেষটায় কাকটাকে।

বাংলাদেশের আকাশ থেকে প্যাকিস্তানী কাকটা কবে পালাবে ? হঠাৎ এই কথাটা মনে হ'ল।

৫

ধরা প'ড়ে গেল আমার মনের ফাঁকি
মনে মনেই ডাকতে ছিলাম, দেশের মানুষ কোথায় তুমি
হঠাৎ সাড়া পেলাম যেন—
এই তো তোমার পাশেই আছি, তুমি অন্ধ নাকি!
ধরা প'ড়ে গেল আমার মনের ফাঁকি।

৬

বাংলাদেশ থেকে একটি মুসলমান যুবক এসেছিল। বলল, রংপুর থেকে এসেছে। বাংলাদেশের কিছু খবর তার মুখ থেকে শুনলাম। বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমি যে তিনটে কবিতা লিখেছিলাম, তা' টুকে নিয়ে গেল। বলল, একটা বই ছাপাবে।

১৩

শূকরের ঔরসে শকুনির গর্ভে জন্মায় যেই জীব
তার নাম জান ঠিক?
জান না? সত্যিই জান না? সেইটেই স্বাভাবিক।
বহু নাম আছে তার ইতিহাস কেতাবে
ভূষিতও হয় তারা বহুবিধ খেতাবে
দুনিয়াটা মাৎ করে করে ছাদ-ছোঁয়া গর্বে।
শূকরের ঔরসে শকুনির গর্ভে জন্মিল যাহারা
দুনিয়ার থিয়েটারে নায়ক যে তাহারা।
এরোপ্লেনে ছুট্‌ছে, ট্যাংকেতে দলছে,
ক্রমাগত লুটছে, ক্রমাগত ছলছে
ফতোয়াও দিচ্ছে 'যা করছি তাই ঠিক'
পোষা টিকটিকিরা সায় দিয়ে বলছে, টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।
ধিক্ ধিক ধিক্ ধিক্ বলছে না কেউ তো
স্তব্ধ হয়নি আজও পেজোমির ঢেউ তো।
ওরে বুড়ো বেম্‌মা!
কি সৃষ্টি করলি এম্‌মা—এম্‌মা।

১৪

আমি মৃত্তিকার জীব
দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার 'পরে
মহাশূন্যে চেয়ে থাকি
অতিদূর আকাশের পানে
আমার চরণ-চাপে
দুর্বাদল বার বার মরে
দেখি না তাদের; দেখি
সূর্য্য চন্দ্র আছে কোন্‌খানে।

১৬

ডুলুর [ভ্রাতা চিত্রপরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়] 'ধন্যি মেয়ে' আজ দেখে এলাম সবাই মিলে। ছবিটা গোড়ার দিকে তত জমে নি। হাফ টাইমের পর খুব জমল। বেশ হয়েছে। এটাও 'হিট' করবে সম্ভবত।

১৭

লীলার [স্ত্রী] মা নাকি খুব অসুস্থ। তিনি নাকি তাঁকে আর আমাকে দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত। আজ সকালে তাই বেনুর [চিত্রাভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী] বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানেই লীলার মা আছেন। উত্তমের [চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার] সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম মা ভালো আছেন। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব ক'রে চলে এলাম। বেনু একটু কফি করে দিল। কফিটা ভাল ছিল।

১৮

রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন্ কুঞ্জে লীলা খেলা করেন,
কোথায় কেন গদা ঘোরান, কোথায় ধামা ধরেন
সব জানি তো—

তবু আমরা চড়াগলায় বলে যাচ্ছি ঠিক,
দয়া করুন দয়া করুন ধর্ম মানবিক
পালন করা উচিত নয় কি?
তারা শুধু হাসছে খিক্ খিক

* * *

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অজিত বিশ্বাস খুন হয়েছে। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। খাওয়া-দাওয়া, অফিস যাওয়া, সিনেমা দেখা, পরনিন্দা পরচর্চা করা কিন্তু বন্ধ হয় নি। খালি ট্রাম-বাস বন্ধ। আমাদের মতো জাত পৃথিবীতে আর আছে কি? আজ বেয়াইমশায়ের সঙ্গে তাঁর গোপালবাটির বাগান-বাড়িতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে বীরেন ভদ্রও ছিল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম সেখানে গিয়ে। করবী-মায়া-রুচিরা আগেই গিয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই চা এবং পরে গরম গরম তেলেভাজা, খাওয়া হল। চমৎকার লাগল। তারপর ল্যাংচা। সে-ও চমৎকার। আড্ডা খুব জমল। বীরেন ছিল যখন জমবেই। ক্রমাগত টগবগ ক'রে ফুটতে লাগল সে। হেসে গড়িয়ে পড়লাম আমরা সবাই। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর পোকার উপদ্রব হল বেশ। রাত্রে খেলাম ভাত, ধোকার ডালনা (এটা অপূর্ব হয়েছিল) আর মুরগীর ঝোল। মাটিতে লম্বা বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম সবাই তারপর।

ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। শুনতে পেলাম হলদে পাখীর গলা। উঠে বেরিয়ে এলাম। সামনে সবুজ 'লন'। চোখ জুড়িয়ে গেল। তারপর মাছ ধরা হল পুকুরে। খুব ভালো লাগল। বড় বড় কাত্‌লা উঠল।

২৩

গোপালবাটি থেকে বেরুতে হল তিনটের সময়। কারণ দেড়কড়ি শর্মার বাড়িতে রবিবাসরের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে ছোটগল্প পড়লাম একটা। রঘুবীর রাউত।

* * *

মুট্‌কি বউকে যারা গদগদকণ্ঠে
বলে, অয়ি অপরূপা তন্বী
প্রাণভয়ে বলে তারা, রেগেমেগে ওই লাশ
ঘাড়ে এসে পড়ে যদি হবে যে সর্বনাশ
পটোল তুলিতে হবে তখনই
শ্মশানে জ্বলিবে চিতা-বহ্নি।
মুখে বলে, তুমি সখী অপরূপা তন্বী
মনে বলে—কিন্তু যে তিনমণি বস্তা,
দূরে থাক, সরে থাক
পৈত্রিক প্রাণটা তো নয় মোর শস্তা।

২৪

হে দিবস, রাত্রি হবে তুমি একটু পরে;
কখনও মেঘাচ্ছন্ন কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল
নানারূপ দেখেছি তোমার, আরও হয়তো দেখব।
কিন্তু একটা আকাঙ্ক্ষা আছে আমার; সেটা পূর্ণ হবে কি?
দিবস আর রাত্রি যেখানে সম্মিলিত,

যেখানে আলো-আঁধারের অভিনব সমন্বয়ে
আলো-আঁধার দুই লুপ্ত হ'য়ে হয়েছে তৃতীয় একটা অপরূপ আবির্ভাব
যা মেঘাচ্ছন্ন নয়, রৌদ্রোজ্জ্বলও নয়—অথচ যা দুইই।
এ আবির্ভাব দেখতে পাব কি?

২৫

দোয়েল ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম একটি আলোর থামের উপর ব'সে গায়ক রেওয়াজ করছেন। তারপরই হুড়মুড় ক'রে একটি লরি এসে পড়ল। সরে পড়লেন গায়ক। তার একটু পরে দেখি পাশের সবুজ জমিতে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর গৃহিণীটি। পোকার সন্ধানে, না, দয়িতের সন্ধানে? দোয়েল গৃহিণীর রং কুচ্‌কুচে কালো নয়, কালোর মধ্যে একটু সাদার আমেজ আছে। দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। চমৎকার স্নিগ্ধতা আছে একটি।

২৬

ছুটে-চলা জীবনের ফেলে-আসা পথ
দেখিয়েছে নানাবিধ সাগর পর্বত,
সব চেয়ে আশ্চর্য দেখিয়াছি যাহা—
মানুষ নামেতে ভবে প্রখ্যাত তাহা।

২৭

আনন্দ তো চতুর্দিকে, নিরানন্দ কেন?
হত্যা-খুন-বোমা-গুলি? আনন্দের তাই তো প্রকাশ
হয়তো বিকৃতরূপে—তবু আনন্দই জেনো আছে মূলে এর।
হয়তো এ তিক্ত তীব্র পরিহাস সত্য-শিব-আনন্দের,
সুন্দরের রুদ্র প্রতিভাস হয়তো বা।
শান্তি-স্তম্ভ ভেদ করি' নরসিংহ মূর্তি ধরি'
এসেছেন যিনি, তিনি অনিবার্য, চিরন্তন
আনন্দ-রক্ষক মহাজন—
ঘাতকের ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে এসে
তিনিই তো সত্য কথা কন
ধরার উত্তাপ যবে মাত্রা ছাড়ায় তখনি তো আসে প্রভঞ্জন।

২৯

আজ রেডিওর লোকদের আসবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁরা এলেন না। এতএব একটা কবিতা লেখা যাক।

পাজি আর বদমাস এদের তফাত কথা
জানা নেই—
হাসিয়া কহিনু তারে, একটি তফাত আছে
সে তফাৎ বানানেই।

৩০

আজ জামাইষষ্ঠী। খুব হৈ হৈ হল জামাই, মেয়ে আর নাতনীদের নিয়ে। রান্নাও ভালো হয়েছিল। কাঁঠালটা নাকি ভালো ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা দ্বারিকদের বাড়ি গিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল খানিকক্ষণ। বেশ লাগল।

আড্ডাই বাঙালীর জীবন, আড্ডাই বাঙালীর মরণ
'বুড়ো'র শরণ না নিয়ে নিই মোরা আড্ডার শরণ।
সে শরণ মাঝে মাঝে হায়রে ফেলে দেয় প্রকান্ড গাড্ডায়
গাড্ডায় পড়ে গিয়ে তবুও মেতে যাই পুনরায় আড্ডায়।

৩১

আজ সকালে আসানসোল থেকে একটি যুবক নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, সেখানকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'তে প্রধান অতিথি হবার জন্য। 'না' করে দিলাম। ভাল কথা, আজ কিন্তু পাড়ার একটি রবীন্দ্র জয়ন্তীতে যেতে হবে মল রোতে। শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞের পুত্র সুকান্ত নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পুরাতন প্রবন্ধ পড়ব একটি। যারা শুনবে তাদের কাছে নূতন ব'লে মনে হবে। আমি জানি এ-প্রবন্ধ বহুকাল আগে ছাপা হয়েছে যদিও, তবু বহু লোক পড়ে নি সেটা। এদেশে প্রবন্ধ আর ক'টা লোক পড়ে! সভার জন্যেই মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখি।

সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, আটটায় হল! কোনক্রমে প্রবন্ধটা পড়ে বাড়ি ফিরে হাঁফ ছাড়লুম।

নমস্কার সভা,
তোমার প্রকোপে হায়
শ্রীনবকুমার হয়ে যান নবা।

জুন ১৯৭১

১

পয়লা জুন পয়লা জুন
ওপারেতে ইয়হিয়া
নেতারা খান কাবাব-কোপতা
বাজিয়ে খোল-করতাল
আকাশ জুড়ে এক মন্ত্র
পয়লা জুন পয়লা জুন
পুড়ে গেল মুখটা

হচ্ছে আজও অনেক খুন
এপারেতেও অনেক মিঞা
খুন হচ্ছে চোরা গোপ্তা
করছে খালি হরতাল
গণতন্ত্র গণতন্ত্র
তোমার পানে বস্ত চূর্ণ
জ্বলছেও যে বুকটা।

নিয়মানুবর্তিতা ভালো, কিন্তু ওট্যকে বেশী আঁকড়ে থাকলে নিয়মের কারাগারে বন্দী হয়ে পড়তে হয়। নিয়মের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য মাঝে মাঝে নিয়মভঙ্গ করা ভালো। ঠিক দশটায় খাব, ঠিক ন'টায় ঘুমুব, ঠিক পাঁচটায় উঠব, ঠিক চারটেয় বেড়াতে বেরুব—এ নিয়মগুলো পালন করতে করতে জীবনটাই শেষে একঘেয়ে হয়ে যায়। জীবনের স্বাদ চলে যায়। যাঁরা চাকরি বা ব্যবসা করেন এই নিয়মের বন্ধনে তাঁরা আস্টপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই তাঁদের মধ্যে জীবনের স্ফূর্তি কম দেখা যায়। যাঁরা স্ফূর্তি করেন তাঁরাও সেটা নিয়ম ক'রে করেন, তাই স্ফূর্তিটাও কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ে, স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না। জেলের কয়েদীরাও আজকাল শুনেছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। আমরা সবাই কোন না কোন কারাগারে বন্দী করে রেখেছি।

স্বাধীন কী তবে কেউ নেই? আছে, ছোটশিশুরা। তারাই যখন হাসে, যখন খুশি কাঁদে, যখন খুশি ঘুমায়, যখন খুশি জাগে। গণতন্ত্রের যুগে ওরাই ডিক্টেটার।

৩

সদা সত্য কথা বলিবে এ নিয়ম পালন করা বড় কঠিন। যথাসম্ভব সত্য কথা বলিবে এই নিয়মই ভালো। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও হত ইতি গজ করেছিলেন। আমাদেরও অনেক সময় দায়ে পড়ে করতে হয়। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্তর হিউগো তাঁর 'লে মিজারেবল' গ্রন্থে একটি সদা সত্যবাদিনী নারীকে দিয়ে দু'দুবার মিথ্যাভাষণ করিয়েছেন। না করলে শুধু যে তাঁর গল্পে ছন্দপতন হত তা নয়, মেয়েটির চরিত্রে ও অমন চমৎকার হ'ত না, মেয়েটির নাম Sister Simplice

শাস্ত্রকাররা বলেন—সত্যই ভগবান। কিন্তু শিব ও সুন্দরকে রক্ষা করবার জন্যই অনেক সময় সত্যকে আড়াল করতে হয়, তখন সে প্রচেষ্টার মধ্যেও ভগবান কি থাকেন না? আমার মনে হয়, থাকেন।

৪

কুমারেশ (সুলেখক কুমারের ঘোষ) সকালে এসেছিল। বড্ড ভুগছে। রোগাও হয়ে গেছে। গল্প ক'রে কিছু সময় আনন্দে কেটে গেল। ও চলে যাবার পর লেখার ঘরে এলাম। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। এই ছড়াটা মনে এল।

'তুমি কি গো ফুলকি?'
'না না আমি উলকি
খাব আমি কুলপি
আপনি দেবেন দাম
মৃদু হেসে বললাম,
'তাতে আর ভুল কি!'

৫

আজ ভয়ানক দুর্যোগ। সাইক্লোন। এলোমেলো হাওয়া আর বৃষ্টি। কখনও ঝিরঝির, কখনও মুষলধারা। কর্ণেল গুহ সামনের বাড়িতে বিব্রতমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখছি। আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে বউভাতের ভোজ। সব আয়োজন বারবার ভিজে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে। এই বৃষ্টিতে আর ঝড়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর আসবার কথা। এসেছেনও নিশ্চয়। দুর্যোগসত্ত্বেও আটকাচ্ছে না কিছুই। হরিণঘাটার দুধটাই কেবল এল না। পিওনও নয়। এরা গভর্ণমেন্টের চাকরি করে, এ দুর্যোগের বেরুবে কেন? স্বাধীন ভারতবর্ষে সবাই তো স্বাধীন! একটি ছোট্ট মেয়ে দেখলাম ওয়াটারপ্রুফ গায়ে ছোট্ট ভাঁড়ে ক'রে দই নিয়ে যাচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। শালিকগুলো সব আমার বারান্দায় sunshade-এর তলায় বুগেনভিলার ঝোপে বসে পাখা ঝাড়ছে! চুনুক্ চুনুক্ চুনুক্ করে একটি চড়াই ডেকে চলেছে। তার সঙ্গীকে খুঁজে পাচ্ছে না। এই বৃষ্টি ঝড়ে সে কোথায় হারিয়ে গেছে।

৬

হুড়মুড়িয়ে অনেক কিছু এলো
হুড়মুড়িয়ে আবার চলে গেল
টুকরো টাকরা খুচরো খাচরা এটা এবং সেটা
প'ড়ে আছে দেখছি দুটো বাজরা মস্ত নাদা-পেটা
টিন, কৌটো, ভাঙা কলম কোলপ্সিবল্ টিউবেতে ঘায়ের মলম
খালি শিশি ছিপি-খোলা তার পাশেতে কয়েকটা আরসোলা
ছোট্ট একটা পুতুল চতুর্ভুজ লিপস্টিক আর রুজ
টিনের একটা ছোট্ট রুই—

ও কল্পনা–আয় না তুই
রংগভরে ডানা দুটো মেল না
এসব নিয়েই খেলাঘরে সাজাই আবার খেলনা।

৮

আকাশে পূর্ণচন্দ্র আছে আজ, কিন্তু জ্যোৎস্না নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রচুর মেঘ, অথচ বৃষ্টি নেই। গুমোট গরম একটা। সুইচ টিপে পাখা চালাবার ও আলো জ্বালবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম কারেন্ট নেই। উচ্চকণ্ঠে চাকরকে ডাকলাম। গিন্নি বললেন–চাকর নেই, সে বাজারে গেছে। ঘণ্টা দুই পরে ফিরবে। চাকর ফিরে এসে বলল–বাজারে কিছু নেই। ট্রাম-বাসও নেই। সুতরাং পরিস্থিতি এই–

নেই নেই নেই।
নাচবো যে ধেই ধেই ধেই
তারাও আশা নেই :
দুটো হাঁটুতেই জাগ্রত বাত,
বললাম শুধু তাই,
হুররে, কেয়াবাৎ।

৯

আজ ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের আহবানে অধ্যাপক শিবদাস চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি যুবক ডাক্তারবাবুর সংগে আলাপ হল–ডাক্তার মুখার্জী। খুব ভালো লাগল তাঁকে। আমি দুটো ছোট গল্প পড়লাম। হরপ্রসাদ (কবি হরপ্রসাদ মিত্র) বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সুন্দর একটি বক্তৃতা করল। ডাঃ মুখার্জী রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেন। দুটো গান হল। মনমোহন (চিত্রগুপ্ত) চমৎকার ছোটগল্প শোনালেন একটি। তারাশঙ্কর (বন্দোপাধ্যায়) সভাপতির ভাষণ দিলেন। অবশেষে ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত চমৎকার একটি ভাষণে মধুরেণ সমাপয়েৎ করলেন! পাশে কোথায় বোমও পড়ল। তারাশঙ্কর সরে পড়ল তাড়াতাড়ি। খাওয়ার প্রচুর আয়োজন ছিল। আমি কিন্তু শুধু একটু ছানা আর দু'চারটে কাজুবাদাম খেলাম। সন্ধ্যাটা ভালই কাটল। প্রেসার মাপি নি।

১০

আজ সকালে কুমারেশ এসেছিল। তাকে আমার নূতন উপন্যাসটা পড়ে শোনালাম প্রায় তিনঘন্টা ধ'রে। দুপুরে ঘুম এল না। বই পড়লাম খানিকক্ষণ। তারপর উঠে আবার উপন্যাসটা নিয়েই পড়লাম। লিখলাম ঘন্টা দুই। বিকেলে একটু ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম। প্যালপিটেশনও হচ্ছিল একটু। খানিকক্ষণ শুয়ে রইলাম। সাপসিঁড়ি খেললাম। বাড়ির সামনে পায়চারি করলাম একটু। তারপর আমাদের গেটের সামনেই চেয়ার পেতে বসলাম স-গৃহিণী। আমাদের প্রতিবেশী কর্ণেল গুহ এসে বসলেন। নানা কথার পর তিনি বললেন–'মাংস না খাইয়েও অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে স্বাস্থ্যবান রাখা যায়।' তিনি এক নিরামিষভোজী মাড়োয়ারির হোয়াইট অ্যালশেসিয়ানের কথা বললেন,–সে না কি দুধ পাঁউরুটি আর ডাল রোটি খেয়েই ইয়া তাগড়া হয়েছিল।

১১

আমরা যে কলা খাই জানি না শাস্ত্রোক্ত চৌষট্টি কলার মধ্যে তার স্থান আছে কিনা। এ-ও জানি না মধুর রস যে পাটালিতে আমরা পাই তা নবরস রসিক বিদগ্ধ কবি-সমাজে

কাব্যের উপাদান হিসাবে আদৃত হয় কি না। বত্রিশটি দন্ত চালনা ক'রে যে চর্বণ আমরা করি তা নর্তনের মতো একটা শিল্প কিনা, তাও আমার জানা নেই। তবু যা করলাম আজ তাতে চিত্ত বিনোদিত হল।

কলার নামটি কাঁটালি গুড়ের নামটি পাটালি
দুধ আর খই যোগ করে তাতে কি মজায় দিন কাটালি!
দাঁত আর জিবে যা করল সেটা বলবে তোমরা চর্বণ
আমি তো বলব রসনা আসরে দন্ত ব্যালের নর্তন!

১২

কাকেরা ভাবছে নরম হবে বেল
ছুঁচোরা ভাবছে সিংহ দেবে তেল
আমড়া ভাবছে ল্যাংড়া হব আমি
শস্তা ভাবছে হতেই হবে দামী।

* * *

আজ সন্ধ্যার সময় ময়দানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক্যাল একজিবিশন-এর কর্তৃপক্ষরা কেন জানি না সাহিত্য-সভার আয়োজন করেছিলেন। পীড়াপীড়িতে কাবু হয়ে যাব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। রাঘববাবুর ছেলে রাজা বলেছিল গাড়ী পাঠিয়ে দেব। বেলা পাঁচটার সময় খবর এলো রাজার গাড়ি খারাপ হয়েছে। ডাঃ কালীকিংকর (সেনগুপ্ত) বাবু আমাদের নিয়ে যাবেন। তিনি এলেন। আমাদের নিয়ে গেলেন তারাশংকরের বাড়িতে। তারও যাওয়ার কথা ছিল। সে বলল—শরীর খারাপ, যেতে পারব না। সেখান থেকে আমরা মাঠের উদ্দেশ্যে বেরুলাম তারপর। কিছুদূরে গিয়েই গাড়ি অচল। ঠেলেঠুলে কিছুদূর চলল। কিন্তু আবার অচল। তখন ড্রাইভার বললে A. C. Pump. এর একটা কি যেন খারাপ হয়েছে! সেটা দোকান থেকে কিনে লাগাল। তাতেও গাড়ি চলল না। শেষে অনেক কষ্টে ট্যাক্সি ধ'রে সভাস্থলে পৌছলাম। গল্প পড়লাম সেখানে একটা। শ্রোতা বড় একটা কেউ ছিল না। প্রবোধ সান্যাল ছিল। সেখানে সর্প-স্পেশালিস্ট দীপককে দেখলাম। বিশ-ত্রিশটা বিষাক্ত সাপ নিয়ে বসে আছে। ফেরবার সময় ওঁরা একটা গাড়ি দিলেন। ফেরবার পথে বৌবাজারের কাছে তার Axel ভেঙে গেল। আবার stranded. ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। ফোন ক'রে আবার একটা গাড়ি আনানো হল। বাড়ি পৌছলাম রাত দশটায়।

১৩

কুমারেশের বাড়িতে আজ 'উত্তর ভারতী'র সভা হল সন্ধ্যাবেলা। অনেক ভালো গল্প কবিতা শুনলাম। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' থেকে আমি কিছু পড়লাম। কিন্তু সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে কুমারেশ যে শিঙাড়া খাওয়ালে তা চমৎকার। অমন ভালো শিঙাড়া অনেকদিন খাইনি। উপর্যুপরি তিনটে খেয়ে ফেললাম।

শিং-ওলা পশুদের ভয় করি আমরা
পাছে করে তাড়া
কিন্তু শিঙাড়া
পশু নয়, শিংও নেই—মোলায়েম স্বস্থ
তাই তো কামড়ে তাকে করি উদরস্থ।

* * *

আষাঢ়ের মেঘকে করলাম অনুনয়—

আর কত ভেজাবে, ঢের হয়েছে, আর না
মেঘ বলে—আমরা যে কান্না
কোটি উদ্বাস্তুর।
ওদের দুঃখ দূর
না হচ্ছে যতদিন
থামবো না ততদিন।
মনে হল—ওরে বাবা, মেঘও করে পলিটিক্স!
নাকে বুকে ভাল ক'রে ঘষে নিয়ে ভিক্স
জানলা বন্ধ ক'রে শুলাম শয্যা 'পরে
জড়াইয়া কন্থা নান্যাঃ পন্থা।

১৪

আজ কুমারেশের (সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ) আর রমেনকে (কবি রমেন মল্লিক) আমার নূতন উপন্যাস 'সন্ধিপূজা' থেকে খানিকটা পড়ে শোনালাম। ওদের ভালো লেগেছে বলল।

সন্ধি ও সমাসের রহস্য অদ্ভুত
আছে তাতে দ্বন্দ্ব ও ছন্দ
আছে তাতে দুঃখ-আনন্দ
আছে তাতে মুক্তি ও বন্ধ—
আছে তাতে ছোটবড় ছুৎ আর অচ্ছুৎ
কভু নিঃসংশয় কভু করি খুঁত খুঁত
সন্ধি ও সমাসের রহস্য অদ্ভুত!

১৭

আজ ১লা আষাঢ়। শ্রীযুক্তা ইলা পাল চৌধুরীর বাড়িতে ১লা আষাঢ়ের উৎসব হল। একটা পুরনো কবিতা পড়লাম। শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন। অনেক লোক হয়েছিল সভায়। শ্রীমতী চৌধুরীর ছাদটিও চমৎকার। অনেক চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হল। সভার মাঝখানেই আমাকে উঠে আসতে হল। আমার ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতে হবে। দমদমে থাকে সে, বেশী দেরি করলে 'বাস' পাবে না।

'বাস' না পেলেই সর্বনাশ
চরণ-জুড়ির গর্বনাশ
করেছেন যে সভ্যতা
নয় তো কহতব্য তা।

প্রচুর আড্ডা দিলাম
দ্বারিকবাবুর বাড়িতে
অনেক রকম হাঁড়িতে
চামচ ঢুকিয়ে নিলাম
অনেক রকম তরকারি,
এবং সে সব চাখিলাম।
নাম যদিও দরকারি

অনেক আতর মাখিলাম
গোলাপ, জুঁই-ইভ্‌নিং অফ প্যারি
মনোমোহন গন্ধে
ভরে দিলে সন্ধ্যাটা আজ
নানারকম ছন্দে।
দ্বারিক শেষে বার করল গাড়ি
ফিরে এলাম বাড়ি।
এসে দেখি অর্জুনও নয়-কম
ফার্স্টক্লাস আলুর দম
রেঁধে রেখেছে: তার সঙ্গে গরম রুটি
তোফা লাগল: সবশেষে দুটি
আমও খেলাম। শেষ হল দিন-
পরিশেষে বেশী ডোজে নিয়ে ইনস্যুলিন
বিছানায় শুয়ে পড়লাম: কিন্তু কই
নিদ্রা দেবীর দেখা নেই তো?
পড়তে লাগলাম বই।

১৮

আজ শঙ্কর-স্কোপ দেখলাম। খুব খারাপ লাগল। ম্যাজিক, স্টান্ট, কতকগুলো কুৎসিত ছেলেমেয়ের দাপাদাপি-এ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। শেষের দৃশ্যটি 'বিউটি কম্‌পিটিশন্' মন্দ লাগল না। বড় আর্টগ্যালারির স্রষ্টা উদয়শঙ্কর শস্তা মনোহারীর দোকান খুলে খদ্দের জোটাবার চেষ্টা করছেন দেখে দুঃখ হল।

শিল্পীকে হতে হয় সন্ন্যাসী
দুঃখে অনুদ্বিগ্ন
সুখে বিগতস্পৃহ
মোহাচ্ছন্ন হলেই তার পতন, মূর্চ্ছা
এবং অবশেষে হয়তো মৃত্যু।
তার মৃত্যু না হোক
আর্টের মৃত্যু!
আর্ট অতি কোমল অতি পরিচ্ছন্ন।
আসক্তির স্থূল অবলেপ
তাকে মলিন করে মেরে ফেল।

১৯

স্বপনবুড়ো এসেছিল কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। স্বপনের পশরা নিয়ে নয়। উদ্দেশ্য দুটি-

(১) এক জায়গায় সভা হচ্ছে, সেখানে যেতে হবে সভাপতি হয়ে, (২) তার 'সবুজ পাতা'র পূজা সংখ্যায় একটি গল্প দিতে হবে।

মুখে বললাম-চেষ্টা করব। মনে মনে বললাম-

একটি পতিই হয়ে বাবা
পাচ্ছি না কূল-কিনারা

আবার পতি হবার জন্য
জেদ করেছেন ইনারা!
সবুজ পাতায় ধরেছে ছাতা
ডি ডি টি না দিয়ে
দিচ্ছে খালি ছড়া গল্প
আজব কান্ড কি এ!
পরের হাঁড়িতে কাঠি দেওয়াটাই
হয়েছে যাদের পেশা
পরচর্চাই হয়েছে যাদের নেশা
সব জিনিসের খুঁত ধরে যারা
খুঁত-খুঁতে মন নিয়ে
খাতির তাদের করিও বন্ধু
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে;
কিন্তু কখনো ভুলেও খুলো না
নিজের হাঁড়ির সরা—
কারণ সে সরা তাঁদের কণ্ঠে
হইবে শতস্বরা।

২১ .

চৈতন্য নামে আমার একটি চাকর বহাল হয়েছে। কালো-কালো কোমল বলিষ্ঠ যুবক। আমার মেয়ে তাকে হাফ্ প্যান্ট কিনে দিয়েছে। সেটা পারছে সে, কিন্তু তার উপর জড়িয়েছে একটা গামছা। বললে—লাজ লাগে। শুনে সুখী হলাম, ছোকরা খেতে পারে ভালো। ঐ জৌলুস-হীন সরল উদ্ভিদটি শহুরে আবহাওয়ায় ক্রোটোন বা ক্যাক্টাস হয়ে যাবে না তো! আমার আগের চাকরটি একটি ঝি-প্রণয়িণী জুটিয়ে পালিয়েছে।

২২

মহর্ষি চার্বাক বলে গেছেন—যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কিন্তু তিনি বোধহয় এ যুগের কথা ভাবতে পারেন নি। এ যুগে ঋণ পাওয়া শক্ত, ঘি পাওয়া আরও শক্ত। এ যুগে ছবি তাঁর দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়লে হয়তো বলতেন—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
চৌর্যং কৃত্বা দালদা পীবেৎ;
তথাপি ক্ষুধা যদিবা প্রচন্ডা
সজল দুগ্ধ সহ 'বাওয়া' আন্ডা
গ্রাস কর না বিচারি পুঙ্খানুপুঙ্খ
যাহা পাও সম্মুখে ভুঙ্খ ভুঙ্খ।

২৩

আমার বড় মেয়ে কেয়া আজ অনেকগুলি ভালো জরদালু আম পাঠিয়েছে। দেখে ভারি আনন্দ হল। মনে পড়ল ভাগলপুরকে, ভাগলপুরের সেই আমওলাকে, আর মনে পড়ল সেই ছোট্ট কেয়াকে, সে ফ্রক প'রে বেণী দুলিয়ে নানা রকম দুষ্টুমি করে বেড়াত আর আমার কাছে বকুনি খেত।

পুরাতন চেহারা বদলাচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যেও বাজছে পুরাতনের সুর। যে

গান গাওয়া হয়ে গেছে তার রেশ যেন শেষ হয়েও হচ্ছে না।

২৪

তাইরে না রে না
স্বার্থ ছাড়া এক পা চলি না।
তোমার যাতে ভালো হবে
এমন কথা একটা বলি না
তাইরে না রে না
খাওয়াবি ভাই—বল যদি
করি না তো গা
খাবি? বললেই তৎক্ষণাৎ
করে ফেলি হাঁ
তাইরে না রে না!
গা বাঁচিয়ে চলছি দাদা
এড়িয়ে খানা খন্দ খাদা
গায়ে যদি ছিটোও কাদা
বলে দিচ্ছি হাঁ
সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দেব
রেহাই পাবে না।
তাইরে না রে না—।
হতে পারি চিমড়ে বাসি
হতে পারি খোদার খাসী
কিন্তু আমি বঙ্গবাসী
সেইটি ভুলো না।
তাইরে না রে না।

২৫

আজ এক ছাত্রনেতা খুন হয়েছে ব'লে হরতাল। উচ্চারণটা হর্তাল। এর আর একটা মানে হতে পারে, তাল হরণ করে যা, তাই হর্তাল। জীবনটাকে হঠাৎ বেতালা করে দেয়। আমার ভাগ্য ভালো, বাজারে মুর্গি একটা পাওয়া গিয়েছিল। পাশের বাড়ির তারা দুটো বেলে মাছও দিয়েছিল। তাই হর্তাল সত্ত্বেও আমাদের ভালে কাটেনি। লীলার এয়োত্ব এবং আমার পেটুকত্ব দুই-ই বজায় ছিল। ইদানিং এই হর্তাল প্রবর্তন করেছিলেন গান্ধিজি। তাঁর কিছুই আমরা নিতে পারি নি, কিন্তু হর্তাল নিয়েছি। আমরা গুণগ্রাহী যে!

তুমুল বর্ষা আজ
চারদিক থমথম
বৃষ্টিও ঝমঝম
এটা খিচুড়িকাল
লীলা আজ বেসামাল
ঘরেতে নেইকো ডাল
হর্তাল, হর্তাল।

২৬

আজকের প্রধান খবর বিধানসভা ভেঙে গেল। আর একটা খবর সকাল থেকে প্রচুর

বৃষ্টি হচ্ছে। অভিভূত হই, রাজনীতির দাবা খেলাতে হই না। ওরা যা করছে করুক, যেমনভাবে মরতে চায় মরুক। একটা কথা কিন্তু মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে বলা যায় না। কথাটা এই—

সেই তোপটা কবে আসবে
কে আনবে সেই তোপ
যে তোপের সামনে
আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে
উড়িয়ে দেবে নিমেষে;
নির্মনুষ্য হয়ে যাবে এ দেশ
নিশ্চিন্ত হবে সবাই ?
তারপর ?
গাছপালা বনজংগল গজাবে ?
গজাক,
তারা আমাদের চেয়ে ভালো।
হিংস্র পশুরা ঘুরে বেড়াবে সে জংগলে ?
বেড়াক।
মানুষ-পশুর চেয়ে
বেশী হিংস্র, বেশী কুটিল, বেশী দাগাবাজ
কোন পশু আছে না কি।
বাঘ সিংহ ভালুক গন্ডার
সাপ কিছু
আমাদের তুলনায় নয় কিছু
তারা আর যাই করুক
রাজনীতি করে না।

২৭

আজ ড্রাইভার এসেছিল, বেরিয়েছিলাম অনেকদিন পরে। রাজাবাজার থেকে চৌথা নামক আম কিনলাম কয়েকটা। চৌথা লক্ষ্ণৌ শহরের 'রইস' আম। হঠাৎ মনে হল, চৌথা নাম কেন। মারাঠারা এককালে ওই অঞ্চলে আধিপত্য করে 'চৌথা' আদায় করত। সেই স্মৃতিটাই কি আমের মধ্যে অমর হয়ে আছে ?

খেয়ে দেখলাম, খুব মিষ্টি আম। অনেকটা ফজলির মত। প্রসংগত বলি, ফজলি নামের মধ্যে বিখ্যাত গায়িকা ফজলিবাঈ অমর হয়েছেন। তিনি শুধু যে সুকণ্ঠী ছিলেন তা নয় গায়ে গতরেও বেশ ভারিক্কী ছিলেন। আর একজনের কাছে শুনলাম আমটার নাম 'চৌসা'। তাই বা কেন ? চুষে খেতে হবে এই ইংগিত প্রচ্ছন্ন আছে নাকি ?

২৯

ও মিস্টার নিক্সন
তোমাদের ওই মানব-প্রীতি
একেবারে fiction
গা-বাঁচানো ফতোয়া গুলির

প্যাঁচোয়া সব diction
মনে করিয়ে দেয়—তোমরা
ব্যবসাদারের Big Son!
মনে নেই কো নিক্‌সন
তোমারই এক পূর্বসূরী
করেছিলেন চিৎকার
আমরা সবাই মানব-প্রেমিক
পশুকে দেই ধিক্কার।
তারই সুরে সুর মিলিয়ে
ও নিক্‌সন-ভোমরা
বলছ নাকি—মজনু আমি
লায়লা হও তোমরা।
কাম ডার্লিংস, কাম অন
প্রেম রয়েছে টনটন
জমাও প্রেমের ফলার
আহা, মরি কি মিষ্টি সুর গলার
সুরের সংগে ঝরে পড়ছে
লক্ষ লক্ষ ডলার।

জুলাই ১৯৭১

১

ইলিশ মাছের লোভে আজ মানিকতলাবাজার গিয়েছিলাম। মাছ একটা কিনেওছি। ঠকেছি মনে হচ্ছে। লীলার অন্তত তাই মত। মাছের পেটে অনেক ডিম ছিল। লীলা একটা কথা ভুলে যাচ্ছে—ইলিশ মাছের ডিমও সুখাদ্য।

ইলিশ গুঁড়ি জলের পরাগ
ছড়ায় চারিভিতে
সবুজ ফসল ফলবে এবার
উষর ধরণীতে।
সেই ফসলের সরেস স্বরূপ
মাছের পেটে কিম্‌?
ইলিশ মাছের ডিম।

২

প্রবল বর্ষায় আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিকের মাঠটা জলে কাদায় থৈ থৈ করছে। যারা এই মাঠ পেরিয়ে ওপার যেত তাদের অসুবিধা হয়েছে। অসুবিধা হয়েছে সেই ময়না, চড়াই, দোয়েলদের যারা ওই মাঠে রোজ চরতে নামত।

সুবিধা হয়েছে মোষদের। তারা মহা আনন্দে কাদায় জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। লুটোপুটি খাচ্ছে আনন্দে।

সুবিধা হয়েছে আর একদল অর্কেষ্ট্রাবাদকদের। তিমির নামলেই তাদের অর্কেষ্ট্রা শুরু হয়। কিন্তু তারা তিমিরবরণের দলভুক্ত নয়। চলতি বাংলায় তাদের নাম ব্যাং, সংস্কৃতে ভেক বা দর্দুর। রাত্রে বেশ জমিয়ে তোলে ওরা।

ঘোর বর্ষা
নিবিড় অন্ধকার।
বৃষ্টি পড়ছে, জোর নয়,
আস্তে আস্তে।
মনে হচ্ছে মৃদু মর্মর।
সে এসেছে
কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।
মনে হল—ভাগ্যে পাচ্ছি না
পেলে ফুরিয়ে যেত।
জানলা দিয়ে এক ঝলক পূবের হাওয়া
ঢুকল এসে চঞ্চলা কিশোরীর মতো
বলে গেল কি যেন একটা—
কি বলে' গেল
তাও বোঝা গেল না।
বৃষ্টির মর্মর
আরও অস্ফুট হয়ে গেল
অন্ধকর হল
আরও নিবিড়।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে জিনিসটা
অস্পষ্ট রইল না
সেটা হচ্ছে—ক্ষিধে পেয়েছে খুব।
তরতরিয়ে নীচে নেমে গেলাম
হাঁক দিলাম—বুঝলে—
ক্ষিধে পেয়েছে।
মুড়ি বার কর
বেগুনি ভাজ।

চিকিৎসা দফতরের হর্তাকর্তা যিনি
জানেন না তিনি বন্ধু চিকিৎসার 'চ'-ও
সব বিভাগেই ভাই এই হাল, সব্বাই 'মিনি'
ভোট-জোরে মূর্খেরাই হতেছেন দফতর-চালক
সুতরাং কও
কোন মন্ত্রে লোকসভা হইবেন লোকের পালক?
উত্যক্ত তাই তিনি বলিছেন—আরে রও রও
চিৎকার আর চেঁচামেচি কোরো না নাহক।
টুকে-পাশ-করা ছেলে যেখানেতে শিক্ষক ডাক্তার
গবেট গোমেষ যেথা কাগজের হয় সম্পাদক
খুনোখুনি রোজই যেথা, কোনও দিন নাইতো ফাঁক তার

ফাউন্টেন-প্রসাদাৎ যে দেশেতে সবাই লেখক
আশেপাশে কাছে দূরে সর্বস্তরে যেখানে তস্কর
ধরাধরি না করিলে হীরকও পায় না যেথা দাম
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঘোষ বোস গড়াই নস্কর
গড্ডালিকা সম যেথা চলিয়াছে—আরে রাম, রাম—
সোজা উচ্ছন্নের পথে, যে দেশেতে কল্পি অবতার
গাঁজার কল্‌কে হায়, সে দেশের আছে কি উদ্ধার ?

* * *

হাস্যকর ব্যাপার করতে আমরা ওস্তাদ। শুনলাম কাল অনেক জায়গায় নাকি মেকি-আদালত বসিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ এবং বিশ্ববিবেককে দন্ড দেওয়া হয়েছে। কি আর বলব!

৬

সমস্ত দিন নিরুপদ্রবে কেটেছে। বাজে লোক এসে ভীড় করেনি। নিরুপদ্রবে লিখেছি, পড়েছি, খেয়েছি, ঘুমিয়েছি। সন্ধ্যার সময় রেডিওর খবরে শুনলাম শিয়ালদহ লাইনে ট্রেন কলিশন হয়ে অনেক লোক মারা গেছে, অনেক লোক আহত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি গিরি এবং রেলমন্ত্রী হনুমন্তিয়া দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

৮

আজ বরুণ দাশগুপ্ত প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইখানার নাট্যরূপ দেখতে গিয়েছিলাম। খুব জমে নি। কারণ মূলত ওটা নাটক নয়, খেয়ালখুশীর আবোল-তাবোল। ওতে নাট্যরূপ ফুটিয়ে তোলা শক্ত।

* * *

চলেছি সদাই জীবন যাত্রী
কাটিল দিবস, কাটিবে রাত্রি
অনেক লোকের অনেক সঙ্গ
কখনও দ্বন্দ্ব কখনও রঙ্গ।
চলেছি সদাই চলিব সদাই
হবে না কখনও যাত্রা-ভঙ্গ।

৯

'সারথী' সংঘের নিমন্ত্রণে আজ তাদের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্য বিশ্বরূপায় গিয়েছিলাম। ছেলেগুলিকে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে ভাল লাগল ওদের সহ-সভাপতি ডক্টর ব্যানার্জিকে। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। একদিন আসবেন বলেছেন। Biochemistryর ছাত্র, গবেষণা করছেন, ভিটামিন 'সি' নিয়ে। অনুষ্ঠানের শেষে সত্যবাবুর (সত্য বন্দোপাধ্যায়) 'শেষ থেকে শুরু' অভিনয় হল। খুব ভালো লাগল।

১০

আজ ড্রাইভার আসে নি। কোথায় কি গোলমালের জন্য 'বাস' বন্ধ। আজ কবিশেখর কালিদাস রায়ের জন্মজয়ন্তী। সেখানে না গেলে অন্যায় হবে। তাই একটা ট্যাক্সি করেই গেলাম। অনেক এসেছিলেন। কালিদাসদাকে দেখে বড় কষ্ট হল। কিন্তু অন্ধ হয়ে গেছেন। কানেও কম শোনেন। আমি একটা কবিতা লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। শুনতে পেলেন না বোধ হয়। রাত দশটা নাগাদ ডাক্তার কালীকিংকর সেনগুপ্তর গাড়িতে ফিরলাম।

চারিদিকে ফেউ-ফেউ-ফেউ
শুনে হচ্ছে রাগ
রাগের কারণ কোথাও নেই বাঘ!
তবু ডাকছে ফেউ
নকল ফেউ ওরা সবাই
আসল নয় কেউ।
নকলেতে ভরে গেল দেশটা
নকল জল খেয়ে কিন্তু মেটে না যে তেষ্টা।
চারিদিকে জঞ্জাল যখন
গগনচুম্বী হয়ে ওঠে
তখন কে যেন আদেশ দেয়—
সাফ করে ফেল সব।
শুরু হয়ে যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব
মারামারি খুনোখুনি
ইয়াহিয়ারা লম্ফঝম্ফ করেন
ঝড় হয়, ভূমিকম্প হয়
কলিশন হয়
ডাকাতি হয়
বান আসে
মহামারী হয়
দেখতে দেখতে সাফ হয়ে যায়
জঞ্জালের স্তূপ।
আকাশের সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র আবার দেখা যায়।
কিন্তু আদেশটা কে দেয়?
স্বরাষ্ট্র দফতর জানাচ্ছেন—
তদন্ত হচ্ছে
খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও।

আজ বনবিহারীর নাতনীকে (পাপিয়ার মেয়েকে) দেখতে Newlands নার্সিং হোম-এ গিয়েছিলাম। নাতনী রূপসী হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছিল। যাওয়ার সময়ে আমার মোটর প্রায় সাঁতরে গেল। ফেরবার সময় ট্রাফিক জ্যামে আটক পড়ল। ভাগ্য ভালো, কোন গুন্ডা এসে হামলা করে নি। বাড়ি ফিরে রেডিওতে শুনলাম সব ঠিক হয়ে যাবে। মহাকরণে মহাবৈঠক বসেছে এবং ক্রমাগত নাকি বসতে থাকবে। যে দেশে এমন মহাকরণ আছে সে দেশের ভাবনা কি?

জাহাজের ক্যাপটেন বলছেন, সাবধান
গেট কর বন্ধ
এ কথা শুনে যে বড় হাসছেন?
হচ্ছে কি সন্দ?
দূরেতে দেখুন ওই কারা সব আসছেন
আদার ব্যাপারী ওঁরা—খবরেই সুখ পান

ছোট বড় মিঠে তেতো নানান খবর চান
খবরের সন্ধানে খুঁজবেন জাহাজের
অন্ধ্র ও রন্ধ্র
এ ঝক্কি সামলানো যাবে নাকো, সুতরাং
গেট কর বন্ধ।
ফুলের ঘায়ে তুমি যখন মূর্ছা যেতে
সে করত তর্জন
ইনিয়ে বিনিয়ে তুমি যখন নাকে কাঁদতে
সে করত গর্জন
এখন তুমি দাবি করছ--নাই বা থাকল প্রমাণ
সাম্যনীতি অনুসারে তুমি আর সে সমান।
রেগে মেগে সুতরাং সে ঝেড়েছে লাথি
খসে গেছে তোমার দন্ত-পাঁতি
ডেন্টিস্টের বাড়ি গিয়ে করছ
এখন গাওনা
বিনে পয়সায় দোহাই দাদা
প্লেট বানিয়ে দাও না
শামু বললে রামুকে
ব্যাপারটা কি বুঝছ ভাই
রামু বললে, যাচ্ছেতাই।
বাঁ হাঁটুতে বাত দিয়েছে জানান্
ব্যাপারটা কি বড্ডই বেমানান ?
মাড়ি থাকলেই দাঁত হয়
হাঁটু থাকলেই বাত হয়
ঘর থাকলেই ছাত হয়।
কষ্ট হচ্ছে ?
কষ্ট একটু হবেই তো
কষ্ট-কেষ্ট ভজলে পরে
মুক্তি পাবে তবেই তো।
মাছের ঝোল ভাত খাও
এবং মিষ্টি আম
তার সঙ্গে Asperin
এবং Colehicum
তার সঙ্গে পারো যদি
Infra Red লাগাও
চিন্তা-টিন্তা nonsense
ঝাঁটা মেরে ভাগাও।

বাত বেদনাহত জানু রে—
তুমি যদি হতে ভাই কানু রে
বলিতাম—চল চল এসেছে রূপসী রাই
যমুনায় চল যাই, ওঠ ওঠ ওঠ ভাই
হয়তো উঠতে তুমি
হয়তো ছুটতে তুমি
হয়তো ফুটতে গিয়ে
কদম্ব-প্রশাখায়
কিন্তু রে হায় হায়
বাতাহত জানু রে
নও তুমি কানু রে
সুতরাং হে অচল
শুয়ে থাক বিছানায়।

১৬

আজ চারিদিকে 'বাস' বন্ধ। 'বাস'-ওয়ালা ভাড়া বাড়াতে চায়। সব জিনিসের দামই হু হু বাড়ছে। আজ তেলাপিয়া মাছও নাকি চার টাকা সেরে বিক্রি হচ্ছে। কাগজে প্রচুর দুঃসংবাদ। ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে পুলিশদের সংঘর্ষ, তার চুরি, খুন, জখম ইত্যাদি ইত্যাদি। উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে নাকি কয়েকটা। কর্তারা তাহলে ঘুমিয়ে নেই!

আমেরিকা নাকি তার সুয়োরাণী পাকিস্তানকে বলেছে—তুমি ও পাশ ফিরে শোও।

এই সংবাদে আমরা সবাই কৃতার্থ হয়ে গেছি। কাগজে বড় বড় হেড লাইন। একজন বড় zoologist বলেছেন—আমরা সব Naked Ape. আমাদের বাঁদুরে প্রবৃত্তি এখনও বেশ আছে। তার সঙ্গে মিলেছে তথাকথিত কালচারের ভিটকেলিমি

মেছুনী গায়েতে মেখেছে আতর
তবু ছাড়ছে আঁসটে গন্ধ
ভদ্র সেজেছে বেয়াড়া বাঁদর
গাধারা সাধছে সুরেলা ছন্দ
নাচতে চাইছে খঞ্জ শ্রীপদ
রসিকেরা বলে একি এ বিপদ!

মহারাজ—
এ কি বেশ আজ?
কামাও নি দাড়ি
এসেছ পায়েতে হেঁটে
কোথা গেল গাড়ি!
বিড়ি কবে ধরিয়াছ?
ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়াছ
এ কি তব লীলা
মহারাজ কহিলেন—
মন্ত্রী মন্ত্র দিলা।

মহারাজা টহারাজা
এ বাজারে নিতান্ত অচল
সর্বহারা হও যদি
থাকিবে সচল।
তাই এই বেশ
ঝোলাগুড় হয়েছে সন্দেশ।

১৮

আজ অসীমরা [পুত্র] এল বাঁকুড়া থেকে। ট্রেন আসতে অনেক দেরী হয়েছিল। আমরা চিন্তিত হয়ে বসেছিলাম। বলল রাস্তায় ট্রেনের ইনজিনে আগুন ধরে গিয়েছিল। বেয়ারিং জ্বলে গিয়েছিল না কি। একটা মালগাড়ির ইনজিন কেটে ওদের গাড়িতে জুড়ে দিলে তবে ওদের ট্রেন চলল। ড্রাইভার নাকি ওদের বলেছিল, অনেক ইনজিন অকোজো হয়ে পড়ে আছে। কেউ কিছু দেখে না।

১৯

আইনত সম্পর্ক যাই হোক ভাই
বাবাকে অনেকে বলে শালা
জাতীয় সংগীতরূপে সভাতে যা গাই
বাস্তব জীবনে তার সাক্ষাৎ না পাই
বাস্তবের জাতীয় সংগীত—
পালা-পালা-পালা!
পালা পালা জুজু এর ওই
বউ ছেলে ঘর দোর ঘটি বাটি থালা
ফেলে খালি পালা
গা-বাঁচাতে পটু মোরা
পালাতে ওস্তাদ
পালিয়ে বিলেতে যাই
আমেরিকা-গুণ গাই

২০

বাড়ি আজ জমজমাট। রংগনা সমুদ্রে তো এসেইছে, ঊর্মিও এসেছে কাল বিকেলে। কাল বিকেলে সবাই 'হাতী মেরে সাথী' দেখে এলাম। খান্না আর তনুজার চেয়ে হাতীগুলোকেই বেশী ভাল লাগল। একটা ভাল থীমকে কি করে নষ্ট করতে হয় তা বম্বে ফিল্মওয়ালা জানে। অস্থানে অকারণে লম্বা লম্বা গান আর অনবরত ঘুঁসোঘুঁসি মারামারি—নষ্ট করে দিয়েছে ফিল্মটাকে। হাতীগুলো না থাকলে উঠে আসতাম।

আজ সকালে সমুদ্র অনেক বড় হয়ে গেছে। ঊর্মি কাজল দিয়ে তার গোঁফ আর জুলপি এঁকে দিয়েছে।

* * *

আজ পুজোর উপন্যাস 'সন্ধিপূজা' শেষ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

২১

আজ আমার জন্মদিন। ৭৩ বছরে পা দিলুম। অনেক হৈ চৈ হল। অনেক ফুল, অনেক মালা, অনেক উপহার, অনেক খাবার। ঝামেলার চূড়ান্ত। এক লাইন লেখা হল না। যিনি

আমাকে দিয়ে লেখান তিনি দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

আর একজন প্রশ্নকর্তা পরীক্ষক মনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো কার জন্মদিন? তোমার? তুমি কে? তুমি কি রোজ জন্মাচ্ছ না? তবে আলাদা একটা জন্মদিন বলছ কেন? জন্ম আর মৃত্যুর তফাৎ কি?

হাত জোড় করে তাঁকে বললাম—মশাই আমি মূর্খ লোক। অতএব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। আপনি আমাকে zero দিন। আর অনুমতি করেন তো আপনাকেও দুটো রসগোল্লা খাওয়াই।

২৪

আজ এসেছিলেন কল্যাণী রায় আর তাঁর স্বামী। অনেকক্ষণ গল্প হল। দেখলাম আমরা একই রোগে ভুগছি। রোগটার নাম সংস্কৃতি রোগ।

দুশ্চিকিৎস্য এই রোগে ভুগিছেন যাঁরা
একটি বিষয়ে জানি একমত তাঁরা
এ অসুখ সেরে যাক এ তাঁরা চান না
ওষুধ পেলেও তাই ছোন্ না, খান না।

বিকেলে কুমারেশ ঘোষ আর রমেন (মল্লিক) এসে 'সন্ধিপূজা' শেষ পর্যন্ত শুনলে। দুজনেই বললে—ভালো হয়েছে।

২৫

আমরা থিয়েটার দেখতে গেলাম 'উত্তরণ'। সাবিত্রী আর সরযূর অভিনয় খুব চমৎকার লাগল। সাবিত্রী Superb রাত সাড়ে নটার সময় ফিরে শুনলাম মেদিনীপুর থেকে শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সাঁতরা এসেছিলেন। 'আমরা তৈরী' পত্রিকা রেখে গেছেন কয়েক কপি।

তোমরা তৈরি আছো?
সত্যি কি তৈরি?
মনে রেখো বীরগণ
অন্তরে বৈরী
গিজ গিজ করছে,
তাহাদের উৎখাত
আগে কর তা না হলে
হবে শেষে চিৎপাত।

২৭

ও জুলাই সাতাশে—
এই পূর্বে বাতাসে
কি খবর আনলি?
চোখে কেন জল রে
বল মোরে বল রে
সত্যি কি জানলি
আসবে না বঁধুয়া
গায়ে দিয়ে ফতুয়া
টান দিয়ে বিঁড়িতে
বলবে না মাঠে চল

বলবে না ঘাটে চল
　　বসি গিয়ে সিঁড়িতে ?
কিছুই হবে না রে
দুনিয়াটা একেবারে
হয়ে গেছে দেউলে
নদী নেই সব নালী
ঝগড়া করছে খালি
　　সাপে আর নেউলে।
ফুল নেই সুর নেই
হাওয়া ফুর ফুর নেই
　　আছে শুধু কর্দম
আছে শুধু চিৎকার
ক্রন্দন ধিক্কার
　　এই শুধু হরদম।

২৯

মধু যখন শেষ হয়েছে
　　ভাণ্ডে যখন ঢং ঢং
খ্যাতির ঘড়ি তখন দেখি
　　ঘণ্টা বাজায় টং টং
এবং আমি সভায় সভায়
লেকচার দিই অং বং

৩০

জ্যামিতিতে পড়েছি কি কি শর্ত পূর্ণ হলে দুটি ত্রিভুজ বা দুটি রেখা একেবারে সমান হয়ে যেতে পারে।

নির্জীব ত্রিভুজ বা রেখার পক্ষে এটা সম্ভব। কিন্তু জীবন্ত জিনিসের বেলায় এ নিয়ম খাটে কি ? এক গাছের দুটি ফুল অথবা এক বনের দুটি বাঘ কি identically equal to each other ? না, নয়। কোন শর্তেই তারা identically equal হতে পারে না।

এমন কি, সাম্যনীতির উদ্ভাবক ও প্রবক্তা মানুষের সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। সমান হবার জন্য আমরা নানারকম বুলির আশ্রয় নিয়েছি, একরকম পোষাক পরছি, যাদের সঙ্গে মিলছে না তাদের মগজ ধোলাই করবার চেষ্টা করছি—কিন্তু হচ্ছে না, ব্যর্থ হচ্ছে সব চেষ্টা। তবু—

চারলাখকে চারশ' বলছে
　　আমি তোমার সমান
চার বলছে চারশ'কে
　　শূন্য দুটো সমান
চারকে বলে শূন্য
　　আমার মাঝে ডুব দাওনা হবে মহাশূন্য।

৩১

শত্রু ভিতরে আছে বাহিরে তো নেই

এ খবর দিয়েছেন অনেক মিতা
কিন্তু যে খবরটি দেননি কেহই
সে খবর বড্ড তিতা।
ভিতরের শত্রু বন্ধু মোদের
যে গয়না পরি তাতে ভরাই যে খাদ
খাদহীন গয়না কি হয় কখনও ?
ওরাই তো জীবনের সাধ আহ্লাদ
ওদের কি করে দেব বাদ।

আগস্ট ১৯৭১

আজ সন্ধ্যাবেলা অল ইন্ডিয়া রেডিওর আয়োজিত কবি সম্মেলনে গিয়েছিলাম। অনেক চেনা মুখের সঙ্গে আবার দেখা হল, অনেক অচেনাকেও দেখলাম। বেশ উপভোগ করলাম সভাটা। বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা বললাম আমরা, নানাভাবে, নানাসুরে, নানা ছন্দে। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে–

এ বলা কেবল মৌখিক নয় তো
এ সভা কেবল লৌকিক নয় তো!

৩

ক। তোমার লেখা আজকাল খারাপ হয়ে গেছে। অনেক বাজে ব্যাপারে মেতে তুমি সাহিত্যের প্রতি অমনোযোগী হয়েছ।
খ। [উষ্মা ভরে] আমার লেখা যদি ভালো না লাগে, পড়ো না।
ক। সত্যি পড়ি না, পড়তে পারি না। কিন্তু অপরে যে তোমার নিন্দা করে এসে, সেটা বড্ড গায়ে লাগে। তুমি আমার বন্ধু।
খ। [সক্ষোভে] অপরের কথা বিশ্বাস করো না।
ক। কিন্তু সত্যি তোমার লেখা খারাপ হয়েছে যে। ওরা মিথ্যে কথা বলছে না। তুমি আজকাল খারাপ লিখছ।
খ। [আরও উত্তেজিত] বেশ করছি, খারাপ লিখছি, তোমার তাতে কি ?
ক। আমার কিছু নয়, ক্ষতি সাহিত্যের।
খ। [সদম্ভে] দেখ, আমি যখন সাহিত্যের জমিদারিতে মুহুরি ছিলাম সকলের মন রেখে চলতাম। এখন আমি সম্রাট হয়েছি, যা খুশি করব। যা করব তাই মেনে নিতে হবে সবাইকে। যা বলব তাতেই জয়ধ্বনি দিতে হবে তোমাদের।
ক। [কুর্নিশ করে] জাঁহাপনা, আমি তাহলে বিদায় নিলাম।

৪

রঙমহলে চন্দ্রগুপ্ত দেখতে গিয়েছিলাম আজ। দানীবাবুর চাণক্য দেখেছি, শিশিরবাবুরও দেখেছি। চমক লেগেছিল। মহেন্দ্রগুপ্তর চাণক্য সে রকম চমক লাগল না। মনে হল শিশির ভাদুড়ির নকল। মুরা ভাল হয়েছিল। অ্যান্টিগোনাস চমৎকার। চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের আড়ম্বর করছিলেন বলেই দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারছিলেন না। মাঝে

তো একটা হৈ চৈ হয়ে গেল। কেতকী দত্তের হেলেন ভালো লাগল। তার কণ্ঠস্বরে তার মা প্রভার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

ছায়ার গানও বেশ লাগল।

আগষ্ট ১৯৭১

ঢাক বাজছে—লাগিয়ে মন
আমার কথা শোনরে শোন।
দাবী যদি না মানো তো
মাঠে করব মীটিং
এবং তাতে আমার নামটা
ঢাকে বাজবে আগে
আমার কথা না শোনো তো
দেব তোমায় বীটিং।'
এস বন্ধু বাগে
শিল্পী এবং রাজনীতিক
খেলুড়ে ও সাহিত্যিক
ঢাকের দিকে ছুটছে সব।
হারিয়ে গেছে দিগ্বিদিক।

আর কিছু থাক না থাক-
বাজুক শুধু আমার ঢাক
চলছে খালি ঢাকোৎসব।
শব বাহক এবং শব
বাজিয়ে যাচ্ছে ত্রেকেটে তাক।
আর কিছু থাক না থাক-
বাজছে ঢাক-বাজছে ঢাক।

বজ্র আঁটন ফসকা গেরোর খেলা
চলছে দিবানিশি
চলছে সারাবেলা।
ভূত বলছে সরষে মশাই
সবাই জানে আমি কশাই
আপনি মহাপ্রভু
ধর্মরাজের চেলা।
একটি কথা বলছি শুনুন
টাকাগুলো আগে গুনুন
টং টং টং করে
বাজিয়ে দেখে নিন।
তার পরেতে গ্রীন সিগন্যাল দিন।

হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ি সবাই
সব গুলোকে করে ফেলি জবাই
আপনি ঘটা করে
পাঠিয়ে দিন মর্গে
তার পরেতে তদন্তেরই স্বর্গে
হেঁয়ালি নাচ নাচতে থাকুক মেনকা ও রম্ভা
আমরা দিই লম্বা।
মহাপ্রভু শুনুন
টাকাগুলো গুনুন।

রবিবাসরের সভায় অনেকদিন পরে আশাপূর্ণা ও তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। খুব ভাল লাগল। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্করের বক্তৃতাটাও খুব উপভোগ করলাম। চমৎকৃত হলাম কিন্তু তারাশঙ্করের একটি কথা শুনে। সত্যি চমৎকৃত হলাম। সে বললে- ফজলুল হকের সঙ্গে তার যখন দেখা হয়েছিল তিনি নাকি তারাশঙ্করকে জড়িয়ে বলেছিলেন 'মরবার পর খোদা যখন জিজ্ঞেস করবেন তুমি বাংলা দেশ থেকে এসেছ তারাশঙ্করকে চেন ? তখন বলতে পারব হ্যাঁ চিনি; তাকে আমি দেখেছি।

নিজের মুখে সভায় একথা বলল তারাশঙ্কর। মন্মথ রায় ছোট্ট একটি নাটক পড়ল।

বাংলা দেশের ছোট্ট দুটি ঘটনাকে চমৎকার একটি নাটকীয় রূপ দিয়েছে সে। আমিও ওই দুটি ঘটনা নিয়ে ছোট গল্প লিখেছি একটা। নাম—'অসাধারণ খবর'। বেরুবে 'শ্রীমতী' পত্রিকায়।

* * *

মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দাও দাবী করতে গিয়েছিল গাঁয়ে-মানে-না আপনি-মোড়লরা। সে দাবী ছাড়িয়ে সভায় প্রবলতর দাবী উঠল সিনেমার নটনটীদের আমরা দেখতে চাই। মুজিবর ভেসে গেলেন। ভেসে গেলেন মোড়লরা। আনন্দবাজারে খবরটা ছাপেনি, পুরো ছেপেছে স্টেট্সম্যান আর Hindusthan Standard.

১২

মানুষ পশু এই কথা মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করা উচিত; কিম্বা মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন এইটে ধরে' নিয়ে তার দেবত্বকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করা উচিত ? এ এক মহা ধাঁধা। পশুর সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করবার ক্ষমতা কি সকলের আছে ? সকলে কি দেবতাকে উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখেন ? দুটোরই উত্তর—না। সুতরাং যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থাই চলছে সর্বত্র। আর মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

কালো আর সাদা।
কোনটাকে বেছে নিবি ?
মন বলছে দুটোকেই চাই।
এই হয়েছে মুশকিল ভাই।
সংশয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে তাই করছি হাঁইফাই।

১৪

'আহা কথাটির অনেক মানে।
ভাল গান শুনে বলি—আহা
কারও দুঃখ দেখলে বলি—আহা
কোন প্রতিবাদ করতে গেলে বলি—আহা
আবার অট্টহাস্য করি যখন
তখন বলি—আ-হা হা-হা-হা।
'আহা'র প্রাণের বন্ধু 'মরি'।
প্রায়ই আমরা করি
আহা মরি, আহা মরি
কিন্তু মরি না
দিব্যি বেঁচে থাকি।
আমাদের কথার সঙ্গে
কাজের মিল
কে দেখেছে কবে।
যেটা বলি 'হবে'
সেটা হবে না
যেটা বলি হবে না
হবে সেটাই।
আমরা দুঃখ মেটাই
কাজ করে নয়
হুজুক করে 'থিয়েটার করে' সিনেমা দেখে
কাগজ পড়ে' কবিতা লিখে
বিদেশীদের বাঁদরামি নকল করে'।
বিদেশে যত্র তত্র দেখি যাহা
গদ গদ কণ্ঠে বলি আহা আহা'।
বাহা বাহা বাহা!

১৫

হে পনেরই আগষ্ট,
ভারতের স্বাধীনতা দিবস বলে,
সবাই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে
আমিও জানাচ্ছি।
কিন্তু আমার মনের কথাটা শোনো
আমার মতে তুমি এখনও আসনি,
তুমি আসন্ন।
প্রসব-বেদনাতুরা ভারত-মাতা
এখনও প্রসব বেদনায় কাঁদছেন।
মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে
শেষ পর্যন্ত

সীজারিয়ান না করতে হয়।
যেদিন তুমি সত্যিই জন্মাবে,
সে দিন কি তারিখ হবে
তা জানি না।
সন্দেহ হচ্ছে
হয়তো সেই তারিখটার গায়েও
আমরা লেবেল লাগিয়ে দেব
পনরই আগষ্ট।
সুতরাং স্বাগত
হে ঐতিহাসিক ভুল তারিখ।
ক্ষুদিরাম কানাইলালের জন্মদিন
আমরা এমন ঘটা করে' পালন করি না।
কোন জিনিসটাই বা ঠিক করি আমরা?
একটি জিনিস করি শুধু
চাকরি।
তাও ঠিকমতো করি কি?

১৬

আজ রমাপদর 'এখনই' দেখলাম। মনে হল যেন ছবির মারফত খবরের কাগজ পড়লাম, রাস্তায় ঘাটে রোজ যা দেখি, যা শুনি তারই ফোটোগ্রাফ। রস স্রষ্টা কবির কোন পরিচয় নেই এতে। কিছু কিছু অশ্লীলতা আছে, তাই বোধ হয় বইটা চলছে।

আধুনিক জনতার সাময়িক ক্ষুধা
চিরকাল আছে ও থাকিবে
বিষের সমুদ্র হতে চিরন্তন সুধা
কবিরাই তুলিয়া রাখিবে।
ইহারা অতীব তুচ্ছ অতীব ক্ষণিক
আঁস্তাকুড় বাজারেতে বাস্তব বণিক।

১৮

বর্ষার বোধহয় বদলির অর্ডার এসেছে। জাল গোটাচ্ছে ক্রমশঃ। নীল আকাশের আভাস দেখা যাচ্ছে কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। ঘুঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে দু'একটা। বর্ষার ঘাসে ভরে গেছে মাঠগুলো আর তাতে চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা কালো মোষ। বর্ষাকালে এরা কাদায় মাখামাখি হত, এখন গা চকচকে। ওদের সংগে ঘুরছে বকেরা। তারা এদের পদ-তাড়িত ফড়িংগুলি ধরে ধরে খায় তাই ওদের সংগে অত ভাব। ভিজে কাকও আর দেখতে পাচ্ছিনা।

আমার গোলাপ ফুল খুব ফুটছে। দ্বারিকের কাকা যে গোলাপের চারা তিনটে এনে দিয়েছিলেন তার দুটোতে কুঁড়ি হয়েছে। জুঁই আর রজনী-গন্ধাও ফুটছে খুব। দোয়েলদের দেখা পাইনি ক'দিন। বুলবুলিরাও গা ঢাকা দিয়েছে। শালিক, গো-শালিক, ফিঙে আর চড়াইরা আসর জমিয়ে রেখেছে পূর্ববৎ। বর্ষাও ওদের দমাতে পারে নি। বাড়ির সামনে বিয়ে–শানাই বাজছে।

শরৎ নিঃশব্দে আসে নিতান্ত অনাড়ম্বরে–ফুলে, সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে নদীতে,

নীলাম্বরে। বর্ষার ভাষা বাদল, বর্ষার মেঘ কালো। শরতের মেঘ সাদা শরতের ভাষা আলো।

১৯

কুমারেশ আজ সকালে এসেছিল। বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। পরনিন্দা পরচর্চা আড্ডা-খিচুড়ির প্রধান মশলা। সে মশলা দরাজ হস্তে ব্যবহার করলাম তিনজনেই। লীলাও এসে যোগ দিয়েছিল।

তারপরই হঠাৎ চার দিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। কুমারেশ বলল আজ দোসরা ভদ্র। আমিও কাল লিখেছি—বর্ষার বোধ হল বদলির অর্ডার এসেছে। ভদ্র যদি পড়ে থাকে তাহলে অর্ডার এসেছে নিশ্চয়ই। শুনেছি অনেক বড় অফিসাররা আর মন্ত্রীরা বদলির খবর পেয়ে খস্ খস্ করে অনেক হুকুম লিখে নিজেদের বিক্রম প্রকাশ করে যান শেষ মুহূর্তে। বর্ষাও তাই করছে নাকি। শ্রাবণ শেষ হল, তবু এ কি কান্ড।

ওস্তাদ মার দেয় শেষ রাতে শুনেছি
নাটকের climax শেষ কালে হয়
ও বর্ষা তোমার কি মতলব বলতো
হচ্ছে যে ভয়।

বানে দেশ ডুবু ডুবু, বিরহীরা কুপোকাৎ ব্যাঙেরাও ডাকছেনা, চোয়াচ্ছে। ফাটা ছাত, অনাহার মহামারী হানছে বজ্রাঘাত—আরও কি করবে নয় ছয়? এতটা কি হবে নির্দয়?

২০

ভগবানে বিশ্বাস করি, কারণ বিশ্বাস করলে ক্ষতি নেই। বিশ্বাস করলে যদি মাইনে কাটা যেত, বা ট্যাক্স বাড়ত তাহলে কার বিশ্বাস কতটা অটুট থাকত বলা শক্ত। বিশ্বাস করলে লাভ অনেক সময়।

ভগবানে যারা বিশ্বাস করে না,
তাদের সম্বন্ধেও এসব কথা খাটে,
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের হাটে
একটি মাপেই জিনিস মাপি
সেই মাপটি স্বার্থ
এই নিয়মের ধমকানিতে ঘাটে বাটে
করছি মোরা দাপা দাপি
নেই কো এতে ব্যর্থ।
বলছি হেঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল ছিলেন
চার্বাকটা ছিলেন অপদার্থ।
দাদা এ কি সোজা।
ক'টা লোকে বইতে পারে
ক'টা লোকে সইতে পারে
বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বোঝা?
বড্ড বেশী ভার তো
জনপ্রিয় মাপ-কাটি তাই
স্বার্থ,—উপায়ও নেই এ ছাড়া ভাই
আর তো।

২২

যে বাজারে কেবল দলাদলি
ঢাকীরা সব বাজায় জগঝম্প
সেই বাজারে হঠাৎ এসে
নিশ্চয় তোর হচ্ছে হৃৎকম্প।
সবাই যেথা বুক চাপড়ে বলে
দেখ দেখ আমি মহামস্ত
সবাই যেথা কৌশলে বা ছলে
পদস্থকে করছে অপদস্থ
সুশ্রী এবং বিশ্রী
মুড়ি এবং মিশ্‌রি
যে বাজারে বিকায় একই মূল্যে
বিষবৎ পরিত্যাজ্য তাহা
বিপদ হবে এই কথাটি ভুললে।
থাকে যদি কিছু রূপ ও গন্ধ
এবং যদি থাকে মকরন্দ
তা হলে তুই এখান থেকে সর না,
এখানে নর্দমা খালি
কোথায় পাবি ঝরনা
মশা-মাছির এখানে ঘর করনা
থাকে যদি কিছু রূপ গন্ধ
এবং যদি থাকে মকরন্দ
পালা এখান থেকে
রসিক নয় ব্যাপারীরা
ধরবে তোকে ছেঁকে
এবং তোকে সং সাজিয়ে বলবে মারো লম্ফ
বাজিয়ে জগঝম্ফ।

২৩

কাল আশাপূর্ণার বাড়িতে রবিবাসর হয়েছিল। খুব ভালো লাগল, তার স্মৃতি এখনও মনকে আমোদিত করে' রেখেছে। সব ভাল লেগেছে আশাপূর্ণাকে আর তার স্বামী গুপ্ত মশাইকে। ভাল লাগাবার এই মন্ত্রটি সকলের আয়ত্তে নেই। আশাপূর্ণার আছে দেখলাম।

সহজ আন্তরিকতা
বহি আনে যে বারতা
কাগজে যায় না তাহা ছাপা
তবু তাহা খনে খনে
নাড়া দিয়ে যায় মনে
কিছুতে থাকে না তাহা চাপা।

২৪

পরিষ্কার বোঝা গেল পরিষ্কার কিছু নেই

সবেতেই এক-আধটু আছে নাকি ময়লা
এমন যে চকচকে উজ্জ্বল শ্রীহীরক
তারও নাকি আত্মীয় কয়লা!
চন্দন-চর্চিত পবিত্র গুরুদেব
যাহার তুলনা নেই ত্রিভুবনে কুত্র
সহসা হইল মনে–বাই জোভ, বাইগড্
তাঁরও পেটে আছে মলমূত্র।
ঘাবড়ো না বন্ধু হে তুচ্ছ ময়লা দেখে
লাভ কর শাশ্বত সেই কবি-দৃষ্টি
দেখবে তখন ভাই সব কিছু সুন্দর
আলো-কালো মিলে এই সৃষ্টি।

২৬

বাংলা ভাষার উন্নতি হইয়াছে, অনেক নূতন নূতন শব্দে সে নিজেকে সমৃদ্ধ করিতেছে। 'ফারাক' 'সমঝোতা' 'মোরচা' 'সামিল' 'মদত' জাতীয় নানা শব্দ আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি। প্রকাশের ভংগীও বদলাইয়াছে–এখন আমরা প্রস্তাব করি না, প্রস্তাব রাখি, মেয়েদের এবং ছেলেদের সাজসজ্জাতেও নূতনত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট। মেয়েদের নিম্ন নীবিবন্ধ, খোলা কাঁধ, খোলা পিঠ, ব্লাউজের বিদ্রোহী 'কাট' এবং ছেলেদের টাইট চোং প্যান্ট, টাইট জামা প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়–হ্যাঁ আমরা উন্নতি করিয়াছি বটে। পরকে আপন করিবার ক্ষমতা আমরা রাখি। সেই বেংগল যুগ হইতে অদ্যাবধি এ প্রমাণ আমরা দিয়াছি। অনেক মেয়ে লুংগী বা শালোয়ার পরিয়াও ঘুরিতেছেন এ দৃশ্যও আজকাল বিরল নয়! এ দেশে অনেক বেকার, এ দেশের ছেলে মেয়েরা টোকাটুকি করিয়া পাশ করে, এ দেশের ছেলে মেয়েরা খুনো-খুনিতে ওস্তাদ, ভালো ভালো রাজনৈতিক শ্লোগান রচনায় তাহারা দক্ষ, মানীদের অপমান করিতে বা গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া চুরি ডাকাতি করিতেও তাহারা নাকি পশ্চাৎপদ নয়। এসবকে যাঁহারা দোষ বলিয়া মনে করিতেছেন তাঁহাদের সহিত আমি একমত নই। বাঙালীর আবার দোষ কি, বাঙালীর ছেলেমেয়েরা যাহা করিবে তাহাই ভালো। তাহারা যে আলালের দুলাল। তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিনেমার অভিনেতা বা রাজনৈতিক নেতা হওয়া। এটাই কি কম!

আলু হবে না আঙুর কভু, বড় জোর হবে আলুর দম। আলুর দমও মিষ্টি। ওতেও আছে কৃষ্টি!

২৭

আজ বাংলা দেশে 'বাংলা বন্ধ্'। কিন্তু বাংলার বাহিরে রোজই বাংলা বন্ধ্! কোথাও সে কলকে পায় না। যে ক্রিকেটের জয়লাভ লইয়া আমরা এত বাজি ফুটাইলাম সে ক্রিকেটের দলে বাঙালী অনুপস্থিত। যে রাজনীতি লইয়া আমাদের এত লম্ফঝম্ফ সে রাজনীতিতে আমাদের কোন স্থান নাই। আমরা কেবল কয়েকটা দল করিয়া হুল্লোড় করি মাত্র। সে হুল্লোড়ে কেহ কান দেয় না। আমাদের দেশের অনেক কারখানা বন্ধ, বাংলার বাহিরে কোন কারখানায় আমাদের ঢুকিতে দেয় না। বলে শালা চোট্টা হ্যায়। চাকরির ক্ষেত্রেও তাই বাংলা সিনেমাগুলিও বন্ধ হইয়া আসিতেছে। উত্তমকুমার প্রাণভয়ে নাকি বম্বে পলাইয়াছেন। সেখানে তিনি কলকে পাইবেন কিনা জানি না। এ দেশের ভালো

ছেলে-মেয়েরা ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জারমানীতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তেমন সম্মান পাইতেছেন না। তাঁহাদের তাড়াইবার জন্য ২।১টা দেশে আইনও নাকি হইতেছে। আমাদের সাহিত্য ? সেখানে তো কেবল দলাদলি। প্রত্যেকেই নিজেদের ঢাক নিজেরাই পিটাইতেছে। খিস্তি এবং রাজনীতির চর্বিত চর্বনই এখন সাহিত্য, কিন্তু প্রকাশকরা বলেন—তাও নাকি বিক্রয় হয় না। সকলেই বিনা পয়সায় পড়িতে চায়।

সুতরাং 'বাংলা বন্ধ্'। শুধু আজ নয়, রোজ।

২৯

বাইরে যুক্তির কংক্রিট, হিসাবনিকাশের কঠিন আস্তরণ। কিন্তু একটু খুঁড়ুন জল বেরিয়ে পড়বে। চোখের জল। থিয়েটারে, সিনেমায়, বক্তৃতার গল্প পড়তে গিয়ে কথায় কথায় চোখে জল এসে পড়ে। ওইটেই বোধহয় আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলি। এখনও একেবারে শুকিয়ে যাই নি।

কাল সমস্ত রাত জল পড়েছে। তার জের আজও চলছে। মাঠে মহিষরা নেই, বকও নেই। একটা আর্ত কাকের ডাক শুনতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে।

আজও প্রধান খবর বৃষ্টি। আমার মোটরের ব্যাটারিটা চার্জ করবার জন্য বসিয়েছি। ড্রাইভার ভেসেও যায়নি ডুবেও যায় নি। তবু অনুপস্থিত। প্রয়োজন থাকলে, মানে তার নিজের প্রয়োজন থাকলে, সাঁতরাতে সাঁতরাতে আসত। সে প্রয়োজন নেই, সুতরাং আসে নি। কুমারেশ এর মধ্যে সিনেমার টিকিট কিনে বসেছে আমাদের জন্য। নিউএম্পায়ারে যেতে হবে। ভরসা দিয়ে গেল আপনার ড্রাইভার যদি না আসে আমি এসে নিয়ে যাব। ছবিটির নাম When Dinosaurs Ruled the Earth। প্রাগৈতিহাসিক নেতাদের ছবি। আধুনিক নেতাদের প্রাগৈতিহাসিক চেহারা দেখা যাবে। তখন অবশ্য গণতন্ত্র ছিল না। ছিল খোলাখুলি শক্তিতন্ত্র, উলঙ্গ ফ্যাসিবাদ। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি। এখনও সেই শক্তিতন্ত্র চলছে, গণতন্ত্রটা মুখোশ। ওই শক্তিতন্ত্রের আড়ালে আছে তদ্বিরতন্ত্র, গুন্ডাতন্ত্র, ঘুষ-তন্ত্র, ভন্ডামি-তন্ত্র নেপোতন্ত্র। যাক অত কথায় কাজ কি—

প্রধান মন্ত্রীর জয় গাই
প্রচন্ড বৃষ্টিতেও তিনি নাকি ছাতা লন নাই
কোটি কোটি শরণার্থী যে দেশেতে বেছাতা বিরাজে
আমার কি সেখানেতে ছাতা লওয়া সাজে ?
এই কথা বলেছেন নাকি
রটাইছে কাগজের ঢাকী।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১

হে পয়লা সেপ্টেম্বর, সেলাম।
কিন্তু আমরা যে ভাই গেলাম
ছোরা, বোমা, পাইপ-গান
করছে মোদের খান খান
শরণার্থীর কোলাহল
রাজনৈতিক প্রবল দল
তার উপর নানান্ বান।

শরতের বার্তাবহ
ওগো তুমি কহ কহ
কবে এর হবে অবসান।
কহেন ইন্দিরা গান্ধি
ধৈর্য ধরে বুক বান্ধি
রহ সবে, মিলিবে আসান।
কিন্তু শক্তি কোথা পাই
পেটে যে খাবার নাই,
দুর্মূল্য প্রতিটি আইটেম্,
শুনিতেছি থাকি থাকি
এ সব কান্ড নাকি
সবই চোরাবাজারীর গেম
ছোরা মেরে দেশোদ্ধার
করে যারা বার বার
এদের নাগাল তারা পায় না?
ছোরা মেরে এদের কি
দাবড়ানো যায় না?

আজ When Dinosaurs Ruled the Earth দেখলাম। Wonderful ছবি। এজন্য কুমারেশের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

২

আজ প্রধান খবর আলো। সকালে উঠেছে রোদ। খবরের কাগজ যদিও শাসিয়েছে আজও বৃষ্টি হবে।

তবু উচ্চকণ্ঠে কহি
আলোর ফরমান বহি
এলো যে তপন
সে আরাধ্য আমাদের
সফল স্বপন।
আজ নয় বরাবর
সমুজ্জ্বল দিবাকর
আমাদের 'for'-এ
বিজ্ঞানীরা শুনিয়াছি
গবেষণা করে'
বলেছেন, জ্যোতিষ্ক মহলে
স্বাতী লুব্ধকের দলে
রবি অতি নীচে!
কণ্ঠস্বর উঠাইয়া
অতি উচ্চ 'পিচে'
ঘোষিব তত্রাপি'
আমাদের কানা পুতে

পদ্মলোচন বলি
আছি মোরা happy
কত ছোট, কত বড় সে তর্ক নাহক
মূল কথা তিনি বন্ধু, আলোর বাহক।

৩

আকাশে মেঘ আছে, তবু বর্ষা নামে নি। আলোরই প্রাধান্য। ও বাড়ির ছাদে মেয়েটি কাপড় শুকুতে দিচ্ছে। ওকে চিনি। কিন্তু এতদূর থেকে মনে হচ্ছে চিনি না। চেনা-অচেনার বাজারে দূরত্বটাই বড় জিনিস। খুব দূরে চলে গেলে আপন লোকও অচেনা হয়ে যায়, খুব কাছে এলে অনাত্মীয়ও আত্মীয় হয়। দূরত্বের তোয়াক্কা করে না কল্পনা। সে দূরকে নিকট এবং নিকটকে দূর করে' হরদম খেলা করছে। তার কাছে সবাই চেনা, সবাই অচেনা, সবাই হাতের কাছে। যখন খুশী ধরে' যা খুশী করছে।

বেগমের সাথে সে যে বিয়ে দেয় ভিখারীর
চোখ ভরে' জল আনে নিষ্ঠুর শিকারীর
পাপের পঙ্ক মাঝে খুঁজে পায় পুণ্য।
তিনকে তিরিশ করে পিঠে দিয়ে শূন্য
কখনও কাহারও শিরে ধরেনাতো ছাতা সে
ছোট বড় নিয়ে কভু ঘামায় না মাথা সে
সত্যের খোঁজে কভু হয় নি সে মত্ত
তার মতে দুনিয়ায় সুন্দরই সত্য
ঘুঁটে কুড়োনীকে তাই তার রাজহস্তী
পিঠে তুলে নিয়ে শুধু পায় নাক স্বস্তি
রাজরাণী করে তাকে, আনে রাজপুত্র
খেয়ালীর খেয়ালের শেষ নেই কুত্র।

৪

বর্তমান নিয়ে আমরা বড্ড বেশী ব্যতিব্যস্ত। কেউ খুশী নই, সবাই অসন্তুষ্ট। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলি—আহা, আগে কি রাম রাজত্বেই বাস করেছি, কিন্তু ইতিহাস পড়লে বুঝতে পারি অতীতেও আমাদের দুঃখ কম ছিল না। খুনোখুনি, রাহাজানি, জোচ্চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, তেলদেওয়া, তেল নেওয়া, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, ভূমিকম্প সব ছিল। কিন্তু অতীতের মোহাঞ্জন চোখে পরে আমরা অতীতের সবকিছুকেই ভাল দেখি। আগে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল, কিন্তু আয়ও তেমনি কম ছিল। চার আনা সের মাছও রোজ কেনবার সামর্থ্য থাকত না যখন মাসিক আয় ছিল পঁচিশ টাকা। আসলে সন্তুষ্ট থাকাটা আমাদের ধাতে নাই। ওটা জীবধর্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার।

জীবধর্মের প্রেরণ হচ্ছে
    আরও, আরও, আরও,
নিজেদের কোলের দিকে সব ঝোল টেনে নাও
    যতখানি পারো
যদি কেউ বাধা দেয়
    সে ব্যাটাকে মারো।

'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—একথা শাস্ত্রে লেখা আছে। সে শাস্ত্র বাজারে কাটে না। পোকায় কাটে।

সুতরাং দুরারোগ্য ক্যানসারের মতো এই অসন্তুষ্টি আমাদের মনকে চিরকাল কুরে কুরে খাবে, আর আমরা চিরকাল হাহাকার করব। ইতিহাসের এইই নজীর।

খুকী বলে, কি সুন্দর ধপধপে সাদা তুমি দাদা
সাবান কি মাখ গাদা গাদা?
উত্তর দাও না কেন? কোন ক্রীম পাউডার 'ঘষে'
ফিট্‌ফাট্ হয়ে আছ বসে'?
দেবে না উত্তর? দাঁড়াও তাহলে—
এই বলে খুকী তার কাছে গেল চলে'
তাও কিন্তু হল অনর্থক
দুগ্ধ পক্ষ প্রসারিয়া উড়ে গেল বক।

কাল বাণী আমাদের My fair Lady ফিল্মটা দেখাল। G. B.S. এর পিগম্যালিয়নে গল্পটা গীতিনাট্য করেছে। চমৎকার লাগল। কিন্তু হৈ হুল্লোড়ের বাড়াবাড়িতে গল্পের আসল সুরটা কেটে গেছে মনে হল। অদ্ভুত অভিনয় করেছেন প্রফেসর হিগিন্‌স্ আর সেই ফুল-ওয়ালী। দুজনেরই অভিনয় নিখুঁত এবং অপূর্ব্ব।

... ...

আজ ভ্রাতঃ বাদলা বাদলা ভাব
এ বাজারে চলিবে না শরবৎ ডাব
চলিবে না অন্য কিছু মাছ মাংস ছাড়া
উদিল প্রভাসচন্দ্র স-মাংস-সিঙাড়া।
মাংসের সিঙাড়া নহে কাফি কিম্বা দেশ,
সঙ্গীতের রস তবু পাওয়া গেল বেশ।
মাংসের কিমা যবে দন্তেরা পিষিল
বেহাগের সঙ্গে যেন ভৈরবী মিশিল।

কাল রবিবাসর খুব জমেছিল ধীরেনবাবুর বাড়িতে। ভবানী মুখুজ্যে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা বিশ্লেষণ করলেন। চমৎকার লাগল। খুব ভাল লাগল পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ভাষণটিও। তিনি নিজে একজন নামজাদা শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ ও এদেশের শিল্প জগৎ সম্বন্ধে সুন্দর একটি আলাপ করলেন তিনি। ধীরেনবাবুর ওখানে প্রচুর খাওয়া হল। রাত্রে বাড়ী ফিরে আর খেলাম না কিছু। কুমারেশও এসেছিল। সে ভালো আছে দেখে আনন্দ হল। লীলা যায় নি। বাড়ী এসে শুনলাম দ্বারিক আর ক্ষৌণীশ বাবু এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে গল্প করেই তার সময়টা কেটে গেছে।

ছড়া—

মুড়োয় নি নটে গাছ। ফুরোয় নি গল্প
গল্পের ছোট ভাই যার নাম টল্প
সব্বাই বেঁচে আছে, নট-নটী ফর্মে
নটে গাছই নাচছে তো সব প্ল্যাটফর্মে
কাগজেতে গল্পেরা দাঁত ছিরকুট্‌ছে।
টল্পেরা গুজবেতে খই হ'য়ে ফুটছে।

সেকালের ঠাকুমারা চলে গেছে স্বর্গে
কেউ কেউ পড়ে আছে গবেষণা-মর্গে
তাদের ছিল কি দাঁত? অথবা অদন্ত?
এ নিয়ে হচ্ছে না কি ময়না-তদন্ত।

'হ্যাঁ' এসে বললেন, আমাক এবার থেকে
বলবেন 'না'
'না' এসে বললেন—আমার নাম 'হ্যাঁ'।
হকচকিয়ে বললুম
খুলে বলুন ব্যাপারটা
বুদ্ধি কিঞ্চিৎ কমতো,
রহস্যের ব্যাপারটা
না খুললে কি করে' ঠিক করব
ইতি কর্তব্য!
হেসে উঠলো দুজনেই
বললেন—হয়েছি যে সভ্য
নাককে বলতে হবে কান
কানকে ওষ্ঠ
তবেই না জমজমাট হবে
সভ্যতার গোষ্ঠ

... ...

তারাশঙ্কর অসুস্থ। ফোনে তাকে পাচ্ছি না! কাল তার বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম—পাঁচমাথার মোড়ে ট্র্যাফিক জ্যাম এত জটিল ছিল যে ফিরে আসতে হল। আজ রোদও হচ্ছে। জানি না আজ যেতে পারব কিনা। গিয়ে অবশ্য লাভ নেই। কিন্তু মন মানে না।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৮

খোকন সোনা চাঁদের কণা নয়
সে যে মানুষ মন্দ
খোকা বাবু খোকন মণি নয়
নয় সে টগর পদ্ম
নয় সে ভাবের রঙ্গীন মানুষ
নয় সে কার্তিক নয় সে গাণেশ
সে যে মানুষ সে যে মানুষ
সে যে মানুষ
তার পরিচয় যদিও নয় ছদ্ম
তবু সেটা লিখতে না রে
গদ্য কিংবা পদ্য

সে পুরাতন অতি প্রবীণ
অথচ সে সদা-নবীন সদা।

* * *

আজ সকালে বেশ রোদ হয়েছে। দেখা যাক কতক্ষণ টেকে। চক্রবালের সীমায় এখনও তো মেঘের স্তূপ। বিকেল নাগাদ কি মূর্তি ধরবে কে জানে।

* * *

কাল তারাশংকরের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখলাম ওকে পেথিডিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। সকালের দিকে একবার বমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল শুনলাম। ন্যাড়া ডাক্তার সুনীল দত্ত ওঁকে দেখছেন। আমরা যখন চলে আসছিলাম তখন উনি ঢুকলেন দেখলাম। আমি পরামর্শ দিলাম যোগেশ বাঁড়ুয্যে বা শিশির মুখুজ্যেকে ডেকে একবার দেখাও।

৯

আমাদের বাড়ির কাছে থাকেন ভবেশবাবু। পুলিশের আই. জি. কাল দেখলাম তাঁর বাড়ির ছাদে কাকেদের মেলা বসেছে। চেঁচাচ্ছে সবাই। উড়ছে, বসছে, ছটফট করছে।

হঠাৎ মনে হল পুলিশ অফিসারের বাড়িতে হয়তো বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। ওদের মধ্যেও রাজনীতি ঢুকেছে না কি? একটু পরেই কিন্তু হৈ হৈ করে চলে গেল। কি ব্যাপার হল বুঝলাম না! কোনটাই বা বুঝি!

* * *

আজ আমার বাড়ির কাঁটাতারের উপর একটা লাল ফড়িং আকাশের দিকে নিম্নাঙ্গ উঁচু করে বসে' আছে। ইংরাজীতে এদের বলে Dragon fly. আমি বাংলা নাম দিয়েছিলাম খপোত ফড়িং! ঠিক এরোপ্লেনের মত উড়ে বেড়ায়। নানা রঙের হয়। আজ যেটাকে দেখলাম সেটার রং লাল। শরৎকালেই এদের দেখা যায় বেশী।

* * *

তারাশংকরকে দেখে এলাম একটু আগে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। লোক চিনতে পারছে না। অনেক চেঁচামেচির পর সাড়া দিচ্ছে।

ভাল লাগল না।

১০

'আমি তোমার সংগে আলোচনা করব না।'

'কেন?'

'যে জন্মান্ধ তার সংগে আলো নিয়ে আলোচনা করা বৃথা।'

'কেন অশ্লীল বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা কি সম্ভব নয়?'

'সম্ভব। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয় সে কৌশলটুকু তোমার জানা নেই।

তুমি অশ্লীলতাটাই আস্ফালন করতে চাও। পশুরাও তা করে। পশুদের সাহিত্যিক বলে' সম্মান কেউ কখনও করেনি।'

'যা বাস্তব তাকে মানতেই হবে।'

'মানব। কিন্তু তা সুন্দর না হলে কাব্য সাহিত্যের শিল্পশালায় তাকে অপাংক্তেয় মনে করব। তা বিজ্ঞান হতে পারে সমাজতত্ত্ব হতে পারে, নৃতত্ত্ব হতে পারে কিন্তু কাব্য হবে না।'

'বিশদ করে করে' বলুন। কাব্যের সংজ্ঞা কি তাহলে আপনার মতে?'

'আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দুধে পেঁয়াজের রস মিশিয়ে দিলে খেতে ভাল লাগে তোমার?'

'দুধে পেঁয়াজের গন্ধ তো বিশ্রী।'

'কিন্তু ঐ পেঁয়াজ দিয়েই পেঁয়াজের পায়স তৈরি করতে পারেন শিল্পী রাঁধুনিরা। সে পায়সে পেঁয়াজের গন্ধ মাত্র থাকে না, খেতে চমৎকার হয়। আবার ঐ পেঁয়াজের গন্ধই মাংস বা আলুর দমে চমৎকার। তখন ঐ পেঁয়াজের গন্ধই শিল্পপর্যায়ে উঠে যায়। অশ্লীলতাকেও সুন্দর সাহিত্য করা যায়। কিন্তু সে ক্ষমতা তোমার নেই। তোমার রিরংসাটাকেই নানাভাবে প্রকাশ করছ তুমি। রিরংসা ফুটেছে, কিন্তু কাব্য হয়নি।'

১১

আজকাল দেখি শিশু সাহিত্য মানে ভাঁড়ামি। ছেলেমেয়েদের ফাজিল, ফক্কোড়, অসভ্য করে দেবার চেষ্টা। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' বইটা থেকেই এই প্রবণতা শুরু হয়েছে। সুকুমার রায় প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। কিন্তু তার 'আবোল-তাবোল' বই হিসাবে শ্রেষ্ঠ নয়। ওটা বড়দের পড়বার বই। বড়রা ওটা পড়ে আনন্দ পাবে। শিশু সাহিত্যে যোগেন সরকার, দক্ষিণারঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ চমৎকার চমৎকার বই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সব বইও তেমনি উতরোয়নি। উতরেছে অবনীন্দ্রনাথের। ত্রৈলোক্যনাথও চমৎকার।

তিলক-মালা ধারণ করলে
হয় না যেমন ভক্ত
আবির গুললে কলের জলে
হয় না যেমন রক্ত
শিশু-সাহিত্য হয় না তেমনি
ফাজলামি-ভগ্নাংশে
ক্ষীরের সোয়াদ যায় না পাওয়া
'Pun' সত্ত্বেও পানসে
শিশুর মনে রস যোগানো
সত্যি বড় শক্ত
তোমরা খালি আঁকছ বসে'
অসভ্যতার ছক তো।

* * *

দেখলাম প্রকান্ড একটা মোষ কাদায় মাখামাখি হয়ে শুয়ে আছে ডোবায়। তার শিং-এ একটা কাক বসেছে, আর একটা বসেছে মুখে। ঠুকরে ঠুকরে কি করছে যেন। মোষটা পরম আরামে শুয়ে তাদের সেবা নিচ্ছে।

১২

আজ ছাতের আলসেতে শালিক পাখীর একটি বাচ্চার সঙ্গে দেখা হল। সদ্য উড়তে শিখেছে। ডানা কাঁপিয়ে আমার দিকে চেয়ে পক্ষী ভাষায় যা নিবেদন করল, তার মানে হল— আমাকে মারবে নাকি? আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না, এগিয়ে গিয়ে বল্লাম, আয় আয়। এল না, উড়ে গেল। মানুষ মাত্রেই যে পাজি এই ধারণা ওদের মজ্জাগত।

শালিক-বালক কিম্বা ওগো শালিক-বালিকা

লীলাবতী হ'ত যদি তুহার পালিকা
হ'ত কি খুব ক্ষতি ?
ফুড়ুৎ করে' পালিয়ে গেলি
তুই তো বোকা অতি।

লিখেই মনে হচ্ছে ওকে কি আমরা ওর খাবার দিতে পারতাম ? ওরা পোকা ধরে' খায়। আমরা তো দিতে পারতাম না। বড় জোর ভাত, ছাতু দিতাম। তা-ও ওরা খায়। কিন্তু পোকা না পেলে সুখী হয় না। তার উপর হয়তো খাঁচায় পুরে রাখতাম। সে আর এক যন্ত্রণা। না, ও পালিয়ে বুদ্ধির পরিচয়-ই দিয়েছে।

স্বাধীনভাবে থাকবে ওরা
সুখেতে বা দুঃখেতে
পরাশ্রয়ী হ'য়ে থাকে
অলস এবং মূর্খেতে
স্বাধীনতার মানে
শালিকেরাও জানে।

১৩

তারাশঙ্করকে দেখে এলাম এখনই ! চেহারা দেখে ভাল লাগল না, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। ঘড়ঘড় শব্দও হচ্ছে একটা। চোখ বোজা। জ্ঞান নেই ! কাল রাত থেকে পেচ্ছাপ হয় নি। পায়খানাও হচ্ছে না। ব্যাপার মোটেই আরামপ্রদ নয়, বহুকালের বন্ধু, চলে যাবে। সজনী অনেকদিন আগেই গেছে। পরিমলের অবস্থাও ভাল নয়।

যাওয়াটাই স্বাভাবিক
নহে তা নিবার্য
হায় হায় কিন্তু আমাদের কার্য
ঠিক এর বিপরীত
ক্রমাগত বলছি হারব না, হারব না
হবেই হবে জিৎ।
ছাড়ব না কাউকেই
কিছুতেই
নিজেকে বলছি
ভিন্ সুরে বলছি
মৃত্যুর সঙ্গে লড়ব
দুদ্দাড় ছুটে গিয়ে পড়ব
ছাড়ব না, ছাড়ব না
কাউকেই ছাড়ব না। ছেড়ে দিতে পারব না।
শেষে হায় ছেড়ে দিতে হচ্ছে
টানাটানি যুদ্ধটা
চিরকালই চলবে ও চলছে।
হেরে হেরে মরছি
যুদ্ধও করছি

চিরকালই করব
লড়ব ও মরব।

১৪

তারাশঙ্কর চলে' গেল আজ।

১৫

তারাশঙ্করের শোকে আচ্ছন্ন আমরা। তবু আজ বিকেলে বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। গজেনের ওখানে প্রমথ বিশীর সঙ্গে দেখা। তাকে আনন্দবাজার আপিসে পৌঁছে দিতে হল। ফেরবার মুখে বিরাট জ্যাম-এর ভিতর পড়ে' গেলাম! ভাগ্য ভাল ছিল তাই 'জেলি' হয়ে যাইনি। একটা গরদের পাঞ্জাবী করতে দিলাম। রন্তুবাবু টাকা দিয়ে গিয়েছিল। ফিরবার সময় মাণিকতলা বাজারে ঢুকে ভাঙন মাছ কিনলাম একটা, বাড়ি এসে ওজন করে দেখলাম পঞ্চাশ গ্রাম কম দিয়েছে। মেছুনীটা চোর। যে দেশে ভদ্রলোকরাই চোর সে দেশে মেছুনী সৎ হবে এ আশা করা অবশ্য অন্যায়।

রাজ্যপাল ১৬ জন কর্মচারীকে কাজে গাফিলতির জন্য বরখাস্ত করেছেন। তাই নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। ভাবটা আমরা কাজ ভালভাবে করব না, কিন্তু আমাদের কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এসব চুকে গেলে যেই একলা হলাম অমনি মনে হল তারাশঙ্কর নেই।

১৬

দুপুরে খাওয়ার পর একতলায় দক্ষিণদিকের গ্রিলঘেরা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়েছিলাম। রোজ খানিকক্ষণ এখানে শুয়ে থাকি। আজ হঠাৎ দেখি গ্রিলের ফাঁকে এসে বসল একটা পুরুষ দোয়েল পাখী ল্যাজ খাড়া করে। তার কুচকুচে কালো আর ধপধপে সাদার অপূর্ব সমন্বয় মহিমান্বিত করে তুলল জায়গাটাকে। আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। সে গ্রিল দিয়ে বারান্দায় ঢু'কে পশ্চিমদিকের গ্রিলের ফাঁক দিয়ে গিয়ে বসল বুগেনভিলার লতার ঝাড়ে। তারই ডালপালায় ঘোরাঘুরি করতে লাগল। মাঝে মাঝে ল্যাজটা খাড়া করছে আবার নামিয়ে নিচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, তারপর টপ্ করে নীচে মাটিতে নামল। একটা পোকা মুখে নিয়ে উড়ে গেল কিছুক্ষণ পরে। সামান্য একটা ঘটনা। কিন্তু এইটেই আমার কাছে অসামান্য মনে হচ্ছে আজ। খবরের কাগজে আজ অনেক বড় বড় খবর বেরিয়েছে–কিন্তু এ খবরটার তুলনায় সব তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

দোয়েল পাখী খুব কাছে যে এসেছিল
পারছি না কো কিছুতে যে এ আনন্দ রাখতে চেপে
কালো সাদার ঠমক ঠাটে নেচেছিল
বলেছিল মনের কথা পুচ্ছটুকুর উৎক্ষেপে।
বলেছিল নইকো আমি শালিক চড়াই
    কাকের মতো নইকো আমি ঘরোয়া
তোমাদের কি করি আমি কেয়ার' থোড়াই
    নেই নেইকো আমার কুছ পরোয়া।
তুড়ুক তুড়ুক করে' লাফাই–ফুড়ুৎ করে' উড়ি
পোকা ধরে' খাই তো আমি খাই না ছাতু মুড়ি।

১৭

আজ শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। এই উপলক্ষে 'শরৎ-সমিতি'র একটি সভা আজ হল। কিন্তু সে সভায় শরৎচন্দ্রের চেয়ে বেশী আলোচনা হল তারাশঙ্করের। নূতন লোক যেমন আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে, নূতন শোকও তেমনি।

জীবনের প্রতি ক্ষণ ক্ষণকাল পরে
লুপ্ত হয় সুপ্রাচীন কালের সাগরে
প্রাচীনে দেখে না কেহ, নূতনের লাগি
উৎসুক মানবমন সদা আছে জাগি'
সে উৎসুক মনও শেষে ক্ষণকাল পরে
অবলুপ্ত হয়ে যায় কালের সাগরে।
বর্তমান তার পায়ে নিত্য হ'য়ে বলি
ধরে অতীতের রূপ, পরে যেই সাজ
সে সাজের অলংকার বহু মৃত 'আজ'।

১৮

এপার বাংলা ওপার বাংলা লেখকদের সম্মেলনে গিয়েছিলাম। বেশ ভালো লাগল। ওপার বাংলার লেখকদের মধ্যে যে আগ্রহ মনে হল তা আন্তরিক। তাঁদের ভাষণগুলিও তথ্যপূর্ণ, প্রাণময়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কি হল তা এখনও অজানা। আগুন জ্বলছে, আগুনের মধ্যে লোহা পুড়ছে, সেই পোড়া লোহা কোন হাতুড়ির আঘাতে কি মূর্তি নেবে তা জানি না।

আজকের সভাটি কিন্তু ভাল লাগল। প্রত্যেকের ভাষণ ছাপা হওয়া উচিত। কিন্তু হায়, সাহিত্যিকদের নিজেদের কোন পত্রিকা নেই। ব্যবসাদাররাই সাহিত্যের হালে বসে আছেন সেখানে সব সাহিত্যিকদের জায়গা নেই। বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভা বাঙময় হয় এমন কোনও পত্রিকা তো দেখতে পাইনা। নামজাদা পত্রিকাগুলোতে পত্রিকার কর্মচারীরা বা তাদের পেটোয়া লোকেরাই লেখক। তাঁরাই পাঠকমহলে সুসাহিত্যিক, বিজ্ঞাপনের জোরে গাধাও ঘোড়া হচ্ছে। ভেড়াদের গায়ে লেবেল লাগানো হচ্ছে—ইনি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। দুর্ভাগ্য আমাদের।

১৯

আজ ডাক্তার কালীকিংকর সেনগুপ্তের বাড়িতে রবিবাসর হল। কালীদার ভদ্রতা এবং অমায়িক ব্যবহার তুলনাহীন। প্রকৃত বিদগ্ধ ব্যক্তি তিনি।

সভার উপলক্ষ—তারাশঙ্করের স্মৃতি-তর্পণ। বেশ ভালো ভাবেই হল সেটা। তাঁর সম্বন্ধে সকলেই বেশ চমৎকার বললেন। আমি একটি কবিতা পড়লাম। সভানেত্রী হয়েছিল আশাপূর্ণা। গানগুলিও প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। আকাশে মেঘও ঘনিয়ে এসেছিল চারদিকে। অনেকে ভিজতে ভিজতেই এলেন। এই মেঘমেদুর পরিবেশে আমাদের সকলের প্রিয় তারাশঙ্করকে আমরা আমাদের মনের কথা নিবেদন করলাম। এ পরিবেশ কিন্তু থাকবে না।

মেঘ কাটবে রোদ উঠবে
নূতন গাছের ফুল ফুটবে

তাদের নিয়ে মাতব মোরা
তোমায় যাব ভুলে
তুমি বন্ধু ছবি হয়ে
থাকবে শুধু ঝুলে।

২১

সত্যি আজ গিয়েছিলাম তারাশঙ্করের বাড়ি। সত্যিই বাড়িটা কেমন খাঁ খাঁ করছে। গাছ রয়েছে ফুল নেই। বৌদি কাঁদছেন না। একটা ময়লা কাপড় পরে তারাশঙ্করের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 'এখানে ধূপকাঠি দিয়ে যাও' কাকে যেন বললেন।

আমাকে চিনতে পারলেন না। বললেন–চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তারপর হঠাৎ বললেন–ও আপনি বনফুল। এইবার চিনেছি। বসুন বসুন। আমি ঠাকুর ঘরে যাই।

বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। লোক খাওয়ানোর প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছে। ভিখারীরা ভিক্ষা চাইছে। তারাশঙ্কর রোজ না কি ওদের ভিক্ষা দিত। এখন সবাই ধমক দিচ্ছে।

আজ সুনীতিবাবুর ছেলে একটি জাপানী মহিলাকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। মেয়েটি টোকিও থেকে এসেছে। আমার লেখা পড়েছে, অনুবাদ করেছে। আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য খুব উৎসুক। চমৎকার মেয়ে। সঙ্গে আছে ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার। দুটোরই সামনে বসতে হল আমাকে। বললে–আপনাকে জামা পরতে হবে না। আপনার শুধু গায়ের ছবিই তুলব আমি। টেপরেকর্ডারে বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বললাম। আমার জন্য জাপানী একটি চমৎকার ছোট ট্রে নিয়ে এসেছিল। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ায়। এদেশে বাংলা বই সংগ্রহ করতে এসেছে। আমার লেখা 'তুমি' ও 'তীর্থের কাক' দিলাম ওকে। একটা ছোট ছবিও দিলাম। ভারী খুশি। আবার আসবে বলে' গেছে।

মেয়েটির নাম কাজুকো ইয়ামাদা
নেই কোন চালিয়াতি অতিশয়
সিধে সাদা।
ঝুঁকে ঝুঁকে বার বার
করল নমস্কার
হাসি খুশি মুখ খানি
কইল একটি বাণী
যদিও রয়েছি দূরে
বাঁধা আছি একসুরে।

২৩

কাল বিকেলে বাচ্চুদের বাড়ি গিয়েছিলাম অনেক দিন পরে।...ফেরবার সময় দেখলাম রাস্তায় ট্র্যাফিক পুলিশ নেই। সম্ভবত কোনও ট্র্যাফিক পুলিশ খুন হয়েছে কোথাও।

নেইক নিরাপত্তা
চতুর্দিকে হত্যা এবং হত্যা
শাসন-তরীর হাল ধরেছেন

নানান্ জাতের কর্তা
পাচ্ছে না কেউ ধরতে কিন্তু
আসল সুরের ধরতা।

কারো চোখে চর্ম নেই
কারো মনে ধর্ম নেই
হিংসা ঘুড়ির চলছে লড়াই।

মাগগি জিনিস, ভাঙছি চড়াই
আয়ের ব্যয়ের পড়তা
মিলছে না যে কোন মতেই
হচ্ছে খালি হত্যা!

২৪

আজ মেয়েরা আর নাতনীরা এসেছিল। খুব আনন্দে কাটল দিনটা। সকালে তারাশঙ্করের বাড়ি গিয়েছিলাম। সমারোহে শ্রাদ্ধ হচ্ছে দেখলাম। সন্ধ্যার দিকে বহুবাজারে এক পূজামন্ডপে প্রধান অতিথি হওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণটা নিয়েছিলাম কুমারেশের অনুরোধে। গিয়ে দেখি চরম বন্দোবস্ত। তার ওপর বৃষ্টি। কোনরকমে কাজ সেরে পালিয়ে এলাম।

চারিদিকে গোলমাল
ঠ্যালাঠেলি, মাইক
শশব্যস্ত, হন্তদন্ত
ভলান্টিয়ার পাইক
এরি মধ্যে কোনক্রমে
সাঙ্গ করে ভাষণ
ফিরে এসে নিজের ঘরে
নিলাম নিজ আসন।
লুঙ্গি পরে খালি গায়ে
চেয়ারেতে বসে'
পাখাটাকে ফুল ফোর্সে
চালিয়ে দিয়ে কোসে'
বললাম—আঃ বাঁচা গেল
বেঁচে গেছে প্রাণটা
ঢকঢকিয়ে খেয়ে ফেললাম
জল কিছু ঠান্ডা।

সন্ধ্যাবেলায় লেকের পূজামন্ডপে গেলাম। আজকাল ঠাকুররা আর এক চালচিত্রে থাকেন না; একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা। মস্তানের যুগ বলেই কি অসুরটাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে? দুর্গার চেয়ে অসুরই বেশী করে' চোখে পড়ে'। একটা সিনেমা হওয়ার কথা শুনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ হট্টগোলই চলল। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম হওয়াতে বাড়ি ফিরে এলাম।

২৭

আজ অষ্টমী! লীলার এবং পুতুলের অঞ্জলি দিতে হবে। বাঙালীরা এক মতে কিছু করতে পারে না, ওইটেই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। পূজোতে গুপ্তপ্রেস মত এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মত চালু হয়েছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আজ সপ্তমী। লীলা কিন্তু গুপ্তপ্রেস মতাবলম্বী। সুতরাং পুতুলও। তাদের অঞ্জলি দেওয়াবার জন্য গুপ্তপ্রেস মতাবলম্বী প্যাণ্ডেলে–অর্থাৎ লেকটাউন এ্যাসোশিয়েসন প্যাণ্ডেল যেতে হল। আমাদের লেকটাউনে যে পূজোটা হচ্ছে সেটা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে।

সুতরাং অনেকক্ষণ সহিয়া দুর্গতি
অঞ্জলি সমাপ্ত হল ভীড় গোলমালে
তারপর বাড়ি এসে পুতুলের হইল সুমতি
আলুর পরোটা করি সামালিল তালে।
আরতি দেখিতে পুন গেনু সন্ধ্যাবেলা
দাঁড়াইনু বহুক্ষণ পরিক্লান্ত দেহে
শুনিনু ঢাকের বাদ্য, পুরুতের খেলা
তারপর অকেকের সাথে হল হেঁ হেঁ।

২৮ নবমী

আজ ভোরে মোটরে করে'রনতু এসেছে! আর এসেছে ফ্রিজের মিস্ত্রি আহুজা। ফ্রিজ দেখে শুনে বলল কি যেন পুড়ে গেছে। কিনতে হবে। ১২৫ টাকা রনতু দিল। টাকাটি নিয়ে আহুজা হাওয়া হয়েছে। কখন ফিরবে সেই আশায় আছি। লোকটা মদ খায়, আজ মদের দোকান নাকি সব সময় খোলা। আমাকে বাবা বলে' ডাকে। তার বয়সও ষোলোর চেয়ে বেশী। দেখা যাক পুত্র শেষ পর্যন্ত মিত্রবৎ আচরণ করে কিনা।

আহুজা বিকেলে এসে ফ্রিজ ঠিক করে দিয়ে গেছে।

ছড়া

শ্রী অমুক দত্ত
ঠিক যেন গর্ত।
শ্রী অমুক পালটি
রাখেন ঠিক তালটি
সেন মহাশয়ের নাচ-পা
দ্যাখেন সাপের পাঁচ পা
তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছেন
ত্রিভুবন কাঁপাচ্ছেন।
মুখুজ্যে কি করছেন?
সব হাটেই বিকোচ্ছেন।
মুজিবর রহমান
পাহাড় যেন দহমান।
মারছে কোপ ফেলছে টোপ
অনেক দাস অনেক গোপ
অনেক লাল অনেক সিং
টেলিফোনে করছে রিং।

২৯

কাগজে দেখলাম ব্যারাকপুর পূজো প্যাণ্ডেলেও সমাজ বিরোধীরা বন্দুক ছোরা ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছিল। প্রতিমাও riddled with bullets স্টেটম্যান লিখেছে। একটি ছেলে মারা গেছে। কয়েকজন আহত।

বীরত্বের চাপে
বীরত্বের তাপে
ত্রিভুবন কাঁপে
ভাবছেন যাঁহারা
বীরত্বের ভুল মানে
বুঝেছেন তাঁহারা।

গুণ্ডার গুণ্ডামী
বীরত্ব নয়
ওরা যা করেছে তাকে
গুণ্ডামী কয়
ওরা যা করেছে সাকরেদ
জেনারেল টিক্কার
ওদের প্রাপ্য শুধু
নির্জলা ধিক্কার।

৩০

কালকেরই খবর লিখছি আজ।

প্রধান খবর সাইক্লোন। আমাদের পূজা প্যাণ্ডেল ভেঙে গেছে। লেকটাউন নিষ্প্রদীপ। প্রতিমাকে গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে এনে রাখা হয়েছিল। সেখানে হ্যাজাকের লণ্ঠনের আলোয় মা বিরাজ করছেন এক রাত্রির জন্য। মিঃ গুপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সুতরাং মা নিরাপদেই থাকবেন আশা করি।

সাইক্লোনের দাপাদাপি সামনে কিন্তু চলেছে। আলো নেই। টুলুরা যেতে পারল না। ট্যাক্সি পাওয়া গেল না।

চারিদিকে অন্ধকার
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বার
মোমবাতি জ্বালালাম
লিখিলাম দুর্গানাম।

* * *

পূজার বাজারে ইলিশ এবং ভেটকি আমাদের মুখ রক্ষা করেছে। রোহিত কাকে মোহিত করতে গেছেন জানি না—আমরা পেলাম না।

অক্টোবর ১৯৭১

১

তারাশঙ্করকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট্ ডিগ্রীতে ভূষিত করলেন তাঁর মরবার পর। সমারোহ ভালই হয়েছিল। গিয়েছিলাম

সেখানে। ছোটখাট বক্তৃতাও দিতে হল একটা। তারাশঙ্কর জীবনেও অনেক সম্মান এবং পুরস্কার পেয়ে গেছে। এখন আসল সম্মান যেটা সেটার জন্য তাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। মহাকাল শেষ বিচারক। কিন্তু তিনি তড়িঘড়ি কিছু করেন না। তার বিচার বেশ সময়-সাপেক্ষ। অত্যুক্তির ঝড় ঝাপটা যখন কেটে যায়, সমসাময়িক বন্ধু বা শত্রুরা যখন গতাসু হবেন, তখন তাঁর রায় বেরুবে। সে অভ্রান্ত রায়ের কি মর্ম তা এখন আন্দাজ করা শক্ত। আশা করি সে রায়েও তারাশঙ্কর অত্যুক্তিবর্জিত নিখাদ সোনার মর্যাদা লাভ করবে।

২

বিজয়ার প্রণাম এবং কোলাকুলি চলেছে পরশু থেকে। আরও ক'দিন চলবে কে জানে। চিঠিও আসছে গাদা গাদা।

সমাজে যখন বাস করি তখন এসব সহ্য করতে হবে।

খাঁটি দুধ চাও যদি
পোষ ভাই গাভী
গাভী কিন্তু জেনে রেখো
ঝন্‌ঝাটের চাবি।
ঝন্‌ঝাট এড়াইতে
চাহ বন্ধু যদি
গয়লার সজল দুগ্ধ
ভুঞ্জ নিরবধি।
সংসার-ঝামেলা যদি
এড়াইতে চাহ
বনে গিয়ে কর তবে
জীবন নির্বাহ।
সংসারেতে মজা আছে
আছে লাথি ঝাঁটা
সুস্বাদু ইলিশ মাছ
কিন্তু বহু কাঁটা।

৩

আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। ১৯২৯ থেকে এই দিনটিতে মা লক্ষ্মীর একটি পটকে পূজা করে সামান্য কিছু উৎসব হয়। এই দিনেই ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ভাগলপুরে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। এবারও সে পূজার আয়োজন হচ্ছে। আগে আমি আর লীলা এ আয়োজন করতাম। এখন ছেলেরা করছে। আমি নির্বিকারভাবে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি। লীলা উপবাস করে পূজোর ঘরে পায়েস রাঁধছে। পুতুল ভোগ রান্নায় ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর মা লক্ষ্মী একটা কৌতুক করলেন। হঠাৎ ইলেকট্রিক কারেন্ট চলে গেল। মনে হল বাড়িরই কোন অংশে ফিউজড্ হয়েছে। ডাঃ সুবোধবাবু তখন এসেছিলেন। তিনি বৃদ্ধ। আমার চেয়েও এক বছরের সিনিয়র। তিনি একটু পরে একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে খুঁজে এনে হাজির করলেন। ইলেকট্রিকের আলো আবার ফিরে এল। কিন্তু সুবোধবাবুর মধ্যে যে আলো দেখলাম সে আলো আগে দেখিনি। মুগ্ধ হলাম।

পুজোর পর পাড়ার অনেকেই এসে প্রসাদ নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে এসেছিলেন আমার শাশুড়ী, আশাপূর্ণা আর তার স্বামী। আরও অনেকে এসেছিলেন। বৌমার রান্না খিচুড়ি ভোগ অপূর্ব হয়েছিল।

বেশ আনন্দে কাটল সন্ধ্যাটা। পাড়ার মেয়েরা ছেলেরা আমারই ঘরের ছেলে মেয়ে হয়ে গেল। পরিবেশন করল, খেল, আনন্দ করল। মনে হতে লাগল আমিই যেন বাইরের লোক।

৫

অর্থ মনর্থম
এটা না কি মহা ভ্রম।
এ যুগের শর্ত
টাকাই সামর্থ্য।
সব করি বর্জন
সামর্থ্য অর্জন
কর আদা জল খেয়ে
কহেন বন্ধু জন।
টং টং ঝন্ ঝন্
টঙ্কার নিক্কন
কম্প লোকেতে করে
উন্মন তনুমন
বাস্তবে দেখি হায়
সব শেষে উপে যায়
আসে বান আসে ঝড়
ডুবে যায় ভেসে যায়
মজে যায় ফেঁসে যায়
বহু ঝামেলার বাঁশ
ঢুকে যায় চচ্চড়।

পাড়ার কয়েকটি ছেলে এসেছিল। তারা 'সুভেনির'
বার করবে। তাতে কিছু বাণী দিতে হল।
এই হুজুগেই বাঙ্গালী মোলো।

চাকরি লোলুপতা
আর হুজুক প্রবণতা
বাঙ্গালীর এই দুটি দুর্বলতা
তাদের ফোতো বাবু
আর ফফর দালাল করছে
তাদের হৃদয়-কুম্ভ যা দিয়ে ভরেছে
তা নয় পশ্চিমবঙ্গের জল বা পূর্ববঙ্গের পানি
তা ধার করা কচকচানি আর কপচানি
তাতে আছে নোংরামি আর অসভ্যতা

শালীনতাহীন অভব্যতা।

* * *

সন্ধ্যাবেলা ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এসেছিলেন। খানিকক্ষণ গল্প করে ভারি তৃপ্তি পেলাম। তিনি প্রকৃতই বিদগ্ধ ব্যক্তি।

* * *

ড্রাইভার আসে নি। নূতন লোক খুঁজতে হবে। চেষ্টা করছি চারদিকে। হতভাগ্য দেশে ভালো লোক পাওয়াও মুশকিল।

৯

আজ বিকেলে লেখকদের আহ্বানে একটা সভা হচ্ছে। সেখানে আমাকে যেতে হবে এই চিন্তায় মনে মনে একটু অস্বস্তি ভোগ করছি।

তারাশঙ্করের সব লেখা কেউ পড়ে কি? পড়বে না। কিন্তু তাকে নিয়ে সভা করল হরদম। আত্ম আস্ফালনের এ আর এক কায়দা।

আত্ম আস্ফানের এ আর এক কায়দা।

আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা নেই। কিন্তু স্রোতের টান তীব্র। আমি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারি না। সাঁতারই জানি না। সুতরাং বিকেলে যদি গাড়ি আসে যেতেই হবে।

তার সম্বন্ধে যে কবিতাটি রবিবাসরে পড়েছি সেটাই পড়ে দেব ভাবছি। নতুন কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না।

সভা ভালো হয়েছিল। অনেকে এসেছিল। আমি সেই কবিতাটাই পড়লাম।

১৪ই নভেম্বর ১৯৭১

অর্জ্জুন আজ ধরে ফেলেছিল একটা ঘুঘুকে। ফের আমার ঘরে ঢুকেছিল। আচ্ছা নাছোড়বান্দাতো। অর্জ্জুনের ইচ্ছে ছিল ওকে খাঁচায় পুরে রাখা। আমি ছেড়ে দিতে বললাম।

আজও প্রভাস এসেছিল মাংসের সিঙাড়া নিয়ে। খেয়ে খুব ভাল লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—দোকানটা কোথা? বললে—দর্পণা সিনেমার পাশেই। দোকানের নাম 'দিলরুবা'। কালাচাঁদবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করতে বাণী, কানু আর উর্মি এসেছিল। এসেই চলে গেল।

আজ আবার সভা আছে সাহিত্য-তীর্থে। বিষয় অতুলপ্রসাদ। তারপর কবিতা পাঠ। সেখান থেকে যেতে হবে শৈলেন গুহর বাড়ি। আজ তাঁর জন্মদিনে সেখানে সাহিত্যিকদের একটা জটলা হবে। সেই সভায় আশাপূর্ণার মুখে শুনলাম ডাক্তার বনবিহারীর ছেলে ডাক্তার বুলবুলি (ভালো নাম ধ্রুব) রিকসা থেকে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছে।

কাল তাকে দেখতে যাব।

১৫

লোক বাঘের ভয়ে ঘরের কপাট জানালা বন্ধ করে। আমি ঘুঘুর ভয়ে করছি। ভয় হচ্ছে কপাট খোলা পেলেই ও আবার ঘরে এসে ঢুকবে। বাঘকে গুলি করা যায়, কিন্তু ঘুঘুকে

করা যায় না। ২/৪ দিন কপাট জানালা বন্ধ দেখলেই ও বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করবে আমরা ওদের চাই না। দেখা যাক, কি হয়।

বুলবুলিকে দেখতে গিয়েছিলাম আজ। সর্বাঙ্গে প্লাস্টার লাগিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছে দেখলাম। আরও প্রায় মাসখানেক শুয়ে থাকতে হবে। বনবিহারীর ব্লাডপ্রেসার ওঠা-নামা করছে। কখনও খুব বেশী, কখনও খুব কম। কাজের চাপও পড়ছে।

খানিকক্ষণ গল্প করে' বেশ ভাল লাগল।

অরুণা (বুলবুলির স্ত্রী) magnum সাইজের দুই পানতোয়া এনে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আধখানা খেলাম। চমৎকার।

১৬

আজ হাওড়া রেলওয়ে কলোনীতে আমার 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' অভিনয় করবে রেলকর্মীরা। গাড়ি আনবে বলেছে। যদি ওরা আসে—যাব।

গাড়ি এসেছিল এবং আমরা গিয়েছিলাম। উপভোগ করলাম ওদের ভদ্রতা আর ওদের অভিনয়। সাহেবগঞ্জর এবং ভাগলপুরের অনেক পুরানো লোকের খবর পেলাম। সবটা দেখতে পারিনি। অনেক দূর। তাই মাঝখানে উঠে পড়তে হল। বাড়ি ফিরে শুনলাম রমেন এসে ফিরে গেছে।

১৭

আজ সকালে উঠেই শুনলাম দুটি পায়রা এসেছিল না কি আমার বাড়িতে। তারাও বাসা বানাতে চায়। লীলা দেখলাম এতে অখুশী নয়। বেবিয়ে আমি কিন্তু পায়রা দুটোকে দেখতে পেলাম না।

দেখলাম চমৎকার একটা হলদে পাখী (Oriole) দেবেনবাবুর বাগানের বেড়ায় বসে' আছে। আমি তাকে দেখছি দেখেই সে আত্মগোপন করল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে।

কাল থেকে সকালে বেড়ানো শুরু করেছি। আজ লীলাও সঙ্গে ছিল। বেশী কিছু নয়, আধঘণ্টায় একটা চক্কর।

আজ একটা খঞ্জনও দেখলাম। মনে হচ্ছে উইনটার ভিজিটার।

১৮

আজ কালাচাঁদবাবুর শ্রাদ্ধে গিয়েছিলাম। কানু শ্রাদ্ধ করছিল। উমাকে দেখে বড় কষ্ট হল। খুব কাঁদছিল। কারো দুঃখ ঘোচাবার সামর্থ্য মানুষের নেই বিধাতার বিধান আর নিয়তির মার সহ্য করতেই হবে। ফিরবার সময় করবীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাজশ্রী খুব অসুস্থ। হাম হবে মনে হচ্ছে। বমিও করছে। বারবার পায়খানা হচ্ছে বমিও হচ্ছে। জ্বরও আছে বেশ। মনে হয় ৩/৪ দিনের মধ্যে সামলে উঠবে।

বেয়াই মশায়ের প্রস্টেট অপারেশন হবে পরশু দিন। কাল তিনি নার্সিং হোমে যাবেন। এর মধ্যে রাজশ্রী একটু সামলে উঠলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

১৯

জন্ম-মৃত্যু দুইই হচ্ছে অবিরত।
মূর্খের মতো আমরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছি।
মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের ভার কাকে দিয়েছি?
নিয়তিকে? সে কি কারো কথা শোনে?
সে আপন মনে
ঝরাপাতাদের সাফ করে দিচ্ছে অহরহ।
ওহে বন্ধু, কহ কহ
সফল যদি হয় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ
তাহলে ভবিষ্যতের উদ্যান কানন
আর কি সুশোভিত হবে কচি-পাতায়?
কচি-পাতা ঝরা পাতাদের শোক ভোলাতো
এখন কে ভোলাবে? নিরোধের গালা তো
চারিদিকে গজিয়ে উঠেছে
অপত্য হীনাদের শাড়ি-ব্লাউজে
নূতন রং ফুটেছে
সতীত্ব বন্ধ্যা, অসতীত্ব উদ্দাম,
সভ্যতা কি এর নাম?
একটা সান্ত্বনা এ সভ্যতা টিকবে না চিরকাল
কিন্তু চিরকাল বইয়ে উত্তাল
জন্ম-মৃত্যুর বিপরীত-গামী
যুগল ধারা
তাতে করে' বারবার অবগাহন
অবশেষে মুক্তি পাব—বলছেন যাঁরা
তাঁরা মহাজ্ঞানী মহাজন।

২০

বেল-ভ্যু ক্লিনিকে আজ বেয়াই মশায়ের প্রস্টেট বিসর্জন মহাসমারোহে হল। অপারেশন সাকসেসফুল। ধাক্কাটা সামলাতে অবশ্য লাগবে কয়েকদিন।

সন্ধ্যার সময় যখন গেলাম তখন দেখলাম তিনি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। নাকে Oxygen-এর টিউব, হাতে Glucose Saline-এর ছুঁচ বেঁধানো। খানিকক্ষণ থেকে চলে এলাম।

অনেকবার মনে হয়েছে আবার মনে হল—আমরা কি অসহায়।

২১

এপার বাংলা ওপার বাংলার সংস্কৃতি সংসদ স্থাপিত হল আজ। সেখানে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলাম। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' নামটায় আপত্তি করলাম। বললাম

ওতে আমাদের অখন্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়। ওর নাম রাখা হোক বাঙালী সংস্কৃতি সংসদ। দাক্ষিণারঞ্জন বসুরও তাই মত।

পরবর্তী একটা সভায় এ নিয়ে আলোচনা হবে ঠিক হল।

২২

আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র ভারতীর আমন্ত্রণে একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। নাচ, গান, সরোদ, বেহালা, ভজনগান, রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা-আবৃত্তি শুনে মনে হচ্ছিল যে বাঙালী সংস্কৃতির জগতে এত উন্নত সেই বাঙালীই দৈনন্দিন জীবনে এত পিছিয়ে কেন? সত্যি বাঙালীরই জীবনে পাশাপাশি আলো আর অন্ধকার, গান আর হাহাকার। অপূর্ব বিচিত্র অনুষ্ঠানে মুগ্ধও যেমন হলাম, ক্ষুব্ধও হলাম তেমনি।

২৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণে তারাশঙ্করের শোকসভায় বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম। নূতন কথা বলবার আর কি আছে, পুরাতন কথাই বললাম। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেখে কিন্তু ভারি আনন্দ হল।

একটা সুখবরও শুনলাম।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বললেন বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শ্রীমধুসূদন নাটকটার জন্য না কি দু'হাজার টাকা প্রাইজ দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখনও কোন খবর পাইনি অবশ্য। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেল-ভ্যু ক্লিনিকে বেয়াইকে দেখতে গেলাম। বেয়াই ভালো আছেন।

২৪

আজ মানিকতলা বাজারে ঢুকেছিলাম। মহাশোল মাছ পেলাম। কিনে এনেছি খানিকটা। মহাশোলের সঙ্গে শোলের কোনো সাদৃশ্য নেই। রোহিতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বরং খানিকটা। যে মেছোটা বেচছিল সে বলল, উৎকৃষ্ট মাছ। নিয়ে যান।

খেয়ে দেখলাম মহাশোল বাজে মাছ। শোল মাছের তবু বিশেষ একটা স্বাদ আছে। এটা আড় মাছের মতো। পন্ডিত আর মহাপন্ডিতে যা তফাৎ, শোল আর মহাশোলে তাই তফাৎ দেখছি।

২৮

পাকিস্তান আমাদের সীমান্তের চারিদিকে বোমা ফেলেছে। মনে হচ্ছে যুদ্ধ বেধে যাবে। যদি বাধে পাকিস্তান শেষে হবে।

২৯

ও নিকসন দাদা

কেন ভাবছ বল দিকি
আমরা সবাই গাধা ?

আমাদেরও বুদ্ধি আছে
আমাদেরও চক্ষু আছে
কোনটা কালো, সাদা
বুঝি আমরা দাদা।

ইয়াহিয়া দিচ্ছে তেল
খেলছ তাই অনেক খেল
কিন্তু সেটা হয়ে যাচ্ছে পণ্ড
সম্ভ্রমটা হচ্ছে তোমার নষ্ট।

১লা ডিসেম্বর
হলদে পাখী ডেকে উঠল
সোনাঝুরির গাছে
ছুটে গেলাম কাছে
'টিউ' বলে' ফুড়ৎ করে' উড়ল
সোনাঝুরির গাছে খালি সবুজ আর সবুজ।
সোনা সেথায় নেই।
খুঁজছি পই পই
গাছের সোনা পাখীর সোনা কই।

২
কাগজে কাগজে যুদ্ধের দামামা
বাজছে। দামামা পিটছে ইয়াহিয়া
সীমান্তের চারদিকে বোমা ফেলছে।

বালুরঘাটে বোমা পড়েছে। মন্মথ রায়ের খুড়িমা সেখানে থাকেন। বড্ড ঘাবড়ে গেছে বেচারা।

৩
ইন্দিরাজী আজ কলকাতায় এসেছেন। মাঠে বক্তৃতা দিলেন। রেডিওতে শুনলাম। খুব ভালো লাগল। আজই ফিরে গেলেন সন্ধ্যাবেলা। সীমান্তে পাকিস্তান খুব বোমা ফেলছে। ওরা যুদ্ধ না বাধিয়ে ছাড়বে না। মনে হচ্ছে যুদ্ধ লাগো লাগো। হঠাৎ নজরে পড়ল দর্জি পাখীটা ল্যাজ উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। ওই যেন ইয়াহিয়াকে ঠাণ্ডা করে দেবে।

৪
যুদ্ধ বেধে গেল।

ইয়াহিয়া war declare করেছে। আমাদের জোয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলা দেশে। এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম সীমান্তে। আমরা জিতবই।

আশাবরী রাগিনীতে
সুর দিনু গানটিতে
সে সুরের মূলকথা
জিতবে সত্য ন্যায়
অনেক রক্ত ব্যয়
অনেক অর্থ ব্যয়
হবে জানি তবুও
আশাবরী সুর মোর
থামবেনা কভুও।

৬

আমার নতুন গোলাপ গাছে ফুল ফুটেছে। হলদে রং। ফিকে হলুদ। মাঝখানটি গাঢ় রঙের। কি যে সুন্দর, অবর্ণনীয়। নাম–Personality আর একটা নতুন গাছেও ফুল ফুটেছে। সাদা গোলাপ। নাম–ভট্টাচার্য্যিস্ White। শাদা বটে; কিন্তু গোলাপ গুলোর কেমন যেন ঘাঁড় গোঁজড়ানো ভাব। বোঁটা গুলো রোগা ফুলকে সোজা করে রাখতে পাচ্ছে না। ফুলগুলো মাথা নীচু করে আছে। ভালো লাগছে না। গাছটাও রোগা। দেখা যাক পরে কি দাঁড়ায়। গাছটায় সার দিতে হবে।

বগুড়া, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ সব আমাদের হাতে এসে পড়েছে। সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে যশোরের দিকে।

হঠাৎ মনে হল যশোরের কই মাছ কি এখনও আছে? না খান সেনারা সব শেষ করে দিয়েছে!

বাংলাদেশের সব ঐশ্বর্য্যই তো লুটছে ওরা এতদিন।

৭

আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক এমন একটা কুকুর পুষেছেন যার চীৎকারে চতুর্দিক সর্বদা শব্দিত। ডাক শুনে মনে হয়–ওটা বোধহয় Boxer : ও কুকুর কণ্ঠস্বর দিয়েই Boxing করে। তার উপর বেঁধে রেখেছে বোধহয়। তাই চেঁচাচ্ছে।

মোট কথা–জ্বালাতন।
বাতাসের পাটাতন
তার উপর আছড়ায় কুকুরের চীৎকার
সারাদিন বলে যেন
ধিক্কার–ধিক্কার–ধিক্কার!

যশোরের পতন হয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনীরা গিয়ে দেখে কেউ নেই। সব পালিয়েছে। খালি শহর দখল করল তারা।

৮

যুদ্ধ চলেছে। যশোর আমাদের হাতে। জঙ্গী সেনারা যশোর ছেড়ে পালিয়েছে। ঢাকায় গিয়ে জমায়েত হচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু ঢাকাও বেশী দিন ঢাকতে পারবে না পাষন্ডদের। হয় আত্মসমর্পণ, না হয় মৃত্যু—এ ছাড়া গতি নেই তাদের। আমেরিকা তার কেরদানি দেখাতে চেষ্টা করছে U. N. মারফৎ। রুশ ভিটো দিয়েছে। বলেছে—এ যুদ্ধে বাইরের কোন শক্তি নাক গলিও না।

৯

বাংলা দেশে আমাদের সৈন্যরা
খুব জিতেছে। পালাচ্ছে খান সেনারা।

দেবতা জিতছে দৈত্য হারছে।
ধর্ম এবার পাপকে মারছে
ইয়াহিয়াদের গদি যে টুটল
পদ্মার জলে পদ্ম ফুটল।

নতুন পদ্ম—রক্ত কমল
টকটকে লাল বিমল অমল
সে লাল রঙের নাই যে তুলনা
বুকের রক্ত সেকথা ভুলো না
লড়ছে জোয়ান বইছে খুন যে
দীপক রাগিনী বাজছে দুন যে
আগুন জ্বলছে আগুন জ্বলছে
ধর্ম এবার পাপকে দলছে।

১০

কি অপূর্ব কাহিনী
ঢাকার দ্বার প্রান্তে
আমাদের বাহিনী
অপরূপ কাহিনী।
মন উঠছে দুলে
বুক উঠছে ফুলে
আশা নদীর কূলে
আজ ভাঙছে ঢেউ
অগণিত উচ্ছ্বসিত
আনন্দদায়িনী
জয়তু জয়তু জয়
সৈন্যবাহিনী।

১১

রবীন্দ্রভারতীতে বেলা ২½ টের সময় 'ছোট গল্প' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বড়ই বেবন্দোবস্ত সেখানে। মাইক নেই। ৪ টে বাজতে না বাজতেই অনেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ Black out। সুতরাং জমল না।

১২

নির্ম্মাল্যর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হল। আমাকে সভাপতি করেছিল। গিয়ে ভারি ভালো লাগল। আমার লেখা-'যদু' গল্পটা পড়ে শোনালাম ওদের। পড়তে পড়তে এক অদ্ভূত কান্ড হল। ভাবাবেগে গলা কেঁপে গেল আমার। চক্ষু সজল হয়ে উঠল। বুড়ো হচ্ছি তার আর একটা প্রমাণ পেলাম।

১৫

ঢাকার ভিতরে আমাদের সৈন্য ঢুকছে। ঢাকার গভর্নর মালিক নমাজ পড়ে' কাজে ইস্তফা দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গো সহ আশ্রয় নিয়েছেন Inter Continental Red cross-এর আশয়ে। অনেক সেনা আত্মসমর্পণ করছে। নিয়াজি কিন্তু হুঙ্কার ছাড়ছে শেষ পর্যন্ত লড়ব। মিঞার দৌড় কতটা দেখা যাক। ছাতে উঠে টেলিফোন লাগিয়ে বোধহয় দেখতে পেয়েছে নিকসনের জাহাজ আসছে।

যুদ্ধ থামাও-U. N. এই প্রস্তাব 'পাস করতে চাইছিল। আবার ভিটো দিয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার হল।

খান সেনাদের অধিনায়ক নিয়াজি আমাদের সেনাধক্ষ ম্যানেকশর কাছে যুদ্ধ বিরতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ম্যানেকশর উত্তর-যুদ্ধ থামাচ্ছি। কিন্তু কাল নটার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যদি সক্রিয় সাড়া না পাওয়া যায় আবার প্রচন্ড বেগে আক্রমণ সুরু হবে ঢাকার উপর।

১৬

প্রধান খবর আজ ঢাকার পতন, নিয়াজি সাহেব বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন জেনারেল ম্যানেকশর কাছে। আত্মসমর্পণের চুক্তি পত্রে সই করেছেন নিয়াজি এবং আমাদের পক্ষে অরোরা। জয় বাংলা।

পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ কিন্তু চলছে
এখনও তড়পাচ্ছে
        ইয়াহিয়া মিঞা
ধর্ম-সত্য ন্যায়ের মিথ্যা জিগির দিয়া
দুকান কাটা ভদ্রলোক
        থ্যাতলানো নাকটিকে
বাঁচবার চেষ্টা করছেন
        অ্যান্টিবায়োটিকে।
কোলাপসিবল টিউব কিনে

চীনা এবং মার্কিনে
শুনছি নাকি প্লেনে করে'
পাঠাচ্ছে ওটিকে।

থ্যাতলানো নাক গোটা হবে
অ্যানটিবায়োটিকে
এই আশাতে
এই তুফানে ফুটো তরী
চাচ্ছে ভাসাতে।

১৭

ইন্দিরা গান্ধীর জয়। তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছেন কাল। ইয়াহিয়াও অবশেষে সেটা মেনে নিয়েছে। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সারা ভারত জুড়ে আজ উৎসব। দারুণ দুর্যোগের অবসান.হল।

কাকের বকের ভীড় তো যত্র তত্র
শালিক চড়াই উড়ছে তো সর্বত্র
ঈগল ক'টা দেখতে পেয়েছ?
নদী পুকুর ডোবা কিম্বা কলে
স্নান করছ প্রত্যহ সক্কলে
সমুদ্রেতে কবার নেয়েছ?
আজকে হঠাৎ ঈগল পাখী দেখতে পেয়েছি
তৃপ্ত আজি ধন্য আজি,
সমুদ্রেতে আজকে নেয়েছি।

১৮

ওহে বন্ধু শুন শুন
উনোতে অনেক ঝুনো
সমবেত হয় পুন
করিছে ফিসফাস
আমার বিশ্বাস
মানব প্রেমিক তারা
ইয়াহিয়া দুঃখে সারা
তাই হয় দিশেহারা
ফেলিছে নিশ্বাস।

বল হরি হরি বোল
নয়কো তেঁতুল—ওল
আমেরিকা চীন
কাঁচকলা কয়—দাদা

আয় বুকে ওরে আদা
আমরাও বন্ধু অভিন।

আমরা কি করি বল ?
এ হট্টগোলেতে চল
দু'হাত তুলিয়া দাদা
নাচি ধিন ধিন
নৃত্য দক্ষ মোরা জাতি
সবেতেই নাচি মাতি
শিল্প ঘোড়ায় এস
কসি মোরা জিন!

২০

ভুলে গেছি, ভুলে গেছি
কি ছিল তোমার নাম
কোথায় তোমার ধাম
কিন্তু ভুলিনি তো
আমার মনস্কাম
তোমার পরশ পেয়ে
হয়েছিল উদ্দাম
তোমার তুচ্ছ কথা
হয়েছিল ঋক সাম
কি পেলাম কি দিলাম
হিসাব করিনি তো
উড়ে আসা পাখীটিকে
খাঁচায় ধরিনি তো
উড়ে উড়ে এসেছিল
চলে গেল উড়ে উড়ে
মনে হয় এখন সে
উড়ছে আকাশ জুড়ে
কি ছিল তোমার নাম
কোথায় তোমার ধাম
কিছু জানি না তা
তবু যেন মনে হয়
পুরেছে মনস্কাম।

আমার শাদা গোলাপের গাছটা মরে গেল। নাম ছিল ভট্টাচার্য্যিস হোয়াইট।

২১

মা কালীর কাছে যখন পাঁঠা বলি হয়–তখন সেটা আপাতদৃষ্টিতে বীভৎস হলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তা তাৎপর্যপূর্ণ। দেবীশক্তির কাছে পশু-শক্তির বলিদান সেটা। একটা পাঁঠা যখন বলি হয়ে যায় তখন আসন্ন বলির মুখে অন্য পাঁঠাগুলো ব্যা ব্যা করে চিৎকার করে।

ইয়াহিয়ার বলিদান হয়ে গেছে। ভুট্টো ব্যা ব্যা করছে।

২২

যে শয়তানরা বাংলাদেশের অগণ্য নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার করছে, সেখানকার বুদ্ধিজীবিদের গুলি করে মেরেছে তাদের জন্য বিচার দাবী করছে অনেকে।

মানুষই মানুষের বিচার করে। ওরা কি মানুষ। ওরা সাপ, বাঘ, নেকড়ের মতো। আমরা সাপ বাঘ নেকড়ের বিচার করি না।

নাগালের মধ্যে পেলেই তাদের মেরে ফেলি। রাজনীতির দাবা খেলায় অনেক সময় ভন্ডামির মুখোস পরতে হয়। এক্ষেত্রেও হয়তো তাই পরতে হবে। কিন্তু kill the snake, shoot the tiger at once এই হল–সনাতন নীতি।

২৩

কাল ভোর রাত্রে অদ্ভূত স্বপ্ন দেখলাম একটা। নেতাজী যেন হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। বললেন–একটা সভায় তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতাটা লিখে ফেল দিকি।

কার নাম করে বললেন তিনিও আসবেন। অনেকক্ষণ থাকবেন আমাদের মধ্যে। লম্বা বক্তৃতা করলেও বিরক্ত হবেন না। বলেছেন–I am unemployed to-day কার নাম করলেন মনে পড়ছে না।

বললাম আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন।

বললেন–'আমি শুয়েই পড়ি। বড্ড ক্লান্ত।'

বলেই আমার বিছানাটায় শুয়ে পড়লেন।

এ স্বপ্নের মানে কি তা জানি না। খুব ভাল লাগছে কিন্তু।

২৪

দূর থেকে মনে হয়েছিল অভিজাত বংশীয় ছাগলটা। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। হঠাৎ কাছাকাছি দেখলাম আজ। দেখলাম মোটেই অভিজাত নয়। একেবারে ভি-জাত–অর্থাৎ ভিলেন-জাত। অতিসাধারণ নূরওলা ছাগলী একটা। দূরদর্শীরা তাই বলে গেছেন–দূর থেকে দেখাই ভালো। কাছে গেলে মোহ কেটে যায়। Familiarity breeds contempt.

কাছাকাছি যেও নাকো ভাই
কাছাকাছি গেলে মোরা ধরা পড়ে যাই
মনেতে রাখিও
সুদূরে আছেন বলে' ভগবান চির পূজনীয়।

২৫

প্রায় সমস্ত দিন কাটল শ্রীরামপুরে। সেখানকার লাইব্রেরীর উৎসবে গিয়েছিলাম। কবিসম্মেলন হয়েছিল। অনেক কবিতা শুনলাম। পড়ালামও ২।৪ টে। ফিরলাম রাত আটটায়। এসে দেখি Lake Town অন্ধকার। কারেন্ট নেই। প্রায়ই এখানে Current থাকে না।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রীদের কর্মতৎপরতার নমুনা দেখে মনে হয় ডি. এল. রায়ের গানের সেই লাইনটা-মানুষ আমরা নহি তো মেষ। নহি তো'র পরে একটা কমা বা সেমিকোলন থাকলে ঠিক হয়।

বাঁদরের গলায় যে মুক্তোর মালা মানাচ্ছে না। এটা আমরা বারবার নানাভাবে প্রকাশ করছি।

২৮

কাগজে আজকাল মাঝে মাঝে দেখছি হিন্দু যুবক মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করছে। আগে দেখতাম মুসলমান যুবকই বিয়ে করত হিন্দু মেয়েকে। দুজনের নাম মনে পড়ছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর অধ্যাপক (মন্ত্রীও) হুমায়ুন কবির। দুজনেই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিলেন ত্রিদেবের (স্বর্গীয় ঐতিহাসিক নিখিল রায়ের পুত্র) মেয়েও মুসলমান বিয়ে করেছিল শুনেছি। আগে হিন্দুর মেয়েরাই মুসলমানদের ঘরে যেত। এখন দেখছি মুসলমান মেয়েরাও হিন্দুদের ঘরে আসছেন। চাকা ঘুরে গেল নাকি?

চাকা ঘোরে, চাকা ঘোরে
ঘুরে যায় চাকা
মিলে যায় নবদ্বীপ ঢাকা
ঘুরতে ঘুরতে যদি ইসলাম হিন্দু
হয়ে যায় শেষে এক বিন্দু
তাহলে তো কাজ হয় পাকা
কিন্তু তা হবে কি? হবে না, হবে না
বেঁচে আছে সংস্কার-কাকা।
দুটি সত্য কথা এখানে রেকর্ড করা উচিৎ
(১) চাঁদা মাছটা সত্যিই সুস্বাদু ছিল।
(২) 'ছদ্মবেশী' বাজে বই।.

একটা ছোট গল্পকে টেনে বড় করেছে। আঙুরকে আনারস করতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে।

২৯

আজ আমার এনা হার্কনিস গাছের শেষ গোলাপটিও ঝরে পড়ল। চমৎকার ফল

ফুটেছিল কয়েকটি। President রাধাকৃষ্ণননেও ভাল ফুল ফুটেছিল। এনা হার্কনিস আর নতুন কুঁড়ি দেখছি না রাধাকৃষ্ণননে আছে দু একটা কুঁড়ি। মাদাম কুরিতেও ফুল ফুটছে। একটা ফুল কাল ফুটবে। চমৎকার ফুল ফুটছে কনফিডেন্সে। ওতেও আর কুড়ি দেখছি না। গাছগুলো বুড়ো হয়ে গেছে। নতুন গাছ 'পারসোন্যালিটি' দুটি চমৎকার ফুল দিয়েছে। হয়েছে আরও তিনটি।

চড়ুই পাখীগুলো বড় বিরক্ত করছে। ব্যুগনভীলায় ফুল ধরেছে অনেক। তাই নিয়েই হল্লা করছে ওরা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মতো। হুড়োমুড়ি করছে ব্যুগেনভিলার ঝাড়ে।

বাজারে বেরিয়েছিলাম। লীলার নাগপুরী শাড়িটার পুনর্জন্ম হল সিল্কের দেহে। লীলার একটা ছোট শালও কেনা হল। আমিও কিনলুম একটা শাদা মাফলার। পরিশেষে বেয়াইমশাইকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছেন। একটু পরে উঠলেন। আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত ৮টায়। এসে দেখি আলো নেই। হায় ইলেকট্রিসিটি বোর্ড।

৩০

১৯৭১ হল শেষ
বেশ বেশ বেশ বেশ।
সারা বছর জ্বালাল
শেষ কালেতে পালাল।
স্বাধীন হল বাংলাদেশ
এ খবরটি করবে পেশ
ইতিহাসের দফ্‌তরে
রক্তমাখা অক্ষরে
স্বয়ং মহাকাল।
চীন-মার্কিন জাল
ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন ইন্দু
উন্মথিত সিন্ধু
দিল যেন আবার
লক্ষ্মী উপহার।
স্বর্ণাক্ষরে থাকবে লেখা এটা।
আর থাকবে রাজনৈতিক
এটা ওটা সেটা
বিশেষ করে কুকুরগুলোর
খেয়োখেয়ি সারাটা দেশময়।
থাকবে, কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে নয়।
আর থাকবে হীরক দ্যুতিময়
আমাদের জোয়ানদের বীরত্ব অক্ষয়।
ভারতের দুর্বার যৌবন,
মনে রাখব তুমি মোদের
গর্ব চিরন্তন।

ইংরেজি বছরের শেষ দিন আজ
কাল সে তো থাকবে না আর
কিন্তু কোথাও কই
নেই কোন হই-চই
সেই খাতা সেই বই
সেই মুড়ি, সেই খই
সকালে চায়ের পেয়ালার
সেই পুনরাগমন
পুরাতন লোকজন
আসে আর যায় বারবার।
ভাই
মনে ভাই হয় তাই
৭১ই ৭২ নামে প্রতিষ্ঠিত হবে ধরাধামে।

মাণ্ডা মহল

পরিশিষ্ট

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

কুমারেশের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর নাতনি আমার ওভারকোট-পরা চেহারা দে‍ে কেঁদে উঠল। অনেক কষ্টে তার ভয় ভাঙালাম। বেলা চমৎকার পেড়া আর সিঙ' খাওয়াল। আসবার সময় রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' বইটা নিয়ে এলাম।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজ ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনে নীরেন চক্রবর্তীকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে না কি 'চেক আপ' করাবার জন্যে ওখানে গেছে। গিয়ে শুনলাম এখনও পর্যন্ত খারাপ কোনও কিছু পাওয়া যায় নি। অথচ ওর কেবলি মনে হচ্ছে শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না। খাওয়ার প্রাচুর্য এবং মনের শান্তি এ দুটো না থাকলে শরীর ভালো থাকে না। 'চেক আপ' করিয়ে এই গলদ দুটো বের করতে পারবে না ডাক্তাররা।

ফেরার সময় দেখলাম ২।১টা সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রতিমা দেখলাম তার চারটি হাত, বেশ বাস বাইজির মতো, পরণে চুস্ত পাজামা।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ আসবেন। রাস্তায় পুলিশের খুব ভীড়। দর্শন প্রার্থীদেরও। বাড়ি ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজ বেলা সাড়ে বারোটার সময় ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী আর ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী এসে হাজির। স্নান করবার জন্য উঠছিলাম—ওঠা হল না। আড্ডায় জমে' গেলাম। গোরাচাঁদ তার নব প্রকাশিত কবিতার বই 'উত্তরা' নিয়ে এসেছিল আমার জন্য। আমিও ওদের সুরসপ্তক দিলাম।

গোরাচাঁদ আগামী শনিবার মুক্ত মেলায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। কিন্তু ওকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারলুম না।

বেশী ঘোরাঘুরি করলে লেখাপড়া হয় না। পরে বড় ক্লান্ত মনে হয়। ঠিক হল একদিন Zoo garden-এ যাব। ডকটার ভাদুড়ী সব ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ করতে দুটো বেজে গেল।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

আমার 'অগ্নীশ্বর' বইটার আজ সিনেমা-কণ্ট্রাক্ট হল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়।

চুনু সপরিবারে এসেছিল। সমস্ত দিন আনন্দে কাটল। কবু আর কেয়াও এসেছিল ওদের মেয়েদের নিয়ে।

সমস্ত দিন হৈ হৈ।। কাল একটা ভেটকি মাছ এনেছিলাম। তার সঙ্গে ছিল মাংস। চুনুও কই মাছ এনেছিল।

জমেছিল খুব।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

তেঁতুল গোলা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চমৎকার চাটনি আজ তৈরি করেছিল লীলা। বেশ লাগল। শহরে ফ্যাসানদোরস্ত লোকের ভীড় যেন পুরোন গেঁয়ো মানুষের দেখা পেলাম। জ্যাম জেলি সস্ সব একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল—তেঁতুলের চাটনি খেয়ে আবার যেন নূতন স্বাদ ফিরে পেলাম। পুরাতনকেও অনেকদিন পরে নূতন বলে মনে হয়।

১0ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

সবাই চোর সবাই চোর সবাই চোর
দিবারাত্রি এইটি শুধু শুনছি
এবং বসে' ঘরের কোনে
আপন মনে
ট্যাঁকের টাকা গুনছি।
বৃহৎ কাজ, মহৎ কাজ, দেশের ডাক, মায়ের ডাক
মাইকেতে বাজছে ঢাক
ঢাকীরা সব মাইনে পায়
তাই বাজায়
বিশ বাজায়
ডিউটি সেরে কিন্তু তারাও
একই তুলো ধুনছে
ট্যাঁকের টাকা গুনছে।
হায় রে হায়
দেশ কোথায়
মা কোথায়!
বৃহৎ কাজ মহৎ কাজ করবে কে
এই তুফানে হালটি এসে ধরবে কে।
স্বার্থ ঢেঁকি সক্কলকে করছে চিঁড়ে
শকুনিরা খাচ্ছে মড়ার মাংস ছিঁড়ে।
কিন্তু তবু আকাশ জুড়ে বাজাচ্ছে ঢাক
মহৎ কাজ, বৃহৎ কাজ
দেশের ডাক মায়ের ডাক।
ঢাকীরা সব ঢাক বাজায়
মাইনে পায়
হায়রে হায়

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

সকালে উঠেই দেখি আবার মেঘলা। এলোমেলো ঠান্ডা হাওয়া বইছে একটা। আমার সকাল মানে আটটা। রাত বারোটা পর্যন্ত পড়ি। ঘুম আসতে আসতে একটা। পরবারও মাঝে মাঝে উঠতে হয় আবার। প্রোস্টেটটা বড় হয়েছে বোধহয়। এইসব কারণে উঠতে দেরি হয়ে যায়। খুব ভোরে উঠেও লাভ নেই। তখন লেখবার মতো পরিবেশ থাকে না। শীত করে। চা জলখাবার নিতেও দেরি হয়ে যায়। আটটার সময় কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। প্রাতরাশ শেষ করে' রোদে পিট দিয়ে বসি।

আজ কিন্তু রোদ নেই। গরম জোব্বা জাব্বা গায়ে দিয়ে কপাট জানলা বন্ধ করে' বসলাম লেখার টেবিলে।

বিকেলে কেয়া আর ঊর্মি এসেছিল। উদ্দেশ্য ঊর্মির ইন্‌জেকশন। পাড়ার ডাক্তার দ্বারিক দিয়ে দেবে। ইন্‌জেকশনের পর সবাই আমরা মাছ কিনতে বেরুলাম। কেয়া নিজের বাড়ির জন্য ভেটকি কিনল,আমি কিনলাম ভাংগন।

রাত্রে আমাদের বাড়ির কাছেই প্রচন্ড শব্দ করে' একটা বোমা ফাটল।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজ প্রধান ঘটনা হচ্ছে লীলা পরদা কিনে এনেছে। ডাইনিং রুম আর ড্রইংরুমের মাঝখানে এবার থেকে লাল পরদা ঝুলবে। অবশ্য এখনও একটা প্রধান কাজ বাকি। দরজি। তাকে খবর দিতে দিতেই তিন চার দিন কাটবে। তারপর তাঁর মরজি মতন তিনি আসবেন। মরজি মতন বানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ অন্ততপক্ষে মাসখানেক লাগবে আরও। এ দেশে তাড়াতাড়ি কিছু হয় না।

হয় কেবল স্ট্রাইক, বন্‌ধ, আর চুরি। ভাবছিলাম 'পরদা না করলেই বা ক্ষতি ছিল কি? আমরা কেউ পরদানশীল নই। যে ধরনের লোক ড্রইংরুমে এসে বসেন তাঁরা আমাদের ডাইনিং রুম দেখলেও ক্ষতি নেই কিছু।

কিন্তু আমার মত কেউ কি শুনবে?

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

কাল কবু এসেছিল মেয়েদের নিয়ে। সমস্ত দিন ছিল। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে রাজশ্রী। একটুও গোলমাল করে নি। নিজের মনে খেলা করেছে। সেদিন ওর হাতের যা শেলাই দেখেছি তাতে মনে হয়েছিল এ যেন কোন বড় মেয়ের শেলাই।

যদি ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখেন ও অনেক উন্নতি করবে, অনেক বড় হবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজ প্রহ্লাদ প্রামাণিক আর শিবরাম চক্রবর্তীর এখানে খাওয়ার কথা দুপুরে। তারা নিজেরাই খাবে বলেছিল। খেয়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়ি যাওয়ার কথা। রান্না-বান্না সব প্রস্তুত। সাড়ে বারোটা বেজে গেল তবু কারো পাত্তা নেই। দ্বারিকের বাড়ি গিয়ে ফোন করলাম। ফোনে প্রহ্লাদ বল্‌ল—শিবরামকে ডাকতে পাঠিয়েছি। সে এলেই যাব। আরও ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করে, শেষে দেড়টার সময় আমরা খেয়ে নিলাম। দুটো

নাগাদ শিবরাম এল। বলল সতীশ সামন্ত এসেছেন, বলল, প্রহলাদ আসতে পারল না। আমি এমন back dated যে সতীশ সামন্তকে চিনতে পারলাম না। বুঝতেই পারলাম না কে তিনি। নাকি একজন বিখ্যাত এম. পি.।

সব শুনে বুঝতে হল এদেশে রাজনীতির দাবী সর্বাগ্রে, ভদ্রতার কোনও দাবী নেই। শিবরাম সঙ্গে করে' একটি ছোকরাকে এনেছিল। দুজনে কিছু কিছু খেলো, যদিও তারা খেয়েই এসেছিল।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজ চিড়িয়াখানায় যাওয়ার কথা ছিল। ডক্টার জ্ঞানেন্দ্র লাল ভাদুড়ী সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু সকাল বেলা উঠেই শরীর খুব খারাপ। গলা ভাঙা। স্বর বেরোয় না। জ্বর জ্বর ভাব। খবর পেলাম নাতনী উর্ম্মির পানবসন্ত বেরিয়েছে। তারও যাওয়ার কথা ছিল।

এ অবস্থায় যাওয়া চলে না।

এখন শুয়ে শুয়ে কাসছি
আর মনে মনে হাসছি
এবং একটু ভাবছি
ভাদুড়ী কি চটবে।
কেমন করে' জানব বল
এ অঘটন ঘটবে।
কিন্তু ও কি ছাড়বে
নিশ্চয়ই ও চটবে
Blood Pressure বাড়বে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজও শরীর খুব খারাপ। তা সত্ত্বেও খেলাম। মাছ, মাংস, কচুরি, ভাত সন্দেশ। বিকেল বেলা বেরোলামও। করবীর বাড়িতে গিয়ে কফি খেলাম। বাড়িতে এসেও খেতে বসলাম। খেলামও। শরীর কিন্তু আর বরদাস্ত করল না। সব বমি হয়ে গেল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

সমস্ত দিন অসুস্থ ছিলাম। শরীর বেশ খারাপ। লীলা খবর নিয়ে এসেছে উর্ম্মি ভাল আছে। সমস্ত দিন উপবাস করলাম।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আজও শরীরের তেমন জুত নেই। তবু খেলাম। কালকের মাংস ছিল। তারই ঝোল দিয়ে ভারি ভাল লাগল ভাত। কাসিটা কমছে না। ক্রমশ কমবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

কেয়া একটা কচুরি পাঠিয়েছিল। তার আগের দিন পরোটাও খেয়েছিলাম, ইলিশ মাছ

এবং মাংসও। বেশ চলছিল। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। ব্লাড প্রেসার ২00 বাস্ সব বন্ধ। উরশুনি ঝোল ভাত খাচ্ছি।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

আমার বেয়াই মশাই-এর ড্রাইভার মদ খেত জানতাম। শুনলাম সে নাকি পলিটিক্সও করে। পুলিশে ধরে' নিয়ে গিয়েছিল তাকে। খুব না কি মার ধোর করেছে।

মাঝ থেকে বেয়াই মশায়ের তিন চারশ টাকা খরচ হয়ে গেছে তাকে ছাড়িয়ে আনতে। এ বাজারে ভদ্রলোক হলেই নানান ঝামেলা।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

নানা রঙের ভালো 'ফিনিশ'
গুজব একটা আজব জিনিস।
তার বহু পিতা, বহু মাতা।
নিজেও তিনি জন্মদাতা
অনেক কিছুর
অনেক উঁচুর সঙ্গে নীচুর।
পাহাড়, নদী সাগর পর্বত
সব শরবত
করে' গুলে খেয়েছেন তিনি
কখনো কুইনিন, কখনও চিনি
খুব চটপটে, খুব ছটফটে
দেশের লোকে তার কথায় বসে ওঠে
দুম দুম বোমা ফাটায়, বোঁ বোঁ করে' ছোটে
কখনও মোটরে, কখনও প্লেনে কখনও বোটে
তাঁকে ভয় করি কি ?
—আরে না না
এ যেন আহলাদে নন আটখানা
কৃতার্থ হয়ে উঠি বিলকুল
আড্ডা হয় জমজমাট বন্ধুরা হন মশগুল
কেটে যায় সব মেঘ
কাপের পর কাপ চা আসে
পেগের পর পেগ।

১লা মার্চ, ১৯৭১

সামনের মিত্তির বাড়ির বউটি এসেছিল তার দুটি ছোট মেয়েকে নিয়ে। আমার নাতি নাতনীদের কথা মনে পড়ল। এদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করলাম। খুব জমল না। একদিনে জমে না। বউটি বললে তার শাশুড়ির না কি হজম হয় না। কষ্ট পাচ্ছেন। কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিয়ে একটা prescription দিলাম।

একটু পরেই গেলাম ডাক্তার নীহার মুন্সীর বাড়িতে। চোখ দেখে বললেন চোখ ঠিক

আছে, 'পাওয়ার' বাড়ে নি। তাঁর বৌমাটিকেও দেখলাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ সার্চ হয়েছিল। একটি ছোটখাটো আর্মারি সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। অগ্নিযুগের কথা মনে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অমিলও মনে পড়ল অনেকগুলো।

২রা মার্চ, ১৯৭১

এসিড খেয়ে ভদ্রমহিলার না কি খুব উপকার হয়েছে। খবর দিতে এসেছিলেন বউটি। মনে হল ওদের ভালবাসা আকর্ষণ করেছি। অথচ বড় সামান্য সামান্য জিনিসের বদলে—মাত্র ফোঁটা কয়েক হাইড্রোক্লোরিক এসিড্!

এসিডও যে মিষ্টত্বের বাহন হতে পারে রসায়ন শাস্ত্রে তার প্রমাণ নেই কিন্তু অন্যত্র তার প্রমাণ পেলুম।

অসীম হঠাৎ এসে হাজির। খুব আনন্দ হল, আমাদের তখন খাওয়াদাওয়া শেষে। ভুক্তাবশেষ মুর্গির ঝোল ছিল একটু, তাই দিয়েই অসীমকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল। আবার ভাত রান্না করতে হল। বললে দু'দিন আগে ও চিঠি লিখেছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বাস করি যে। চিঠি ঠিক সময়ে আসে নি।

৩রা মার্চ, ১৯৭১

অসীম মাছ ভালোবাসে। কিন্তু বাজারে মাছ পাওয়া গেল না। কোথায় কে খুন হয়েছে—বাজার বন্ধ। মুরগি পাওয়া গেল। তাই দিয়েই পিত্তি রক্ষা হল।

দ্বারিকরা কিছু মিষ্টান্নও পাঠিয়েছিল। সেটাও উপভোগ করা গেল।

সব চেয়ে উপভোগ্য এলোমেলো গল্প আর হাসি।

বিকেলে দ্বারিকদের বাড়ি গিয়ে কেয়াকে জানানো হল যে অসীম এসেছে। শুনলাম এই খুনোখুনির বাজারে দ্বারিকের ভাগনের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এদের আটকাবে এরকম রাজনৈতিক দল জন্মায় নি এখনও।

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

আজ ভালো রুই মাছ পাওয়া গেল। দুপুর বেলা কেয়া করবীও এসেছিল। খুব আড্ডা জমল।

সাড়ে তিনটে নাগাদ অসীম রওনা হল স্টেশনের দিকে। কেয়া করবীরাই ওকে হাওড়ায় পৌঁছে দিল।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। শুনলাম বিনয়বাবুর (বি. আর. গুপ্ত) মায়ের গলস্টোন অপারেশন হয়ে গেছে। ভালো আছেন তিনি।

শম্ভুবাবুর বাড়িতেও গেলাম। অনেকদিন দেখা হয় নি। গল্প হল। দেশটা যে গোল্লায় যাচ্ছে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। আমি সন্দেহ প্রকাশ করলুম না।

বেশ আনন্দে কাটল খানিকক্ষণ।

কিন্তু মশার জ্বালায় বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। উঠে পড়তে হল।

১০ই মার্চ, ১৯৭১

নির্ব্বিঘ্নে ভোট হয়ে গেল। আগেই আমাদের কেন্দ্রের একজন প্রার্থী ছুরিকাঘাতে

নিহত হয়েছেন। সুতরাং বিধানসভার ভোট আমাদের কেন্দ্রে (দমদম) হল না। লোকসভার ভোটটা দিয়ে এলাম।

বেশ ভাল লাগল। সবাই খুব উৎসাহ।

সন্ধ্যায় বেড়িওতে শুনলাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়জয়কার। এ রকম জয়জয়কার আগেও অনেকবারই শুনেছি। অগ্নিযুগের শহীদদের, অহিংস যুগের মহাত্মা গান্ধির, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের। কিন্তু তবু দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে। ওপারের মুজিবর রহমান আর এপারের ইন্দিরা গান্ধির জয়জয়কার কি একমুখে বাজবে? কে জানে।

বিভক্ত বাঙলা দেশ আবার যুক্ত হবে এ স্বপ্ন এখনও কিন্তু দেখি আমি।

১১ই মার্চ, ১৯৭১

সন্ধ্যায় খবর পেলাম ইন্দিরাজী লোভসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করেছেন।

রন্তুর চিঠি পেলাম সে নাকি দোলের সময় আসবে। দুটো খবরই আনন্দের।

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ এসেছিলেন আজ তিনটের সময়। বললেন, তিনি আমার নাম জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য পাঠাচ্ছেন। জ্ঞানপীঠ তাঁর মতামত নাকি চেয়েছে।

বললাম—পাঠান আপত্তি নেই। কিন্তু কোথাও তেল দিতে পারব না।

কিশোর গল্প

অলংকারপুরী

বিরাট রাজ্য অলংকারপুরী রাজার নাম সমূহগুণ। রাজকন্যার নাম রত্নাবলী। রত্নাবলীর জন্মের সময় তার মা মারা গিয়েছিলেন। সমূহগুণ আর বিবাহ করেন নি। রত্নাবলীকে মানুষ করছেন তিনি। রত্নাবলী তাঁর নয়নের মণি। শুধু তাঁর নয়, রাজ্যের সকলের।

অলংকারপুরী সত্যিই নানা অলংকারে অলংকৃত। নদী আছে, ঝরনা আছে, বন আছে, উপবন আছে, পাহাড় আছে, উপত্যকা আছে। ফুল আছে নানা রঙের, ফল আছে নানা স্বাদের। অলংকারপুরীর আকাশ যেন নীলা দিয়ে তৈরী। সে আকাশে মেঘেরা যখন ভাসে মনে হয় যেন স্বপ্নের দল ভেসে বেড়াচ্ছে। সে আকাশের ঊষা যেন রঙীন জাগরণ, সন্ধ্যা বর্ণময় অন্ধকার। সে আকাশে চাঁদ যখন ওঠে মনে হয় কৃষ্ণসায়রে শ্বেত-কমল ফুটল বুঝি।

চাঁদ যখন মেঘে ঢাকা পড়ে যায় অধীর হয়ে ওঠে রত্নাবলী। বাবাকে বলে—বাবা, মেঘকে সরে যেতে বল চাঁদের সামনে থেকে।

তার ধারণা তার বাবার হুকুম অমান্য করবার সাধ্য কারো নেই।

বাবাও সংগে সংগে হুকুম দেন—সেনাপতি, মেঘকে এখুনি সরে যেতে বল। যদি না যায় গুলি ছোঁড়।

সেনাপতি গুলি ছোঁড়ে মেঘকে লক্ষ্য করে। মেঘ একটু পরে আপনিই সরে যায়।

রত্নাবলী ভাবে, বাবার হুকুমেই সরে গেল মেঘটা।

মেয়ের বাবা-অন্ত প্রাণ। বাবারও একমাত্র বন্ধু মেয়ে।

রাজা সমূহগুণও একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তিনি সমস্ত দিন ঘুমোন, জেগে থাকেন রাত্রে। সারারাত নক্ষত্র-চর্চা করেন। নিশাচর পাখীদের সংগেও আলাপ করেন। মাঝে মাঝে প্যাঁচার পিঠে চড়ে মা-লক্ষ্মীও নাকি দেখা দেন তাঁকে। বাদুড়েরা দিয়ে যায় দেশ-বিদেশের খবর। জোনাকীরা নিয়ে আসে লুকানো আলোর খবর। ঝিঁঝিঁ পোকারা শোনায় সেই সংগীত যার স্বরলিপি কোনও গানের খাতায় লেখা হয়নি। গভীর রাত্রে ফিঙে পাখী মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে—মেকি, মেকি, মেকি। সমূহগুণের কোলের উপরও থাকে ছোট একটি দিলরুবা। তিনিও মাঝে মাঝে দিলরুবাতে রাগ-রাগিণী আলাপ করেন চোখ বুজে। তাঁর মনে হয় নক্ষত্রলোক থেকে শ্রোতা আর শ্রোত্রীর দল যেন নেমে এসেছে তাঁর বাজনা শোনবার জন্য। ঘিরে বসেছে তাঁকে। স্ফটিকের তৈরি বিরাট রাজপ্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাতে প্রায় সমস্ত রাত একা থাকতেন সমূহগুণ। রত্নার ঘরে থাকতে তার দুই সহচরী—নীরা ও তীরা। আর তার পাশের ঘরে থাকত সশস্ত্র প্রহরিণীরা। পাহারা দিত রত্নাকে। প্রহরে প্রহরে প্রহরিণী বদল হ'ত। কিন্তু আসল প্রহরিণী থাকতেন রত্নার ঘরেই স্বর্ণবেদির উপর—রত্নার পরলোকগতা মা কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণ-প্রতিমাটি। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তিনি। মনে হ'ত তিনি যেন জীবন্ত। সমূহগুণ প্রতিদিন সকালে ছাত থেকে নেমেই একটি পদ্মের মালা পরিয়ে দিতেন তাঁর গলায়। রাত্রে ছাতে যাওয়ার আগে সেই পদ্মের

মালাটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দিতেন গোলাপের একটি মালা। এই দুটি ফুলই খুব ভালবাসতেন কমলাঙ্গিনী। পদ্মফুলের জন্য বিরাট বিরাট পুকুর এবং গোলাপফুলের জন্য বিরাট বিরাট বাগান করিয়েছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। মাঝে মাঝে স্বর্ণ-প্রতিমাটি খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে হ'ত তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তখন রাজা বুঝতে পারতেন রানী তাঁকে কিছু বলতে চান। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বলতেন শুনব, রাত্রে ছাতে এস। রানী যেতেন কি না, গেলেও তাঁর সঙ্গে কোন কথা হ'ত কি না একথা রাজা ছাড়া আর কেউ জানত না!

২

রাজার একমাত্র মেয়ে রত্নাবলী যে কত আদরিণী ছিল তার কিছু পরিচয় শোন। এক রকম খাবার রোজ খাবে না। রোজ আলাদা রকম খাবার চাই। একরকম পোশাক দুদিন পরবে না, রোজ আলাদা পোশাক চাই। গয়নাও তাই। রোজ চাই নূতন ধরনের। ফুলের গয়নাই বেশী পছন্দ। রত্নাবলীর খাবার করবার জন্যে দেশ-দেশান্তর থেকে রাঁধুনী এসেছিল, তার পোশাকের বৈচিত্রও করবার জন্য এসেছিল দেশ-বিদেশ থেকে দরজী। গয়নার নূতনত্ব করবার জন্য স্যাকরার দল সর্বদা মাথা ঘামাতো। আর মালী-মালিনীরা রোজ নূতন নূতন ধরনের ফুলের গয়না করবার জন্য ধর্না দিত রূপশ্রীর কাছে। রূপশ্রী মন্ত্রী ভানুনাথের মেয়ে। তার রং কালো, দেখতে তেমন ভালো নয়। ভানুনাথ তার নাম রেখেছিলেন লবঙ্গ। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল লবঙ্গ বাইরেই কালো—অন্তরে তার রূপের উৎস অফুরন্ত। খুব উঁচুদরের শিল্পী সে। মহারানী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণমূর্তি সে-ই গড়েছিল। যেদিন মহারাজের অপরূপ তৈলচিত্রখানি এঁকে মহারাজকে উপহার দিয়ে এল সে, সেই দিনই মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তার নাম বদলে দিলেন। বললেন—আজ থেকে তোমার নাম দিলাম রূপশ্রী, আর তোমার শিল্পচর্চার জন্য আলাদা একটা বাড়িই বানিয়ে দেব আমি। সেখানে তোমার শিল্প-চর্চার যে কোনও জিনিস তুমি চাইলেই পাবে। আর তোমার তৈরি জিনিসগুলি যদি অন্য রাজ্যের বাজারে পাঠাতে চাও তারও ব্যবস্থা করে দেব আমি। এর থেকে যা রোজগার হবে তা তোমার হবে, আর যে সব জিনিস বিক্রি হবে না তা আমি কিনে নেব।

রূপশ্রীর তাই অবসর নেই। দেশ-বিদেশের খদ্দের সর্বদা ভিড় করে থাকে তার বাড়ির সামনে। রূপশ্রী কিন্তু সকালে উঠেই রত্নার জন্য ফুলের গয়না গড়তে বসে। নিত্য নূতন রকম ফুলের হার, ফুলের চুড়ি, ফুলের বাজু আর ফুলের মুকুট তৈরি করে সে। করে তার সহকর্মিনীরা, কিন্তু কি করে তা নিত্য নূতন রকমের হবে কৌশলটি রূপশ্রী বলে দেয়। ফুলের গয়নায় শুধু ফুলই থাকে না, থাকে সোনা-রূপোর জরি আর নানা রঙের রেশমী সুতো।

রত্নাও খুব ভোরে ওঠে। উঠেই নীরা আর তীরাকে নিয়ে সে বেরিয়ে যায় তার নিজের বাগানে। বাগানটি বাড়ির পাশেই আর সে-বাগানে আছে দেশ-বিদেশের নানা রকম ফুল। রত্না গিয়ে ফোটা ফুলগুলির কাছে দাঁড়ায় আর কুঁড়িগুলিকে চুমু খায়। তার ধারণা, তার চুমু না খেলে কুঁড়িদের ঘুম ভাঙবে না। তীরা আর নীরার হাতে থাকে গোলাপজলে-ভরা রূপোর ঝাঁঝরি পিচকিরি। তাদের পিছনে থাকে বাগানের মালী ভরদ্বাজ হাতে একটি কারুকার্যখচিত সোনার বালতি নিয়ে, বালতিতে থাকে গোলাপজল। বালতি থেকে গোলাপজল নিয়ে নিয়ে তীরা আর নীরা নাইয়ে দেয় গাছগুলিকে।

রত্নার পাখী পোষার শখ ছিল না। বনের জন্তুদের ধরে এনে চিড়িয়াখানা বানানোর শখও না। স্বাধীন জন্তুদের এনে বন্দী করে রাখার পক্ষপাতী ছিল না সে। তার শখ ছিল হাতী পোষার আর ঘোড়াপোষার। কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সে হরণ করেনি। হাতীরা থাকত পাহাড়ের ধারে একটা জঙ্গলে, ঘোড়ারাও তাই। তাদের জন্য নদীর ওপারে আর একটা জঙ্গল ছিল। সেটাও আর একটা পাহাড়ধারে। তাদের দেখাশোনা করবার জন্য অনেক লোকজন ছিল। রত্না কিন্তু রোজ সকালে এদের কাছে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত প্রচুর ভালো ভালো খাবার। নানা রকম ঘাস, পাতা, ডাল, কাঁচা তরি-তরকারি, বহু রকম ফল, তা ছাড়া সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপী, বোঁদে, মিহিদানা।

রত্নার সাড়া পেলেই হ্রেষায় হর্ষধ্বনি করে বেরিয়ে আসত ঘোড়ার দল। রত্নাকে দেখে কেউ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে উঠত, কেউ তাকে ঘিরে বনবন করে ছুটত, কেউ এসে মাথা ঘষত তার গায়ে। হাতীর দল বন থেকে বেরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসত রত্নার সামনে, আর মাথার উপর শুঁড় তুলে অভিবাদন করত তাকে। সকালটা এইভাবে কেটে যেত রত্নার। দুপুরে ঘুমুত না সে, লেখাপড়া করত গুরুদেব ভট্টজীর কাছে। বিকেলে নদীতে গিয়ে বাচ খেলত। রত্নার নিজের একটি আলাদা ছিপ ছিল। সে ছিপে তার সঙ্গে থাকত তীরা, নীরা, হীরা আর পান্না। তারা ইচ্ছে করলে সব্বাইকে হারিয়ে দিতে পারত। কিন্তু রত্না তাদের জোরে বাইতে দিত না। সে ইচ্ছে করে হেরে যেত। হেরে গিয়ে বেশী আনন্দ পেত সে। যে জিতত তাকে পুরস্কার দিত মুক্তার মালা।

সন্ধ্যার সময় এসে স্নান করত গোলাপজলে। নতুন করে সাজত নতুন ধরনের পোশাকে–গয়নায়। তারপর প্রণাম করত মায়ের প্রতিমাকে, আর বলত–মা, তুমি আবার এসো। আবার এসো।

নির্বাক প্রতিমা চেয়ে থাকত নিষ্পলক দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকত রত্নাও তন্ময় হয়ে। ভাবত, এত সুন্দরী ছিল তার মা! রূপশ্রী দিদির কি ভাগ্য, সে দশ বছর তার মায়ের নিত্যসঙ্গিনী ছিল! মাকেও সে রোজ ফুলে গয়না পরিয়েছে। মাঝে মাঝে রত্নার মনে হয়, রূপশ্রী দিদির বয়স কত? দেখলে মনে হয়, ষোলো-সতেরো বছরের বেশী নয়। তীরা একদিন বলেছিল, ওঁর বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি আর নীরা বলেছিল, ও নাকি মন্ত্রীমশায়ের আপন মেয়ে নয়–পালিতা কন্যা। ওকে মন্ত্রীমশাই নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মুক্তি নদীর তীরে এক তমালগাছের তলায়। মন্ত্রী ভানুনাথ নাকি চিরকুমার। রূপশ্রীও চিরকুমারী। এই সব কথা মনে হয় তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। একটু পরে নূপুরের গুঞ্জন শোনা যায়। উঠে পড়ে রত্না সম্মুখ থেকে। পাশের ঘরে গিয়ে প্রণাম করে সভা-কবি মুকুন্দদেবকে। মুকুন্দ দেবের মাথার চুল শাদা, গায়ের বর্ণ গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো। তাঁর বয়স যদিও ষাট, মুখে জরার চিহ্ন নেই, চোখের দৃষ্টি প্রাণবন্ত। তিনি শুধু বড় কবি নন, বড় গায়ক এবং প্রসিদ্ধ নর্তকও। রত্নাকে তিনি গান বাজনা আর নাচ শেখান। পায়ে তাঁর রূপোর নূপুর, হাতে একটি ছোট এস্রাজ। মুকুন্দ দেব কিন্তু মহারাজের বেতনভুক্ ভৃত্য নন। তিনি স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে রত্নাকে নাচ, গান শেখান। মহারাজের আমন্ত্রণ পেলেই সভায় গিয়ে স্বরচিত কাব্য শোনান বা রাগরাগিনী আলাপ করেন। মহারাজ সমূহগুণ অনেক অনেক সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে কোনও পারিশ্রমিক দিতে পারেননি। তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির আয় থেকে সামান্যভাবেই সংসার নির্বাহ করেন। তিনি স্বাধীন, তাই তিনি অত বড় শিল্পী। তিনি রত্নাকে পৌত্রীবৎ স্নেহ করেন–

তাই তাকে যত্ন করে নাচ গান শেখান। তিনি শুধু বড় সুরশিল্পীই নন–তিনি একজন বড় জ্যোতিষীও।

এইভাবে দিন কাটে রত্নার। রাত্রে সে অঘোরে ঘুমোয়।

সমুহগুণ ছাতে জেগে থাকেন।

৩

বিরাট রাজ্য অলংকারপুরী। মহারাজ সমুহগুণ নিশাচর। সমস্ত দিন ঘুমোন। রাজ্য চালান মন্ত্রী ভানুনাথ। তিনিই সর্বেসর্বা। কিন্তু তাঁর মতো বিনয়ী, নিরীহ, সজ্জন লোক অলংকারপুরীতে আর কেউ নেই। অনাড়ম্বর নিরহংকার সুপণ্ডিত ভানুনাথ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে পূজায় বসতেন।

অলংকারপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহালক্ষ্মীর ধ্যান করতেন তিনি। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকতেন চুপ করে। পদ্মাসনা মহালক্ষ্মীর জীবন্ত ছবি ভেসে উঠত তাঁর মনের আয়নায়। তাঁকে প্রণাম করে শুরু করতেন দিনের কাজ।

ভানুনাথ বাস করতেন চন্দনা নদীর তীরে ছোট একটি মাটির বাড়িতে। খড়ের চাল, চারিদিকে বারান্দা। বাড়ির চারপাশে অনেক জমি। সে জমিতে নানা রকম শাক সবজি, তরি-তরকারি ফলত। ফলের গাছও ছিল অনেক। এদের দেখাশোনা করবার জন্য যে মালীরা বাগানের মধ্যে ছোট ছোট পর্ণ কুটিরে থাকত, তারাই ছিল তাঁর প্রতীবেশী। তাঁর চারিদিকে প্রায় একশ' বিঘে জমি ছিল। ভানুনাথের মাটির বাড়িটিতে তিনটি ঘর। একটি শোবার ঘর, একটি পড়ার ঘর, আর একটি রান্নাঘর। তিনি দিনে একবার স্বপাক খান। রাত্রে খান দুধ আর ফল।

ব্রাহ্মমুহূর্তে মহালক্ষ্মীকে প্রণাম করে তিনি চন্দনায় স্নান করতে যান। স্নান করেন অনেকক্ষণ ধরে। স্নান করতে করতে মনে মনে অনেক স্তব পাঠ করেন। তারপর যখন আকাশ ঊষার রঙে লাল হয়ে যায় তখন জলের মধ্যেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তারপর সূর্যদেব যখন চারিদিকে আলো ছড়াতে ছড়াতে চক্রবাল রেখায় দেখা দিতেন তখন তাঁকে প্রণাম করে নদী থেকে উঠে আসতেন তিনি।

নিজের কাপড়, গামছা নিজে কেচে শুকনো কাপড় পরে যখন রাস্তায় আসতেন, তখন প্রায় কারো সংগে দেখা হ'ত না তাঁর। তখনও বাড়ি ছেড়ে পথে বেরোয়নি কেউ। এই সময় ভানুনাথ পালিতাকন্যা লবংগর সংগে দেখা করতেন। মহারাজ যদিও তার নতুন নামকরণ করেছিলেন রূপশ্রী, কিন্তু ভানুনাথ লবংগ বলেই ডাকতেন তাকে। লবংগ তাঁকে প্রণাম করে কপালে পরিয়ে দিত চন্দনের টিপ একটি। তারপর ভানুনাথকে চন্দনের পিঁড়েয় বসতে হ'ত। রূপশ্রী রূপোর থালায় করে যে ফল আর মিষ্টান্ন আনত তা খেতেন তিনি। তারপর রূপশ্রীর কপালে চুমও খেতেন একটি। রূপশ্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা হ'ত ভাণ্ডারীদের সংগে। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তারা। তাদের প্রত্যেকের কাঁধ থেকে ঝুলছে একটি করে থলি। কোনও থলিতে ধান, কোনও থলিতে ডাল, কোনও থলিতে খই, কোনটাতে মুড়ি, কোনটাতে বোঁদে, কোনটাতে ছোট ছোট নিমকি। ভানুনাথ নিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেন আর ভাণ্ডারীরা সেই সব খাবার চারিদিকে মুঠো মুঠো ছড়াতে ছড়াতে যেত। নেমে আসত পাখীর দল। খেত মহানন্দে হুড়োহুড়ি করে। এইটেই ভানুনাথের বিলাস। তিনি যখন বাড়িতে গিয়ে পৌছতেন তখনও পাখীর দল খাচ্ছে–রোজ দশ মণ খাবার ছড়ানো হয় চারিদিকে।

বাড়িতে পৌঁছেই দেখতে পান গুপ্তচররা তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে। তিনি প্রত্যেক গুপ্তচরের সঙ্গে আলাদা আলাদা একা দেখা করেন। গুপ্তচররা খবর আনে রাজ্যে কোথায় কোন অভাবগ্রস্ত প্রজা আছে। এখানে সব প্রজাই ভদ্রলোক। অভাবে পড়লে তারা ভিক্ষা করতে পারে না। তাদের খবর পেলেই ভানুনাথ রাজভাণ্ডার থেকে তাদের প্রচুর উপঢৌকন পাঠান। অলংকারপুরীতে চোর নেই, ডাকাত নেই, জেলখানা নেই, ফাঁসীকাঠ নেই। এখানে দরিদ্রলোকও নেই। কেউ যদি দরিদ্র হয়ে পড়ে রাজভাণ্ডার থেকে তার দারিদ্র্য মোচন করবার ব্যবস্থা আছে। আর তার দারিদ্র্যের খবর গোপনে সংগ্রহ করে গুপ্তচররা।

অলঙ্কারপুরীর প্রজারা কেউ চাষী, কেউ শিল্পী। নানারকম শিল্পের ছোট ছোট কারখানায় বহু রকম জিনিস তৈরী করে তারা। সব জিনিস মহারাজই কিনে নেন, মহারাজই বিদেশে চালান দেন সে সব। চাষীদের খাজনা দিতে হয় না, তারা ফসলের এক-দশমাংশ রাজভাণ্ডারে দান করে। নিজেই এসে দিয়ে যায় তারা। সে সব ফসলও বিদেশের হাটে পাঠান ভানুনাথ। অলঙ্কারপুরীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। উৎসব লেগেই আছে। ভানুনাথের প্রধান কাজ এই সব নিয়ে। বিকেলে রাজসভা বসে। রাজ্যের বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী-গুণীরা এই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে আসেন রোজ। সে সভায় প্রধানত কবিতা পাঠ আর গান হয়। মুকুন্দ দেব মাঝে মাঝে নাচও দেখান। তাঁর তাণ্ডব নাচ দেখবার মতো।

সমূহগুণের প্রচুর খরচ। কিন্তু অভাব নেই। লক্ষ্মী যেদিন পেঁচায় চড়ে তাঁর সঙ্গে রাত্রে দেখা করেন, তার পরদিনই দেখা যায় রাজভাণ্ডার মোহরে পরিপূর্ণ। সুখের রাজ্য অলংকারপুরী। কারও অভাব নেই, কাউকে অনাহারে থাকতে হয় না। মহারাজের ভোজনশালা রাত দিন খোলা। যে যখন যায় তখনই খেতে পায়।

৪

একদিন একটি গুপ্তচর একটি অদ্ভুত খবর নিয়ে এলো। বলল—একটি লোক দেখলাম আমাদের বকুলকুঞ্জে একটি গাছতলায় বসে আছে। লোকটিকে আগন্তুক বলে মনে হ'ল। মনে হ'ল ক্ষুধা-তৃষ্ণাতেও কাতর সে। তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তর দিল না, পালটা প্রশ্ন করল আমাকে—বলতে পারেন, আপনাদের রাজ্যে টাক দাড়ি আছেন? বেঁটে কালো টাক দাড়ি?

বলেই গুপ্তচরটি সলজ্জভাবে মাথা হেঁট করলে। ভানুনাথ কালো বেঁটে। তাঁর মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, আর মাথায় প্রকাণ্ড টাক। ছোট ছোট চোখ দুটি মণির মতো উজ্জ্বল। শুকচঞ্চু নাসা।

মৃদু হেসে তিনি গুপ্তচরকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বললে?'

বললাম, 'আমি কাল এসে খবরটা দেব। মনে হচ্ছে আপনি আগন্তুক, আমাদের অতিথিশালায় চলুন। লোকটি চুপ করে রইল। তারপর বলল—যতক্ষণ খবর না পাচ্ছি ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ করব না।'

বকুলকুঞ্জ ভানুনাথের বাড়ি থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে। তিনি গুপ্তচরকে বললেন—'তুমি সারথিকে খবর দাও। আমার রথ আনুক, আমি এখনি তার কাছে যাব।' একটু পরেই থপ্ থপ্ থপ্ থপ্ শব্দ করতে করতে চারটি প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া একটি সুদৃশ্য রথকে নিয়ে হাজির হ'ল মন্ত্রীমশায়ের বাড়ির সামনে। এসেই ঘোড়া চারটি ডেকে উঠল সমস্বরে।

সারথি নেমে এসে প্রণাম করে জানাল. রথ এসেছে।

গুপ্তচরকে সংগে নিয়ে ভানুনাথ রথে উঠলেন।

বকুলকুঞ্জে গিয়ে দেখলেন একটি দিব্যকান্তি লোক একটি গাছের তলায় বসে আছে।

ভানুনাথ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি আমাকেই খুঁজছিলেন?'

লোকটি ভানুনাথকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। তারপর বললেন, 'আপনার টাক, দাড়ি দুই-ই আছে। কিন্তু আমি যাঁকে খুঁজছি আপনি সেই লোক কিনা বুঝতে পারছি না। আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন।'

'আপনি কি কখনও এক তমালগাছের তলা থেকে একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

'পেয়েছিলাম। তাকে আমি কন্যার মতো পালন করেছি। কেন, ব্যাপার কি?'

'মেয়েটি আমার সহোদরা বোন। আমরা গন্ধর্ব। আমার মা বোনকে নিয়ে তমালবনে গিয়েছিলেন তমালফুল আনতে। আমার বোনের গায়ের রঙ একটু ময়লা ছিল। তমালফুলের সংগে চন্দন আর মাখন বেটে তার গায়ে লাগালে সে ফরসা হবে বলেছিলেন গন্ধর্ব সিদ্ধিশেখর। তিনি আমাদের চিকিৎসক। আরও বলেছিলেন, তুমি নিজে গাছে উঠে তমালফুল পাড়বে আর মেয়েকে শুইয়ে দেবে গাছের তলায়। এ না করলে সুফল ফলবে না। মা তাই করেছিলেন। কিন্তু তমালগাছের উপর ছিল এক বিষধর সাপ। মায়ের কপালে সে দংশন করবামাত্র মা পড়ে গেলেন গাছ থেকে। সংগে সংগে মৃত্যু হ'ল তাঁর। মা বাড়ি ফিরলেন না দেখে আমরা সবাই খোঁজ করতে বেরুলাম। গিয়ে গাছতলায় মায়ের মৃতদেহ পেলাম। বোনকে কিন্তু পেলাম না।'

ভানুনাথ বললেন—'আমি তোমার মাকে দেখতে পাইনি। তমালগাছের ওধারে খানিকটা জংগল মতো ছিল। তিনি হয়তো তারই ভিতর পড়ে গিয়েছিলেন। আমি অসহায় মেয়েটিকে আমার রথে তুলে নিলাম। তাকে ভালোভাবে মানুষ করেছি। আপনি কি তার সংগে দেখা করতে চান?'

আমি তাকে নিয়ে যেতে চাই।

ভানুনাথ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রশ্ন করলেন—'আপনার বোন যে এখানে আছে তা আপনি খবর পেলেন কার কাছে?'

'খবর দিয়েছেন যাদুকর মহর্ষি ময়ালভুক্।'

'ময়ালভুক্? তিনি কি ময়াল সাপ খান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছরে দুটি ময়াল সাপ খান তিনি। আর কিছু খান না।'

'তিনিও কি গন্ধর্ব?'

'তিনি কি তা আমরা জানি না। শুধু জানি তিনি খুব বড় তপস্বী ও যাদুকর একজন। মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন। পাথরকে জীবন্ত করতে পারেন। অসীম ক্ষমতা তাঁর। পৃথিবীর সমস্ত খবর তাঁর নখদর্পণে। অসাধারণ লোক তিনি। নানা রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর খবর পেয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম আমি। অতিকষ্টে গিয়েছিলাম দুর্গম পথ অতিক্রম করে।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'থাকেন বিরাট শিলাকণ্টক নদীর তীরে গজসিংহ অরণ্যে। শিলাকণ্টক নদী ছোট বড় সূচগ্র পাথরে পরিপূর্ণ। সেখানে নৌকো চলে না। আমি সাঁতরে গিয়েছিলাম। আমি অত কষ্ট করে তাঁর গিয়েছিলাম বলে খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি। আমাকে অলংকারপুরীর

ঠিকানা বলে দিলেন, আর এও বলে দিলেন, যার কাছে আমার বোন থাকে তার টাকও আছে দাড়িও আছে।'

'আমার নাম বলেননি ?'

'না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললেন, পরিচয় না হলে নাম জানা যায় না। তাঁর সংগে আমার পরিচয় হয়নি কখনও। তাঁর চেহারাটা আমি দেখতে পাচ্ছি–বেঁটে, কালো, মাথায় টাক, মুখে চাপদাড়ি। তুমি গেলেই চিনতে পারবে। আমাকে একটা মন্ত্রও শিখিয়ে দিলেন যাতে আমি শিগ্গির এখানে পৌছুতে পারি।'

'কি রকম মন্তর ?'

'সে মন্তর মনে মনে তিনবার বললেই আমি পাখী হয়ে যেতে পারি। আমি গজসিংহ জংগল থেকে পাখী হয়ে এখানে উড়ে এসেছি। আমার বোনকেও আমি সেই মন্তর শিখিয়ে দেব। তারপর দুজনে পাখী হয়ে ফিরে যাব নিজেদের দেশে।'

ভানুনাথ বললেন–'সে যদি তোমার সংগে যেতে রাজি হয়, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তার বিনা সম্মতিতে তাকে নিয়ে যেতে দেব না আমি। আমার সংগে চল, দেখি সে কি বলে। আর একটা কথা জানতে চাই। ও যে তোমার বোন তা তুমি প্রমাণ করবে কি করে ? সে তো তোমায় চিনতে পারবে না। তাকে যখন আমি এনেছিলাম তখন সে অতি শিশু ছিল। তার দেহের কি এমন কোনও চিহ্ন তোমার মনে আছে যা দিয়ে তাকে চিনতে পারবে তুমি ?'

'পারব। আমরা গন্ধর্ব পদ্মচরণের বংশধর। আমাদের প্রত্যেকের পায়ের তলায় ছোট একটি পদ্ম আঁকা আছে। আমার বোনের পায়েও আঁকা আছে সে পদ্ম। আমার পায়েও আছে। এই দেখুন–' লোকটি শুয়ে পড়ে পা দুটি উঁচু করে ধরে রইল। ভানুনাথ সবিস্ময়ে দেখলেন–হাতে যেমন রেখা আঁকা থাকে তেমনি রেখা দিয়ে নিখুঁত কমল আঁকা রয়েছে তার দুটি পায়ের চেটোর মাঝখানে।

লোকটি উঠে বলল–'যাকে আপনি পালন করেছেন সে যদি আমার বোন হয় তালে তার পায়ের তলাতেও এই কমল আঁকা আছে।'

ভানুনাথ বললেন–'চল তবে। রথে ওঠ–'

রূপশ্রীর বাড়িতে যখন তারা পৌছল তখন রূপশ্রী রত্নাবলীকে লতা, পাতা, ফুল দিয়ে সাজাচ্ছিল। রত্নাবলী সখীদের নিয়ে বনভোজনে যাবে। ভানুনাথ সেই লোকটিকে নিয়ে হাজির হলেন যখন তখন রূপশ্রী ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'লবংগ, তুই ওঘরে একটু চল তো।'

পাশের খালি ঘরে নিয়ে গেলেন তাকে।

'পা ছড়িয়ে বোস তো।'

'কেন ?'

'বোস না, তোর পায়ের তলাটা দেখব।'

'আমার পায়ের তলা ? কেন ?'

'দরকার আছে, বোস না তুই।'

বসতে হ'ল রূপশ্রীকে।

ভানুনাথ সবিস্ময়ে দেখলেন তার দুটি পায়ের তলাতেই ছোট ছোট দুটি পদ্ম আঁকা রয়েছে। আর সন্দেহ রইল না তাঁর। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। লবংগ যদি তার ভাইয়ের সংগে চলে যায় তাহলে তো অলংকারপুরী অন্ধকার হয়ে যাবে।

'কি দেখলে বাবা আমার পায়ে?'

'একটা চিহ্ন। তোর পায়ে পদ্ম আঁকা আছে। তার মানে গন্ধর্ব পদ্মচরণের বংশে তোমার জন্ম হয়েছিল। তুমি তো জান তোমাকে আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি তোমার ভাই। তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে চান। তুমি যদি যেতে চাও আমি আপত্তি করব কেমন করে?'

ভানুনাথের চোখ দুটি ছলছল করতে লাগল।

লবঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলা জড়িয়ে বলল—'আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা।'

'তোমার ভাইকে তাহলে বলে দাও সেকথা।'

পাশের ঘরে গেলেন দুজনে।

গিয়ে দেখলেন, রত্নাবলী মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রূপশ্রীর ভাইয়ের দিকে। রূপশ্রীর ভাইও নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে সুন্দরী রত্নাবলীকে।

রূপশ্রী পাশের ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকাতেই তার ভাইকে বলল—'আপনি আমার ছোট ভাই না বড় ভাই?'

'বড় ভাই।'

এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করল রূপশ্রী।

'আপনি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যাব না।'

'যাবে না?'

'না।'

'যাবে না?'

'না।'

'যাবে না?'

'না।'

'বেশ, চললাম তাহলে—'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল লোকটি।

ভানুনাথ বললেন—'লবঙ্গ, যাও তুমি ওঁকে ফিরিয়ে আন। উনি তোমার দাদা। ওকে সমুচিত সম্বর্ধনা করা উচিত।'

লবঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কিন্তু রাস্তায় কাউকে দেখতে পেল না। তার দাদা তখন পাখী হয়ে আকাশে উড়ে চলে যাচ্ছে।

৫

সেদিন রত্না আর তার সহচরীরা যে বনে বনভোজন করবার জন্য গেল সেটি পাহাড়ের গায়ে একটি অপরূপ বন। তাল, তমাল, পলাশ, পিয়াল শিশু, শাল, দেবদারু, শিরিষ, বট, অশ্বত্থ, অর্জুন অনেক রকম গাছ সে-বনে। অনেক গাছের গায়ে লতাও উঠেছে। পাহাড় থেকে ঝরনা নেমে ঢুকেছে ওই বনের মধ্যে। বসন্ত কাল। ফুল ফুটেছে চারিদিকে। পাহাড় বেয়ে ঝরনা যেখানে বনে ঢুকেছে তার একধারে অসংখ্য পলাশগাছে ফুল ফুটেছে। লালে লাল হয়ে গেছে সে-দিকটা। মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে কে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে।

রত্নারা ঝরনার ধারে নাচ গান শুরু করেছিল। তাদের খাবার তৈরী করছিল একজন কাশ্মীরী রাঁধুনী। ভালো রুদমি চাল, সোনা মুগের ডাল, বাদাম পেস্তার খিচুড়ি, কিসমিস দিয়ে আলুরদম, আর খুবানীর অম্বল।

নাচ-গান শেষ হ'তে রত্না বলল—'তীরা, একটা গল্প বল না ভাই।'

তীরা বলল—'রাজার গল্প শুনবি না খাজার গল্প শুনবি?'

'রাজার গল্প অনেক শুনেছি। খাজার গল্পই বল। যে খাজা আমরা খাই তার গল্প?'

'আরে না না। এ একটা খাজা মূর্খের গল্প—'

'খাজা মূর্খ মানে? খাজা তো একটা ভালো মিষ্টান্ন, সে মূর্খ কি খাজার মতো মিষ্টি?'

'ঠিক ধরেছিস। লেখাপড়া কিছু জানত না, বুদ্ধিসুদ্ধিও ছিল না বিশেষ। কিন্তু ভারি মিষ্টি মানুষ ছিল সে। পয়সার অভাব ছিল না তার। খেটে খেতে হ'ত না। সকালে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম যার সংগে দেখা হ'ত একমুখ হেসে এগিয়ে যেত তার দিকে আর বলত চল ভাই, তোমার সংগে আজ দিনটা কাটাই। এমনি করে নিত্য নূতন লোকের সংগে ভাব করত সে। আর তার সংগেই দিনটা কাটাত সে। গরীব লোক হলে তাকে মোহর দিত একটি। গুণী লোক হলে প্রণাম করত। আর ধনী লোক হলে বলত, আপনাকে টাকা দেবার স্পর্ধা নেই, প্রণাম করবার ইচ্ছা নেই—আপনি আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন, আমি সেখানে একটি চুম খাই।

একদিন সকালে উঠেই তার দেখা হয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা ষাঁড়ের সংগে। বিরাট ষাঁড়। খাজা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কি ভাই, কোথা যাচ্ছ? ষাঁড় উত্তর দিল, ফোঁস্। খাজা দমল না। দোকান থেকে জিলিপি কিনে ষাঁড়ের দিকে ঠোঙা নিয়ে এগিয়ে গেল। বলল, রাগ করছ কেন ভাই? খাও না কিছু। ষাঁড় ঠোঙাসুদ্ধ সব খেয়ে ফেলল। শেষ করে এগোল খাবারের দোকানটার দিকে। খাজা দোকানদারকে বলল, এ যা খেতে চায়, দাও একে। দাম আমি দেব। ষাঁড় দোকানে যত খাবার ছিল, সব খেয়ে ফেললে। খাজা সব দাম মিটিয়ে দিয়ে ষাঁড়ের পিছু পিছু চলতে লাগল। ষাঁড় হঠাৎ মানুষের ভাষায় বলে উঠল, 'বেঁচে থাক। তোমার উপর খুশী হয়েছি। আমার সংগে যাবে?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কৈলাসে। মহাদেবের কাছে। আমি তাঁর সেবক নন্দী। তিনি আমাকে দুনিয়ার হাল-চাল দেখতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে ভাল খবর দিতে পারব একটা। আমার সংগে যাও যদি তিনি তোমাকে হয়তো বরই দিয়ে দেবেন একটা।'

খাজা বলল—'এইভাবে কি যেতে পারব?'

ষাঁড় বলল—'না, উলংগ অবস্থায় যেতে হবে। ছাই মাখতে হবে সর্বাংগে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতে হবে, একটা জটা যদি পরতে পার, আরও ভাল হয়—'

ভয় পেয়ে গেল খাজা।

বলল—'না বাপু, ওসব আমি পারব না।'

গল্প এই পর্যন্ত এগিয়েছে, এমন সময় চমৎকার সুর একটা ভেসে এল। থেমে গেল গল্প। তারা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল লাল পলাশবনের উপর সবুজ রঙের একটি ফানুস উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর তার ভিতর থেকেই বেরুচ্ছে সাহানা সুরের একটি গান। রত্না বলল—'এমন চমৎকার সাহানা গাইছে কে?'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ফানুসকে ডাকতে লাগলো—'ওগো, তুমি এদিকে এসো, এদিকে এসো—'

ফানুস কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। তখন রত্না আলাপ করতে লাগল সাহানা রাগিণী। মুকুন্দ দেবের ছাত্রী সে। দেখতে দেখতে তার আলাপও জমে উঠল খুব। তখন সবুজ ফানুসটি ভেসে ভেসে এল তাদের কাছে এবং তার থেকে বেরুল সুন্দরী একটি কুমারী।

রত্না প্রশ্ন করল–'কে আপনি ?'

'আমি সাহানা রাগিণী।'

'ফানুসে চড়ে বেড়াচ্ছেন কেন ?'

'মহর্ষি ময়ালভুকের আদেশে। তিনি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীকে নানা রঙের ফানুস বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা উড়ে উড়ে গান গেয়ে ময়ালসাপদের গানে মুগ্ধ করে নিয়ে যাই গজসিংহ অরণ্যে। তিনি তাদের খান।'

'ময়ালসাপ খান তিনি ?'

হ্যাঁ। তিতি বলেন, ময়ালসাপ নিষ্ঠুর সাপ। জীবনকে নিষ্পিষ্ট করে তার শ্বাসরোধ করে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে আগে তাকে হত্যা করে, তারপর খায়। তাই খাদ্য হিসাবে তিনি ওই ময়ালসাপকেই বেছে নিয়েছেন।'

'সাপকে কামড়ে কামড়ে খান ?'

'না। তাকে আগে সুখাদ্যে রূপান্তরিত করেন, তারপর খান। অদ্ভুত যাদুকর তিনি।'

'সুখাদ্যে পরিণত করেন কিভাবে ?'

'মন্ত্রবলে। সাপটিকে একটি ঘরের মধ্যে পুরে কপাট বন্ধ করে দেন। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। খানিকক্ষণ পরে কপাট খুললে দেখা যায়, সাপ নেই। প্রকান্ড এক কড়াই দুধ, কিছু মিহি চাল, কিছু চিনি আর এক কড়াই গাওয়া ঘি রয়েছে। তখন তিনি দুধের কড়াটা উনুনে চড়িয়ে দেন। দুধ ফুটে উঠলেই চাল আর চিনি ছেড়ে দেন তাতে। তারপর সেটাকে চন্দন কাঠের হাতা দিয়ে নাড়তে থাকেন ক্রমাগত। দুধটা যখন খুব ঘন হয়ে যায়, চালগুলো যখন সিদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত ঘিটা ঢেলে দেন তাতে। আর একটু ফুটিয়ে নামিয়ে নেন। এর নাম নাকি চরু। একটু পরে জমে শক্ত হয়ে যায় সেটা। অনেকদিন থাকে। এরই এক গুলি সকালে আর এক গুলি সন্ধ্যেবেলা খান তিনি।'

'চরু কে রান্না করে দেয়–?'

'উনি নিজেই সব করেন। উনি স্বাধীন সর্বশক্তিমান। কারো সাহায্য নেন না।'

'দেখতে কেমন ?'

'অপরূপ। সর্বদা মুচকি মুচকি হাসছেন। সদানন্দময়। শুনেছি স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি ওঁর গুরু। অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছেন ওঁকে। এই দেখ না, আমাদের জন্যে এমন ফানুস বানিয়ে দিয়েছেন যা জলে ভেজে না, আগুনে পোড়ে না। এত হাল্কা অথচ ঝড়ে উড়ে যায় না। আমরা যেমন বেগে যেতে চাই ঠিক তেমনি বেগে চলি।'

নীরা জিগ্যেস করল–'ক্ষিদে পেলে কি কর ? ওর মধ্যে খাবার এসে যায় ?'

'রাগ-রাগিণীদের ক্ষিদে পায় না।'

রত্না জিগ্যেস করল, 'তিনি যে বনে থাকেন সে বনের নাম গজসিংহ কেন ? অনেক হাতী আর সিংহ আছে নাকি ?'

'প্রচুর। বিরাট জঙ্গল, আর অনেক রকম জানোয়ার আছে সেখানে।'

'ময়ালভুক ওখানে থাকেন কেন ?'

'তপস্যা করছেন। তিনি এমন একটা জীব সৃষ্টি করতে চান যার বদমাইশি বুদ্ধি নেই।'

'তিনি জীব সৃষ্টি করতে পারবেন?'

'অসম্ভব নয়। জীবের রূপান্তর তিনি ঘটাতে পারেন। মানুষকে পাখী করে দিতে পারেন। গজসিংহ জঙ্গলে হাতী আর সিংহে প্রায়ই লড়াই হ'ত। উনি বললেন–যে ঝগড়া করবার জন্য প্রথম আক্রমণ করবে তাকে আমি পিঁপড়ে করে দেব। করেও দিয়েছিলেন একটা হাতীকে পিঁপড়ে। তারপর থেকে আব টুঁ শব্দটি করে না কেউ–'

'সে হাতীটা পিঁপড়ে হয়েই আছে?'

'না। সে তাঁর পায়ের উপর পড়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আবার হাতী করে দিয়েছেন তাকে–খুব দয়ালু লোক। আমি ভাই, এবার উঠি। আমার গান শুনে একটা ময়ালসাপ আমার পিছু পিছু আসছিল, গান বন্ধ হয়ে গেছে, ওই দেখ পাহাড়টার উপব এদিক ওদিক ঘুরছে।'

সবাই দেখল পাহাড়ের উপর থেকে এক বিরাট ময়াল আস্তে আস্তে নামছে।

'যাই ওকে গান গেয়ে গেয়ে শিলাকণ্টক নদীর দিকে নিয়ে যাই।'

'শিলাকণ্টক নদীর ধারে গজসিংহ বন নাকি?'

'হ্যাঁ, সে নদী নৌকা করে পার হওয়া যায় না, সাঁতরে পেরুতে হয়। আমি এবার চলি ভাই–'

রত্না বললে–'তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আবার কবে দেখা হবে ভাই?'

'তুমি যদি আকাশের দিকে চেয়ে সাহানা আলাপ কর, আমি শুনতে পাব। শুনতে পেলেই চলে আসব তোমার কাছে। চমৎকার গলা তোমার। যাই ভাই।'

সবুজ ফানুসে চড়ে সাহানা উড়ে গেল। সাহানা রাগিণীতে পূর্ণ হয়ে উঠল চারদিক। ময়ালসাপটা আস্তে আস্তে নামতে লাগল পাহাড় থেকে।

৬

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছাতে যাবার আগে মহারাজ সমূহগুণ কমলাঙ্গিণীর স্বর্ণপ্রতিমায় মালা পরাতে গিয়ে দেখলেন, প্রতিমার সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। স্পর্শ করে দেখলেন, একটু উত্তপ্ত হয়েছে যেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন–ছাতে এস আজ। ছাতে তিনি গিয়েছিলেন কি না, কিছু বলেছিলেন কি না, তা কেউ জানে না। তারপর কিন্তু তিনি আর ঘুমুতে গেলেন। সোজা চলে গেলেন ভানুনাথের বাড়ি। তাকে ডেকে বললেন 'আমাদের একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। রত্নার যে বিয়ের বয়স হয়ে গেছে তা আমরা খেয়াল করিনি। তুমি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে প্রচার করে দাও যে, আমরা রত্নার জন্য স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করব। রাজপুত্রদের মধ্যে যদি কেউ রত্নাকে বিবাহ করবার অভিপ্রায়ে সে সভায় আসেন তাঁদের যথোচিত সম্বর্ধনা করব আমরা।'

ভানুনাথ বললেন–যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করছি। আমাদের পাঁচটি বড় প্রতিবেশী রাজ্য আছে। সেখানে আমি নিমন্ত্রণ পাঠাব। তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে আমাদের মর্যাদাহানি হবে না। মল্ল, বর্মণ, সিংহ, কৌশিক, সভ্যশীল–এরা পাঁচজনেই অভিজাত ক্ষত্রিয় রাজা। এঁদের পুত্রেরা বিবাহযোগ্যও হয়েছে। মল্লের বড় ছেলে ক্ষেত্ররাজ, বর্মণের কনিষ্ঠপুত্র তারাবণ্টন, সিংহের বড় ছেলে বজ্রসিংহ, কৌশিকের ভ্রাতা ছন্দ, কৌশিক আর সভ্যশীলের একমাত্র পুত্র ভদ্রশীল, প্রত্যেকেই সৎপাত্র। এঁদের প্রত্যেককেই আমি পদ্ম বনোৎসবে নিমন্ত্রণ করছি। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে।'

'কি বল–

'সেকালে যে স্বয়ম্বর সভা প্রচলিত ছিল সে-রকমটা না করাই ভালো। সেকালে কন্যা মালা নিয়ে প্রত্যেক রাজপুত্রের সামনে দাঁড়াতেন, রাজপুত্রের অনুচর রাজপুত্রের গুণকীর্তন করতেন–রাজকন্যার পছন্দ হলে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিতেন, পছন্দ না হলে প্রণাম করে চলে যেতেন আর-এক রাজপুত্রের সামনে। এ যুগে এটা অশোভন। যে রাজপুত্রদের রত্না প্রত্যাখ্যান করবে, অপমানিত বোধ করবেন তাঁরা। আমাদের উপর হয়তো রুষ্ট হবেন। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াটা ঠিক নয়। আমাদের যোজন দীঘি এক যোজন লম্বা এক যোজন চওড়া। তার মাঝখানে স্ফটিকের যে বিস্তৃত মঞ্চটি আছে সেইখানেই রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ করি। রত্না তার সহচরীদের নিয়ে সেখানে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করুন। লবঙ্গ সাজিয়ে দেবে মঞ্চটি। রত্নার যদি কাউকে পছন্দ হয় তখন আমরা বিধিমত বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব।'

মহারাজ বললেন–'বেশ, তাই হোক।'

৭

রূপশ্রীর ভাই–তার নাম ছিল শুদ্ধসুর–যখন তার বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারল না তখন বড়ই হতাশ হ'ল সে। শুধু হতাশ নয়, বিব্রতও হ'ল মনে মনে। শুদ্ধসুর গন্ধর্বদের রাজা। কিন্নররাজ পুষ্পেন্দ্র তার প্রিয়তম বন্ধু। পুষ্পেন্দ্র তাকে বলেছিল, তোর বোনকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারিস, আমি তাকে বিয়ে করব। আমার রাজ্যের রাণী হবে সে। শুদ্ধসুর বলেছিল, নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে আনব আর নিশ্চয় তোর সঙ্গে বিয়ে দেব।

রূপশ্রী কিন্তু এল না।

শুদ্ধসুর তখন উড়তে উড়তে আবার গজসিংহ জঙ্গলে ফিরে গেল ময়ালভুকের কাছে। গিয়ে দেখল, ময়ালভুক নেই, তার শিষ্য পঞ্চক রয়েছে।

পঞ্চক বলল–'প্রভু এখন ধ্যানে বসেছেন।'

'কোথা তিনি?'

'এই যে–'

শুদ্ধসুর দেখল, একটি প্রকান্ড লম্বা গাছ আকাশের দিকে সোজা উঠে গেছে। নীচের দিকে তার কোন ডাল নেই। উপর দিকে প্রকান্ড দুটি ডাল প্রসারিত হয়ে আকাশের দিকে চলে গেছে। আর সেই ডাল দুটির মাঝে ঊর্ধ্বমুখী বিরাট ফুল একটি। ফুলটি ধপধপে সাদা। মনে হচ্ছে, যেন একজন ঊর্ধ্ববাহু তপস্বী তপস্যা করছেন, তাঁর মাথার চুল গুলি ধপধপে সাদা। পঞ্চক বলল–'উনি তপস্যার সময় রূপান্তরিত হয়ে যান। পাহাড় হন মাঝে মাঝে–'

'কতক্ষণ ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবেন উনি?'

'সাধারণত দু'দিনের বেশী থাকেন না। তিনদিন পার হয়ে গেছে। একটু পরেই বোধহয় ধ্যানভঙ্গ হবে। আপনি বসুন।'

অপেক্ষা করতে লাগল শুদ্ধসুর।

একটু পরেই ধ্যানভঙ্গ হ'ল ময়ালভুকের, দেখতে দেখতে গাছটি ছোট হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল তারপর। ময়ালভুক সামনে এসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

'কি খবর হে শুদ্ধসুর? বোনের দেখা পেয়েছ?'

'দেখা পেয়েছি। কিন্তু সে আসতে চাইল না। আপনি এর একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন।'

'এর ব্যবস্থা করা যাবে না। ওর স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা শক্ত। তোমার বোনও শক্তিময়ী তপস্বিনী। পূর্বজন্মে ও ময়দানবের মেয়ে ছিল। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না।'

'তাহলে আমি কি করব?'

'তুমি অলঙ্কারপুরীতেই ফিরে যাও। ফিরে গিয়ে তোমার বোনকে রাজী করাও আগে। তার অমতে তাকে আনা সম্ভব নয়।'

এই বলে চেয়ে রইলেন তার দিকে। হেসে বললেন–'আর একটি মেয়ে তো তোমার মনে ঘুর ঘুর করছে দেখছি। রাজকন্যা রত্না। অলঙ্কারপুরীতেই ফিরে যাও তুমি–' বলেই ময়ালভুক গাছের পাতা হয়ে একটি গাছের ডালে গিয়ে লেগে রইলেন। শুম্ভসুর বুঝতে পারল উনি আর কথা বলবেন না। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গজসিংহ বন থেকে চলে এল সে।

৮

গুপ্তচররা একদিন একটি অদ্ভূত লোককে নিয়ে এল ভানুনাথের কাছে। মিশমিশে কালো চেহারা, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, থ্যাবড়া ভুঁড়ো নাক। গালের মাংস আর ভুরুর চুল চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। মাথার লম্বা চুল চূড়ো করে বাঁধা। পরনে কাপড় নেই, প্যান্ট নেই, আছে একটা ঘাগরা তাও হাঁটুর উপর পর্যন্ত। ঘাগরা কাপড়ের নয়, ঘাসের। ঘাস কাপড়ের মত বোনা। ভানুনাথ প্রশ্ন করলেন–'কে তুমি?'

'আমার নাম ভল্লু।'

'বাড়ি কোথা?'

'জম্বী দ্বীপের কাছে ছোট একটা হম্বু দ্বীপ ছিল। সেইখানেই আমি থাকতাম। একাই থাকতাম। আমার বাবা, মা, ভাই, বোন সব মরে গেছে। ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে হম্বু দ্বীপটাও সমুদ্রে ডুবে গেছে। অনেক কষ্টে আমি বেঁচেছি। ক্রমাগত সাঁতার কেটেছি দশ দিন। তীরে পৌঁছে আপনাদের খুব সুনাম শুনলাম। তাই আপনাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি।'

'তুমি কি কাজ করতে পার?'

'খেতে পারি আর ঘুমুতে পারি।'

'হম্বু দ্বীপে কি করতে?'

'সেখানে প্রচুর নারকেল গাছ ছিল। আমি রোজ দশ-বারোটা নারকেল পেড়ে খেতাম। বন্ধুদের সংগে গল্প করতাম, তারপর ঘুমুতাম।'

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?'

'তারা মরে গেছে বোধহয়। কিম্বা হয়তো সাঁতরে কোথাও উঠেছে। আমার বন্ধুরা মানুষ ছিল না, ছিল কয়েকটি হাতী আর ঘোড়া। তাদের কথা আমি বুঝতে পারি। বলতেও পারি।'

এই বলে ভল্লু একবার হাতীর ডাক তারপর ঘোড়ার ডাক শুনিয়ে দিল ভানুনাথকে।

ভানুনাথ বললেন, 'আমাদের রাজকন্যা রত্নার হাতী আর ঘোড়া পোষার শখ আছে। তার হাতীরা আর ঘোড়ারা পাহাড়ের ধারে দুটো জংগলে থাকে। তুমি সেইখানেই থাক তাহলে। ওদের ভাষা যখন তুমি জানো তখন ওদের সুখ-দুঃখ অনুযোগ-অভিযোগ আমাদের জানিও। সেখানে আরও অনেক লোকজনও আছে। সেইখানেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা

করে দিচ্ছি আমি।'

ভল্দু একবার হাতীর ভাষায়, আর একবার ঘোড়ার ভাষায় ধন্যবাদ জানাল ভানুনাথকে। তারপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল তাঁকে। তারপর দুহাত তুলে বলল, 'কেঁক্ কেঁক্ কোঁথা কোঁথাক্ গাঁ গাঁ গাঁক হুে হুে চিঁহি চিঁহি গর গর গরাট।

প্রথম ছত্র হাতীর ভাষা, দ্বিতীয় ছত্র ঘোড়ার। দুটিরই অর্থ—হে মন্ত্রিমশায়, আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক!

৯

যোজন দীঘি বিরাট দীঘি। হাজার হাজার পদ্মফুল ফোটে তাতে। চার ক্রোশ লম্বা চার ক্রোশ চওড়া। কাকচক্ষুর মতো কালো জল টলটল করছে। সে দীঘির মাঝখানে স্ফটিক পাথরের যে মঞ্চটি আছে সেটিও বেশ বড়। পাঁচশ লোক অনায়াসে বসতে পারে তাতে। ছাত নেই। প্রয়োজন হলে নীল মখমলের স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। চারিদিকে মর্মর পাথরের পাতলা পাতলা থাম আছে।

রূপশ্রী সাজায় সেই মঞ্চকে। সে একদিন ছোট একটি পানসি নিয়ে যোজনা দীঘিটি ঘুরে ঘুরে দেখল। তার মনে হ'ল, যে রাজপুত্ররা আসবেন তাঁদের যোজন দীঘিটি পাড় থেকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে কেমন করে? পানসি করে? তার খুঁতখুঁত মন সায় দিল না এতে। যোজন দীঘির পাড় থেকে মঞ্চ পর্যন্ত প্রায় এক ক্রোশ দূর। তার মনে হ'ল, যোজন দীঘির পাড় থেকে মঞ্চ পর্যন্ত সোনার পাত দিয়ে প্রকান্ড একটা পুল তৈরি করে দিতে হবে। তা না করলে মহারাজ সমূহগুণের মর্যাদাহানি হবে। সোনার পুলটিকেও মনোমত করে সাজাবে সে।

রূপশ্রীর এই প্রস্তাব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মন্ত্রী ভানুনাথ। এক ক্রোশ লম্বা সোনার সেতু তৈরি করতে যে অনেক সোনা লাগবে। অত সোনা কি রাজভান্ডারে আছে? আছে কি না তিনি তাও ঠিকমতো জানেন না। শুধু জানেন রাজভান্ডার মাঝে মাঝে আপনিই ভরে যায় সোনায়। ঘড়া ঘড়া মোহর কে যেন রেখে যায়। তিনি বিশ্বাস করেন মা লক্ষ্মীর কৃপাতেই হয় এটা। কিন্তু এক ক্রোশ লম্বা একটা সোনার পুল তৈরি করবার মতো সোনা কি মা লক্ষ্মী দেবেন? ভাবনায় পড়লেন ভানুনাথ। রূপশ্রীকে কিন্তু তিনি 'না' বলতে পারলেন না। তাকে মনে মনে ভয় করেন তিনি। বললেন—'অনেক সোনা লাগবে তো। ভান্ডারে কত সোনা আছে দেখি। সোনার না করে চন্দনকাঠের করলে কেমন হয়?'

রূপশ্রী জবাব দিল—'চন্দনকাঠ তো থাকবেই সোনার সঙ্গে। সোনা আর চন্দন কাঠ দিয়ে কয়েকটি বড় তোরণ করব ভেবেছি।'

ভানুনাথ মাথার টাকে একবার হাত বুলোলেন কেবল। কোনও উত্তর দিলেন না।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মহালক্ষ্মীর ধ্যানে বসলেন তিনি। মহালক্ষ্মীর মূর্তি মনে মনে যখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তখন তিনি বললেন—'লবঙ্গের আবদার না রাখলে ও যে কি করবে তা জানি না। বড় আদুরে মেয়ে—বড় ভাবনা হচ্ছে।'

ভানুনাথ মহালক্ষ্মীর কাছে কখনও কিছু চাননি। আজও চাইলেন না। কেবল হাত জোড় করে নীরবে চেয়ে রইলেন মহালক্ষ্মীর মুখের দিকে। মহালক্ষ্মী মৃদু হাসলেন একটু। তারপর মিলিয়ে গেলেন।

তার পরদিন ভোরের দিকে মহারাজ ভৈরব রাগ আলাপ করছিলেন ছাতে বসে। তাঁর মুদিত চোখের সামনে ভৈরব রাগ যেন মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল সে

মূর্তির উপর যেন ছায়া পড়ল কার। চোখ চেয়ে দেখলেন স্বয়ং মহালক্ষ্মী দাঁড়িয়েছেন এসে। পাশে তাঁর পেঁচাটি। সামান্য সাধারণ পেঁচা নয়। ধপধপে সাদা প্রকাণ্ড লক্ষ্মীপেঁচা। গায়ের পালক যেন মখমল, চোখ দুটি যেন চুনী, ঠোঁটটি প্রবাল। গৌরবর্ণা সুরূপা সর্বালংকারশোভিতা মহালক্ষ্মী মুগ্ধ নিস্তব্ধ হয়ে শুনছেন ভৈরব রাগের আলাপ। স্বর্ণপ্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর সবুজ শাড়িটি জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা অপূর্ব গানের সুরই বুঝি জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে।

সমুহগুণ প্রণাম করলেন মহালক্ষ্মীকে।

মহালক্ষ্মী বললেন–'শুনে সুখী হলাম তুমি রত্নার বিবাহের আয়োজন করছ। আরও খুশী হলাম রূপশ্রীর মঞ্চ সাজাবার ভার নিয়েছে শুনে।'

'ওরাই তো আমার সহায়। আমি তো কিছু করতে পারি না।'

'শুধু ওরা কেন, সবাই তোমার সহায়। তুমি যে ভালো লোক। সব ঠিক হয়ে যাবে। পেঁচার পিঠে চড়লেন মহালক্ষ্মী। তিনি কিছুদূর আকাশে যখন উঠেছেন, তখন মনে হ'ল জ্যোতির্ময় কি একটা যেন ছিটকে পড়ল তাঁর পায়ের তলা থেকে আর নামতে লাগল অলংকারপুরীর দিকে। কিছু পরেই কিন্তু মানুষের মতো হয়ে গেল সেটা। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মহারাজ। তারপর ভাবলেন দেবতাদের কত খেয়াল, কত লীলা। প্রত্যেকটির অর্থ কি আমরা বুঝতে পারি? কিছুক্ষণ পরেই ভৈরোঁ রাগিণীতে মন দিলেন তিনি।

১০

রূপশ্রী সমস্ত স্যাকরা আর ছুতোরকে ডেকে পাঠাল। ছুতোররা বলল–চন্দনকাঠ প্রচুর আছে। আপনার ফরমাসমতো চন্দনকাঠের দশটি তোরণ বানিয়ে দিতে পারবো আমরা। রূপশ্রী বলল–'প্রত্যেক তোরণের উপর সোনার কলসী থাকবে। আর কলসীতে থাকবে পদ্মফুলের গোছা।'

'তাও হবে। তোরণের মাথার উপর কলসী বসাবার মতো খাঁজ বানিয়ে দেব আমরা।'

গোলমাল বাধাল কিন্তু স্যাকরারা।

তারা বলল–'আপনি বলছেন রাজভাণ্ডারে প্রচুর মোহর আছে। কিন্তু সেতু বানাতে হলে তক্তা চাই। মোহর পিটিয়ে তো তক্তা হবে না। মোহর গলিয়ে তক্তার মতো হতে পারে। ঢালাই করতে হবে। কিন্তু অত বড় ঢালাই করবার ব্যবস্থা আমাদের তো নেই। তাছাড়া সোহাগাও বেশী নেই আমাদের। ম্লেচ্ছ বণিকদের কাছ থেকে আমরা সোহাগা কিনি বছরে একবার। তারা বছরে একবারই আসে সমুদ্র পার হয়ে। সে সোহাগা দিয়ে রাজকন্যার জন্য নিত্য নূতন গয়না তৈরি হয়। তক্তা করবার মতো সোহাগা তো আমাদের ভাঁড়ারে নেই।' রূপশ্রী বলল–'ম্লেচ্ছ দেশে লোক পাঠাতে হবে তাহলে। সোনার সেতু করতেই হবে।'

'নমস্কার মা ঠাকরুণ!'

রূপশ্রী পিছু ফিরে দেখলে একটি অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা টের পায়নি রূপশ্রী।

'নমস্কার! কে আপনি?'

'আমি সেতু তৈরি করি। শুনলাম, আপনি একটি সেতু তৈরি করাবেন, তাই এসেছি যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি–'

'কি ভাবে সাহায্য করবেন?'

'আপনি যেমন চান ঠিক তেমনি সেতুই নির্মাণ করে দেব আমি।'

'আমি এক ক্রোশ লম্বা একটি সোনার সেতু চাই।'

'বেশ, তাই হবে। কত দিনের মধ্যে চাই?'

'আপনিই বলুন না, কত তাড়াতাড়ি হতে পারে। যত শীঘ্র সম্ভব চাই।'

'আপনার এখানে লোহার মিস্ত্রী কত আছে?'

'প্রচুর আছে। কিন্তু আমার সেতু হবে সোনার।'

'সোনার সেতুই দেব আপনাকে, কিন্তু তার আগে লোহার সেতু তৈরি করব একটা। মিস্ত্রী যদি বেশী থাকে এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে।'

'সোনার সেতুই হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

'কিন্তু আপনি যদি প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালন না করেন তখন আমি কি করব?'

'আমাকে নজরবন্দী করে রাখুন। এক মাস পরে যদি আপনার নির্দেশমতো সোনার সেতু তৈরি করে দিতে না পারি, আমার প্রাণদণ্ড দেবেন।'

অলঙ্কারপুরীতে প্রাণদণ্ড হয় না।' লোকটি তখন নিজের পকেট থেকে একটি ছোট, কাপড়ের পুতুল বার করে বলল—'এই পুতুলটি আপনার কাছে রেখে দিন, সোনার সেতু যদি তৈরি না করে দিতে পারি এটি পুড়িয়ে ফেলবেন, তাহলেই মৃত্যু হবে আমার। আমার কথার জামিনস্বরূপ এই আংটিটিও আপনাকে দিচ্ছি। এতে যে মণিটি রয়েছে সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈদূর্যমণি।'

রূপশ্রী অবাক হয়ে দেখল লোকটির মুখের দিকে। দেখলে, তার চোখ দুটিও যেন মণির মতো। সর্বাঙ্গ দিয়ে আলোর আভা বেরুচ্ছে।

রূপশ্রী হঠাৎ বিশ্বাস হয়ে গেল লোকটাকে। বলল—'বেশ, বিশ্বাস করলাম আপনার কথায়। আপনার পুতুল আর আংটি আমি চাই না। আপনার কথাই আমি বিশ্বাস করলাম। আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?'

'আগে সেতু তৈরি হোক। তখন চেয়ে নেব।'

রূপশ্রী মৃদু হেসে তখন বলল—'ও, আচ্ছা। এখন আপনাকে কি করতে হবে তাহলে বলুন।' লোহার মিস্ত্রীদের দিয়ে আপনার মনের মতো লোহার সেতু আগে করিয়ে ফেলুন, ছুতোররাও তোরণগুলো বানিয়ে ফেলুক।'

রূপশ্রী বলল—'আমার কাছে দশটা এক রকম সোনার কলসী আছে। তোমরা এসে তার মাপ নিয়ে যাও। সেই মাপে তোরণের উপরে খাঁজ কোরো।'

সেই আগন্তুক লোকটির দিকে চেয়ে রূপশ্রী বলল—'আপনি এখানে কোথায় আছেন?

'আপনাদের অতিথিশালায়। রাজার হালে আছি।'

'কোন্ দেশের লোক আপনি?'

লোকটি হেসে বলল—'আমার দেশ-টেশ নেই। যখন যেখানে থাকি সেখানেই আমার দেশ।'

আর একটু হেসে সে চলে গেল অতিথিশালার দিকে।

সেদিন রত্না, তীরা আর নীরা কবিতা-কবিতা খেলছিল। প্রথম লাইন বলছিল রত্না, দ্বিতীয় লাইন তীরা, তৃতীয় লাইন নীরা, তারপর আবার রত্না।

রত্না। হাওয়া বয় ফুর ফুর

তীরা। চল খাই চানাচুর
নীরা। খাব এখন? দূরদূর
রত্না। গানে আয় তুলি সুর
তীরা। কিম্বা যাই মধুপুর
নীরা হাতে পরি রতনচূড়
কানে পরি নতুন দুল
রত্না। খোঁপায় গুঁজি বেল ফুল
তীরা। ফুরফুরে এই বায়ে
নীরা। আতর মাখি গায়ে
রত্না। ওড়না দিয়ে গায়ে
তীরা। বৈঠা বেয়ে ঠায়ে
নীরা। চড়ি গিয়ে নায়ে
রত্না। যাই রূপোলি গাঁয়ে
তীরা। সেথা সোনা হীরা নেই
আছে শুধু মুক্তো
নীরা। চমৎকার রাঁধতে পারে সুক্তো।
রত্না। তার ভাই আলতা
নীরা। ভালবাসে পান্তা
তীরা। পান্তায় দই চাই
রত্না। ডিম-ভরা কই চাই
নীরা। সোনা রং ঝাল তার
তীরা। ভারি প্রিয় আলতার
রত্না। চলুক পানসি ফের
নীরা। যাক দেশে বেহাগের
তীরা। বেহাগ রাতের সুর
রত্না। এখন অনেক দূর
নীরা। এখন যে চারদিকে
কাঠ-ফাটা রোদ্দুর
তীরা। নদী বয় তর তর
রত্না। তাহলে সারং ধর
নীরা। আকাশেতে ওই শোন
তীরা। সারঙের ঝন ঝন
রত্না। কেঁপে ওঠে প্রাণমন
নীরা। থর থর থর থর
তীরা। আকাশ স্বয়ম্বর
হচ্ছে কি আজ লো
রত্না। তাই কি লো বাজলো
ঝন ঝন ঝংকার
নীরা। আশার আশংকার

তাদের কবিতা-খেলা চলছিল, এমন সময় ভীষণ একটা শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল তারা। কপাট খুলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখে—একি কান্ড! সারি সারি হাতির দল হাঁটু গেড়ে শুঁড় তুলে বসে আছে আর তাদের সিংদরজার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার দল, পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে। আর সবাই চীৎকার করছে।

একটি বড় হাতির পিঠে বসে আছে ভল্লু। সে হাত জোড় করে বললে—"রাজকন্যা' এরা আপনার কাছে একটি আবেদন জানাচ্ছে। এরা সবাই আপনাকে ভালবাসে। এরা বলছে এদের আপনি এত সুখে রেখেছেন, রোজ এত ভালো ভালো খাবার খেতে দেন, এত আদর করেন—অথচ এদের কোনও কাজে লাগান না। এরা আপনার জন্যে কিছু কাজ করতে চায়। কোনও কঠিন কাজ—যা আর কেউ সহজে পারবে না—সেই রকম একটা কঠিন কাজ দিলে এরা ভারি খুশী হবে। এরা যে জংগলে আছে সেই জংগলে বড় বড় গাছ আছে অনেক। আমি সেই গাছগুলো কেটে এদের দিয়ে স্তূপীকৃত করছি এক জায়গায়। এসব করছি এদের কাজ দেওয়ার জন্য। আপনি এদের একটা কাজ দিন।"

রত্না হেসে বললে—"ওদের আমি ভালবাসি। ওরাও আমাকে ভালবাসে। এই তো যথেষ্ট। কোনও কঠিন কাজ করে সে-ভালবাসার প্রতিদান দেবার কোনও দরকার নেই। কোনও কঠিন কাজও তো নেই। এখন ওরা যেমন আছে থাকুক। তুমি বরং যে গাছগুলো কেটেছ সেগুলো জুড়ে জুড়ে বড় বড় মেজের মতো তৈরি করে ফেল। বন্দনা নদীতে সেগুলো ভাসিয়ে নাচগান করতে পারব।"

"যে আজ্ঞে-"

হাতী ও ঘোড়ার দলকে নিয়ে ভল্লু চলে গেল। তাদের কলরব থামতেই আর এক রকম কলরব ভেসে এল। চং চং ঘড়াং ঘড়াং। লোহার মিস্ত্রীরা পুল তৈরি করতে শুরু করেছে। হাজার হাজার মিস্ত্রী কাজে লেগে গেছে। হই হই পড়ে গেছে চারদিকে।

১২

গহসিংহ বন থেকে শুম্ভসুর আর অলংকারপুরীতে গেল না। তার আত্মসম্মানে কেমন যেন বাধতে লাগল। হাজার হোক, সে-ও একজন রাজপুত। গন্ধর্ব পদ্মচরণের বংশধর। তার কি ওরকম হ্যাংলার মতো সেখানে আবার যাওয়া উচিত? মন কিন্তু যেতে চাইছিল। রত্নাকে সত্যি খুব ভালো লেগেছিল তার। তবু সে নিজের রাজত্বেই ফিরে গেল। সেখানে সপ্তশিবের বিরাট মন্দির ছিল। সেখানেই গিয়ে ধর্না দিল। ভাবল শিব যা আদেশ করবেন তাই করবে সে। শিবমন্দিরের চত্বরে শুম্ভসুর অনাহারে পড়ে রইল চোখ বুজে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। অনড় অচল হয়ে পড়ে রইল শুম্ভসুর। তার পণ মহাদেবের আদেশ না পেলে সে কিছুতেই উঠবে না। একদিন ঝড়-বৃষ্টি হ'ল খুব। জলের ঝাপটায় মন্দিরের চত্বর জলে জলময়। আপাদমস্তক ভিজে গেল শুম্ভসুর। কিন্তু অনড় হয়ে রইল সে। মনের পটে সারি সারি সপ্তশিবের মূর্ত্তি, কেউ নীলকন্ঠ, কেউ ধূর্জ্জটি, কেউ পিনাকপানি, কেউ গংগাধর, কেউ উমাপতি, কেউ ভূজংগভূষণ, কেউ নন্দীবাহন। এদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে মনে মনে। একদিন খুব বরফ পড়ল। সে বরফে প্রায় চাপা পড়ে গেল। তবু তার একাগ্র ধ্যান ভংগ হ'ল না। তারপর রোদ উঠল। কট্‌কটে রোদ। বরফ গলে গেল, গায়ের জল শুকিয়ে গেল, শেষে রোদের তাপে ঝলসে গেল তার গা। শুম্ভসুর তবু অনড়। মহাদেরব আদেশ না নিয়ে সে কিছুতে উঠবে না। শেষে ভয়ানক কান্ড হ'ল একটা। প্রকান্ড

একটা গোখরো সাপ তার গায়ে মুখে মাথায় পেটে বুকে চলে বেড়াতে লাগল। শুদ্ধসুর মড়ার মতো পড়ে আছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খুশী হলেন মহাদেব। তিনিই পরীক্ষা করে দেখছিলেন তার একাগ্রতা কত দূর।

অবশেষে আবির্ভূত হলেন তিনি তার সম্মুখে। সে দেখল রজতকান্তি একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নীরবে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। অবশেষে তিনি কথা বললেন। গন্ধর্ব শুদ্ধসুর, তোমার একাগ্রতায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি অলঙ্কারপুরীতে যাও। কিন্তু সেখানে যতি তারা সাগ্রহে তোমাকে আহ্বান না করে সেখানে থেকো না। মনে রেখো তুমি রাজপুত। তোমার বোন রূপশ্রীকে আনবার চেষ্টা কোরো না। সে সরস্বতীর বরপুত্রী, তোমার মা বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করেছিলেন বলেই তাকে পেয়েছিলেন। সে যাঁর কাছে মানুষ হচ্ছে সেই ভানুনাথও একজন পুণ্যবান জ্ঞানী লোক। তাকে ছেড়ে রূপশ্রী কিছুতেই আসবে না। তাকে আনবার চেষ্টা কোরো না। রাজকন্যা রত্নাও গুণবতী, সে যদি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয় তুমি তাকে বিয়ে করতে পার। কিন্তু মনে রেখো সে মানবী, তুমি গন্ধর্ব। মহর্ষি ময়ালভুক যদি এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন তবেই এ বিবাহ সিদ্ধ হবে তাঁর অলৌকিক তপোবলে, তা না হলে হবে না-"

শুদ্ধসুর বলল-"মহর্ষি ময়ালভুক কি অত দূরে গিয়ে পৌরহিত্য করতে রাজী হবেন?"

"হবেন-যদি অলঙ্কারপুরীর মহারাজ স্বয়ং গিয়ে অনুরোধ করেন। মহারাজ যদি সেখানে গিয়ে তাঁকে বলেন, তিনি নিশ্চয় যাবেন। আমি তাঁকে যেতে অনুরোধ করব। তাঁর সংগে আমার রোজ যোগাযোগ হয়।"

এই বলে, মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। তপস্যা করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুদ্ধসুর। এতদিন অনাহার, তার উপর শরীরের উপর কম ধকল যায়নি। সে ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে বলল-"আমার জন্যে ভাবছিলেন নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতদিন কোথায় ছিলেন?"

"সপ্তশিবের মন্দিরে তপস্যা করছিলাম। এখন ঘুমুব। গন্ধর্ব্বী দ্রৌপদীকে বলুন আমাকে কিছু খাবার আর এক ভৃংগার সোমরস যেন অবিলম্বে দিয়ে যায়। গন্ধর্ব্বীকে বলুন আমার শয্যা প্রস্তুত করতে। এখন আমি কারো সংগে দেখা করব না। রাজ্যের খবর ভালো তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ভালো। তবে আমাদের খবর সরবরাহকারিণী পতঙ্গিনীকে কয়েক দিন থেকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোথাও উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন হয়তো খবর সংগ্রহ করবার জন্য। ও অমর-ওর জন্যে চিন্তিত হবেন না।"

গন্ধর্ব্বী পতঙ্গিনী পবনদেবের কনিষ্ঠা কন্যা। ইন্দ্রানী শচীবেদীর কথা শোনেনি বলে তিনি রেগে তাকে গন্ধর্ব্বী করে দিয়েছেন। বহুবর্ণা এক পতঙ্গিনীর বেশে সে হাজির হয়েছিল শুদ্ধসুরের কাছে।

"আপনি আমাকে কোনও কাজ দিন। ইন্দ্রানী রেগে আমাকে গন্ধর্ব্বী তো করে দিয়েছেনই পতঙ্গিনীও করে দিয়েছেন। আমি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। যখন খুশী যেখানে পারি। উড়তে উড়তে আপনার কাছেই এলুম, আপনি তো গন্ধর্ব্বরাজ।" শুদ্ধসুর সংগে সংগে বলেছিলেন-"বেশ, যতদিন ইচ্ছে থাকো।"

"আমাকে কি করতে হবে বলুন-"

"কিছু করতে হবে না। আমার বাগানে উড়ে উড়ে বেড়াও।"

"আমি যে এক জায়গায় থাকতে পারি না। দেশ-বিদেশে উড়ে বেড়াব।"

"বেশ, তাই বেড়িও।"

পতঙ্গিনী শুম্ভসুরকে দেশ-বিদেশের খবর এনে দিত। সেই তাকে গজসিংহ জঙ্গল আর মহর্ষি ময়ালভুকের খবর এনে দিয়েছিল।

শুম্ভসুর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। ঘুম ভেঙে দেখল পতঙ্গিনী ঘরের চারদিকে গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

"কি পতঙ্গিনী, তুমি আমার শোবার ঘরে কেন?"

"আপনি সাত দিন সাত রাত ঘুমিয়েছেন। আজ অষ্টম দিন। মন্ত্রী মশাই বললেন, ওঁকে উঠিয়ে দাও, উনি সাত দিন সাত রাত কিছু খাননি। ওঁকে উঠিয়ে দাও। তিনি দ্রৌপদীকে বলেছেন আপনার জন্য খাবার আনতে। যদি আরও ঘুমতে চান খেয়ে নিয়ে ঘুমুন।"

"না, আর ঘুমুব না। খিদে পেয়েছে খুব। তুমি কোথা গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম অলঙ্কারপুরীতে। সেখানে শুনলাম রাজকন্যা রত্নার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। পাঁচজন রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করেছেন মহারাজ। তাঁদের মধ্যে রত্না যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যাবে তার।"

"সত্যি না কি?"

"পতঙ্গিনী কখনও মিথ্যে খবর আনে না।"

"তুমি তাহলে আবার সেখানে যাও। রাজপুত্রেরা কবে আসবেন সে-খবরটা যোগাড় করে নিয়ে এস।"

"বেশ।"

পতঙ্গিনী উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল।

১৩

সেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হব-হব। একক্রোশ-ব্যাপী লোহার বিরাট সেতু তৈরি করেছে লোহার কারিগররা। রূপশ্রীর নির্দেশমতো লোহার লতা-পাতা ফুল তৈরি হয়েছে সেটিতে। রূপশ্রী কিন্তু ভাবনায় পড়েছে একটু। যে লোকটি সোনার সেতু করে দেবে বলেছিল সে লোকটি প্রথম দিন থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। লোকটি কি তাহলে জুয়াচোর? ধাপ্পাবাজ? কিন্তু মার মুখ দেখে তো তা মনে হয়নি। রূপশ্রী তার চেহারা দেখে বিশ্বাসই করেছিল তাকে। সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন? অতিথিশালায় খোঁজ করে জানা গেল তার প্রতি কোনও রকম অসৌজন্য করা হয়নি। হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথা গেল, কেন গেল? রূপশ্রীর সত্যিই বড় ভাবনা হতে লাগল। শেষে কি লোহার সেতুর উপর দিয়েই নিয়ে যেতে হবে রাজপুত্রদের? লোহার সেতুকে অবশ্য ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে দেবে সে। রেলিঙের দু'ধারে মোহরের হার গেঁথে ঝুলিয়ে দেবে, নানা রঙের রেশমের পতাকা উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে যা চেয়েছিল তা তো হ'ল না। লোহার সেতু আর সোনার সেতু তো এক নয়। ছি, ছি, লোকটা এমনভাবে ঠকিয়ে গেল তাকে? ঠকিয়ে তার লাভটা কি? এই সব ভাবছে, এমন সময় লোহার কারিগরদের প্রধান অয়স্কান্তি এসে প্রণাম করে বলল—'মা, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। মঞ্চে বসবার জন্য আমরা একশটি লোহার সিংহাসনও তৈরি করে দিয়েছি। আপনি কি এখন দেখবেন?'

রূপশ্রী বলল–'এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কাল সকালে যাব।'

অয়স্কান্তি প্রণাম করে চলে গেল।

তার পরদিন সকালে উঠে কপাট খুলেই বিস্মিত হয়ে গেল রূপশ্রী। সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই নমস্কার করে বলল–"আপনার সেতুটি চমৎকার হয়েছে। আপনাব শিল্প-প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়েছি আমি। সমস্ত রাত আমি আপনার মনোরম সেতুর উপর বেড়িয়েছি। মঞ্চের উপর যে আসনগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলিও অতি সুন্দর।"

রূপশ্রী বলল–"আপনি বলেছিলেন সোনার সেতু তৈরি করে দেবেন–"

"সোনাবই তো হয়েছে। দেখবেন চলুন।"

"সোনার হয়ে গেছে? কি রকম?"

"আসুনই না আমার সঙ্গে।"

যোজন দীঘিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল রূপশ্রী। সমস্ত সেতুটা ঝলমল করছে–সোনার হয়ে গেছে সবটা। এমন কি, মঞ্চের সিংহাসনগুলো পর্যন্ত।

"কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল?"

লোকটি হেসে বললে, "কাল সারাত আমি এই সেতুর উপর ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার স্পর্শে সব সোনা হয়ে গেছে।"

"কে আপনি? কোথা থাকেন?"

"আমি স্পর্শমণি। থাকি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। তিনিই আমাকে একদিন ঝাঁপি থেকে বার করে বললেন, তুমি মানুষের রূপ ধরে অলংকারপুরীতে যাও। রূপশ্রীর লোহার সেতুকে সোনার সেতু করে দিয়ে এস। আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমি চললাম।

সহসা দেখল সে একটা জ্যোতির্ময় আলোর রেখা আকাশের দিকে চলে গেল।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রূপশ্রী।

১৪

মহারাজ সমূহগুণের স্বাক্ষরিত পাঁচটি আমন্ত্রণলিপি নিয়ে ভানুনাথ স্বয়ং গেলেন পাঁচটি প্রতিবেশী রাজ্যে অলংকারপুরীতে অলংকৃত রাজরথে চড়ে। আমন্ত্রণলিপিগুলি রূপোর পাতে সবুজ রঙ দিয়ে লিখেছিল রূপশ্রী। সেগুলি ছোট ছোট স্বর্ণ পেটিকায় পুরে গোলাপী আতর মাখিয়ে সুগন্ধিও করে দিয়েছিল সে। চিঠিতে লেখা ছিল–যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন, আগামী পূর্ণিমায় আমাদের যোজন দীঘির মঞ্চে আমাদের পদ্মবনোৎসব পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হবে। আপনি তাতে এসে যোগদান করলে আমি কৃতার্থ হব।

অলংকারপুরীতে প্রবেশ করবার বিরাট তোরণ ছিল একটি। পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে মহারাজ সমূহগুণ সেই তোরণের পাশে একটি তাঁবু খাটিয়ে সেখানেই বসে রইলেন। রাজপুত্রেরা এলে স্বয়ং তিনি তাদের অভ্যর্থনা করবেন। তোরণের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইল অলংকারপুরীতে রূপসী কন্যারা। কারো হাতে শাঁখ, কারো হাতে খইয়ের ডালা, কারো হাতে ফুলের মালা। ভোর থেকেই নহবৎ বসেছে তোরণের উপর। নর্তকীরা ফুলের সাজে সেজে প্রত্যেকেই লীলায়িত ভংগীতে নৃত্য করছে পথের দু'ধারে। প্রত্যেকের মাথার খোঁপায় বা বেণীর ডগায় পদ্মফুল। পিচকিরি করে আতর ছিটানো হচ্ছে চারিদিকে। বৈতালিকেরা সবুজ পোশাক পরে গলায় পদ্মফুলের মালা দুলিয়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে

পথে পথে। রূপশ্রী রত্নাকে এমন ভাবে সাজিয়েছে যে মনে হচ্ছে সে যেন নিজেই একটি পদ্মফুল। তীরা নীরা হীরা পান্নাও সেজেছে খুব। রত্নার হাতী-ঘোড়াদেরও নূতন পোশাক পরানো হয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে পদ্মফুলের গোছা। তারাও অলংকারপুরী-প্রবেশের পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। রাস্তার ধারে ধারে সবুজ রঙের সারি সারি টবও রয়েছে। প্রত্যেক টবে মাটির তৈরী পাতাসুদ্ধ পদ্মফুল, এমন চমৎকার যে মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। সমস্ত অলংকারপুরীই আনন্দে যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। সকলের চোখে-মুখে আনন্দ যেন ঝলমল করছে। যোজন দীঘি পদ্মে পদ্মে ছেয়ে গেছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট রঙীন পানসি। প্রত্যেক পানসিতে রয়েছে গায়িকা। তারা পদ্মফুলকে সম্বোধন করে গান গাইছে:

ওরে রোদ-সোহাগী ফুল
তুই গন্ধে যে ভুর ভুর
মধুতে টুল টুল।
তোর মিষ্টি হাসি
রং-বাহারী বাঁশীর যেন সুর
তুই গন্ধেতে ভুর ভুর
তুই কাছে থেকেও দূর
তুই মধুতে টুল টুল।
ওরে রোদ-সোহাগী ফুল।।

সবার মুখের এই একই গান। যোজন দীঘি জুড়ে একটা গানের গুঞ্জন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে রাজপুত্রেরা আসতে আরম্ভ করলেন। চারিদিকে শাঁখ বেজে উঠল। তোপখানা থেকে তোপ পড়তে লাগল। ক্ষেমরাজ এলেন শ্বেত হস্তীর পিঠে চড়ে, এসে বসলেন চমৎকার একটি পালকিতে, বজ্রসিংহ এলেন বিরাট অশ্ব-পৃষ্ঠে, ছন্দ-কৌশিক এলেন মনোরম একটি স্বর্ণরথে, ভদ্রশীল এলেন চন্দনকাঠের মণিমাণিক্য খচিত চতুর্দ্দোলায়।

সমুহগুণ প্রত্যেককে আহ্বান জানালেন সমাদরে। ভানুনাথ তোরণের ভিতর পাঁচটি মখমলমন্ডিত রথ রেখেছিলেন। তিনি তাঁদের আহ্বান করে রথ থেকে নামালেন, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন সমুহগুণ। মেয়েরা খই আর ফুল বর্ষণ করতে লাগল তাঁদের মাথায়। রত্নার সহচরীরা গিয়ে তাঁদের কপালে চন্দনের টিপ আর গলায় মালা পরিয়ে দিল। রাজকুমাররা এসে ভানুনাথের রথগুলিতে চড়লেন। রথগুলি চলল যোজন দীঘির সোনার সেতুর দিকে। চারিদিকে নানা রকম বাজনা বেজে উঠল।

সোনার সেতু অপরূপ সাজে সেজেছে। তার দু'পাশে যে সোনার রেলিং—সেগুলিতে পদ্মফুল তো আছেই, আরও আছে মণি মুক্তা মাণিক্য পান্নার মালা, মাঝে মাঝে চুনীর ঝালর। দশটি চন্দনকাঠের তোরণও চমৎকার সেজেছে। প্রত্যেক তোরণের গায়ে রূপশ্রী আঁকা ছবি ঝুলছে। পদ্মফুল তো আছেই।

রাজপুত্রেরা রথে করে এই অপরূপ সেতু পার হয়ে স্ফটিক মঞ্চে উঠলেন। স্ফটিক মঞ্চে একশত স্বর্ণ-সিংহাসন ছিল। পঁচানব্বইটি সিংহাসনে অলংকারপুরীর গণ্যমান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসেছিলেন। মাঝখানে পাঁচটি সিংহাসন আলাদা করা ছিল রাজপুত্রদের জন্য। প্রত্যেকটি সিংহাসন পদ্মফুলে সুশোভিত। রাজপুত্ররা আসতেই

সকলে উঠে দাঁড়ালেন। স্বাগতম্ বলে সম্বর্দ্ধনা করলেন তাঁদের। শংখধ্বনি হতে লাগল আবার। রাজপত্রেরা আসন গ্রহণ করলেন। তারপর পণ্ডিত ভট্টজী উঠে বললেন—"যাঁর নাম শতদল, যার নাম কমল, যার নাম অরবিন্দ, যার নাম সরোরুহ, যার সাধারণ নাম পদ্ম, যে পদ্মের উপর লক্ষ্মী-স্বরস্বতী উভয়েই অধিষ্ঠিতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নাভিমূলের শোভা যে পদ্ম, সেই পদ্মকে কেন্দ্র করে আমাদের এই উৎসব। রাজকন্যা রত্নাবলী এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র, মন্ত্রীকন্যা রূপশ্রী ও উৎসবের শিল্পনেত্রী। মহারাজ এবার তাদের সংগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।"

মহারাজ সমূহগুণ রত্না আর রূপশ্রীকে নিয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন—"এইটি আমার কন্যা রত্না, আর এইটি ভানুনাথের কন্যা রূপশ্রী।"

রত্না ও রূপশ্রী দু'জনেই একে একে গিয়ে প্রণাম করলেন রাজপুত্রদের, তারপর তাঁদের হাতে দিলেন কমলফুলের গুচ্ছ।

তারপরই নৃত্য-গীত খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হ'ল। রত্না ও রূপশ্রী তাদের সহচরীদের কাছে গিয়ে বসল।

হঠাৎ রত্না দেখতে পেল স্ফটিক মঞ্চের উপর একটি চমৎকার পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। তার বুকটা শাদা কিন্তু স্বর্ণাভ, তার ডানা দুটি সবুজ, ঠোঁট দুটি টক্‌টকে লাল, মাথাটি ধপ-ধপে শাদা, চোখ দুটি নীল। এরকম পাখী রত্না কোথাও কখনও দেখেনি। রত্না যেখানে বসেছিল তার সামনে ছিল স্ফটিকের একটি থাম। তার উপর এসে বসল পাখীটা। রত্না একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাখীটির দিকে।

১৫

সভা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

রাজপুত্রেরা চলে গেছেন সবাই।

পাখীটি কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তখনও।

রত্নার ঘরে বসে আছে তীরা আর নীরা।

তীরা জিজ্ঞেস করলে—"কোন রাজপুত্রকে পছন্দ হ'ল তোর?"

"কাউকে না।"

"কাউকে না?"

"কাউকে না? বলিস কি!"

"না। ক্ষেমরাজ নেউলমুখো, বর্জসিংহ যেন একটা দারোয়ান, ভদ্রশীল লিকলিকে রোগা, ছন্দ-কৌশিকের ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফ-দাড়ি সিংহের মতো, আর তারাবর্ম্মণের খোঁচাখোঁচা কাটা গোঁফ; মুখটি বেরালের মুখের মতো।"

"একজনকেও পছন্দ হ'ল না?"

"এতো খুঁতখুঁতে তুই! আমার তো ছন্দ-কৌশিককে বেশ ভালো লাগল। পুরুষ মানুষের গোঁফ-দাড়ি তো থাকবেই।"

রত্না বলল—"একজনকে কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছে—ওই চমৎকার পাখীটিকে।"

"সে তো এখনও উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তোর ঘরের চারিদিকে।"

"তাই না কি?"

রত্না বারান্দায় বেরিয়ে দেখল তার বাগানের একটি গাছের উপর বসে আছে পাখীটি।

একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার ঘরের দিকে।

তীরা বলল—"খুব শান্ত পাখী মনে হচ্ছে।"

নীরা লাফিয়ে উঠল—"চল ভরদ্বাজকে বলি গিয়ে—ও এখ্খুনি জাল ফেলে ধরে ফেলবে।"

রত্না বলল—"আমি খাঁচাতে পাখী পুষব না।"

"পরে না হয় ছেড়ে দিস। দেখি ধরতে পারা যায় কি না।"

তীরা নীরা দু'জনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে যাওয়ার পরই আশ্চর্য কান্ডটি ঘটল। পাখীটি সোজা উড়ে এসে রত্নার ঘরে ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব্ব শুদ্ধসুর রূপান্তরিত হয়ে নমস্কার করল রত্নাকে।

"আমি রূপশ্রীর দাদা। আমি যখন তাকে নিতে এসেছিলাম তখন আপনি আমাকে দেখেছেন। রূপশ্রী আমার সঙ্গে গেল না, কিন্তু আমি সেই থেকে অহরহ আপনার কথাই ভাবছি। খবর পেলাম আজ আপনার বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, পাঁচজন রাজপুত্র এসেছিলেন। কাউকে কি আপনি পছন্দ করেছেন?"

বিস্ময়ে রত্না নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চোখের সামনে একটা পাখী মানুষ হয়ে গেল। এ কী কান্ড!

তারপর শুদ্ধসুরের কথা শুনে লজ্জা হ'ল তার। মাথা নত করে মৃদুকণ্ঠে বলল, "না, কাউকে পছন্দ করিনি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"আমি আমার রাজ্য গন্ধর্ব্বলোক থেকে উড়তে উড়তে আসছি। আমি মন্ত্রবলে নিজেকে পাখী করে ফেলতে পারি।"

ক্ষণকাল নীরব থেকে রত্না প্রশ্ন করল—"আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার বাবার কাছে এ প্রস্তাব করব। তাঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?"

"কাল সকালে তিনি যাবেন মুকুন্দদেবের বাড়িতে দিলরুবা নিয়ে। প্রত্যেক পূর্ণিমার পরদিন তিনি তাঁর কাছ থেকে একটি সুর শেখেন।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার বাবার সঙ্গে সেইখানেই দেখা করব।"

রত্না কিছু না বলে মাথা হেঁট করে পাশের ঘরে চলে গেল। লজ্জায় তার তখন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল।

১৬

পরদিন খুব ভোরে যখন শুদ্ধসুর কবি মুকুন্দদেবের বাড়ি গেল তখন বাইরে থেকেই শুনতে পেল ভিতরে ভৈরবী আলাপ হচ্ছে। সে আর ভিতরে ঢুকল না। বাইরে বারান্দায় বসে সেও গুন গুন করে ওই ভৈরবীই আলাপ করতে লাগল। সমূহগুণ অনেকক্ষণ আলাপ করে অবশেষে থামলেন। থেমেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন বাইরে থেকে অপূর্ব্ব কণ্ঠে কে ভৈরবী আলাপ করছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন একটি দিব্যকান্তি যুবক চোখ বুজে তন্ময় হয়ে ভৈরবী আলাপ করে যাচ্ছে। মুকুন্দদেবও উঠে এলেন। দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ রকম অসামান্য অপূর্ব্ব কণ্ঠ তাঁরা আর শোনেননি। এ যেন মানুষের কণ্ঠ নয়—এ যেন বীণা বাজছে। যতক্ষণ শুদ্ধসুর গান গাইল ততক্ষণ মুগ্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা।

গান শেষ করে চোখ খুলেই শুদ্ধসুর দেখতে পেল তাঁদের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলঃ "আমি মহারাজ সমূহগুণের সংগে দেখা করতে এসেছি।"

"ইনিই মহারাজ–" বললেন মুকুন্দদেব।

মহারাজকে প্রণাম করে শুদ্ধসুর বলল, "আমি আপনার সংগে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।"

"আপনার পরিচয় দিন।"

"আমি গন্ধর্ব্বরাজ শুদ্ধসুর।"

"গন্ধর্ব্বরাজ!"

দু'জনেই বিস্মিত হলেন।

"আসুন তাহলে পাশের ঘরে যাই।"

শুদ্ধসুরকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন মহারাজ। উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুকুন্দদেব। একটু পরে কথা কইতে কইতে বেরিয়ে এলেন সমূহগুণ ও শুদ্ধসুর।

সমূহগুণ–আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চান? কিন্তু তার অমতে কোথাও তো বিয়ে হবে না। সে কালই পাঁচজন রাজপুত্রকে অপছন্দ করেছে।

শুদ্ধসুর–আমার সংগেও তাঁর দেখা হয়েছে। তাঁর অনুমতি নিয়েই আপনার সংগে দেখা করতে এসেছি।

সমূহগুণ–ও! আর একটা কথাও মনে হচ্ছে আমার। গন্ধর্ব্বের সংগে মানুষের বিয়ে হবে কি করে?

এই সময় বাধা দিলেন কবি মুকুন্দদেব।

মুকুন্দদেব–মহারাজ, রত্নার সংগে গন্ধর্ব্বেরই বিয়ে হবে। আমি ওর হাত দেখেছি। আর সেই জন্যেই বিশেষ করে ওকে নাচ-গান শেখাচ্ছি।

সমূহগুণ–তাই না কি? আচ্ছা ভেবে দেখি তাহলে।

শুদ্ধসুর–আমি তাহলে একমাস পরে দেখা করব আপনার সংগে।

সমূহগুণ–বেশ।

শুদ্ধসুর প্রণাম করে চলে গেল। রত্নার সংগে একা দেখা করার আর সুযোগ হ'ল না তার। সেই দিনই পাখী হয়ে উড়ে গেল নিজের দেশে। অলংকারপুরী ছেড়ে তার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। অন্ততঃ আর একবার রত্নাকে দেখবার লোভ হচ্ছিল খুব। কিন্তু তার মনে হ'ল সেটা মোটেই শোভন হবে না। সে গন্ধর্ব্বরাজ। অশোভন অশালীন কিছু করবে না সে। মহারাজ বিবাহে মত দেবেন কি না এটা জানতেও সে আর নিজে আসবে না। পাঠাবে মন্ত্রী নিখাদকে।

রত্না কিন্তু আশা করেছিল শুদ্ধসুর আর একবার আসবেন তার কাছে। তীরা নীরা ফিরে এসে বলল–"পাখীটা বাগানে নেই। কোথাও খুঁজে পেলাম না।"

রত্না বলল–"ও আকাশের পাখী, আকাশে উড়ে গেল।"

পরদিন মহারাজ সমূহগুণ রত্নাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন–"গন্ধর্ব্ব দেশের রাজার সংগে তোর দেখা হয়েছিল না কি?"

"হয়েছিল। যেদিন রাজপুত্রেরা এসেছিলেন সেদিন তিনিও এসেছিলেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি বলে সভায় যাননি।"

মহারাজ বললেন—"তিনি আমার কাছেও এসেছিলেন। তোকে বিয়ে করতে চান। তোর পছন্দ হয়েছে তাঁকে?"

রত্না মাথা হেঁট করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। সমূহগুণ বুঝলেন, তার পছন্দ হয়েছে।

মহারাজ মহারানী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"একজন পরম রূপবান গন্ধর্ব্বরাজ রত্নাকে বিয়ে করতে চাইছেন। তিনি শুধু রূপবান নন, গুণবানও। খুব উচুঁদরের গায়ক তিনি। এ বিয়েতে তোমার মত আছে?"

কমলাঙ্গিনীর সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখ দুটি যেন হাসতে লাগল।

মহারাজ বুঝলেন, মত আছে।

তারপর তিনি গেলেন কুলগুরু আম্বুজানন্দ বাচস্পতির কাছে। তিনি বললেন—"কোনও মহাযোগী যদি এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন তাহলেই এ বিবাহ সিদ্ধ হবে। গন্ধর্ব্বের সঙ্গে মানুষের বিবাহ দিতে পারেন এরকম মহাযোগী তো অলংকারপুরীতে নেই। প্রকৃত মহাযোগীরা মহাশক্তিমান। তাঁরা সব করতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাঁরা সুলভ নন। প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকেন। আপনি একজন মহাযোগীর সন্ধান করুন। মুকুন্দদেব বড় জ্যোতিষী। তিনি হয়তো গণনা করে কোনও সন্ধান পেতে পারেন।"

মুকুন্দদেব সত্যিই বড় জ্যোতিষী।

বিশেষ করে প্রশ্ন-গণনায় তিনি খুবই নিপুণ। প্রশ্ন গণনা করে কিন্তু তিনি যে উত্তর পেলেন তাতে হতাশ হলেন একটু। উত্তর পেলেন—আজকাল সত্যই কে মহাযোগী, কোথায় তিনি থাকেন, এর উত্তর স্বয়ং ভৈরব ছাড়া আর কেউ জানেন না। দুর্ভাবনায় পড়লেন মুকুন্দদেব। ভৈরবের দেখা পাওয়া যায় কি করে? অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলেন ভৈরব–রাগ আলাপ করে তিনি ভৈরবকে আহ্বান করবেন। গানের সুরে ভৈরব কি সাড়া দেবেন? তবুও একবার চেষ্টা করে দেখবেন তিনি। রত্নাকে সত্যি তিনি খুব ভালবাসতেন। সেদিন গন্ধর্ব্বরাজ এসেছিলেন। তিনিও গুণবাণ এবং রূপবান। এদের বিবাহ দিতেই হবে। রোজ গভীর রাত্রে উঠে তানপুরা নিয়ে ভৈরবরাগ আলাপ করাও শুরু করলেন তিনি। সমূহগুণকে কিছু বললেন না। ভাবলেন একথা বললে মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়বেন। তাঁকে অনর্থক চিন্তিত করে লাভ কি?

প্রত্যহ গভীর রাত্রে উঠে ভৈরব-রাগ আলাপ করতেন নির্বিঘ্ন চিত্তে। সে আলাপ গাছের ঘুমন্ত পাখীরাও জেগে উঠত। মুক্ত বাদুড়ের দল চক্রাকারে ঘুরে বেড়াত তাঁর বাড়ির উপর। রাত্রির অন্ধকারে শিহরণ জাগত, ফুটে উঠত গাছের মুকুলগুলি, থেমে যেত বন্দনা নদীর গতিবেগ। সমস্ত প্রকৃতি মুগ্ধ হয়ে শুনত তাঁর আলাপ। ভৈরবের কিন্তু দেখা নেই। শিবই ভৈরব। তিনি কি আসবেন আমার কুটিরে? এ সন্দেহ রোজই জাগত মুকুন্দদেবের মনে। একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল সন্দেহ করছি বলেই আসছেন না তিনি। সেদিন রাত্রে তিনি যখন তানপুরা তুলে আলাপ শুরু করলেন, তাঁর মনে সন্দেহের ছায়া মাত্র নেই।

তিনি ভাবলেন, আজ তিনি আসবেন, আসবেনই, নিশ্চয় আসবেন, তাঁকে আসতেই হবে। চোখ বুজে শুরু করলেন আলাপ। আলাপ করতে করতে তন্ময় হয়ে গেলেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তাঁর। মনে হ'ল তিনি যেন সুরের নৌকোয় বিরাট একটা সমুদ্র পার হচ্ছেন। আর সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আকাশচুম্বী প্রকাণ্ড শাদা পাহাড় একটি। বরফের পাহাড়। কাছে যেতেই সেই পাহাড় কথা ক'য়ে উঠল মানুষের

ভাষায় : "মুকুন্দদেব, তুমি যে মহাযোগীর সন্ধান করছ তিনি থাকেন শিলাকন্টক নদীর তীরে গজসিংহ জঙ্গলে। তাঁর নাম মহর্ষি ময়ালভুক।"

সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র, পাহাড় সব মিলিয়ে গেল। মুকুন্দদেব চোখ খুলে দেখলেন তিনি নিজের ঘরে বসে আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবরটি মহারাজকে দিতে গেলেন। মহারাজ তখন কমলাঙ্গিনীর গলায় পদ্মের মালাটি পরিয়ে নীচে নেমে এসেছেন বৈঠকখানায়। বৈঠকখানার পাশেই রত্নার বাগান। রত্নাও সেইখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। মুকুন্দদেব যখন খবরটি দিলেন তখন রত্নার কানেও গেল সেটি।

মহারাজ বললেন–"গজসিংহ জঙ্গল কোথায়? শিলাকন্টক নামও তো শুনিনি। মহর্ষি ময়ালভুক নামটিও বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে। আমি যা শুনেছি তাই বললাম। তখন অবশ্য আমি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। এটা কিন্তু স্বপ্ন নয়– সত্য।"

"চলুন তাহলে ভানুনাথের কাছে যাওয়া যাক। তিনি হয়তো জানেন।"

তাঁরা চলে গেলেন ভানুনাথের কাছে।

সব শুনে ভানুনাথ বললেন–"রূপশ্রীকে নেবার জন্যে যে গন্ধর্বটি এসেছিল তার মুখে আমি এই নামগুলি শুনেছি। মহর্ষি ময়ালভুক যে একজন মহাশক্তিমান যোগী, একথাও সে বলেছিল। কিন্তু শিলাকন্টক নদী, গজসিংহ জঙ্গল কোন দেশে তা জানি না।"

"আমি গুপ্তচরদের ডেকে পাঠাচ্ছি, তারা হয়তো কেউ জানতে পারে।" একে একে সব গুপ্তচরকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কোনও গুপ্তচরই শিলাকন্টক নদী বা গজসিংহ জঙ্গলের নাম শোনেনি। সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন খুব।

রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভানুনাথ বার বার হাত বুলোতে লাগলেন তাঁর টাকে, মুকুন্দদেব আবার ভৈরব-রাগ আলাপ করতে লাগলেন। ভাবলেন, মহাদেব যদি আবার দেখা দেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন গজসিংহ জঙ্গল কোথায়। কিন্তু মহাদেব আর দেখা দিলেন না। বিপদের অন্ধকার নেমে এল অলঙ্কারপুরীতে। মহারাজ ভাবতে লাগলেন, একমাস পরে যখন গন্ধর্ব্ব-রাজকুমার আসবেন তখন কি উত্তর দেবেন তাকে? মহর্ষি ময়ালভুকের সন্ধান না পেলে তিনি বিবাহে মত দেবেন কেমন করে?

রত্নার কানেও কথাটা গেল। তারপর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। সাহানা রাগীণীর কথা। তারা যখন বনভোজন করতে গিয়েছিল তখন সবুজ ফানুসে চড়ে ভাসতে ভাসতে এসেছিল সাহানা রাগিণী। সে তো গজসিংহ জঙ্গলের রাস্তা জানে। সে-ই তো বলেছিল আমি যদি সাহানা রাগিণীতে তাকে ডাকি তাহলে সে আসবে আমার কাছে।

পরদিন সকালে রত্না একাই চলে গেল সেই বনের মধ্যে। বসল গিয়ে সেই নদীর ধারে। দূরের পাহাড় পলাশফুলে তেমনি লাল হয়ে আছে। একটি পাথরের উপরে বসে আকাশের দিকে চেয়ে রত্না শুরু করে দিল সাহানা রাগিণীর আলাপ। একটু পরেই দেখতে পেল সবুজ ফানুসটি ভাসতে ভাসতে আসছে। কাছে আসতেই থেমে গেল সেটি। তার থেকে বেরিয়ে এল সাহানা। "আমাকে ডাকছিলে ভাই?"

"হ্যাঁ। গজসিংহ জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা বলে দিতে পার?"

"খুব পারি। কেন, সেখানে যাবে নাকি?"

রত্না লজ্জিত মুখে চুপ করে রইল। তারপর বলল–"তুমি একটি উপকার করবে আমার? আমাদের মন্ত্রীমশাই কাছেই থাকেন। তাঁকে গিয়ে রাস্তাটা বলে দেবে?"

"আমি কি বলে নিজের পরিচয় দেব তাঁর কাছে?"

"পরিচয় দেবার দরকার কি? গিয়ে শুধু বল, শুনলাম, আপনারা গজসিংহ জঙ্গলের রাস্তাটা জানতে চান। আমি জানি। তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।"

মুচকি হেসে সাহানা বলল—"বেশ তো, চল, বলে দিচ্ছি তাঁকে।"

পরদিনই ভানুনাথ দশজন অশ্বারোহীকে পাঠালেন রাস্তাটির খবর নিতে। দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল তারা। দশদিন পরে ফিরে এসে তারা বলল—"শিলাকণ্টক নদী পর্যন্ত পথ খুব ভালো। কিন্তু তা পার হওয়া অসম্ভব। অনেক ছোট ছোট পাথরে নদীটি পরিপূর্ণ, আর প্রত্যেকটি পাথরের মুখ খুব সূঁচালো। নদীর ঠিক ওপারেই গজসিংহ জঙ্গল। এপার থেকেই দেখা যায়।"

তারা যখন এই সব বর্ণনা করছিল তার একটু আগে এসেছিল ভন্দু। সে বলল—"ওই নদীর ওপারে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি?" ভানুনাথ উত্তর দিলেন—"বিশেষ প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র সম্ভব। মহারাজ স্বয়ং গজসিংহ জঙ্গলে যাবেন।"

"ও, তাই নাকি? তা এর জন্যে এত ভাবছেন কেন? নদী যখন বেশী চওড়া নয় তখন বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঢেকে দেব সে নদীকে। বনে আমি বড় বড় গাছ কাটিয়ে সেগুলো জমা করে রেখেছি। ছুতোরদের দিয়ে কিছু তক্তাও চিরিয়ে রেখেছি। রাজকন্যা বন্দনা নদীতে একটা কাঠের পাটাতনের উপর নাচ-গানের ব্যবস্থা করে দিলে, আমি হাতীর পিঠে করে সব নিয়ে যাব সেখানে।"

ভানুনাথ বললেন—"তুমি এখুনি রওনা হয়ে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সারি সারি হাতী বড় বড় গাছের গুঁড়ি পিঠে করে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়ার পিঠে চাপল অনেক লোক আর ছুতোর। সবার পিছনে ভন্দু একটা বড় ঘোড়ার পিঠে গান গাইতে গাইতে চলল।

প্রায় কুড়িদিন কেটে গেল ভন্দু তবু ফিরল না। গজসিংহ জঙ্গলে গিয়ে ফিরে আসতে দশদিন লাগবে। মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একমাস পরে শ্বশুর আসবে। সে এসে যদি তাকে দেখতে না পায়—তাহলে কি হবে? সে কি ফিরে যাবে? তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওই গন্ধর্ব-রাজকুমারকে রত্নার খুব ভালো লেগেছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সত্যিই ও খুব খুশী হবে। তিনি নিজেও খুব খুশী হবেন। কিন্তু এ বিয়েতে বাগড়া লাগিয়েছেন অম্বুজানন্দ বাচস্পতি। তাঁর কথা অমান্য করা শক্ত। অবশেষে তিনি একদিন আবার গেলেন। মুকুন্দদেবের কাছে; "একবার গুণে দেখুন তো, বিয়েটা হবে কি না।"

গণনা করলেন মুকুন্দদেব। বললেন, "এ বিয়ে অভাবিত উপায়ে হবে। ভন্দু আর পাঁচদিন পরে ফিরবে।"

"ভন্দু যদি পাঁচদিন পরে ফেরে আর সেই দিনই যদি আমি রওনা হই তাহলেও তো যেতে-আসতে দুশদিন লাগবে। কিন্তু শ্বশুর যে তার আগেই এসে পড়বে। আমাকে দেখতে না পেলে সে ফিরে যাবে না তো? বিয়ে যদি না হয়?"

মুকুন্দদেব বললেন—"আমি বলছি মহারাজ, এ বিবাহ একটু অভাবিত উপায়ে হবে।"

ঠিক পাঁচদিন পরেই ভন্দু ফিরে এল। এসে বলল—"কাঠ দিয়ে আমরা শিলাকণ্টক নদী ঢেকে দিয়েছি। এইবার কিন্তু সেটার উপর মখমলের একটা গদি বিছিয়ে দিতে হবে তা না হলে মহারাজ সেই এবড়ো-খেবড়ো কাঠের উপর দিয়ে যেতে পারবেন না। তিনশ' হাত লম্বা আর পঁচাত্তর হাত চাওড়া একটা গদি হলেই চলবে।"

ভানুনাথ বললেন–"আমাদের সভায় যে গদি পাতা হয় সেটা ওর চেয়েও বড়। সেইটে সঙ্গে নিয়ে গেলেই হবে।"

সমূহগুণ মহারাণী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমার সামনে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। তারপর বেরিয়ে এসে ভানুনাথকে বললেন, "আমি আজই যাত্রা করব। ব্যবস্থা করুন।"

বিরাট রাজহস্তী অদ্রিকে রাজবেশে সাজানো হ'ল। সোনার হাওদা, হাওদার উপর মখমলের স্বর্ণখচিত রাজছত্র, অদ্রিকের সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের চিত্র-লেখা। মহারাজ কিন্তু বেরিয়ে এলেন নগ্ন গাত্রে, খালি পায়ে। অবাক হলেন ভানুনাথ।

"মহারাজ, এই বেশে যাবেন।"

"হ্যাঁ। আমি যাচ্ছি একজন মহাযোগীর কাছে প্রার্থী হয়ে। রাজবেশ প'রে যাওয়াটা হাস্যকর হবে। আমি সমস্ত পথটা হেঁটেই যেতাম, কিন্তু গজসিংহ জঙ্গল যে অনেক দূর। তাই হাতীর পিঠে যাচ্ছি। হাতীকে শিলাকণ্টক নদীর এপারেই দাঁড় করাব। গজসিংহ জঙ্গলে হেঁটেই যাব আমি।"

ভম্ভু বলল–"আমি তাহলে মখমলের গদিটা নিয়ে এগিয়ে যাই। বদরি আমার পিছনে পিছনে আসুক।"

বদরি অদ্রির মাহুত। পুরোনাম বদ্রিবিশাল। বিরাটকায় লোক সে। সে কিন্তু পাগড়ি আর জমকালো জোব্বা পরেই হাতীতে উঠল।

তাদের পিছনে আরও কয়েকটি হাতী গেল। খাবার আর তাঁবু নিয়ে গেল তারা। দশদিন পথে থাকতে হবে। তাই এমন ব্যবস্থা।

গজসিংহ জঙ্গলে মহারাজ যখন প্রবেশ করলেন তখন কাউকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন, দূরে একটি পাঁচ ছ' বছরের শিশু নদীর ধারে বসে বালি দিয়ে বাড়ি তৈরি করছে। আর সে-বাড়ি ভেঙে পড়ছে বার বার। তারই কাছে গেলেন মহারাজ।

"খোকা, মহর্ষি ময়ালভুক কোথায় থাকেন বলতে পারো?"

"কেন, তাকে কি দরকার আপনার?"

"আমার মেয়ের বিয়েতে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করব।"

সঙ্গে সঙ্গে শিশু রূপান্তরিত হয়ে গেল দিব্যকান্তি মহর্ষি ময়ালভুক। মহারাজ তো অবাক।

"ও,আপনিই অলঙ্কারপুরীর মহারাজ সমূহগুণ? মহাদেব আপনার কথা বলেছিলেন আমাকে। আমি নিশ্চয় যাব। কবে বিয়ে?"

"দিন এখনও স্থির হয়নি। আপনিই দিন স্থির করে দিন একটা।"

"আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে থাকবেন। সেই দিনেই গোধূলি লগ্নে ব্যবস্থা করুন।"

২১

সেদিন সকালে রত্না, তীরা আর নীরা তাদের বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছে গাছে গোলাপজল ছিটোচ্ছিল। ভরদ্বাজ মালী গোলাপজলে-ভরা বালতি নিয়ে ঘুরছিল তাদের পিছু পিছু। এমন সময় একটি পাখীওলা এসে হাজির হ'ল। রত্নাকে বলল–"আজ খুব ভোরে একটি চমৎকার পাখী আপনার বাগানে চন্দনগাছের উপর চুপ করে বসেছিল।

আমরা সেটাকে জাল ফেলে ধরেছি। নেবেন আপনি ?"

"নিয়ে আয়, দেখি কেমন পাখী ?"

পাখীওয়ালা ছুটে চলে গেল। একটু পরে লোহার খাঁচায় করে নিয়ে এল পাখীটাকে।

তীরা বলল–"এ যে সেই পাখীটা, যাকে আমরা ধরতে পারিনি!"

নীরা বলল–'অবিকল সেই রকম।"

রত্না চিনতে পেরেছিল শুদ্ধসুরকে। পাখীওলাকে দুটি মোহর দিল সে। তারপর তীরা আর নীরাকে বলল–"তোরা রূপশ্রী দিদির কাছে যা। তিনি কিছুদিন আগে সুন্দর একটি বড় সোনার খাঁচা বানিয়েছিলেন, সেই খাঁচাটা নিয়ে আয়।"

পাখীওলা মোহর পেয়ে খুশী হয়ে চলে গেল। তীরা-নীরাও ছুটল রূপশ্রীর বাড়ির দিকে। তখন রত্না বলল–"তোমাকে চিনেছি। এখন কয়েকদিন বন্দী হয়ে থাকতে হবে। বাবা এখনও ফেরেননি।"

"কোথায় গেছেন তিনি ?"

"গজসিংহ জঙ্গলে মহর্ষি ময়ালভুককে আমাদের বিয়েতে পৌরোহিত্যে বরণ করতে। তিনি যতদিন না ফিরছেন ততদিন তোমার মুক্তি নেই। যে খাঁচায় তোমাকে রাখব সেটি আমার দিদির তৈরি ছোটখাটো একটি সোনার প্রাসাদ। তোমার কষ্ট হবে না।"

"বেশ, থাকব।"

"কি খাবে ?"

"যতক্ষণ পাখী হ'য়ে থাকি আমার ক্ষিধে পায় না।"

একটু পরেই চারজন লোক সোনার খাঁচাটি বয়ে নিয়ে এল। সত্যিই সেটি মণিমাণিক্যখচিত ছোট্ট একটি রাজপ্রাসাদ। তার চারদিকে সোনার অলিন্দ আছে, খাওয়ার ঘর আছে, দোলবার জন্য চমৎকার একটি দোলনা আছে, বসবার জন্য সুন্দর একটি দাঁড় আছে। তার ভিতর ছোট্ট একটি বাগান আছে, স্নান করবার জন্য ঝর্না আছে। সমস্তটা কিন্তু সোনার জাল দিয়ে ঢাকা। তীরা-নীরা এল নানারকম ফল নিয়ে।

২২

যথাসময়ে সমূহগুণ ফিরে এলেন গজসিংহ জঙ্গলে থেকে। এ খবর পাওয়া মাত্র রত্না লুকিয়ে ছেড়ে দিল পাখীটিকে। তীরা-নীরাকে বলল–"ওর কষ্ট হচ্ছিল, তাই ছেড়ে দিলাম।"

পাখী খাঁচা থেকে বেরিয়েই রূপান্তরিত হয়ে গেল শুদ্ধসুরে। মহারাজাকে গিয়ে প্রণাম করল। মহারাজ বললেন,–"ও–তুমি এসে গেছ ? তোমার হাতেই রত্নাকে সম্প্রদান করব আমি। মহর্ষি ময়ালভুক এ বিয়েতে পৌরোহিত্য করবেন। তিনিই বিবাহের দিন স্থির করে দিয়েছেন। আগামী পূর্ণিমায় গোধূলি লগ্নে বিয়ে হবে।"

শুদ্ধসুর আবার প্রণাম করল তাঁকে। বলল–"আমি তাহলে এখন চলি। আগামী পূর্ণিমায় দুপুর বেলা আসব। আমার সঙ্গে কিছু গন্ধর্ব্ব বরযাত্রীও আসবে।"

শুদ্ধসুর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সমূহগুণ ভানুনাথকে বললেন–"ওর সমুচিত সম্বর্ধনার ব্যবস্থা কর।"

ভানুনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে কিন্তু আর দেখতে পেলেন না কাউকে।

বিয়ের দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। নানা সাজে সাজতে লাগল

অলঙ্কারপুরী। রাস্তার দু'পাশে সারি দিয়ে সাজানো হ'তে লাগল সোনার মঙ্গলঘট। স্বর্ণসেতুর তোরণগুলো রাস্তায় রাস্তায় বসানো হ'ল। চারিদিকে টাঙানো হতে লাগল রূপশ্রীর আঁকা বড় বড় তৈলচিত্র। কোনও ছবিতে একটি ডালে দুটি পাখী পাশাপাশি বসে আছে, কোনও ছবিতে পদ্মের উপর ভ্রমর এসে বসেছে, কোনো ছবিতে চাঁদের পাশে রোহিণী, কোনও ছবি শিব-দুর্গার, কোনও ছবি লক্ষ্মী-নারায়ণের। আরও কত ছবি। কত রঙীন পরদা। চমৎকার পতাকাও উড়তে লাগল চারদিকে। মুকুন্দদেব একটা অভ্যর্থনা সঙ্গীত লিখে দিলেন। নর্ত্তকীর দল পথে পথে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল। প্রত্যেক পথের তোরণেতোরণে নহবৎ। হাতীর দল আর ঘোড়ার দলও নানা সাজে সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারিদিকে টহল দিয়ে। মহারাণী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণমূর্তি থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল অপূর্ব্ব জ্যোতি। মহারাজ রোজ রাত্রে ছাদে উঠে আলাপ করতে লাগলেন বাগেশ্রী।

বিয়ের দিন কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই। মহর্ষি ময়ালভুক দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও এলেন না। বর আর বরযাত্রীদেরও পাত্তা নেই। মহারাজ বিষণ্ণ হয়ে চটে গেলেন। কুলপুরোহিত অম্বুজানন্দ বললেন, "আমরা মানুষ। গন্ধর্ব্ব-কিন্নরদের সঙ্গে আত্মীয়তা করা কি আমাদের পোষায়? সাদামাঠা একটা রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলেই হ'ত।" মন্ত্রী ভানুনাথ মহালক্ষ্মীর ধ্যানে বসলেন। রূপশ্রী একটা ছবিই এঁকে ফেলল শুদ্ধসুরের। বললে—সে যদি না থাকে এই ছবির সঙ্গেই গোধূলি লগ্নে রত্নার বিয়ে দেব আমরা। সে পরে এসে বৌ নিয়ে যাবে। সে আসবে ঠিক।"

রূপশ্রী ছবিটি শেষ ক'রে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে, এমন সময় বাইরে কে একজন জিজ্ঞেস করলেন—"এইটাই কি অলঙ্কারপুরী? যে রকম সাজগোজ, বাজনা-টাজনার ধুম তাতে মনে হচ্ছে এখানে কোনো উৎসব হচ্ছে।"

রূপশ্রী কপাট খুলে দেখলে একটি স্বর্ণ-পেটিকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন আগন্তুক।

হ্যাঁ, এইটেই অলঙ্কারপুরী। আমাদের রাজকন্যার বিবাহ। আপনি কে?"

"আমার নাম ময়ালভুক, আমি তার বিবাহে, পৌরোহিত্য করতে এসেছি। আপনাদের কুল-পুরোহিতের বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিন।"

রূপশ্রী তাঁকে কুল-পুরোহিতের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ইতস্ততঃ করে একটু হেসে বলল, "বর কিন্তু এখনও আসেনি।"

"তারা বেরিয়েছে আসবে বলে। এখুনি এসে পড়বে।"

কুল-পুরোহিতকে তিনি বললেন—"বিবাহের সব কাজ আপনিই করবেন শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে। বিবাহ শেষ হয়ে গেলে আমি সেটা সিদ্ধ করে দেব ; যা দিয়ে সিদ্ধ করব তা এই স্বর্ণ-পেটিকায় আছে। মহাদেবের অনুরোধে স্বয়ং শচীদেবী পাঠিয়েছেন এটি।"

যদিও বর আসেনি তবুও চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল একটা।

তার একটু পরেই, গোধূলি লগ্নের কিছুক্ষণ আগে যে কান্ডটা হ'ল তা অবর্ণনীয়। সমস্ত আকাশ জুড়ে আসতে লাগল সাদা রাজহংসের দল। যেন বিরাট একটা সাদা মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আকাশ। সবচেয়ে আগে যে হাঁসটা ছিল তা শুধু ধপধপে সাদাই নয়, আকারেও বড়। যেন একটা নৌকো। তার মাথাটা যেন প্রকান্ড একটা শাঁখের, সেই শাঁখের উপর বসানো রয়েছে প্রকান্ড একটি হীরে। অন্য হাঁসগুলি এত বড় নয়, কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় একটি করে মণি। হাঁসের দল অলঙ্কারপুরীতে নেমেই দিব্যকান্তি গন্ধর্ব্বে পরিণত

হ'ল। বড় হাঁসটি হ'ল শুদ্ধসুর। আর অন্য হাঁসগুলি হয়ে গেল গন্ধর্ব্বের দল। কী সুন্দর তাদের রূপ! পতঙ্গিনীও এসেছিল। বহুবর্ণ বিরাট পতঙ্গ দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। সে গুন গুন করে চারিদিকে উড়ে বেড়াতে লাগল।

বিরাট নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। অম্বুজানন্দ নিষ্ঠাভরে মন্ত্রপাঠ করালেন। মৃণালভুক তার পানে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন শুধু। বিবাহ যখন শেষ হয়ে গেল তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"এইবার আমি বিবাহটা সিদ্ধ করে দিই। মহাদেবের অনুরোধে ইন্দ্রানী শচীদেবী নন্দন কানন থেকে দুটি পারিজাতের মালা পাঠিয়েছেন। সেই মালা দুটি আমি ওদের গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। সেই মালা দুটি ওরা সকলের সামনে বিনিময় করুক। তাহলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনারা সব জয়ধ্বনি করুন।"

তাই হ'ল।...

বিবাহের পর বরবধূ কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখল তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মেয়েকে বিদায় দিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

রত্না বলল—"মা, আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না। রোজ সমস্ত দিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত, তোমার কাছে-কাছেই থাকব। সন্ধ্যার পর চ'লে যাব।"

শুদ্ধসুর গন্ধর্বলোকের সবাইকে পাখী হবার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল। রত্নাকেও শিখিয়ে দিল। বিয়ের পর তারা সারাদিন অলঙ্কারপুরীতেই থাকত। সন্ধ্যা হয়ে গেলে দু'জনে পাখী হয়ে উড়ে চলে যেত গন্ধর্বলোকে।